আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা

চেপে রাখা ইতিহাস

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী
[মুসলিম জাতীয়তাবাদের স্বচ্ছ দিকনির্দেশক]

Chepe Rakha Ityhash
Allama Golam Ahmad Mortaza

"ইতিহাসের আবরণে বর্ণনা করা অনেক বিষয়বস্তুই সত্যিকার ইতিহাস নয়। মনগড়া কাল্পনিক কথা এবং বিদ্বেষের ছড়াছড়িতে অনেক কিছুই ইতিহাসের রূপ ধারণ করেছে এবং কালক্রমে এগুলোই ইতিহাসের পাতায় স্থানান্তরিত হয়ে ইতিহাস নামে আমাদের চিন্তা-চেতনায় স্থায়ী আসন পেতে বসেছে এবং এগুলোই আমরা ইতিহাস বলে বিশ্বাস করে আসছি।" —মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

চেপে রাখা ইতিহাস

(সংশোধিত নতুন সংস্করণ)

এ গ্রন্থটি বংশানুক্রমে প্রতিটি মুসলিম পরিবারে থাকা একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়, যাতে বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম জানতে পারে 'আমাদের বিরুদ্ধে ইতিহাসের অতীত ষড়যন্ত্রটা কি? তাই এর দায়িত্ব আপনি নিজেও গ্রহণ করে অপরকেও এ গ্রন্থটি পাঠ করতে উৎসাহিত করুন। মনে রাখবেন জ্ঞান আহরণ এবং বিতরণে এটিও হবে আপনার একটি নৈতিক দায়িত্ব। লেখকের বহু দিবা এবং বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রম ও সাধনার সুফল এবং সত্যনিষ্ঠ বিবরণে অমুসলিম ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কবি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মুসলিম জাতির প্রতি হিংসা-বিদ্বেষবশত পরিবেশিত ভুল তথ্য এবং প্রচারণার প্রতি এ গ্রন্থটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। আজ ইতিহাসের পাতায় যা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ান হচ্ছে এর অনেকটাই সত্যিকার ইতিহাস নয়। তাই এ গ্রন্থটি যা ইতিহাসের আবরণে সাজান হয়েছে এমন সব বানোয়াট উদ্ভট, বিকৃত চিন্তা ও তথ্যের বিপক্ষে তিল তিল করে সত্য উৎঘাটন করে এ বইয়ের পাতায় পাতায় তা অবতারণা করে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। সত্যান্বেষী পাঠক এ গ্রন্থ পাঠে এসব রহস্য সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাবেন। এ গ্রন্থ সম্পর্কে নিরপেক্ষ সুধী মহলের মতামত দেখুন এবং পরবর্তীতে ইতিহাস বিষয়ক আরও অনেক কিছু নতুন তথ্য জানার জন্য এ গবেষক লেখকের ইতিহাসের ইতিহাস ও বজ্রকলমসহ অন্যান্য বই পড়ুন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা গ্রন্থাগারে সংরক্ষণরাখার প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভব করুন।

আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা

(বর্তমানকালের অন্যতম সংস্কারবাদী ঐতিহাসিক, গবেষক ও সমালোচক)

মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী
২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রোড
মাতুয়াইল, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬২

মু. মো. মে. বি. একাডেমী ইতিহাস সংক্রান্ত প্রকাশনা–৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ শামসুজ্জামান
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশনা পরিচালক
মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী
মাতুয়াইল, কোনাপাড়া, ডেমরা
ঢাকা-১৩৬২

Estd in the Year Feb.-1997

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ২০১০ ইং

বর্ণবিন্যাস
জবা কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে
মোশাররফ হোসেন বিশ্বাস
আল ফয়সল প্রিন্টার্স
৩৪ শিরিশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

প্রাপ্তিস্থান
রিমঝিম প্রকাশনী
বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার মার্কেট (৩য় তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭৩৯২৩৯০৩৯

ISBN : 984-624-003-4

মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম কুরআন ও মুসলমান ১৭
আর্যদের বর্হিভারত থেকে আগমনের তথ্য ১৭
ইসলাম সম্বন্ধে মনীষীদের মতামত ১৮
মুসলিম জাতির মূল্যায়ন ২০
মুসলমানদের ভারত আগমনের তথ্য ৩০
খ্যাতনামা অমুসলমানদের ইসলাম গ্রহণের কথা ৩৬
এক হাতে অস্ত্র ও অপর হাতে শাস্ত্র'র তাৎপর্য ৩৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুহাম্মাদ বিন্ কাসিম ৬৩
সুলতান মাহমুদ ৬৯
মুহাম্মাদ বিন তুঘলক ৭৪
মুহাম্মাদ বিন তুঘলক কি পাগল ছিলেন? ৭৫
মোঘল আলোচনার পূর্বকথা ৭৯
সম্রাট বাবর ৮০
সম্রাট হুমায়ুন ৮২
সম্রাট শেরশাহ ৮৩
সম্রাট জাহাঙ্গীর ৮৫
সম্রাট শাহজাহান ৮৭
সম্রাট আওরঙ্গজেব ৮৯
সম্রাট আকবর ১১৭
'মহামতি'র ইতিহাসে দুর্লভ দলিল ১২৩
আকবরের বিদায় পর্ব ১৩০
শিবাজী ১৩৫
মহীয়সী জেবুন্নেসার বিকৃত চরিত্রের আসল তথ্য ১৪৫
আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মোঘল বাদশাহগণ ১৪৯
সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের চাপা পড়া তথ্য ১৫১
নবাব সিরাজউদ্দৌলার চেপে রাখা ইতিহাসের তথ্য ১৫৪
অন্ধকূপ হত্যা ঃ ইতিহাসের অলীক অধ্যায় ১৫৯
সিরাজের হত্যা কাহিনী ১৬৩

বিষয় **পৃষ্ঠা**
নবাব মীর কাশিম ১৬৫
নবাবদের ইতিহাসে আর একটি সত্য অধ্যায় ১৬৭
মীর জাফর, জগৎশেঠ, দেবীসিংহ ১৬৭-১৬৮
নন্দকুমার, কান্তবাবু, রামচাঁদ ও নরকৃষ্ণ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১৬৯-১৭১
হায়দার আলি ১৭৩
টিপু সুলতান ১৭৫

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকা ১৭৬
প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের চাপা দেয়া ইতিহাস ১৭৯
সৈয়দ নিসার আলী ১৮১
মাওলানা শরিয়তুল্লাহ ১৮৪
মাওলানা আলাউদ্দিন ১৮৫
আলাউদ্দিনের পুত্রদ্বয় ১৮৭
পলাশী যুদ্ধোত্তার বিদ্রোহের ধারা ১৮৭
চেপে রাখা মোপ্‌লা বিদ্রোহ ২১৪

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় বুদ্ধিজীবি ও নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ২১৬
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২১৬
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২২২
রাজা রামমোহন রায় ২২৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২১৪
হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ২৪৪-২৪৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫৩
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৫৭
কাজী নজরুল ইসলাম ২৬১
অরবিন্দ ঘোষ ২৬৫
স্বামী বিবেকানন্দ ২৬৯

পঞ্চম অধ্যায়

সর্বশেষ স্বাধীনতা আন্দোলন ২৭২

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবেকানন্দ নিয়ে বোধবিকৃতি ২৯৪

ভূমিকা

আমাদের দেশে বিকৃত ইতিহাস পরিবেশনের জন্য ইংরেজদের দোষ দেয়া হলেও তাঁদের কূটনৈতিক জ্ঞান ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার কথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁরা বুঝেছিলেন, ইতিহাসে ভেজাল দিয়েই ভারতবাসীকে অন্ধকারে রাখা সম্ভব এবং এ ইতিহাসের মাধ্যমেই হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে। সে উদ্দেশ্যেই ইতিহাস-স্রষ্টা মুসলিম জাতির অক্লান্ত পরিশ্রমের রচনা-সম্ভার আরবী, ফার্সী ও উর্দু ইতিহাসগুলোর প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যয়ন, গবেষণা ও অনুবাদ করতে তাঁরা যে অধ্যাবসায় ও পরিশ্রমশীলতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা অনস্বীকার্য এবং উল্লেখযোগ্য।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়–আব্বাস শেরওয়ানির লেখা তুহফায়ে আকবর শাহী, জিয়াউদ্দিন বারনীর লেখা তারিখে ফিরোজশাহী, আবদুল হামিদখানের বাদশাহনামা এবং মুহাম্মদ আলীর লেখা চাচানামা, ফাতাহনামা ও মিনহাজুল মাসালিকের অনুবাদ করেছেন যুগ্মভাবে মিঃ ইলিয়ট ও মিঃ ডওসন। মিনজাউদ্দিন সিরাজের তাবাকাতে নাসিরির অনুবাদক এইচ, জি রেভার্টি। আলী হাসানের সিয়াসাতনামার অনুবাদক মিঃ শেফার। ইউসুফের কিতাবুল খারাজের অনুবাদ করেছেন মিঃ ই, ফাগনন। আবু তালেব লিখিত মালফুজাতে তাইমুরির অনুবাদ মিঃ মেজর ডাভি। বাইহাকির তারিখে সুবুক্তগীনের অনুবাদক মিঃ ডব্লু,, এইচ, মোরবি। আবুল ফজলের আকবরনামার তৃতীয় খন্ডের অনুবাদ করেছেন মিঃ হেনরী বেভারিজ। আইনই আকবরীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডের অনুবাদ করেছে মিঃ এইচ এস, জারেট এবং প্রথম খন্ডের অনুবাদ করেছেন মিঃ এইচ, লো এবং স্যার ডব্লু হেইগ। মাওয়ার্দির আল-আহ্কামে সুলতানিয়ার অনুবাদ করেছেন যুগ্মভাবে মিঃ স্ট্রেগ ও মিঃ আঘনিডস। বালাজুরির ফাতহুল বুলদানের তরজমা করেছেন মিঃ ডি, কো'জে। আলবিরুনীর কিতাবুল হিন্দের অনুবাদ করেছেন মিঃ ই.সি, সাচান। ইবনুল আসির লিখিত তারিখুল কামিলের অনুবাদক হচ্ছেন মিঃ টর্ণবার্গ। মুসলিম মহিলা ঐতিহাসিক গুলবদন বেগম লিখিত হুমায়ুননামার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন মিসেস বেভারিজ। বাদশা জাহাঙ্গীরের লেখা তুজুকে জাহাঙ্গীরীর অনুবাদক যুগ্মভাবে মিঃ রজার ও মিঃ বেভারিজ। মির্জা হায়দারের লেখা তারিখে রশীদীর ইংরেজী করেছে মিঃ ই,ডি,রস্। কাফি খানের মুনতাখাবুল লুবাবের অনুবাদ করেছেন স্যার ডব্লু হেইগ। হেদায়া'র মত গ্রন্থের অনুবাদ করতেও চার্লস হ্যামিল্টনের আটকায়নি। পর্যটক ইবনে বতুতার পর্যটনের কাহিনী লিখিত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন মিঃ এইচ,এ, আর গিবন প্রভৃতি।

মূল তথ্যের সাথে কোন কায়দায় কোন ভেজাল কিভাবে সংমিশ্রণ করতে হয় এ বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবাদকগণ 'নিপুণ শিল্পী'র পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে–মূল গ্রন্থের ভাষা আরবী, উর্দু, ফার্সী না জানার জন্য ইংরেজীতে অনূদিত বিভিন্ন পুস্তকের সহায়তা নিয়েই এবং শুধু সেগুলোকে কেন্দ্র করেই ভারতের অধিকাংশ সরকারি ইতিহাস রচিত হয়েছে বা হচ্ছে।

আনন্দবাজার, যুগান্তর ও বসুমতীর প্রশংসিত গ্রন্থ 'বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসে'র ইতিহাসের খন্ডে শ্রীধনঞ্জয় দাস মজুমদার লিখেছেন ঃ "ইংরেজগণ তখন শাসকজাতি ছিলেন। ভারতের আর্যগোষ্ঠীর বহির্ভূত পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বাংলার ইংরেজের সংস্কৃতিতিতে অভিজাত' ও বেতনভুক্ত ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রকারগণ তাঁদের ইচ্ছামত শাস্ত্রগ্রন্থের বহু তালপত্র বদলাইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করেন। আবার বহু তালপত্র ধ্বংস করিয়াছেন। এই শাসক গোষ্ঠীর ভারত শাসনের সুবিধার জন্য তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের বহু তথ্য গোপন, বহু তথ্য বিকৃত এবং বহু মিথ্যা প্রক্ষিপ্ত করিয়া যে মিথ্যা ইতিহাস প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার বহু প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। বিভেদের সুযোগে ইংরেজ রাজত্ব চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য তাঁহারা তাঁদের নবাগত হিন্দুদিগকে এইরূপ মিথ্যা ইতিহাস লিখিতে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল।" (পৃষ্ঠা ঃ ৬৬-৬৭)

Goto List

'ইতিহাসে' যে ভেজাল আছে এ শুধু আমার বক্তব্যই নয়, ভারতের বিখ্যাত নেতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের দু' একটি স্থল ঈষৎ পরিবর্তনপূর্বক, কোথাও বা প্রমাণসূত্রটিকে বদলাইয়া সমগ্র গ্রন্থখানিকে 'হিন্দু' করিয়া তোলা হইয়াছে : পরবর্তীকালে ভাষার পরিমার্জনের সাথে সাথে বাঙ্গলার আদি কবি কৃত্তিবাসও 'পরিমার্জিত' হইয়াছেন। কবির কাব্য পরিষ্কৃত করিতে যাইয়া সংশোধকগণ আবর্জনা রাশির দ্বারা কৃত্তিবাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ হইতে মনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়া আনিয়া কৃত্তিবাসে জুড়িয়া দিয়াছেন।" (সমালোচনা সংগ্রহ-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৩-২৮৪)

তাহলে ইতিহাস, সাহিত্য, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে ভেজাল দেয়ার কথা প্রমাণিত হচ্ছে। এছাড়া আর একটি দিক হচ্ছে–সরকারি ইতিহাসের সাথে বেসরকারি ইতিহাসের পার্থক্য কতটুকু। এ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় বলছি ঃ "ইহা কিছুতেই ভুলিলে চলিবে না যে, সরকারি ইতিহাস এবং পণ্ডিতসুলভ (academlc) ইতিহাসের মধ্যে আদর্শ উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকিবেই। সেইজন্য বেসরকারি ইতিহাসের একটি বিশেষ দায়িত্ব হইল সরকারী ইতিহাসের প্রকৃতির উপর দৃষ্টি রাখা। ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিবৃত্তও নিরপেক্ষ গবেষণার কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়া উচিত। হয়ত তাহার ফলে, প্রচলিত কিছু অলীক ধারণা ধূলিসাৎ হইবে। ব্যক্তি বিশেষের প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তার ফলেই প্রমাণ হইবে প্রকৃত ইতিহাস রচনার সার্থকতা।"

শ্রী মজুমদার আরও বলেন ঃ "সাম্প্রতিককালে সরকারি নির্দেশ মত সত্যকে এবং ইতিহাস রচনাশৈলীর মৌল নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়া ইতিহাস রচনার প্রয়াসকে সমর্থন করা যায় না।" (ভারতে ইতিহাস রচনা প্রণালী, পৃষ্ঠা ঃ ৬০-৬১)

এ প্রসঙ্গে এবার বর্তমান ভারতের ইতিহাসের দুজন দিকপালের দুটি উক্তির উদ্ধৃতি দিচ্ছি। শ্রীমতী রোমিলা থাপার বলেন ঃ "স্কুল-কলেজের পাঠ্য ইতিহাসের বই সত্যিই সেকেলে এবং অজস্র ভুল তত্ত্ব ও তথ্যে ভরা। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের অনুমোদন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার কিংবা শিক্ষা পর্ষদের এখতিয়ার। অথচ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিহাসের লোক নন–হয় আমলা, নয় রাজনীতিবিদ, যাঁরা কখনও ইতিহাস পড়েন নি অথবা ৬০/৭০ বছর আগেরকার দু একটা বই মনে করে পড়েছেন। রাজনীতিবিদদের ইতিহাস চেতনার কথা আর নাই বা বললাম, ইতিহাসের মধ্যে নিজের দল গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ খোঁজাই এঁদের কাজ।"

ইরফান হাবিব বলেন ঃ "আমার মতে, ওরা (সরকারি পাঠ্য ইতিহাস লেখকরা) যেসব ধারণা প্রকাশ করছে সেগুলো শুধু সেকেলে নয়, একেবারে আদিম–যা সব সভ্যদেশেই বিস্মৃত হয়েছে–বহু যুগ আগেই।"

মনীষী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক দুঃস্বপ্নের কাহিনী মাত্র।"

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আমাদের দেশের প্রচলিত ইতিহাস সর্বাংশে সঠিক বলে মনে করা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতবর্ষে ক্যান্সারের মত সবচেয়ে বড় ব্যাধি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। আর এ সাম্প্রদায়িকতার তিক্ততা অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেই বেশি প্রকট। এটাকে নির্মূল করতে হলে, আমাদের ধারণায় সর্বাগ্রে সঠিক ইতিহাস পরিবেশন অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া এই দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক জানাজানির, আদান-প্রদানেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

তবে সঠিক ইতিহাস পরিবেশনের পূর্বোহ্নে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ সাধনে ইসলাম, কুরআন ও মুসলমান সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা দেয়া আবশ্যক।

আমরা আলোচ্য গ্রন্থে এ সমস্ত বিবরণই উপস্থাপন করছি। আমীন!

–গোলাম আহমাদ মোর্তজা

Goto List

যাঁদের রচনা বা আলোচনা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে

আদি মানব হযরত আদম (আঃ)
হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)
যীশুখ্রীস্ট; বুদ্ধদেব, গুরুনানক
শ্রীচৈতন্য; রামচন্দ্র; বাল্মিকী
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
হযরত ওমর (রাঃ); হযরত আবু বকর (রাঃ)
মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ)
নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ)
মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (রহঃ)
আচার্য কেশবচন্দ্র
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
রাজা রামমোহন
স্বামী বিকেকানন্দ
ইবনে বতুতা
আলবিরুনী; নিখিলনাথ রায়
শিবনাথ শাস্ত্রী
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্যার যদুনাথ সরকার
ভিলেন্ট স্মিথ; লেইনপুল
ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ
ডক্টর তারাচাঁদ
রমেশচন্দ্র মজুমদার
কালিকারঞ্জন কানুনগো
বিনয় ঘোষ, রোমিলা থাপার
ইরফান হাবিব; ভি.ডি. মহাজন
রতন লাহিড়ী
মেজর বি.ডি. বসু
অরবিন্দ পোদ্দার
যোগেশচন্দ্র বাগল
ডক্টর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রতিভারঞ্জন মৈত্র; সৈত্যেন সেন
মণি বাগচি; গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র
ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন
সুপ্রকাশ রায়; বাদাউনি
জিয়াউদ্দিন বারণী
মিনহাজুদ্দিন সিরাজ
গোলাম হোসেন;কাফি খাঁন
হলওয়েল; ফিলিপ কে.হিট্টি;; গিবন
ডব্লু হেইগ; ম্যাকেনসন
প্রিঙ্গল কেনেডি; মার্শম্যান
উইলিয়ম হান্টার
কার্লমার্কস; লেনিন; এঙ্গেলস
কমরেড মানবেন্দ্রনাথ রায়
কমরেড মুজফফর আহমদ
কমরেড আবদুল হালিম
কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত
কমরেড ই.এম.এস নাম্বুদিরিপাদ
কমরেড জ্যোতি বসু
কমরেড সরোজ মুখোপাধ্যায়
কমরেড যতীন চক্রবতী
কমরেড আবদুল্লাহ রসূল
কমরেড কলিমুদ্দিন শামস্
মহাত্মা গান্ধী
খাঁন আবদুল গফফার খাঁন
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু
মতিলাল নেহরু
জওহরলাল নেহরু
ইন্দিরা গান্ধী; এ.ও হিউম
স্যার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আচার্য কৃপালিনী
বল্লভভাই প্যাটেল
আবুল কালাম আযাদ

এই বই সমৃদ্ধ তাঁদের কয়েকজন

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য
মাওলানা মহম্মদ আলী
মাওলানা শওকত আলী
মহম্মদ আলী জিন্নাহ
চিত্তরঞ্জন দাস
বিদ্যাপতি ঠাকুর
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
ভূদেব মুখোপাধ্যায়
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কাজী নজরুল ইসলাম
দীনবন্ধু মিত্র
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
নবীনচন্দ্র সেন
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
স্যার ইকবাল
মৈত্রেয়ী দেবী
চন্দ্রশেখর সেন
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
ওমর খৈয়াম
হুসেন আহমদ মাদানী
আইনস্টাইন; গ্যালিলিও
জাবির ইবনে হাইয়ান
ভলতেয়ার; রুশো

আল রাজী; শঙ্করাচার্য
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট
মুহাম্মদ বিন কাসিম থেকে
সিরাজউদ্দৌলা
সৈয়দ আহমদ বেলবী (রহঃ)
স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন
অরবিন্দ ঘোষ
বিপিনচন্দ্র পাল
বালগঙ্গাধর তিলক
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ডক্টর শহীদুল্লাহ
মাওলানা মাহমুদুল হাসান
উবায়দুল্লাহ সিন্ধী; বরকতুল্লাহ
মাওলানা আকরাম খাঁন
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
ডক্টর সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
মোহিতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ডক্টর কালিদাস নাগ
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রভাত কুমার মখোপাধ্যায়
মাওলানা আবুল আলা মওদুদী (রহঃ)
জাস্টিস্ আবদুর মওদুদ
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
ডক্টর অমলেন্দু দে
সুরজিৎ দাশগুপ্ত
পূর্ণেন্দু পত্রী

Goto List

‘চেপে রাখা ইতিহাস’ সম্পর্কে স্বীকৃত পণ্ডিতগণের অভিমত

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যায়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য এবং অতিথি অধ্যাপক ডক্টর শোভন লাল মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ “আলোচ্য বইখানি বাংলার, তথা ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে খুবই সহায়ক হবে। লেখক জনাব মোর্তজা সাহেবেকে ধন্যবাদ যে, তিনি ভারতের ও বাংলার ইতিহাসের অনেক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তলেছেন ও নির্ভীকভাবে উপযুক্ত তথ্যাদির সাহায্যে সে ঘটনাগুলোর অনেকগুলোকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য প্রমাণগুলো ভবিষ্যতেও অন্যান্য গবেষকদের কাছে মৌলিক উপদানরূপে খুব কাজে লাগবে। বইটি পড়ে জানবার মত অনেক কিছুই পাঠক খুঁজে পাবেন নিঃসন্দেহে।

তারিখ ঃ ৯ই এপ্রিল, ১৯৮৭

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অমলেন্দু দে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৩.১.৮৮) সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, “লেখক যেসব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা সবই প্রকাশিত গ্রন্থ; কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এসব গ্রন্থের সাথে সুপরিচিত।”

—অমলেন্দু দে

কলকাতা হাইকোর্ট এবং এলাহবাদ হইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত), পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের সম্মানীয় সদস্য জনাব সামসুদ্দিন আহমেদ সাহেব বলেন ঃ “জনাব গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেবের সুলিখিত ‘চেপে রাখা ইতিহাস’ গ্রন্থখানি ইতিহাস পাঠের একটি মূল্যবান সংযোজন। বৃটিশ আমলে রচিত ভারতের ইতিহাস ইংরেজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য লিখিত; ঐতিহাসিক অনেক সত্য উপেক্ষিত বা বিকৃত করে দেখান হয়েছে! এসবের উর্ধ্বে মূল সূত্র থেকে সত্য প্রতিষ্ঠায় মোর্তজা সাহেবের প্রচেষ্টা সত্যই সাহসিক ও প্রশংসা যোগ্য। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

তারিখ ঃ ৯.৮.৯৬

Goto List

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিত মল্লিক বলেন, "গোলাম আহমাদ মোর্তজা প্রণীত 'চেপে রাখা ইতিহাস' বইটি তাঁর দীর্ঘ এবং সময়সাপেক্ষ গবেষণার ফল।"

তারিখ ঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৯২

অধ্যাপক সত্যনারায়ন ব্যানার্জী বলেন, "চেপে রাখা ইতিহাস" পুস্তকটি প্রতিটি শিক্ষিত, বিশেষ করে ইতিহাসের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকের পড়া উচিত। বইটি পড়ে অনেক নতুন তথ্য জানলাম যা আগে জানা ছিল না। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

তারিখ ঃ ২৩শে এপ্রিল ঃ ১৯৮৬

অধ্যাপক শশাঙ্ক শেখর বলেন, "Gllam Ahmed Mortaza known to us as a man well versed in the history of Islam and respected for his erudition and art of eloquency".

Date : 6th December-1988

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী বলেন, "ভারতের মধ্যকালীন এবং আধুনিক ইতিহাসে ইসলাম-এর এবং মুসলমানদের ভূমিকা এবং স্থান অতি বিশিষ্ট। এ তথ্যকে যাঁরা অবহেলা করেন, তাঁরা ইতিহাসকে চেপে রাখেন। এ গ্রন্থে এটি লেখকের প্রধান যুক্তি। এ যুক্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন। বিভিন্ন উৎস থেকে তিনি তথ্য আহরণ করেছেন। বস্তুতঃ ভারতের মধ্যকালীন এবং আধুনিক ইতিহাসের হিন্দু-সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা এবং সে ব্যাখ্যাতে ইসলাম-এর এবং মুসলমানদের বিদূষণ বিকৃত রুচির পরিচয় বহন করে। তা গ্রাহ্য হতে পারে না। এটি লেখকের (এবং আমাদেরও) যুক্তি। এখন এ কথার উপরেই জোর পড়ুক; বিভিন্নতা বিচ্ছিন্নতা মিলিয়ে যাক।"

তারিখ ঃ ৩রা সেপ্টেম্বর-১৯৯২ ॥ রমাকান্ত চক্রবর্তী ॥

কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'চেপে রাখা ইতিহাসে'র লেখক প্রচুর পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছেন। এই পুস্তক বহু বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। পুস্তকটি প্রশংসার দাবী রাখে।"

তারিখ ঃ ৭ই অক্টোবর-১৯৮৬ শ্রী-ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

Goto List

বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভাত কুমার সামন্ত বলেন, "ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে কোন ছাত্র ও শিক্ষকের পক্ষে এই বইটি অবশ্য পাঠ্য। ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য ভবিষ্যত গবেষণার খোরাক জোগাবে।"

বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ. রায় বলেন, "Undoubtedly he hi a wellread scholar specialising in the history of Muslim religion. The approach of the author is non-communal and his efforts for preserving amity among people of different religions are praiseworthy. In a problem ridden country like ours, men like Golam shmed Mortaza should be encouraged by all for his well thought out ideas about secularity showing repect to various relgions including islam."

Date : 16th November-1987

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীগোলকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "চেপে রাখা ইতিহাস" গ্রন্থটি রাজনীতি ও ইতিহাসের ছাত্রদের খুবই উপযোগী। গ্রন্থটি এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কুসংস্কাররাচ্ছন্ন মনটিকে পরিশুদ্ধ করার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি আশা করা যায়। সেদিক থেকে বইটি সর্বজন পঠিত হলে সমাজ জীবন আরও উন্নততর হবে নিশ্চিত আশা করা যায়। বইটি বহুল প্রচারিত হোক এ কামনাই করি।"

কলকাতার মৌলানা আজাদ (গভঃ) কলেজের অধ্যাপিকা উত্তরা চক্রবর্তী বলেন, "জ্ঞানচর্চা এবং বৈষয়িক বিদ্যালোচনায় আরব পণ্ডিতদের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। ধর্মভিবিভক্ত ভারতীয় সমাজের নিম্নবর্ণের অত্যাচারিত জনসমষ্টি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তাড়নায় যে অনেক বৌদ্ধ ইসলামের আশ্রয় নিয়েছিল, ইতিহাস এ তথ্য অস্বীকার করেনি। চিত্রকুটের কাছে রামঘাটের বালাজী মন্দির বা বিষ্ণুমন্দির যে ঔরঙ্গজেবের তৈরী এটি নতুন তথ্য। ঔরঙ্গজেব যে হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না এ কথাও ঐতিহাসিক ভাবেই সত্য।"

তারিখ ঃ নভেম্বর-১৯৯৬ উত্তরা চক্রবর্তী

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক শিবকালী মিশ্র বলেন, "মত প্রকাশের বলিষ্ঠতা, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও বাস্তবধর্মিতা বিশেষভাবে মনকে নাড়া দেয়। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

তারিখ ঃ ১৯শে জানুয়ারী-১৯৯০ শ্রীশিবকালী মিশ্র

Goto List

অর্পণ

অনুসন্ধিৎসু, সত্যান্বেষী পাঠক-পাঠিকার
করকমলে–

লেখকের অন্যান্য বই

❒ ইতিহাসের ইতিহাস (বাজেয়াপ্ত) / ৩০০.০০
❒ পুস্তক সম্রাট / ৮০.০০
❒ এ সত্য গোপন কেন? / ৮০.০০
❒ বজ্র কলম / ২৫০.০০
❒ এ এক অন্য হাতিহাস / ৩০০.০০
❒ ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় / ১৫০.০০
❒ বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ১০০.০০
❒ চেপেরাখা ইতিহাস / ৩০০.০০

প্রকাশকের কথা

ইতিহাসকে জাতির দর্পণরূপে আখ্যায়িত করা হয়। এ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় যে কোন একটি জাতির অতীত কর্মময় জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কর্মকান্ডের সাফল্য ব্যর্থতা, দোষ-ক্রটির প্রতিচ্ছবি। এ রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক কর্মতৎপরতা সব সময়ই যে সাফল্যের গৌরবের চিহ্ন বহন করবে এ কথাও সঠিক নয়। এতে থাকতে পারে ক্রটি-বিচ্যুতির গভীর ক্ষত-চিহ্ন। এতে অনুরণিত হয়ে উঠতে পারে, না-পাওয়ার শত-সহস্র মৌন-বেদনা। এ সাফল্য ও ব্যর্থতাকে বুকে নিয়েই ইতিহাস কথা বয়ে নিয়ে যায় কাল থেকে কালান্তরে। উত্তরাধিকারীরা ইতিহাসের এ রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ঘটনাবলীর চুলচেরা বিশ্লেষণে ভুল-ক্রটি পরিহার করে নতুন যাত্রা পথের সন্ধান পায়। এ কারণে ইতিহাসকে একটি জাতির উৎস ভূমিও বলা যায়। কালের যাত্রাপথে আমাদের ইতিহাস অতি প্রাচীন আর আমরা জাতি হিসেবে গৌরবোজ্জল ঐতিহ্যের অধিকারী। আমাদের ইতিহাসে রয়েছে কিংবদন্তীতুল্য কাহিনী এবং অবদান।

ইতিহাস কেবল অতীতের অন্ধকারে ফেলে আসা ঘটনাবলীর সমাহার নয়। কালের প্রেক্ষিতে অতীতের কোন এক অধ্যায়কে ধারণ করে থাকলেও তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া ও দূর্ণীরীক্ষ বর্তমানকে অতিক্রম করে অনন্ত ভবিষ্যত অবধি কার্যকারণসূত্রে ঘটনা-পরম্পরায় ক্রিয়াশীল থাকে। বলা চলে, কি ব্যক্তি জীবনে, কি সমাজ জীবনে, ইতিহাস পিছন থেকে নির্দেশনা দান করে চলমান ব্যক্তি বা জাতিকে পথের দিশা দিয়ে থাকে। সমৃদ্ধ ইতিহাসের উজ্জ্বল আলো সঠিক কৌণিক অবস্থান থেকে সম্পাতিত হলে তাতে যেমন অভ্রান্ত পথের সন্ধান মিলে তেমনি ভাবী পথচারিদের পথ-পরিক্রমণও সহজ হয়। এখানেই ইতিহাস ও ইতিহাস সম্বলিত ঐতিহ্যের গুরুত্ব। কোন জাতির ইতিহাস না থাকা দুঃখজনক। কিন্তু ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও যে জাতি আপন ইতিহাস জানে না তারা সত্যিই হতভাগ্য।

ইতিহাসের সঠিক তথ্য সম্পর্কে তাঁদের অনেকেই সচেতন নয় বিধায় ইতিহাসে পরিবেশিত বর্ণনা বা তথ্যকে ধ্রুব সত্য বলে মনে করে বিভ্রান্ত হন। তাই অনুরূপভাবেই কুরআন সুন্নাহর প্রকৃত মর্যাদা ও গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে চান না। তাই সব কিছুকেই একাকার ও সম পর্যায়ের ভেবে ইতিহাস এবং কুরআন সুন্নাহ উভয়ের প্রতি অবিচার করে থাকে। আমরা ভুলে যাই, কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বর্ণনার নির্ভুলতা, নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হতে হবে। বলাবাহুল্য ইতিহাস আমাদিগকে এ নিশ্চয়তা দান করতে পারে না। কেননা ইতিহাস বহুরূপী কখনও একচোখা। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানসিকতার প্রভাব এড়িয়ে চলার সাধ্য ইতিহাসের নেই এ জন্যই আমরা একই ঘটনার পরস্পর বিরোধী বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই, একই চরিত্রের বিভিন্ন চিত্র অংকিত হয় ইতিহাসের তুলিতে। একের তুলিতে যে ব্যক্তিত্ব যে চরিত্র অনন্য সাধারণ, মহিমাময় মহান, অন্যের তুলিতে সে চরিত্র কুৎসিত, কদর্য শয়তানের প্রতিক, এমন দৃশ্য ইতিহাসের বেলায় নিত্য-নৈমিত্তিক সত্য। বন্ধুর তুলিতে অতি কুৎসিত চরিত্রও অনিন্দ সুন্দর আবার শত্রুর তুলিতে অতি সুন্দর চরিত্রও অতি কুৎসিত হয়ে থাকে। তাই সঠিক ইতিহাসের সত্য তথ্য উদ্ধার করা অতি কঠিন। এজন্য জ্ঞানীরা বলেন, ইতিহাস জানা যত সহজ ইতিহাস বুঝা ততই কঠিন। অনেক সময় আমরা পুস্তকের পাতায় দেখতে পাই ঐতিহাসিকরা একজনকে কখনো ডুবিয়েছে, ভাসিয়েছে, উঠিয়েছে, নামিয়েছে। তাই অনেক সাধ্য, সাধনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেও কেহ ইতিহাসের প্রকৃত সত্য যে কি তা সুনিশ্চিত এবং সঠিক

Goto List

করে বলতে পারেন না। ইতিহাসের এ ছলনা, গোলক ধাঁধায় আটকে তাই অনেকেরই ভরাডুবি হয়েছে। শত সাধ্য করেও ইতিহাসের বর্ণনায় অনেক সময় সন্ধেহাতীত এবং সঠিক বলে এ জন্যই মন্তব্য করা যায় না। মানব জীবনে ইতিহাসের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই, এমন কথা বলা সঠিক হবে না। শুধু এটুকুই বলা যায় ইতিহাসের পথ বড়ই পিচ্ছিল। মুহূর্তের অসাবধানতায় পদে পদে একবারে বিভ্রান্তির গহীন খাদে পতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে, তাই ইতিহাসের সংগীন পথে পথিককে অতি সতর্কতার সাথে চলতে হয়।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, জগতে মানবীয় মর্যাদা ও খ্যাতির সাথে সত্যের ভারসাম্য খুবই সামান্য রক্ষিত হতে দেখা যায় । আশ্চর্যের বিষয়, যে ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা এবং খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে যত বেশি উন্নত হন, তাকে কেন্দ্র করেই তত বেশী অলীক কল্প-কাহিনীর সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এজন্য ইতিহাস বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনকারী ইবনে খালদুন বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, যে ঘটনা পৃথিবীতে যত বেশী খ্যাতি ও জনপ্রিয় হবে, কল্প-কাহিনীর অলীকতা তত বেশী তাকে আচ্ছন্ন করবে। পাশ্চাত্যের কবি গ্যাটে এ সত্যটিকে অন্য কথায় বলেন, মানবীয় মর্যাদার সর্বশেষ স্থল হল কল্প-কাহিনীতে রূপান্তর লাভ........। আজ যদি কোন সত্য সন্ধানী কেবলমাত্র ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিচার করে ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনা পাঠ করতে চান তাহলে তাকে প্রায়ই নৈরাশ্য বরণ করতে হবে। ....এমনকি ইতিহাসের আবরণে বর্ণনা করা কিছু বিষয়বস্তু যা ইতিহাসের নামে সংকলিত হয়েছে তার অধিকাংশই ইতিহাস নয়। মনগড়া পক্ষপাতিত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুই ইতিহাসের রূপ ধারণ করেছে।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ 'চেপে রাখা ইতিহাস' এমনই একটি গ্রন্থ যাতে মুসলমানদের ইতিহাসকে যৌক্তিক আলোচনা করে সত্যিকার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। তাতে দেখান হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান, ইংরেজ বিতাড়নে মুসলমানদের ভূমিকা, ইত্যাদি নানান বিষয়। মুসলমানদের ইতিহাস বেশীর ভাগ বিকৃত করা হয়েছে উপমহাদেশে ইংরেজ আগমনের কাল থেকে। এবং এখানে মদদ জুগিয়েছিল বেশীর ভাগ হিন্দুরাই। ধুরন্ধর ইংরেজ জাতি এ দেশে আগমনের পরেই তারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। তারা সফলতার লক্ষ্যে নানানভাবে হিন্দুদের এবং কোথাও মুসলমানদের দ্বারা এ গর্হিত কাজটি সফলতার সাথে করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই নানান পদবী ,সম্মানজনক সম্মানী প্রদানে তাদের নির্দেশিত ইতিহাস রচনার ফাঁদে অনেকেই ধরা দিয়েছিল। ইংরেজ জাতি চলে গেলেও সে ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে যা আলোচ্য পুস্তকের পাতায় পাতায় আলোচনা করা হয়েছে।

পলাশী যুদ্ধের পর, ইংরেজ দস্যুদের জুনিয়র পার্টনার সেকালের রাজা মহারাজা গোষ্ঠীর বংশধর কোলকাতায়ী বাবু বুদ্ধিজীবীরা মিলিতকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন, "বাঙ্গালার কোন ইতিহাস নেই।" সুতরাং সিনিয়র পার্টনার ইংরেজ কর্মচারীদের আত্মপক্ষ সমর্থনে লেখা "সাফাই"-তথ্য অবলম্বনে প্রথম বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করেন হিন্দু জাগরণের বৃটিশপোষ্য পুরোধা পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র, ১৮৪৮ সালে। বাংলার আসল ইতিহাসকে অস্বীকার করে বানোয়াট ইতিহাস বানানোর যে উদ্যোগ বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রহণ করেন তাকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে হিন্দু পুনর্জাগরণের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আহবান জানান বাবু বুদ্ধিজীবীদের কাছে, "বাঙ্গালার কোন ইতিহাস নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইবে। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব। আমরা সকলে মিলিয়া লিখিব।" সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা লিখেছেনও। বাংলার ধ্বংসপ্রাপ্ত মুসলমান সমাজের বুকের উপর দাঁড়িয়ে তারা এক শতাব্দী

ধরে রাশি রাশি বানোয়াট দলীয় রঙ্গীন সূত্রে রচনা করেছেন ইতিহাসের । এ কাহিনী পূর্ণরূপ লাভ করে চলতি শতকের চল্লিশের দশকে, তৎকালীন কোলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাবু অধ্যাপকদের হাতে। তাই তারা এক দিকে সাড়ে পাঁচ শত বছর ব্যাপী মুসলিম শাসনামলের উজ্জ্বল দিকগুলোকে পাইকারীভাবে বাদ দিয়ে সর্বক্ষেত্রে সাধ্যমতো কলংক লেপন করেছেন এবং অন্যদিকে ইংরেজ শাসনামলে বৃটিশ-বর্ণহিন্দু যৌথ অভিযানে বাংলার মুসলমানদের ধ্বংস করার কাহিনীও গোপন করে গেছেন।

ত্রিশ-চল্লিশ দশকের যে দু-একজন মুসলিম সন্তান তাদের কাছে ইতিহাসের পাঠ গ্রহণের সুযোগ পান তারাও বাধ্য ছিলেন বাবুদের লেখা ইতিহাস মুখস্ত করে পরীক্ষায় ভাল ফল লাভের প্রয়োজনে তাদের মনোরঞ্জন উপযোগী উত্তরপত্র লিখতে।

তবু চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত কিছু সংখ্যক মুসলমান ঐতিহাসিকের মনে বাবুদের বানোয়াট ইতিহাস প্রতিবাদের ঝড় তোলে। তাঁদের মধ্যে ড. আবদুর রহীম, ড. মোহর আলী, ড. হাসান জামান, ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, ড.আবদুল করীম, ড. এ, আর, মল্লিক, অধ্যাপিকা লতিফা আখন্দ, ড. সুফিয়া আহমদ, ড. শীরিন আখতার, ড. এনায়েতুর রহমান, ড. মঈনউদ্দিন খান, ড. এম, এফ, ইউ, মোল্লা ড. বজলুর রহমান খান প্রমুখ কয়েকজন কঠিন পরিশ্রম করে বাংলার ইতিহাসের যে তথ্যাবলী তুলে ধরেছেন, তাতে দিকপাল বাবু ঐতিহাসিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক চেহারা অত্যন্ত নগ্ন ও উৎকটভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু বেদনাদায়ক হলেও সত্য যে এদের উদ্ধার করা তথ্যাবলী এখনো বাংলার মুসলিম তরুণদের হাতে পৌঁছানো হচ্ছে না। সাম্প্রতিক ও সমকালীন রাজনৈতিক ও অন্যবিধ কারণে বাবুদের রচিত বানোয়াট ইতিহাসেরই চর্বিত-চর্বণ এদেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে গলধঃকরণ করিয়ে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করা হচ্ছে।

এমন কি বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের চলতি শতকের ইতিহাসও বৃটিশ-বর্ণহিন্দু চক্রান্তের দরুণ ব্যাপক বিকৃতির হাত থেকে রেহাই পায়নি।

আমি নিজে ইতিহাসের পন্ডিত বা ছাত্রও নই, একজন উৎসাহী পাঠক মাত্র। পাক ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস পড়তে গিয়ে যে প্রশ্নগুলো আমাকে পীড়া দিয়েছে, তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরো কিছু পড়াশোনা করেছি, চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং সে চিন্তা-ভাবনাগুলোকে তুলে ধরেছি এ আশায় যে, বাংলার তরুণ সমাজ এ থেকে নিজেদের বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল ইতিহাস, পূর্ব পুরুষের সৌর্য-বীর্যে মাহাত্ম্যমন্ডিত পরিচয় এবং নিকট অতীতে পরাক্রান্ত প্রতিবেশীদের মোকাবিলায় নিজেদের অসহায় পিতামহদের মর্মন্তুদ সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর পরিপূর্ণ চিত্র উদ্ধারের প্রেরণা পাবেন।

এ কাজে বাংলার মাত্র কয়েক ডজন তরুণকেও যদি অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয়, আজকের ষড়যন্ত্রের এ উর্ণাজাল ফুৎকারে মিলিয়ে যাবে, এ বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট অবশ্যই কেটে যাবে। আর তা হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। তবে আল্লাহর অসীম রহমতে আশাতীত অল্প সময়েই আমাদের এ অনধিকার চর্চা ফলপ্রসু হবার আলামত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বড় বিলম্বে হলেও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিহাস বিভাগের অনেক শিক্ষক বর্তমানে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। এ কাজে যারা অনবদ্য অবদান রেখেছন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ড. মহর আলী। তাঁর রচিত গ্রন্থ History of Muslim Bengal (পৃ. ১-১১১) এ সমস্ত বানোয়াট ইতিহাসের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। কিন্তু বইটি ইংরেজি বিধায় বইয়ের তথ্য সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয়। এ গ্রন্থটি মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ রিসার্চ একাডেমীর তরফ থেকে বাংলায় রূপান্তর করার ইনশাআল্লাহ ইচ্ছা রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রখ্যাত ভারতীয় ইতিহাস গবেষক ও সমালোচক আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা–তাঁর ইতিহাস বিষয়ক রচিত গ্রন্থ্ ইতিহাসের ইতিহাস, বজ্র কলম এবং চেপে রাখা ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক প্রাচীন ফারসী, ইংরেজী., আরবী, উর্দু, বাংলা, হিন্দি, প্রভৃতি গ্রন্থ্ থেকে বহু পুরাতন দুর্লভ তথ্য উদ্ধার করেছেন, যা এতকাল লোক চোখের অন্তরালে ছিল। আমাদের ইতিহাস অর্থাৎ মুসলমানদের ইতিহাস ইসলাম বিদ্বেষীরা কিভাবে বিকৃত করেছে সে তথ্যই আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। এতে আশা করা যায় বর্তমান ও আগামী দিনের পাঠক এবং গবেষকরা অনেক সত্য নির্দেশনাই পাবেন এবং তখন তাদের কাছে সত্য অসত্যের দ্বার উন্মোচিত হবে।

এ ব্যাপারে যে সাম্রাজ্যবাদের এ দেশীয় সহায়তাকারীদের রচিত 'ইতিহাস গ্রন্থে' মুসলমানদের ইতিহাসের সঠিক চিত্র মেলেনা।" এখানেও বিভ্রান্তি। বর্তমানকালের গবেষণায় যখন অনেক অজানা তথ্য বের হতে শুরু করছে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন বাবুদের বানোয়াট ইতিহাস সৃষ্ট বিভ্রান্তি থেকে জাতি রেহাই পাবে। তাই আমরা এ লেখকের বইগুলো প্রকাশ করে দেশ এবং জাতির সামনে উপস্থাপন করছি। এতে আশা করা যায় অতীত ইতিহাসের অনেক বানোয়াট কাহিনীর পরিসমাপ্তি হবে।

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিগত ২০০২ সনের ডিসেম্বরে এ লেখকের গবেষণাধর্মী লেখা 'চেপে রাখা ইতিহাস' বইটি স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে আল্লামা উপাধি প্রদান করে তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে দেশ ও জাতি আরো তথ্যপূর্ণ লেখা পাওয়ার আশা পোষণ করছেন।

বিনীত—

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী —মোহাম্মদ শামসুজ্জামান
ঢাকা, ১৭-১-২০০৩ ঈসায়ী

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম, কুরআন ও মুসলমান

ইসলাম একটি ধর্ম ও ইজম্-এর নাম। আদি মানব হযরত আদম (আঃ) ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এ ইসলাম আরও পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সময়। তাঁর ৫৭০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বে আগমন এবং ৬৩২ খৃষ্টাব্দে হয় পরলোকগমন। ইসলাম ধর্মীয় মতানুসারে কুরআন 'সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব' বা গ্রন্থ। আর শেষনবী (সাঃ)-এর বাণী, কাজ-কর্ম এবং সমর্থিত মতামতগুলো হাদীসের মধ্যে গণ্য। যাঁরা ইসলাম ধর্ম তথা কুরআন ও হাদীসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন তাঁরাই মুসলমান।

অত্যান্ত পরিতাপের বিষয়, নানা পুস্তক, প্রবন্ধ, নাটক, চলচিত্রে সংবাদপত্র এবং প্রচার মাধ্যম রেডিও, টি, ভি প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতজনমানসে দেখান হয়েছে এ মুসলমান জাতি বিদেশী, বাকী সব স্বদেশী; অতএব তারা আমাদের মিত্র নয়। অবশ্য সারা ভারতবাসীই যে এ চক্রান্তের শিকার হয়েছেন তা অবশ্যই নয়। সরিষার মত ছোট একটি বটের বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে যেমন বিরাট বিশালবপু বৃহৎ একটি বটের গাছ, তেমনি এ ভেদটুকুর ভিতর লুকিয়ে আছে বিরাট অকল্যাণ। এর সংক্ষেপে সমাধান হচ্ছে মুসলমান স্বদেশী না বিদেশী। এ নিয়ে বিষমন্থন না করে মনে রাখা ভাল, ভারতে মুসলমান আগমন এবং আর্য আগমন অভিন্নভাবে বিচার্য।

আর্যদের বহির্ভারত থেকে আগমনের তথ্য

"আর্যদের সম্বন্ধে ব্যাবিলনীয় ও এশিয়া-মাইনরের প্রাচীন ভাষায় লেখা যে সব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাই এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উল্লেখ। এ উল্লেখ হতে অনুমতি হয় যে, উত্তর হতে ককেসাস পর্বত পার হয়ে, অথবা উত্তর-গ্রীসে মেসিডন ও থ্রেস প্রদেশ হয়ে, কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে উত্তর এশিয়া-মাইনরের পথ ধরে মেসোপোতামিয়া ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে আর্যদের আগমন ঘটে।" (বিনয় ঘোষ, ভারতজনের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৭০)

"কেহ কেহ মধ্য এশিয়ার বদলে পূর্ব ইউরোপকে আর্যদের আদি বাসকেন্দ্র বলেন।" (দ্রষ্টব্য ঐ লেখকের ঐ-গ্রন্থ)

আর্য এবং মুসলমান জাতি যাঁরা নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষায় ভারতে এসে, এখানে বাস করছেন, উন্নতি অবনতির শেষ ফল অর্থাৎ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি ভারতেই রেখে শ্মশান কিংবা কবরের মাটিতে নিজেদের মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁরাই স্বদেশী। আর ইংরেজ, তাঁরাই এসেছিলেন ভাগ্য পরীক্ষা করতে। তাঁরা বণিকের বেশে তুলাদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত করে ভারত দখল করে ভারতের সম্পদ, শস্য, অর্থ যতটা সম্ভব নিংড়ে নিয়ে চলে গেছেন নিজেদের দেশে। তাঁরা বৃটেনকে করেছেন অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। অতএব তাঁরা বিদেশী হলেও কোনক্রমেই মুসলমান ও আর্যজাতি বিদেশী নয়।

Goto List

ইসলাম সম্বন্ধে অমুসলিম মনীষীদের মতামত

ভারত তথা পৃথিবীর খ্যাতনামা অমুসলিম মনীষীরা ইসলাম সম্বন্ধে সুধারণা পোষণ করতেন এবং করেন। মিঃ জি. স্যি. ওয়েল্‌স বলেছেন–আরবদের ভিতর দিয়েই মানুষ জগত তার আলোক ও শক্তি সঞ্চয় করেছে। .....ল্যাটিন জাতির ভিতর দিয়ে নয়।"

মেজর আর্থার গ্লীন লিনওয়ার্ড বলেন–"আরববাসীদের উচ্চ শিক্ষা সভ্যতা ও মানসিক উৎকর্ষ এবং তাদের উচ্চ শিক্ষার প্রণালী প্রবর্তিত না হলে ইউরোপ এখনো অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকত। বিজেতার উপর সদ্ব্যবহার ও উদারতা তাঁরা যে প্রকার প্রদর্শন করেছিলেন তা প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক।"

পাদ্রী আইজ্যাক টেলর বলেন–"জগতের বহু দেশ ব্যাপী ইসলাম ধর্ম খৃষ্টধর্ম অপেক্ষা সাফল্য লাভ করেছে। সর্বক্ষেত্রে খৃস্টধর্মের প্রচার ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতিকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে, এমনকি যে স্থানসমূহে পূর্বে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে, এমনকি যে স্থানসমূহে পূর্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত ছিল তাও ক্রমশঃ খৃষ্টধর্মের প্রচারকগণের প্রভাবমুক্ত হতে আরম্ভ করেছে। মরক্কো হতে জাভা এবং সম্প্রতি পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্বীয়প্রভাব বিস্তার করে ইসলামধর্ম সুদীর্ঘ পদবিক্ষেপে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা প্রভৃতি সকল মহাদেশই অধিকার করতে অভিযান আরম্ভ করেছে।"

সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেন–"আমার আশা হয় অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত দেশের শিক্ষক প্রাজ্ঞমণ্ডলীকে সম্মিলিত করে কোরআনের মতবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করে জগতে একতামূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। কারণ একমাত্র কোরআনই সত্য এবং মানবকে সুখ ও শান্তির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম।" বলাবাহুল্য, তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বেই এ মন্তব্য।

স্যার উইলিয়ম মূর বলেন–"সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অধীন সিরিয়াবাসী খৃষ্টানগণ যেভাবে বাস করেছিলেন আরব মুসলমানদের অধীনে তাঁর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করেছিলেন।"

ঐতিহাসিক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেন–"ইসলামের বিশ্বজনীনত্বের সৌন্দর্যে মুগ্ধ মানবগণ আজ ধরায় এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাদের ভাব ও ভাষার আদান প্রদান করতে এবং কর্মের যোগসূত্র স্থাপন করতে প্রয়াসী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বক্ষব্যাপি এ সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন–তাও ইসলামের উদার শিক্ষার প্রকৃষ্ট অবদান।

আজ যদি জগতের লোক সে বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংসার পথে বিচরণ করতে পারে, সে পূর্ণকীর্তির চরিত্রকথা যদি সর্বত্র প্রচারিত হয় তা হলেই আইন-কানুনের শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য হাজার হাজার প্রহরী নিযুক্ত করার কোন আবশ্যকতা থাকবে না। তা হলে হিংসা, দ্বেষ, কলহ, বিষাদ ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে যাবে। যদি তার উদাহরণে আপনার চরিত্রকে গঠিত করতে পারে, যদি সে ভাবোচ্ছ্বাসে চালিত হয়, তারই সুশীতল ছায়ায় বসে শান্তির ধারা প্রবাহিত করতে পারে তাহলে এ ভারতে স্বাধীনতার পথে কে অন্তরায় হতে পারে? তা হলে কখনও অশান্তির উদয় হয়না।"

ভারতের ব্রহ্মধর্মের নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র বলেন–"যখন কোন বিশ্বাসী স্বর্গের ঈশ্বরের সাথে সংগ্রাম করে, তাঁর সিংহাসন বিপর্যস্ত এবং তাঁর পৃথিবীর রাজ্য ধ্বংস করতে যত্ন করে, ঈশ্বরের প্রত্যেক যথার্থ সৈনিক ঈশ্বরের জয় পতাকা হাতে করে যুদ্ধ করতে অগ্রসর

না করে অবিশ্বাস উপহাস বিমর্দ্দিত হবে। ভারতের ব্রহ্মবাদীগণ যেন নিরন্তর এ প্রেরিত পুরুষের সম্মান করতে পারেন এবং তিনি স্বর্গ হতে যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের সংবাদ আনয়ন করেছেন যে তা গ্রহণ করতে সমর্থন হন।" (মহাজন সমাচার, পৃষ্ঠা ১২৭ – ১২৯)

পরিব্রাজক ব্যারিস্টার চন্দ্রশেখর সেন লিখেছেন–"কেবলমাত্র ষোল বছরের বালক হযরত আলীকে ও বিবি খাদিজাকে সাথে করে যিনি সংসারে সনাতন ধর্ম প্রচার করতে সাহসী ও প্রবৃত্ত হন এবং সে প্রচারের ফলে সহস্রাধিকবর্ষ পৃথিবীর অর্ধেক স্থান ব্যাপি এ ধর্ম চলছে। তিনি ও তাঁর সে ধর্ম যে বিধাতা প্রেরিত তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।" (ভূ-প্রদক্ষিণ, ৫২৫ পৃষ্ঠা)

শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় বলেন—"Leaming from the Muslim Eurpoe became the leader of modern Civilization..." [Historical Role of Islam] ঃ অর্থাৎ মুসলিম শিক্ষার প্রভাবেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার নেতা হতে পেরেছে।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন–"জগতের বুকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট গণতন্ত্রমূলক ধর্ম। প্রশান্ত মহাসাগর হতে আরম্ভ করে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত সমস্ত মানবমণ্ডলীকে উদার নীতির একসূত্রে আবদ্ধ করে ইসলাম পার্থিব উন্নতির চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে।"

ডক্টর তেজ বাহাদুর সাপ্রু বলেন–"হিন্দুদিগকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্মের কতিপয় মূলনীতি–আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও মানবের বিশ্বজনীনত্ব।"

শ্রীভুদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন–"হিন্দু স্বধর্ম বিধেয়রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই বিধাতা মুসলমানকে শাস্তারূপে এ দেশে পাঠিয়েছিলেন।"

গুরু নানক বলেন–"বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে; এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ। মানুষ যে অবিরত অস্থির এবং নরকে যায় তাঁর একমাত্র কারণ এটা যে, ইসলামের নবীর প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা নেই।"

শ্রীজওহরলাল নেহেরু বলেন–"হযরত মুহাম্মদের প্রচারিত ধর্ম, এর সততা, সরলতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং এর বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমতা ও ন্যায়নীতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকেদের অনুপ্রাণিত করে। কারণ এ সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবত একদিকে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল; অপরদিকে ধর্মীয় ব্যাপারে নির্যাতিত নিষ্পেশিত হচ্ছিল পোপদের হাতে। তাঁদের কাছে এ ইসলাম বা মুহাম্মদের নীতি নূতন ব্যবস্থা ছিল মুক্তির দিশারী।"

শ্রীমহাত্মা গান্ধী বলেন–"প্রতীচ্য যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত, প্রাচ্যের আকাশে তখন উদিত হল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আর্ত পৃথিবীকে তা দিল আলো ও স্বস্তি। ইসলাম একটি মিথ্যা ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সাথে হিন্দুরা অধ্যয়ন করুক তাহলে আমার মতই তাঁরা একে ভালবাসবে।"

শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ বলেন–"ইউরোপে সর্বপ্রধান মনীষীগণ–ইউরোপের ভলটেয়ার, ডারউইনি, বুকনার ফ্লমারিয়ঁ, ভিক্টর হুগো-কুল বর্তমানকালে ক্রিশ্চানী দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত; অপরদিকে এ সকল পুরুষকে ইসলাম বিবেচনা করেন যে, এ সকল পুরষ আস্তিক,

কেবল এদের নবীর-বিশ্বাসের অভাব। ধর্ম সকলের উন্নতির বাধকত্ব বা সহায়কত্ব বিশেষ রূপে পরীক্ষিত হোক, দেখা যাবে ইসলাম যেথায় গিয়েছে, সেথায়ই আদিম নিবাসীদের রক্ষা করেছে। সেসব জাত সেথায় বর্তমান। তাঁদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান।

ইউরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তাঁর প্রত্যেকটি খৃষ্টান ধর্মের বিপক্ষে বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ক্রীশ্চানীর শক্তি থাকত তাহলে 'পাস্তের' (Pasteur) এবং 'ককে'র (Koch) ন্যায় সকলকে জীবন্ত পোড়াত এবং ডারউইন-কল্পদের শূলে দিত। এর সাথে ইসলামের তুলনা কর। মুসলমান দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের উপরে সংস্থাপিত এবং ইসলামের ধর্মশিক্ষকরা সমস্ত রাজকর্মচারীদের বহুপূজিত এবং অন্য ধর্মের শিক্ষকেরাও (তাঁদের নিকট) সম্মানিত।" (দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকের ১১৭, ১১৮ ও ১১৯ পৃষ্ঠা)

মুসলিম জাতির মূল্যায়ন

ভারতের হিন্দু-মুসলমান জাতি এক সূত্রে বাঁধা। যদিও ধর্ম পৃথক তবুও মিলনমৈত্রী, দেশের সু-গঠন, সংরক্ষণ বা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এ দুটি সম্প্রদায় মস্তক ও দেহের মত সংযুক্ত। তবুও অনেকে মনে করেন ভারতে আরও জাতি এবং ধর্ম রয়েছে, সুতরাং মুসলমানদেরকে এত গুরুত্ব দেয়ার কোন যুক্তি নেই।

হিন্দু জাতির পাশে মুসলমানদের চিন্তা করতে যে উপকরণ ও বৈশিষ্ট্য মেলে, অন্য ক্ষেত্রে তা মেলে না। আমরা জানি ইংরেজ শাসকগণ বিদেশী, কারণ তাঁরা এদেশকে নিজের দেশ বলে মনে করতে পারেন নি। তাঁরা শাসনের নামে শোষন করে ভারতীয় সম্পদ নিজের দেশে নিয়ে স্বদেশকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। আর বাবর, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আলমগীর, শেরশাহ এঁরা এদেশকে স্বদেশ প্রমাণ করেছেন—অন্য কোন দেশে ভারতের ধনরত্ন নিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন তা নয়। অবশ্য যেসব মুসলমান নৃপতি ভারত আক্রমণ করে এখানকার সম্পদ নিয়ে নিজের দেশে জমা করেছেন তাঁদের বিদেশী বলতে কারো আপত্তি নেই।

এ মুসলিম জাতির সাথে ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তুলনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে অনেক ব্যবধান।

মুসলমান জাতি সাতশত বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতের প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলমান জাতি ছাড়া ভারতে আর কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এ উন্নতির উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারেননি। যদি শক্তিশালী ইংরেজকেও তুলনার জন্য টেনে আনা হয় তাহলে দেখা যাবে ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরা শাসন চালাতে পেরেছেন, অর্থাৎ ২০০ বছরেরও কম।

স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকের ১১৫ পৃষ্ঠা থেকে তুলে ধরছি—ইউরোপের উদ্দেশ্য সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকব, আর্যদের উদ্দেশ্য সকলকে আমরা সমান করব। ইউরোপের সভ্যতার উপায়– তলওয়ার; আর্যের উপায়—শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান—বর্ণবিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু।"

স্বামী বিবেকানন্দ আরও বলেন, "দেখা যাবে ইসলাম যেথায় গিয়েছে, সেথায়ই আদিম নিবাসীদের রক্ষা করেছে। সেসব জাত সেথায় বর্তমান। তাঁদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান।" (দ্রঃ ঐ, পৃষ্ঠা ১১৮)

স্বামীজির কথার সত্যতা চিন্তা করলেই দেখা যাবে হাজার বছর ধরে মুসলমানদের প্রশাসন চললেও ভারতের কোন জাতি ও ধর্মকে তাঁরা শেষ করে দেননি, যদি এ মতলব তাঁদের থাকত তাহলে ভারতে একটিও অমুসলমান থাকার কথা নয়। আজ যদি এ ধারণা হয়–ভারতবাসীকে সব এক ধর্মীয় জাতিতে পরিণত করতে হবে, তাতে ধর্মান্তরকরণ, বিতাড়ণ অথবা পরকালে প্রেরণ যেটি যেখানে প্রয়োজন–তাহলে নিসন্দেহে বলা যায় এ সাংঘাতিক সংকল্পের সাথে বিগত পৌনে এক হাজার বছর রাজত্ব করা মুসলমানদের মানসিকতার তুলনা করলে শ্রদ্ধায় হৃদয় হৃষ্ট ও নমনীয় হয়ে ওঠে।

ভারতের শুধু সংখ্যালঘু জাতিই নয়, যে কোন জাতির সাথে মুসলমানদের তুলনা করলে দেখা যাবে তাঁরা শুধু ভারতীয় জাতিই নন বরং বিশ্ব বা জাগতিক জাতি। কারণ ভারতের সমস্ত মুসলমান যদি কোনভাবে শেষ হয়েও যান তবুও পৃথিবীতে এ জাতি ও ধর্মের বিলুপ্তি ঘটবে না। কারণ, আরব, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও উগাণ্ডার মত গণ্ডা গণ্ডা দেশ আছে, যেখানে মুসলমান সংখ্যাধিক্য। তাছাড়া সারা বিশ্বে এমন কোন রাষ্ট্র নেই যেখানে মুসলমান জাতি স্থায়ীভাবে যুগ যুগ ধরে বাস করছে না।

মুসলমান সভ্যতা বিশ্বের উন্নতির সর্ববিভাগে এমন সৃজনশীলতা আবিস্কারের জনক হয়ে আছে যা ঐতিহাসিক সত্য। বিজ্ঞান বিভাগে দৃষ্টি দিলেই দেখা যায়, রসায়ন বা কেমিস্ট্রির জন্মদাতা মুসলমান। রসায়নের ইতিহাসে জাবিরের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ছোটখাট জিনিস ধরলে তো ফিরিস্তি অনেক লম্বা হয়ে যাবে। বন্দুক, বারুদ, কামান, প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্রের আবিস্কারও তাঁদেরই অবদান। যুদ্ধের উন্নত কৌশল ও বারুদ বা আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে বিখ্যাত আরবী গ্রন্থ তাঁরাই লিখেছেন বিশ্ববাসীর জন্য। সেটির নাম 'আলফুরুসিয়া ওয়াল মানাসিব উল হারাবিয়া। ভূগোলেও মুসলমান অবদান এত বেশি যা জানলে অবাক হতে হয়। ৬০ জন মুসলিম ভূগোলবিদ পৃথিবীর প্রথম যে মানচিত্র এঁকেছিলেন তা আজও বিশ্বের বিস্ময়। আরবী নাম হচ্ছে 'সুরাতুল আরদ', যার অর্থ হচ্ছে বিশ্বের আকৃতি। ইবনে ইউনুসের অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা মণ্ডল নিয়ে গবেষণার ফল ইউরোপ মাথা পেতে মেনে নিয়েছিল। ফরগানী, বাত্তানি ও আল খেরজেমি প্রমুখের ভৌগলিক অবদান স্বর্ণমণ্ডিত বলা যায়। কম্পাস যন্ত্রের আবিস্কারকও মুসলমান। তাঁর নাম ইবনে আহমদ। জলের গভীরতা ও সমুদ্রের স্রোত-মাপক যন্ত্রের আবিস্কারক ইবনে আবদুল মাজিদ। বিজ্ঞানের উপর যে সব মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় আজও তা বিজ্ঞান জগতের পুঁজির মত ব্যবহৃত হচ্ছে। ২৭৫ টি গবেষণামূলক পুস্তক যিনি একাই লিখেছেন তিনি হচ্ছেন আলকিন্দি। প্রাচীন বিজ্ঞানী হাসান, আহমদ ও মুহাম্মদ সম্মিলিতভাবে ৮৬০ সনে বিজ্ঞানের একশত রকমের যন্ত্র তৈরির নিয়ম ও ব্যবহার প্রণালী এবং তাঁর প্রয়োজন নিয়ে গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

চার্লস ডারউইন পশু-পক্ষি, লতা-পাতা নিয়ে গবেষণা করে পৃথিবীতে প্রচার করেছেন 'বিবর্তনবাদ'। কিন্তু তাঁরও পূর্বে যিনি এ কাজ করার রাস্তা করে গেলেন এবং ইতিহাসে সাক্ষ্য রেখে গেলেন, তিনি হচ্ছেন আল আসমাঈ। তঁর বইগুলো অস্বীকার করার উপায় নেই। ৭৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় এবং ৮২৮ খৃষ্টাব্দে হয় তাঁর পরলোকগমন। মুসলমানরাই পৃথিবীতে প্রথম চিনি তৈরি করেন। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুজাম আল উবাদা'র লেখক হচ্ছেন ইয়াকুব ইবনে আবদুল্লাহ ৭০২ খৃষ্টাব্দে তুলা থেকে তুলট কাগজ প্রথম সৃষ্টি করেন ইউসুফ ইবনে উমর। তার দু'বছর পর বাগদাদে কাগজের কারখানা তৈরী হয়।

জাবীর ইবনে হাইয়ান–ইস্পাত তৈরী, ধাতুর শোধন, তরল বাষ্পীকরণ, কাপড় ও চামড়া রং করা, ওয়াটার প্রুফ তৈরী, লোহার মরিচা প্রতিরোধক বার্ণিশ, চুলের কলপ ও লেখার পাকা কালি সৃষ্টিতে অমর হয়ে রয়েছেন। ম্যাঙ্গানিক ডাই অক্সাইড থেকে কাঁচ তৈরীর প্রথম চিন্তাবিদ মুসলিম বিজ্ঞানী 'আররাজী'ও অমর হয়ে আছেন। ইংরেজদের ইংরাজী শব্দে এ বিজ্ঞানীর নাম Razes লেখা আছে।

একদিকে তিনি ধর্মীয় পণ্ডিত অপরদিকে গণিতজ্ঞ ও চিকিৎসা বিশারদ ছিলেন। সোহাগা, লবণ, পারদ, গন্ধক, আর্সেনিক ও সালমিয়াক নিয়ে তাঁর লেখা ও গবেষণা উল্লেখযোগ্য। আরও মজার কথা, পৃথিবীতে প্রথম পানি জমিয়ে বরফ তৈরী করাও তাঁর অক্ষয় কীর্তি। ইউরোপ পরে নিজের দেশে বরফ প্রস্তুত কারখানা চালু করে।

পৃথিবী বিখ্যাত গণিত বিশারদদের ভিতর ওমর খৈয়ামের স্থান উজ্জ্বল রত্নের মত। ঠিক তেমনি নাসিরুদ্দিন তুসী এবং আবুসিনার নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আকাশ জগত পর্যবেক্ষণ করার জন্য বর্তমান বিশ্বের মানমন্দির আছে বৃটেনে এবং আমেরিকায় কিন্তু কে বা কারা এগুলোর প্রথম আবিষ্কারক প্রশ্ন উঠলে উত্তর আসবে হাজ্জাজ ইবনে মাসার এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক। এঁরাই পৃথিবীর প্রথম মানমন্দিরের আবিষ্কারক। সেটা ছিল ৭২৮ খৃষ্টাব্দ। ৮৩০ খৃষ্টাব্দে জন্দেশপুরে দ্বিতীয় মানমন্দির তৈরী হয়।বাগদাদে হয় তৃতীয় মানমন্দির। দামেস্ক শহরে চতুর্থ মানমন্দির তৈরী করেন আল মামুন।

আর ইতিহাসের ঐতিহাসিকদের কথা বলতে গেলে মুসলিম অবদান বাদ দিয়ে তা কল্পনা করা খুবই মুশকিল। এমনকি, মুসলমান ঐতিহাসিকরা কলম না ধরলে ভারতের ইতিহাস হয়ত নিখোঁজ হয়ে যেত। অবশ্য ইংরেজ ঐতিহাসিকদের সংখ্যাও কম নয়। তবে একান্তভাবে মনে রাখার কথা, ইতিহাসের স্রষ্টা বিশেষতঃ মুসলমান। তার অনুবাদক দল ইংরেজ ঐতিহাসিকরা আর আমাদের ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব ইংরাজীর অনুবাদ করেছেন। যে কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক কিংবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক অন্ততঃ 'জানিনা' বলতে পারবেন না, নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, মূল ঐতিহাসক বেশির ভাগই মুসলিম। যেমন–আলবিরুণী, ইবনে বতুতা, আলিবিন হামিদ, বাইহাকীম, উত্বী, কাজী মিনহাজুদ্দিন সিরাজ, মহীয়ুদ্দিন, মুহাম্মদ ঘোরী, জিয়াউদ্দীন বারণী আমীর খুসরু, শামসী সিরাজ, বাবর, ইয়াহিয়া-বিন-আহমদ, জওহর, আব্বাস শেরওয়নি, আবুল ফজল, বাদাউনি, ফিরিস্তা, কাফি খাঁ, মীর গোলাম হুসাইন, হুসাইল সালেমী ও সইদ আলী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। আরও লম্বা ফিরিস্তি হলে অসহিষ্ণু পাঠক পড়তে বিরক্তি বোধ করবেন, তাই ঐতিহাসিকদের নাম ছেড়ে দিয়ে বিখ্যাত বিখ্যাত মূল ইতিহাস গ্রন্থের নাম জানাচ্ছি। অন্তত একবার পাঠকবর্গের পবিত্র রসনার পরশে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের আত্মা ধন্য হোক।

তারিখেই সিন্ধু, চাচানামা, কিজাবুল ইয়ামিনি, তারিখে মাসুদী তারিখে-ফিরোজশাহী, তারিখুল হিন্দ, তা'জুম্মাসির, তবকত-ই-নাসিরী, খাজেনুল ফতোওয়া, ফতোওয়া উস সালাতিন, কিতাবুর রাহ্‌লাব, তারিখে মুবারক শাহী, তারিখে সানাতিনে আফগান, তারিখে শেরশাহী, মাখজানে আফগান, আবকরনামা আইনি আকবরী, মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ, মুনতাখাবুল লুবাব, ফতহুল বুলদান, আনসাবুল আশরাফ ওয়া আখবারোহা, ওয়ুনুল

আখইয়ার, তারিখে ইয়াকুব, তারিখে তাবারী, আখবারুজ্জামান, মারওয়াজুজ জাহ্বাব, তামবিনুল আশরাফ, কামিল, ইসদুল গাবাহ্, আখবারুল আব্বাস, কিতাবুল ফিদ-আ, মুয়াজ্জামুল বুলদান প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থগুলোর নাম পৃথিবী যতদিন থাকবে মুছে যাবে বলে মনে হয় না। সাধারণ পাঠক পাঠ করতে বিরক্তি বোধ করলেও লেখক সাহিত্যিক, নবযুগের বা আগামী যুগের ঐতিহাসিকদের জন্য এসব তথ্য পূর্ণ নামগুলোর মূল্য যে অপরিসীম, তা অস্বীকার করা যায় না।

পৃথিবীর বুকে সভ্যতার আলোকবর্তিকা গোড়া হচ্ছে ‘কলম’, তার পরের ধাপ হচ্ছে গ্রন্থ প্রণয়ন, গ্রন্থাগার নির্মাণ এবং বিদ্যালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, মহাবিদ্যলয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি।

মুসলমান ও আরব সভ্যতা এ বিষয়ে কতটা অগ্রসর ছিল তার সামান্য আভাষ দিচ্ছি। মুসলমান সভ্যতা কেন এদিকে ঝুঁকেছিল তার কারণ কুরআনে যে সাড়ে ছয় হাজারের বেশি বাক্য রয়েছে তার মধ্যে প্রথম বাক্যটি হচ্ছে ‘[illegible] তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন’ আর তৃতীয় বাক্যে আছে, ‘পড় যিনি তোমাদের কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।’

তাছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও আরবীতে যা বলেছেন তার মর্মার্থ হচ্ছে ‘যে জ্ঞানার্জন করে তাঁর মৃত্যু নেই’, ‘চীনে গিয়ে হলেও জ্ঞান অনুসন্ধান কর’, ‘প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ইল্‌ম বা বিদ্যা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য’, ‘সমগ্র রাত্রির উপাসনা অপেক্ষা এক ঘণ্টা জ্ঞান চর্চা করা উত্তম’, ‘যে জ্ঞানীকে সম্মান করে সে আমাকে সম্মান করে।’

সুতরাং নবী (সাঃ)-এর কথার ফলাফল তাঁর জীবদ্দশাতেই আরম্ভ হয়ে পরবর্তীকালে বাগদাদ, মিশরের কায়রো সালেনা ও কর্ডোভায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠল।

(দ্রঃ The Spirit of Islam লেখক সৈয়দ আমীর আলি, পৃষ্ঠা ৩৬১ – ৩৬২)

আদর্শ তালিবি ইলম বা বিদ্যানুসন্ধিৎসু দল হিসেবে তাঁরা ছিলেন পৃথিবীর উন্নত মার্গে।

(দ্রঃ History of the Arabs, পৃষ্ঠা ২৪০, ছাপা ১৯৫১, লেখক Philip Hitti)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরলোকগমনের ১১৮ বছর পর ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা তথা স্পেন হতে আরম্ভ করে একেবারে ভারতের সিন্ধুনদ পর্যন্ত ইসলাম সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। (দ্রঃ বিজ্ঞানের ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৯)

আরব সভ্যতার ধারক ও বাহকরা শুধু দেশ জয়ই করেননি, বরং সেখানে মুসলমান পণ্ডিতদের বসিয়েছেন গবেষণা করতে এবং গ্রন্থাগার ভর্তি করেছেন নতুন ও পুরাতন পুঁথিপত্র ও পুস্তক সম্ভারে। (দ্রঃ ঐ পুস্তকের ১১০ পৃষ্ঠা)

মানুষের স্মরণশক্তি চঞ্চল সেহেতু হয়ত ভুল করে কেহ মনে করতে পারেন শুধু মুসলিম গুণগান এত কেন? তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি, যারা মনে করেন ভারতের সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েব মত মুসলিমরা একটা অন্যতম জাতি, তাঁরা মনে রাখবেন মুসলিম শুধু ভারতের নয় বরং বিশ্বের বুকে সর্বজাগতিক জাতি বলে গণ্য নয় কি, সে বিচারের ভার সুধী সমাজের।

গ্রন্থ বা পুস্তক সংগ্রহ মুসলমানদের জাতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। বন্দরে বন্দরে লোক প্রস্তুত থাকত, কোন বিদেশী এলেই তাঁর কাছে যে বইপত্রগুলো আছে সেগুলো নিয়ে অজানা তথ্যের বইগুলো সাথে সাথে অনুবাদ করে তার কপি তৈরি করে তাঁর বই ফেরত দেয়া হত আর তাঁদের অনিচ্ছা না থাকলে তা কিনে নেয়া হত। (দ্রঃ Guide to the Use of Books and Libraries (Megrow Hill, 1962),পৃষ্ঠা ১২)

হযরত উমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা অভিযোগ আছে যে, তাঁর আদেশে আমর ইবনুল আস্ আলেকজেন্দ্রিয়া লাইব্রেরীর লাখ লাখ গ্রন্থের গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দেন। কিন্তু এ কাহিনীটি কোন ক্রমেই সঠিক নয়, কারণ আমর আলেকজেন্দ্রিয়া দখল করেন ৬৪২ খৃষ্টাব্দে, এ সময়ের পূর্বে লাইব্রেরীটির অস্তিত্বই ছিল না। (প্রমাণ-এর জন্য Mackensen এবং Ruth Stellhom-এর লেখা দ্রষ্টব্য)

তাছাড়া মিঃ গীবন বলেছেন–'আরবরা বিধর্মীদের গ্রন্থাদি বিনষ্ট করা পছন্দ করতেন না। তাঁদের ধর্মীয় নীতি একটা সমর্থন করে না।' (দ্রঃ গ্রন্থাগারের ইতিহাস (মধ্যযুগ) শামসুল হক, পৃষ্ঠা ৩২)

এ প্রসঙ্গে মিঃ হিট্টি বলেছেন–'ওটা কিংবদন্তি হতে পারে তবে ইতিহাস হিসেবে বর্জনযোগ্য' (দ্রঃ History of the Arabs পৃষ্ঠা ১৬৬)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবী হযরত আলী প্রশাসন, বিদ্রোহ দমন প্রভৃতি প্রয়োজনে কর্মব্যস্ত থাকলেও তাঁর চেষ্টায় কুফার জামে মসজিদ জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দেশ ও বিদেশের ছাত্রেরা সেখানে জ্ঞানার্জন করার জন্য ছুটে যেতেন। হযরত আলী (রাঃ) স্বয়ং ছিলেন সেখানকার অধ্যক্ষ। (দ্রঃ মুজীবর রহমানের লেখা 'হযরত আলী পুস্তকের ৩৬০ পৃষ্ঠা, ছাপা ১৯৬৮)

হযরত উমরের একশত বছর পরে বাগদাদে প্রথম পাবলিক লাইব্রেরী পরিদৃষ্ট হয়। (প্রমাণ ঃ Pinto, Olga প্রণীত The Libraries of the Arabs During the Time of the Abbasids, Islamic Culture, April 1929. পৃষ্ঠা ৬০)

উমাইয়া বংশের আমলে ব্যাকরণ লেখা, ইতিহাস লেখা এবং স্থাপত্য বিদ্যার অগ্রগতি শুরু হয়। মিঃ হিট্টির মতে উমাইয়া আমল হচ্ছে উন্নতির যুগে 'ডিমে তা দেয়ার যুগ'। (দ্রঃ History of the Arabs পৃষ্ঠা ২৪০)

হযরতের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যখন পরলোকগমন করেন তখন এক বড় উট বোঝাই বই রেখে গিয়েছিলেন, গবেষকদের চিন্তা করতে হবে, তখন বই সংগ্রহ করা এ যুগের মত সহজ ছিল না, কারণ সবই ছিল হাতের লেখা। (প্রমাণ ঃ মাওঃ নূর মুহাম্মদ আজমীর 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস' পুস্তকের ৮১ পৃষ্ঠা, ১৯৬৬)

হযরত আবু হুরাইরার সাথে বহু গ্রন্থ পাওয়া গেছে, নূর মুহাম্মদ সাহেব যেগুলোকে খাতা বলেছেন। নবী (সাঃ)-এর একটা তরবারীর খাপে অনেক পুস্তিকার উপকরণ সংরক্ষিত ছিল। (দ্রঃ উপরের ঐ গ্রন্থ)

আরবের বিখ্যাত বক্তাদের সারা জীবনের সমস্ত বক্তৃতাগুলো লিখে নেয়ার মত লেখক ও প্রেমিকের অভাব ছিল না। লিখতে লিখতে কাগজ ফুরিয়ে গেলে জুতার চামড়াতে লেখা হত। তাতেও সঙ্কুলান না হলে হাতের তালুতে লিখতেও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। (দ্রঃ ঐ গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৮৫)

Goto List

সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বক্তার মুখ এবং মস্তিষ্ক নিঃসৃত বাণী লিখে সংগ্রহ করেছিলেন আবু আমর ইবনুল আ'লা যা একটি ঘরের ছাদ পর্যন্ত ঠেকে গিয়েছিল। (প্রমাণ : Encyclopaedia of Islam Vol-I P. 127)

খলিফা মামুনের বিরাট গ্রন্থাগারের লাইব্রেরীয়ান ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খারেজেমি। ইনিই পৃথিবীতে প্রথম বীজগণিতের জন্মদাতা। তখনকার যুগে গ্রন্থাগারিক পদটি পাওয়া খুব কঠিন ছিল, কারণ তাঁকে অত্যন্ত পাণ্ডিত্য এবং স্মরণশক্তির অধিকারী, চরিত্রবান, মধুরভাষী ও পরিশ্রমী হতে হত। সে সময় পৃথিবীর মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠতম গণিতজ্ঞ। তিনি এ অভিজ্ঞতা শুধু বই পড়েই অর্জন করেননি বরং বিশ্বপর্যটনও ছিল তার কারণ। তিনি ভারতেও এসেছিলেন বলে অনেকের ধারণা। ভারতের বহু ছাত্রকে তাঁর জ্ঞানাংশ দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিভার বীজ বপন করেন। আর একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতে সে যুগে যা কিছু গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন তা তিনিও গ্রহণ করেছিলেন। কারণ পর্যটনের উদ্দেশ্যই ছিল জ্ঞান সঞ্চয়। তিনি ভারতের বিষয় বর্ণনা করে 'কিতাবুল হিন্দ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আরও মনে রাখার কথা, অঙ্ক বিভাগের শূন্যের মূল্য অমূল্য এবং অপরিসীম। এ শূন্যের (০) জন্মদাতাও তিনি। 'হিসাব আল জাবার ওয়াল মুকাবেলা' গ্রন্থ তাঁর বিরাট অবদান। তিনি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদও ছিলেন। খলিফার অনুরোধে তিনি আকাশের একটি মানচিত্র আঁকেন এবং একটি পঞ্জিকার জন্ম দেন। তাঁকে সরকারি উপাধি দেয়া হয়েছিল 'সাহিব আলজিজ' বলে। (প্রমাণঃ সমরেন্দ্রনাথ সেনের লেখা বিজ্ঞানের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৬, ১৩৬৪)

আলমুকাদ্দাসি একজন ঐতিহাসিক এবং পর্যটক। তিনি বলেন—আদাদ্‌উল্লাহ সিরাজ শহরে এমন একটি লাইব্রেরী করেছিলেন, যে অট্টালিকাটির তখন পৃথিবীতে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ছিল না। যা দেখলে মূর্খ শিক্ষিত যে কোন জন মুগ্ধ না হয়ে পারত না। ভবনটির ভিতরে অগভীর জলের নহর দিয়ে সাজান ছিল, উপরে ছিল গম্বুজ আর অট্টালিকাটি উদ্যানি দিয়ে ঘেরা ছিল, তৎসংলগ্ন একটি হ্রদ ছিল। পাঠকদের সুবিধার জন্য কাঠের মাচান বা কাঠের তাক একেবারে নীচে হতে উপর পর্যন্ত সাজান ছিল, মেঝেতে কার্পেট সাদৃশ্য বিছান বিছান থাকত। আলোর ব্যবস্থাও ছিল। সমস্ত পুস্তকের ক্যাটালগ ছিল। তিনি আরও বলেন, সেটা ছাড়াও সেখানে আরও গ্রন্থাগার ছিল। (প্রমাণ : Pinto, Olga লিখিত পূর্বের পুস্তকের ২২৮ পৃষ্ঠা)

সব্বরের একাডেমী সংলগ্ন গ্রন্থাকাগারটিতে বই ছিল ১০৪০০ খানি। সবগুলোই হাতে লেখা ইয়াকুত ও অন্ধ কবি আল মা'রি যেসব বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলো ব্যবহার করেছেন তাতে সেকালের সংবাদে একালের লোকও অবাক না হয়ে পারে না।

এবার ইউনিভারসিটি ও কলেজের দুএকটা উদাহরণ দিতে চাইছি। বাগদাদে ১০৬৫ খৃষ্টাব্দে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয় আর শেষ হয় ১০৬৭ খৃষ্টাব্দে এটির প্রতিষ্ঠাতা নিজাম-উল-মুলক। তাঁর কিছু দোষ ত্রুটিও যেমন ছিল গুণও ছিল তাঁর সাগরের মত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বেও অনেক মাদ্রাসা বা শিক্ষানিকেতন তৈরী হয়েছিল। তবুও এটা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

এখানে ছেলেরা মাসিক বৃত্তি পেত। অধ্যাপকগণ মিম্বরের মত উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন। ছাত্রদের প্রশ্ন করে উত্তর শুনতেন। দেশ-বিদেশের ছাত্রদের সংখ্যা এত ছিল যে উচ্চকণ্ঠের ঘোষক চীৎকার করে অধ্যাপকদের কথা জানিয়ে দিতেন।

এ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন পৃথিবী বিখ্যাত লাইব্রেরীও সগৌরবে শোভিত হয়েছিল। ১১১৬ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানের চারিদিকে আগুন লেগে যায়। কোনরকমে গ্রন্থগুলো সরিয়ে ফেলা হয় বটে কিন্তু প্রতিষ্ঠান ভয়াবহ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইবনুল জাওজী বলেন, তাঁর ক্যাটালগগুলো বড় সুন্দরভাবে সাজান ছিল, তার মধ্যে একটা ক্যাটালগের বই-এর সংখ্যাই ছ'হাজার।

(প্রমাণ ঃ Abdus Subbuh : Libraries in the Early Islamic World (Reprinted from Journal of the University of Peshwar No–6. 1958) P.8)

মাদ্রাসা মুসতান্‌সিরিয়া নামে এখানেই আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। অনেকের মতে সুলতান আল মুসতানিসিরের উদ্দেশ্য ছিল উপরোক্ত শিক্ষালয়ের সম্মান ম্লান করা। তবুও শিক্ষক, ছাত্র ও প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য-গর্বে সেটাকে নিষ্প্রভ করা সম্ভব হয়নি। (Mackensen-এর লেখা পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪১১)

মোঙ্গল নেতা হালাকু খান ১২৫৮ খৃস্টাব্দে বাগদাদ আক্রমণ করে নগর ও খলিফার বংশ ধ্বংস করে দেয় . অনেকে মনে করেন হালাকু বুঝি মুসলমান। কিন্তু আসলে তা নয়, বরং তাঁরা নরপিশাচ শ্রেণীর শক্তিশালী লুণ্ঠনকারী এবং তাঁরা জাতিতে ছিল অমুসলমান ১৩২৭ খৃস্টাব্দে ইবনে বতুতা যখন বাগদাদ পর্যটন করেন সে সময়টা ছিল হালাকুর আক্রমণের ৭০তম বছর। তিনি এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বর্ণনা করে গেছেন। (Travels of Ibne Botuta, Vol–II, P 332, 1962)

৯৭০ খৃস্টাব্দে আফ্রিকার কায়রো বা মিশরে আলআযহার নামে একটি বিরাট মসজিদ নির্মিত হয়। আল আজিজ তার সাথে একটি একাডেমী তৈরী করেন পরে সেটা উন্নতির শেষ ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এখনও সেটা বর্তমান। সে সময় সে গ্রন্থাগারে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ১৮,০০০। আমরা যেন ভুলে না যাই, তখন এত সহজে ছাপা বই পাওয়ার মত পরিবেশ ছিল না।

১০০৪ খৃস্টাব্দে আল হাকিম 'দারুল ইলম'-এর উদ্বোধন করেন। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন-হাদীস, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ ও চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিমাসে বেশ কয়েকবার বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হত। (দ্রঃ Shalaby, Ahmad-এর লেখা History of Muslim Education, পৃষ্ঠা ১০১)

আজকের একটা আধুনিক গ্রন্থাগার সামনে রেখে হাজার বছর আগের লাইব্রেরীগুলো মিলিয়ে দেখলে মুসলিম সভ্যতার দান ও মানের পরিমাপ করা সহজ হবে।

আল হাকিমের সময়ে গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ছিল ম্যানেজার প্রচুর কর্মচারী, পিওন, দারোয়ান প্রভৃতি। সেটা পরিচালনার জন্য সে যুগের খরচার একটা তালিকার উল্লেখ আছে। তখন সে দেশের স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল 'দীনার'। 'আবদানী' বা মাদুরের মূল্য বাবদ ১০ দীনার, লিপিকারদের কাগজ বাবদ ৯ দীনার, গ্রন্থাগারিকের জন্য ৪৮ দীনার, পানির জন্য ১২ দীনার, চাকর বাবদ ১৫ দীনার, কাগজ-কলম-কালি ১২ দীনার, পর্দা মেরামত ১ দীনার, বই মেরামত ও নষ্ট পাতা উদ্ধারের জন্য ১২ দীনার, শীতকালে ব্যবহারের জন্য ফেল্টের পর্দা ৫ দীনার, শীতকালে ব্যবহারের জন্য কার্পেট বাবদ ৪ দীনার। (দ্রঃ শামসুল হকের লেখা গ্রন্থাগারের ইতিহাস ঃ মধ্যযুগ, পৃষ্ঠা ১৩৫)

অষ্টম শতকে খলিফা হারুনের সময় বাগদাদ, সিরিয়ার দামেস্ক, ত্রিপলি ও হামায় কাগজের কল স্থাপিত হয়। অতএব এ কথা অত্যন্ত সত্য মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের আগে কাগজকল সাহিত্যিক তৎপরতায় নতুন যুগের দারোদ্‌ঘাটন করে। অতএব বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা এ অবদান অস্বীকার করতে পারেন না।

মিশরের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আরও যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছিল, তার সবগুলো মুসলিম সভ্যতার সাক্ষ্য দেয়। যেমন ঃ কার্ডোভা, গ্রানাডা, টলেডো, মার্সিয়া, আলমেরিয়া, সেভিল, ভ্যালেনসিয়া, কাদজে বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলো ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্মদাতা বলা যায়। অবশ্য ইংরেজরা তাদের লেখায় পরিষ্কারভাবে তা স্বীকার করেছেন যেমন মিঃ নিকলসন বলেছেন, মুসলমানদের কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যায় স্পেন, ফ্রান্স, ইটালী এমনকি জার্মানীর জ্ঞান সাধকদের চুম্বকের মত টেনে আনত। (দ্রঃ Nichoison এর লেখা History of the Arabs পুস্তকের ৪১১ পৃষ্ঠা, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণ, ১৯৬২)

আগেই জানান হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষা হচ্ছে 'বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য'। মুসরিম বলতে পুরুষ ও নারী উভয়কেই বুঝায়। সুতরাং হযরতের সময়ে মহিলাগণও কবিতা, কাব্য সাহিত্য এবং কুরআন-হাদীসে যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন সে কথা অনেকের জানা আছে। যেমন হযরতের স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) একজন উচ্চস্তরের হাদীসবিদ ও বিদূষী ছিলেন।

স্পেন দেশে যখন ইসলামী সভ্যতা পৌছাল তখন শুধু পুরুষরাই জ্ঞান চর্চায় এগিয়ে এসেছিলেন তা নয় বরং মেয়েরাও অনগ্রসর ছিলেন না। যেমন বিখ্যাত মহিলা লাবানা, ফাতিমা, রাজিয়া, খাদিজা, আয়েশা প্রভৃতি। কেউ যেন মনে না করেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্ত্রী-কন্যা তাঁরা। তাঁদের নামগুলোর সাথে নবি সাহেবের পরিবারের নামের মিল আছে। মাত্র। এর থেকে বুঝা যায় এ সমস্ত বিদুষী মহিলাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভক্ত ছিলেন। এমনিভাবে 'রাদেয়া' নামে এক সুপণ্ডিত মহিলা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেনএযহেতু তখন বই ছাপার প্রেস ছিল না তাই হাতে লেখার উপর নির্ভর করতে হত জ্ঞান অনুসন্ধানকারীদের। তাই জ্ঞানী পুরুষদের বাড়ীর মেয়েরা স্ত্রী-কন্যা বোনেরা সে কাজে সহযোগিতা করতেন। অতএব লেখায় আরও হাত পাকাত, তাছাড়া যে তথ্য কেউ নিজে হাতে লিখে বা কপি করে অবশ্যই সেটা তার একবার নয় একাধিকবার পড়ার সমতুল্য হয়ে যায়।

আরবে অত্যন্ত প্রাচীনকালে লেখাপড়ার চর্চা ছিল—পুরাতন আরবী সাহিত্য ও পুঁথিতে তার প্রমাণ আছে। যেমন 'সালমা' নামে এক বালিকার বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং দোয়াতে কলম ডুবিয়ে কালি নিয়ে খেলার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বুঝা যায় বিদ্যালয়, কলম ও দোয়াতের সাথে তাদের পরিচয় ছিল। (দ্রঃ ডক্টর হামিদুল্লার রেখা 'আহদে নববী কা নেযামে তালিমের' পৃষ্ঠা ৯)

কবি. গায়ক ও সাহিত্যিকের প্রতিভা প্রবল হলেও আকস্মিক দুর্ঘটনা হলে সে মুহূর্তে প্রতিভা স্থবির হয়ে যায়। কিন্তু আরববাসীদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ব্যাপার ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে আরবদেরশে উট চালকরা একরকম কবিতা বলে উটদের উত্তেজিত করে. ফলে

Goto List

উটোর খুব দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকে। মধুর বিন নাযার নামে এক আরবী যুবক উটের পিঠ হতে পড়ে গেলে তাঁর হাত ভেঙ্গে যায় এবং তখনই হাতের দুঃখে তিনি কাব্র করে কাঁদছিলেন। সাথে সাথে উটটা আরও ছুটতে থাকে। তখন থেকে উটকে দ্রুতগামী করার জন্য এ কবিতা ব্যবহার করা হয়রযব' ছন্দে তা বলা হয়ে থাকে (দ্রঃ জুরজী যয়দান লিখিত তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা, ১ম খণ্ড, মিশরে ১৯৫৯ তে ছাপা, পৃষ্ঠা ৬৪ ও ৬৫ এবং ইবনে সা'দের লেখা আততবকাত্ কুবরা, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২২)

কাব্য, কবিতা, সাহিত্য ও ছড়ায় আরববাসীরা বিশ্ববিখ্যাত ছিলেন। তাই সভা-সমিতি, বিবাহ, আনন্দ ও বিষাদে কবিতা-কাব্য ছিল তাঁদের আভিজাত্যের প্রতীক। (দ্রঃ কিতাবুল উমদাহ, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৯)

আরববাসীদের স্মরণশক্তির প্রখরতা এত বেশি ছিল যে মুখস্ত করা ও বলা একটা বাহাদুরির বিষয় ছিল। ফলে লেখার ব্যাপকতা ছিল না। সে কারণে দেখা যায় নবীর যুগে আরবে সুদক্ষ লেখক হিসেবে সতর জনের নাম গ্রহণযোগ্য। অবশ্য এখনকার মত আরবে তখন মানুষের এত ভীড়ও ছিলনা। (ই. জি. ব্রাউনের লেখা লিটারারী হিস্ট্রি অফ পার্শিয়া, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৬১)

হযরত আদম (আঃ) মানব জাতির আদি পিতা। তিনি নানা ভাষার অক্ষর মাটি দিয়ে তৈরী করে আগুনে তা পুড়িয়ে নিয়েছিলেন। পরে নূহের বন্যায় তা নানা দেশে চলে যায়। কুরআন ও ইতিহাস বর্ণিত এ বন্যা হয়েছিল ঈসা (আঃ) জন্মের ৩২০০ বছর পূর্বে। (দ্রঃ মাওলানা দারিয়াবাদির আল কুরআনের উর্দু তফসীর, পৃষ্ঠা ৩৬৯)

অন্য মতে নবী ইসমাইল আরবী অক্ষরের জন্মদাতা। কেহ বলেন আরবী লিপির জন্মদাতা 'আদনান'। ঐতিহাসিক মসউদির মতে বনিমসিনের ছেলেরা আরবী লিপির আবিষ্কারক। সে সব লোকেদের নাম ছিল। আবজাদ, হুত্তি, হওয়জ ও কালিমন প্রভৃতি। তাঁদের নামানুসারেই আরবী বর্ণমালার নাম করণ হয়েছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেছেন, সারা পৃথিবীতে প্রথমে লেখা শুরু করেন দক্ষিণে আরবের লোকেরা। (দ্রঃ আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১০৪)

অন্যতমে হযরত হুদ (আঃ) লিখিত-বর্ণের স্রষ্টা আর তিনি প্রত্যাদেশ দ্বারা তা শিখেছিলেন। (দ্রঃ আহমদ হাসানের লেখা আরবী বই এর উর্দু অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১৫১)

ডঃ শহীদুল্লাহর মতে আরবী লিপি শামী লিপি হতে এসেছে এবং গ্রীক ও লাতিন বর্ণমালাও এ শামীর অনুকরণে রচিত। (দ্রঃ ডঃ শহীদুল্লাহর সম্বর্ধনা গ্রন্থ. আরবী বর্ণমালা)

ভাষা গবেষক জার্মান প্রাচ্যবিদ মুরতস্ প্রমাণ করেছেন আরবীভাষীরাই ইয়ামেনে আরবী লিপি তৈরি করে। তিনি আরও প্রমাণ করেছেন স্পেনভাষীরা তাঁদের লেখার বিদ্যা শিখেছিল দক্ষিণ আরব থেকে। (দ্রঃ ডক্টর মনসুর ফাহামীর লেখা মুজাল্লাহুল মজমইল আরাবীম দামেশ্‌ক্ ১ম খণ্ড ৩২, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৭)

সুতরাং প্রমাণ হয়, আরবরা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলেন না। বরং তাঁদের তৈরী আলোকবর্তিকা সারা বিশ্বকে আলোকিত করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজে নিরক্ষর ছিলেন, এর অন্য তাৎপর্য রয়েছে। যদি তিনি উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক হতেন অথবা কোন উচ্চ বিদ্যালয়. মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন তাহলে অনেক ভাবতেন এত ভাষা. ভাব

অলংকার সম্বলিত কুরআন তাঁরই রচনা। কিন্তু তিনি তার সুযোগ পাননি। তাছাড়া পণ্ডিত পিতা হতেও পুত্রের পাণ্ডিত্য অর্জন সম্ভব, কিন্তু তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহ পরলোক গমন করেছিলেন। আর বিদুষী মা হতেও শিক্ষা নেয়া যায়, কিন্তু সেখানেও নবী বঞ্চিত ছিলেন। কারণ মক্কার বিষাক্ত 'লু' হাওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য কচি বয়সেই তাঁর মা অনেক দূরে হালিমা নামের এক ধাত্রীকে পালন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আর হালিমার ছেলেরা ছিল মেষের রাখাল। এসব সত্য তথ্যের মাঝখানে এটাই প্রমাণ হয় যে, কুরআনের সৃষ্টি নিপুণতায় নবীর কোন হাত ছিল না বরং তা আল্লাহ্ প্রেরিত আসমানী গ্রন্থ্। পৃথিবীর সকল শিক্ষকের শিক্ষক নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বরণীয় বা স্মরণীয, কিন্তু কারো একথা বলার অধিকার ও সুযোগ নেই যে, তিনি বিশ্বনবীর শিক্ষক। তবে এটা ঠিক যে তিনি নিজে লিখতে না জানলেও কলম ও লেখার গুরুত্ব তাঁর জানা ছিল। তিনি জানতেন, যে, জাতির কলম যত শক্তিশালী সে জাতি তত প্রতিষ্ঠিত ও উন্নত হতে পারবে। তাই ৬২৪ খৃস্টাব্দে বদর যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন এক ঐতিহাসিক শর্তে। সেটা হচ্ছে–নবীর নিরক্ষর ভক্তদের দশজনকে লেখা শেখাতে পারলেই একজন বন্দী মুক্তি পাবে। অবশ্য শিক্ষিত বন্দীদের জন্য এ শর্ত ছিল। (দ্রঃ সিরাতুন মুসতাফা, ১ম খণ্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠা)

বিশ্বনবী তাঁর বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রে লিখিয়ে নিতেন। (হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২২৩ – ২২৪, লেখক মুঃ আঃ রহিম)

'সাদিকাহ্' বলে একটি হাদীস নবীর যুগেই সংকলন করা হয়েছিল যাতে এক হাজার হাদীস লেখা ছিল। (সুনানে দারিমি, পৃষ্ঠা ৬৭)

হযরত আনাস নবীজির সঙ্গী ছিলেন। তিনি তাঁর আদেশ, নির্দেশ, নিষেধ ও উপদেশ লিখে রাখতেন। লেখার মধ্যে যাতে ভুল না হয় বা অনিচ্ছাকৃত যোগ বিয়োগ না হয়, তাই তিনি পড়ে শোনাতে বলতেন এবং তিনি তা শুনতেন। (হাকিম ঃ মুসতরদক, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৭৩)

কবিরা অনেক ক্ষেত্রে ছোটকে বড়, বড়কে ছোট, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করে ফুটিয়ে তোলেন। সেজন্য সে ক্ষেত্রে কুরআনে কবিদের সম্বন্ধে কটূক্তি আছে। নবী তা সহজ করে মানুষের জন্য বোধগম্য করে জানিয়েছেন–কবিতা কথার মতই। ভাল কথা যেমন সুন্দর, ভাল কবিতাও তেমন সুন্দর এব মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই মন্দ। (মিশকাতুল মাসাবিহ পৃষ্ঠা ৪১১)

বিশ্বনবী মক্কা ও মদীনাকেই শুধু শিক্ষাকেন্দ্র গড়েননি বরং তাঁর পণ্ডিত মুহাদ্দিস সাহাবীদের নিজের কাছে না রেখে তাঁদের পাঠিয়ে দিতেন তাঁদের প্রিয় জন্মভূমি হতে দূর দূরান্তে। তাই দেখা যা নবীর যুগে মক্কায় ২৬ জনকে রেখেছিলেন, কুফায় ৫১ জন, আফ্রিকার পশ্চিমে ১৬, খুরাসানে ৬ জন ও জযীরায় ৩ জন। (দ্রঃ নূর মুহাম্মদ আজমীর হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাসের পৃষ্ঠা ১৯)

ভাষা, ব্যাকরণ ও লিপির ইতিহাসের ফিরিস্তি আজ বিশাল হলেও আরব সভ্যতা বা মুসলমান সভ্যতা একটা সাধারণ বস্তু নয় বরং অসাধারণ ও উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পৃথিবীতে যত ভাষা আছে আরবী ভাষা প্রথম সারির আন্তর্জাতিক ভাষা বলে গণ্য। তাই ইউ. এস ও-তে যে কোন বক্তব্য আরবীতে অনুবাদ করতেই হয়। যদিও বর্তমান পৃথিবীতে ভাষা আছে মোট দু'হাজার সাতশ' ছিয়ানব্বইটি (দ্রঃ ডক্টর শহীদুল্লার ভাষার উৎপত্তি, সফিউল্লাহ সম্পাদিত শহীদুল্লার সংবর্ধনা গ্রন্থ (১৯৬৭) পৃষ্ঠা ২২২ হতে ২২৭)

পূর্বেই উল্লেখ করেছি মুসলমান জাতি এবং ইসলাম ধর্মকে যেন কেহ একটা মামুলী বা অতি সাধারণ বিষয় বলে এড়িয়ে না যান। বর্তমান সিনেমা, টেলিভিশন, রেডিও, বই-পুস্তক বিশেষতঃ ইতিহাসে প্রাপ্তব্য বিষয় হল, মুসলমান যেন হতভাগ্য জাতি আর তাঁদের ইতিহাস শুধু অত্যাচার আর বিলাসিতার ফানুস্। তাঁরা 'বিদেশী', আমাদের স্বদেশে এসে ভারতকে কারেছে অনুন্নত অথবা ধ্বংস। কিন্তু এ কথা প্রকৃত ইতিহাস বলেনা। স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির পাঠ্যপুস্তক এখন যেভাবে লেখা হচ্ছে তা বেশ কয়েক বছর পূর্বেই বই-এর সাথে মেলালে অবাক আর বিস্মিতই হতে হবে।

যেমন অধ্যাপক শান্তিভূষণ বসু বলেন (ক) "পৃথিবীর সর্বাধুনিক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম। বহু পণ্ডিতের মতে একমাত্র ইসলাম ধর্মই কার্যকরীভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষায় তৎপর। খৃষ্টধর্ম মানুষকে পাপের ফলস্বরূপ বিচার করেছে। হিন্দু ধর্মে মানুষকে বলা হয়েছে অমৃতের সন্তান। আপন সত্তার রূপ আবিষ্কার করে মানুষ আবার ঈশ্বরেই ফিরে যাবে। তাঁর সত্তার রূপটিই হচ্ছে ঈশ্বরের রূপ, অর্থাৎ মানুষের ঈশ্বর হঁতে কোন বাধা নেই। বাইবেলে লেখা হয়েছে একটি উটের পক্ষে সূঁচের রুদ্ধ পথে চলা যতটা দুষ্কর, ধনী ব্যক্তিদের স্বর্গে পৌঁছান তত কঠিন অথচ ইহজগতে দারিদ্রপীড়িত অসহায় মানুষের দুর্গতির অন্ত নেই। হিন্দু ধর্মে মানুষকে যতেই ঈশ্বর বলা হয়েছে। ততই মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটেছে দিনে দিনে। কাজেই বলা চলে, উপরোক্ত দুটি ধর্মে যদিও মানুষের কল্যাণই সমস্ত আলোচনার লক্ষ্য তবুও কার্যত সামাজিক জীবনে এ কল্যাণ প্রকৃষ্ট রূপ পায়নি। ইসলাম মানুষের কল্যাণ কামনা করে বাস্তব চেহারা পাবার দিকে এগিয়েছে। শুধু বাক্যেই নয়, প্রকাশিত সত্যেই জানা গেছে ইসলাম তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, মানবিক ও ইহজাগতিক। এবং তিনিই (মুহাম্মদ) সমগ্র মানব সমাজকে আহ্বান করেন সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। তাঁর এ আহ্বান ও সংগ্রাম এতেই প্রত্যক্ষ ও এতই সামাজিক মানুষের জীবন যাত্রায় সত্য যে ইসলাম স্বভাবতই সহজ, সরল, গণতান্ত্রিক ও মানবিক ধর্ম হয়ে ওঠে।"

(খ) "মোসলেম শব্দটির অর্থও তাই, 'যারা আনুগত্য স্বীকার করেছে'। এ আনুগত্য পৃথিবীর চূড়ান্ত শক্তির কাছে নয়, মহত্তম কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে নয়, এমন কি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছেও নয়। আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে।"

(গ) "ইসলাম পুরোহিত তন্ত্রের ধর্ম নয়। ঈশ্বর-মানুষের মধ্যে তৃতীয় কোন মধ্যস্থের প্রয়োজন নেই ইসলামে। যে কোন শুদ্ধচরিত মসজিদে প্রার্থনা পরিচালনা করতে পারেন।"

ক, খ ও গ উদ্ধৃতি তিনটি নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শান্তিভূষণ বসুর 'প্রাচ্য দর্শনের ভূমিকা' গ্রন্থের ২২৮, ২২৯, ২৩২ ও ২৩৪ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হল। যেটা ছাপা হয়েছে ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে, কলিকাতা ৯ হতে।

১৯৬৪ সালের ছাপা তথ্যের সাথে ইদানীং কালের ছাপা তথ্যের যে অনেক গরমিল সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয় তা অতীব দুঃখের ও চিন্তার বিষয়।

মুসলমানদের ভারত আগমনের তথ্য

ভারতের পরলোকগত মনীষী হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) লিখিত একটি তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা অবলম্বন করে বলা যায় যে, পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) বেহেশত হতে বিতাড়িত হয়ে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন ভূমণ্ডলের ভারত ভূমিতেই। জায়গাটা ছিল সিংহল, যেটা তখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর আদম, ইভ, জন্নাত, ইত্যাদি এসব কুরআনেরই কাহিনীভুক্ত।

Goto List

ইসলাম ধর্ম বলে, আল্লাহ্‌র প্রচুর পরিমাণে ফেরেশতা বা মালাক আছে, তাঁদের মধ্যে প্রধানতম হযরত জিবরাইল (আঃ)। তাঁর পৃথিবীতে প্রথম পদধূলি পড়েছিল ভারতে। যেহেতু প্রত্যেক নবীর কাছে তাঁকে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ পৌঁছাতে হত। এটাও বিশ্বের মুসলমানদের কাছে ভারতের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জামাতা ও চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-এর সময়ে হযরতের সাথে আরবের কোন যোগাযোগ হয়নি। অথচ এমন কথা তিনি বলে গেছেন যাতে অবাক না হয়ে পারা যায় না। যার মর্মানুবাদ হচ্ছে এ, 'ভারতভূমি-যেখানে হযরত আদম (আঃ) বেহেশত হতে নেমে এসেছিলেন এবং মক্কার ভূমি যা হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত এ দুটি স্থান উত্তম ভূখণ্ড। অতএব, এ মুসলমানদের ভারতপ্রেম যে এক পবিত্র ধর্মীয় কারণ তা বোঝা যায়।

ভারতের অযোধ্যায় এক বিরাট মন্দিরের পাশে সুদীর্ঘ এক কবর রয়েছে এটা সম্বন্ধে যুগ ধরে জনশ্রুতি-এ সমাধি হযরত শীষ আলাইহিস সালামের। তিনি ছিলেন আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্র।

হযরত আলী (রাঃ)-কে সিরিয়ার এক মনীষী জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভূমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ও দেশ কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন-সে দেশ, যাকে সরন্দীপ বলা হয়। যেখানে আদম (আঃ) বেহেশ্‌ত হতে নেমে এসেছিলেন।

গবেষক ডাঃ মুহাম্মদ আলী তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন, "বিশ্বনবী নিজেও ভারতকে ভালবাসতেন। তিনি একবার বলেছিলেন, ভারত হতে আমার প্রতি স্নিগ্ধশীতল হাওয়ার হিল্লোল ভেসে আসে।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে মানুষ পাঠানর পূর্ব সমস্ত আত্মাকে একত্রিত করে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? উত্তরে প্রত্যেক মানুষের আত্মা বলেছিল-নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রভু। বলাবাহুল্য, এ আত্মা-সমাজের একত্রিকরণ পৃথিবীর যে স্থানে হয়েছিল তা ভারতভূমির মধ্যে গণ্য।

সুগন্ধময় বেহেশত হতে হযরত আদম (আঃ) যখন ভারতে আসেন তখন বেহেশতী সুগন্ধে তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমোদিত ছিল। তাই লেখকের ধারণা ভারতের সুগন্ধদ্রব্য তুলনামূলক হিসেবে পৃথিবীতে বিখ্যাত। যেমন ভারতের মৃগনাভি, কর্পুর, চন্দন কাঠ, জাফরান, কেওড়া এবং তীব্র গন্ধের পুষ্প ও মাধুর্য অস্বীকার করা যায় না।

হযরত আদম (আঃ) যখন বেহেশত থেকে পৃথিবীতে আসেন তখন বেহেশত হতে এক খণ্ড পাথর সাথে এনেছিলেন যেটার নাম হাজরোল আসওয়াদ। সেটা কোন ঠাকুর দেবতা নয় শুধু পবিত্র একখানা পাথর মাত্র। বর্তমানে পাথরটা মক্কার কাবা ঘরে বহিঃপ্রাচীরের এক কোণে স্থাপিত আছে। সে পবিত্র পাথর পৃথিবীর প্রথম যেখানে স্পর্শিত হয়েছিল সেটাও ছিল এ ভারতবর্ষের।

বিশ্বনবীর সাহাবা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হযরত আদমকে পৃথিবীতে পাঠানর সাথে সাথে প্রথম হযরত জিবরাইল (আঃ)-কে পাঠান হয়েছিল। তিনি পৃথিবীতে শুভাগমন করে বর্তমানের আযান ধ্বনির মত শব্দ করেন। তাতে মুহাম্মাদুর

রাসুলুল্লাহ কথাও ধ্বনিত হয়েছিল। তখন আদম (আঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন 'মুহাম্মদ ব্যক্তিটি কে? উত্তরে জিবরাইল (আঃ) বলেন, 'ইনি আপনার সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ নবী'। (দ্রঃ তবরানী গ্রন্থ)

এসব বিষয়ে শেষ কথা হচ্ছে এ–হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন, তাঁর উপর 'ওহী' বা আল্লাহ্‌র আদেশবাণী অবতীর্ণ হত। সে বাণীগুলোই কুরআনের বাক্য হয়েছে। আর তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থিত বিষয়গুলো হাদীস বলে গণ্য। প্রত্যেক মুসলমানের কাছে হাদীসের মূল্য কুরআনের পরেই গ্রহণযোগ্য। আর এ হাদীসেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন ভারতের কথা। ভারতকে তিনি 'হিন্দ' বলেই আখ্যায়িত করেছেন। যেমন একটা হাদীসের বঙ্গার্থ হচ্ছে এ–সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদের ভারত (হিন্দ) বিজয়ের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব যদি আমি সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তবে আমি তাতে আমার জান-মাল ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হব না। এতে যদি আমাকে নিহত হতে হয় তাহলে ও আমি শ্রেষ্ঠ শহীদে পরিণত হব। আর যদি শান্তিতে ফিরে আসি তবে আমি জাহান্নাম মুক্ত। আবু হোরায়রা।' (দ্রঃ নাসায়ী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২)

অতএব বহির্ভারতীয় মুসলমানদের ভারতপ্রেম ধর্মীয় কারণের জন্যও বটে। তাছাড়া সে যুগে এক দেশ আর এক দেশে যে অভিযান চালাত তখন সভ্যতার মাপকাঠিতে তা দোষণীয় ছিল না। যেমন বাজারে পণ্যদ্রব্যের মত দাস-দাসী কেনা-বেচা দোষণীয় ছিল না। তাছাড়া ভারতে ভয়াবহ সতীদাহ প্রথা দোষণীয় তো ছিলই না বরং পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হত।

ভারতবর্ষে মুসলিম আগমনের ইতিহাসে আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ এ শিক্ষাই পায় যে, ভারত মুসলমানদের আগমন ঘটেছে মুহাম্মদ বিন কাসেমের সময়। এ সাথে আরও ধারণা–মুসলমানগণ বিদেশী, লুণ্ঠনকারী এবং অত্যাচারী। তাঁরা বিনা কারণ বা প্ররোচনায় ভারত আক্রমণ করেছেন আর জোর করে ভারতের অমুসলমানদের মুসলমান করেছেন। যাঁরা এসব তথ্য পরিবেশ করেন তাদেরও পুরোপুরি দোষী করা যায় না। যেহেতু ভারতের মূল ইতিহাস উদ্ধার করতে গেলে মুসলমান ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বাদ দিয়ে ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ইংরেজসৃষ্ট বিকৃত ইংরেজী ইতিহাসের অনুবাদ আর ভাবানুবাদ ভাঙ্গিয়ে চলতে হয় বেশিরভাগ ভারতীয় ঐতিহাসিকদের।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইসরাঈল আফগান ও নিজের গোত্রের লোকদের পত্র দিয়ে সমস্ত ধর্মগ্রন্থের প্রতিশ্রুত নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণী ও কুরআনের কথা জানান–"আমি নিজে এ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি, আপনারাও সুনিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন আশা করছি। স্রষ্টা ছাড়া কোন সৃষ্টির কাছে নতি স্বীকার করাকে ইসলাম ধর্ম নিষেধ করেছে। সংশোধিত, সভ্য, চরিত্রবান, উন্নত হয়ে অধিকারী হওয়ার পূর্ণ পদ্ধতি লাভ করে আমরা উপকৃত হয়েছি। তাই আপনাদেরও কল্যাণ কামনায় এ পত্র প্রেরণ।' (তারিখে জাহাঁকুশ ও মাজমুয়াউল আনসার)

উপরোক্ত মর্মের পত্র পেয়ে আফগানিস্তান হতে 'কয়স' নামে একজন প্রভাবশালী নেতা একদল লোকসহ মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। অনেক আলোচনার পর তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত 'কয়স' নাম পরিবর্তন করে ইসলামী নাম 'আব্দুর রশিদ' রাখলেন। আবদুর রশিদের সাথে একজন ইসলাম জানা আরবী সাহাবী তাঁদের সাথে আফগানিস্তান যান এবং সেখানে বহু আফগানীকে ইসলাম ধর্ম পরিবেশন করেন। আর তখন এ আফগানিস্তানের সাথেই ভারতবর্ষ সংযুক্ত বা অবিভক্ত ছিল।

ভারতের মাদ্রাজ বা তামিলনাড়ু প্রদেশের জেলার নাম মালাবার বা মালবার। এ মালবার আরবদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবসাকেন্দ্রিক ঘাঁটি ছিল। মাদ্রাজের এক বন্দরের উপর দিয়ে আরবরা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য চীন যাতায়াত করতেন। অবশ্য সারা পৃথিবীতে ইসলাম পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ববোধও তাঁদের ছিল।

মালবার স্থানটিকে আরবরা–'মা'বার' বলতেন, আরবীতে এর অর্থ পারঘাট। আরব বণিক, মুবাল্লিগ ও নাবিকেরা এ ঘাটের উপর দিয়ে মাদ্রাজ, মক্কা, হেযায, মিশর ও চীনের মধ্যে যাতায়াত করতেন। বলাবাহুল্য, রা'বার নাম তাঁদেরই রাখা।

'পরাবৃত্ত' পড়ে জানা যায় যে, ভারতের 'চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমান পেরুমল ইচ্ছা করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কানগরীতে গমন করেন। (দ্রঃ বিশ্বকোষ ১৪ ঃ ১৩৪ পৃষ্ঠা)

এছাড়াও একজন মুসলিম লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়–"একজন হিন্দু রাজার মক্কা গমন এবং তাঁর মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় মুসলমান হওয়া রাজা কিছুকাল হযরতের কাছে অবস্থান করে প্রত্যাবর্তনের সময় 'শহর' নামক স্থানে পরলোক গমন করেন।" (দ্রঃ তুহফাতুরল মুজাহেদিন)

অতএব 'তরবারীর জোরে ইসলাম প্রচারিত' কথাটুকু ভারতের এ রাজার মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে যে মোটেই খাপ খাওয়ান যায় না তা প্রমাণিত সত্য।

বর্তমান বঙ্গের বিখ্যাত ঐতিহাসিক, ভারত পর্যটক লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে আরো পরিষ্কার করে প্রমাণ করা যাবে আমাদের তথ্যের যথার্থতা।

"মালবার রাজাদের মধ্যে চেরুমান পেরুমলই প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পেরুমল বংশীয় শেষ রাজা। শুধু নিজে ধর্মান্তরিত হয়েই চেরুমান পেরুমল ক্ষান্ত হননি, প্রজাদের মধ্যেও ইসলাম ধর্ম প্রচারে তিনি সচেষ্ঠ হন। তবে যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন একজন দক্ষিণ ভারতীয় রাজা অন্তরের আকর্ষণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তার প্রচারের জন্য বিদেশ গিয়ে চেষ্টা করেছেন, এ ব্যাপারটা অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বহু পুরুষ বাহিত ধর্ম ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় উদ্দীপ্তচিত্তে শাসকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এ রকম নজির ভারতবর্ষের অন্যত্র বিরল।" (সুরজিৎ দাশগুপ্তের লেখা–ভারতবর্ষ ও ইসলাম পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫)

তাহলে এ হিন্দু রাজাই কি ভারতের প্রথম মুসলমান? না, তা নয়। তারও অনেক আগে ভারতে ইসলাম ধর্ম এসেছিল, তা না হলে কি করে জানলেন তিনি ইসলাম ও মুহাম্মদের (সাঃ) কথা? কেনই বা তাঁর মক্কা যাওয়ার আকর্ষণ হল?

মাদ্রাজের মালবারের মুসলিমদের 'মোপলা' বলা হয় মোপলা সম্বন্ধে বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের লেখা হতে উদ্ধৃতি দিচ্ছি–"ইহারা অধ্যবসায়শীল, কর্মক্ষম এবং বর্ধিষ্ণু। ইহারা আবার সুগঠিত ও বলিষ্ঠ ইহারা দেখিতে সুশ্রী ইহাদের ন্যায় পরিশ্রমী দ্বিতীয় জাতি ভারতবর্ষে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সাহসিকতায় ইহাবা চিরপ্রসিদ্ধ। ইহারা চিরপ্রসিদ্ধ আরবীয় ধর্ম মতে দীক্ষাদানই ইহাদের প্রধান কাজ। ইহারা শ্মশ্রুধারণ করে। সকলেই মস্তকে টুপি দেয়। ইহারা স্বভাবত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।"

মালবারের প্রাচীন নাম চেরর বা কেরল। ওখানে সে যুগে দশটি স্থানে মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল–(১) কোরঙ্গনুর (২) কুইলন (৩) হিলি ধারওয়া পর্বত (৪) পাকনূর (৫) মঙ্গলোর নগর (৬) ধর্ম পত্তন বা দরফতন নগর (৭) চালিয়ান নগর (৮) কুণ্ড পুরম (৯) পন্থারিনী ও (১০) কঞ্জর কোর্টে।

বিশ্বকোষ প্রণেতা লিখেছেন, "মসজিদ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই যে এতদ্দেশে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল মসজিদের ব্যয়ভার বহনের জন্য অনেক সম্পত্তিও প্রদত্ত হইয়াছিল। এ সময়ে উপকূলবাসী মুসলমান এবং ইসলাম ধর্মে

দীক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সংখ্যা পরিবৃদ্ধি হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহারা রাজ্যের মধ্যে প্রভাব সম্পন্ন হইয়া ওঠে।" (দ্রঃ বিশ্বকোষ ১৪ ঃ পৃষ্ঠা ৬১৮ এবং তোহফাতুল মুজাহেদিন পৃষ্ঠা ২৩ ও ২৪)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরলোকগমণের কয়েক বছর পর হতেই ভারতে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে।

'মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর আশি বছর যেতে না যেতেই মুহাম্মদ বিন কাসিমের পূর্বেই অনেক ইসলাম ধর্মাবলম্বীর আগমন যে ঘটেছে তার প্রমাণে বলা যায় ইসলামে দ্বিতীয় খলিফা উমরের (রাঃ) সময়ে ওসমান নামে এক বিজ্ঞবীরকে আম্মান ও বাহরানের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। ওসমান নিজের ভাইকে বাহরায়েনে নিজের পদে বহাল রেখে আম্মান হতে একটি সৈন্যবাহিনী ভারত সীমান্তে পাঠান। ওখান হতে অভিযান সমাপ্ত করে তাঁর ভাই মুগীরাকে ভারতের করাচীতে পাঠান। বিপুল বাধার সম্মুখীন হয়েও মুগরীরা জয়ী হয়েছিলেন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে।'

হযরত উমর (রাঃ)-এর পর হযরত ওসমান (রাঃ) তৃতীয় খলিফা হন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে ইরাকের শাসনকর্তা করে পাঠান এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক সংবাদ সংগ্রহের নির্দেশ দেন। তিনি 'হাকিম' নামে একজনকে ভারতে এ কাজের জন্য পাঠালেন। তিনি যা রিপোর্ট দিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে, ভারতে না যাওয়া ভাল কারণ সেখানে খাদ্য, পানীয় ও সব কিছুরই অসুবিধা। তাই আরবীয় ৩৮ হিজরী সন পর্যন্ত অভিযান থামিয়ে রাখা হয়। এরপর চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর অনুমতিতে 'হারিস' সিন্ধু অভিযান করেন। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে তাঁকে তীব্র বাধা পেতে হয়। তুমুল যুদ্ধের পর আরবীয়গণ জয়লাভ করে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সৈন্যদের বন্দী করেন।

এ সময়কার মনে রাখার বিষয় হল এটা যে, বন্দীদের হত্যা না করে তাঁদের খাওয়ার ও শোওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও প্রয়োজনীয় পোশাক পরিচ্ছদও সরবরাহ করেন।

অপরদিকে 'কায়নান' নামক স্থানে মুসলমান বাহিনীকে ভারতীয় সৈন্য দ্বারা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত পরাজিত ও বন্দী হতে হয় এবং অবশেষে প্রত্যেক বন্দীই নিহত হয়।

তারপর ৪৪ হিজরীতে আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে মোহাল্লাব ভারত সীমান্তে অভিযান চালান। ফলাফরের সংবাদ সঠিক সূক্ষ্ম ও পর্যাপ্ত নয় বলে আগে বাড়ছি না।

মোহাল্লাবের মৃত্যুর পর মোয়াবিয়া (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে সওয়ারকে ভারতের দিকে পাঠালে তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে বিদেশীর ভূমিকায় কিছু মালপত্র নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। অবশ্য পরে দস্যুর আক্রমণে তিনি নিহত হয়েছিলেন।

তারপর ভারতে আসেন রাশেদ। অবশেষে ময়দদেবল নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ হলে, তাতে তিনি নিহত হন। এ সংবাদ পেয়েই সেনান' এসে আবার বিজয়দের আহ্বান জানালে। পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। এবার সেনান জয়লাভ করে দু'বছর সেখানে শাসনকার্য সম্পাদন করেন।

তারপর জিয়াদের পুত্র আবাবাস ভারতে আসেন এবং বীরত্বের পরিচয় দেন। এরপর মুনজীর ইবনে জরুদ আবেদী ভারতে আসেন এবং জয়ী হন। পরে ইরাকের শাসনকর্তা হন ইউসুফ সকফরি পুত্র হজ্জাজ। তিনি হারুণের পুত্র মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ও বোদাজাল প্রেরণ করেন। তাঁরাও বিক্ষিপ্তভাবে বিজয়ী হন। কারো উদ্দেশ্য ছিলনা তলোয়ার দিয়ে

অমুসলমানকে মুসলমান করা, তাই খুব মূল্যবান একটি উদ্ধৃতি এখানে যোগ করছি–"যে কারণেই হোক ভারতীয়দের মনে একটা ভুল ধারণা আছে, এক হাতে কোরআন আর অন্য হাতে তরবারী নিয়ে এদেশে ইসলামের প্রচার করা হয়েছে, কিন্তু লক্ষণীয় মুসলিম তলোয়ার যেখানে সব চাইতে প্রচণ্ড ছিল সে দিল্লি আগ্রা অঞ্চলের চাইতে ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে–যেমন সিন্ধু, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, কেরালা, বাংলা প্রভৃতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বেশি।" (সুরজিৎ দাশগুপ্তের লেখা ঐ পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠা)

উমাইয়া বংশের খলিফা আল ওয়ালিদের সময় তাঁর সেনাপতি বীর মুসা তাঁর সেরা সৈনিক তারিককে স্পেন বিজয়ে পাঠালেন, স্পেন ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা জয় করে তারপর কুতাইবার বিজ্ঞান সম্মত কৌশল সাহসিকতা ও চরিত্র দৃঢ়তায় এশিয়া মহাদেশের অনেকাংশে ও প্রাচ্যে বিজয়পর্ব প্রতিপালিত হয়। এ প্রামাণ্য আলোচনায় বোঝা যায়, মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রথম ভারত অভিযাত্রী নন।

ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদও বলেছেন—The liest Muslim invaders of Hindustan ... during he Khilafat of Umar..

যার ভাবার্থ হচ্ছে, হিন্দুস্তানের প্রথম মুসলমান বিজয়ীগণ তুর্কী ছিলেন বরং বরং তাঁরা ছিলেন আরব জাতি। মহান নবীর পরলোকগমনের ঠিক পরেই এ আরব জাতি ইসলামের মতবাদের প্রচার ও প্রসারকল্পে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন। ধর্ম প্রচারের মধ্যেই আছে পরকালের ভাল মন্দ–এ ছিল তাঁদের বিশ্বাস। এ আরবগণ যেখানেই গেছেন, বিক্রয়মপূর্ণ দুর্জন সাহসের পরিচয় দিয়েছেন সেখানে এবং জাতীয়তাবাদের গৌরবোজ্জ্বল প্রেরণাকে কেন্দ্র করে এভাবে সত্যে সন্ধানপ্রাপ্ত আরবগণ মাত্র বিশ বছরের মধ্যে সিরিয়া প্যালেস্টাইন, মিশর ও ইরানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। পারস্য ও ইরান বিজয়ের পর আরবগণ তঁদের এ বিজয়কে পূর্বদিকে সম্প্রসারণ করতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

সিরাজ ও হরমুজের ব্যবসাদারগণ তখন ব্যবসায়ী কার্যোপলক্ষে ভারতে উপকূলবর্তী অঞ্চলে গমনাগমন করতেন। আরবগণ তাঁদের মুখ হতেই অল্পবিস্তর ভারতের ধর্ম পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংবাদ পেয়েই ভারত অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং প্রথম ৬৩৬ – ৩৭ খৃষ্টাব্দে উমরের খিলাফতকালে ওমান হতে ভারতের প্রথম অভিযান শুরু হয়। জোর করে অস্ত্রের সাহায্যে ধর্মান্তরকরণের অভিযোগে মুসলমান ইতিহাস যেভাবে ধিকৃত বা বিকৃত তার সমীক্ষা শুরু হতে বিলম্ব হত না–কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি যদি সে বই বাজেয়াপ্ত করে তাহলে কে তা ঠেকাবে?

মুসলমানদের শাসন শেষ হয়ে যাবার পরেও কি অমুসলমানরা মুসলমান হননি, না হচ্ছেন না? শুধু ভারতেই কেন, অন্যান্য প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেই অমুসলমানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার অনেক নজির আছে। বিগত ১৯৮১ তে দশ হাজারের অধিক হরিজন হিন্দু মীনাক্ষীপরমে কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি?

যাঁরা মুসলমান হন তাঁদের বংশে বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের জন্ম হয়েছে এমন অনেক নজিরও আছে। যেমন গান্ধীজীর বংশের উর্ধতন একজন পুরুষ মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁরই পৌত্র হচ্ছেন মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ। কথাটা অনেকের কাছে নতুন লাগছে, ফলে আমাকে উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে–মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নার ও শ্রীমোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর পিতামহ ছিলেন কাথিয়াবাড়ের একই সম্প্রদায়ভুক্ত গুজরাটী হিন্দু, কোন বিশেষ কারণে মিঃ জিন্নার পিতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে করাচীতে বসবাসকরেন।" (দ্রঃ গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রের লেখা অবিস্মরণীয় গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫ পৃষ্ঠা, ১৯৬৬, ২৩ জানুয়ারী, কলকাতা ১২)। এমনিভাবে স্যার ইকবালের উদাহরণ দেয়া যায়।

Goto List

বর্তমান ভারতে যাঁরা মুসলমান বলে পরিচিত তাঁদের পূর্বপুরুষ বেশির ভাগই অনুন্নত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত ভারতীয় মানুষ ছিলেন। তাই বলে সম্ভ্রান্ত রাজা, মন্ত্রী উচ্চপদস্থ অমুসলমানরা যে মুসলমান হননি তা নয় যেমন ধরা যেতে পারে চেরুমল ও গৌড় বাংলার রাজা যদুর মুসলমান হওয়ার কথা। .

খ্যাতনামা অমুসলমানদের ইসলাম গ্রহণের তথ্য

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বহু বিখ্যাত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন যাঁরা বোকাও নন, অত্যাচারেও নয় এবং অস্ত্রের ভয়েও নয় বরং স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন। যেমন আফ্রিকা মহাদেশের উগাণ্ডার বিখ্যাত পণ্ডিত এবং খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক রেভারেন্ড পল। তিনি ১৯৭৫ সনের ২৬শে মে মুসলমান হয়েছেন। অথচ আকস্মিকভাবে নয়, যুগ যুগ ধরে বহু ধর্ম ও নীতি নিয়ে গবেষণা করে তারপর তাঁর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ফ্রান্সের সেলমাঁ বেঁয়োস্ত বিরাট প্রভাবশালী পুরুষ এবং একজন সৃজনশীল বৈজ্ঞানিক। তিনি ওষুধের উপর ডক্টর ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। তিনি অনেক পড়াশোনা ও সমীক্ষা করেন। Le phenomene Coranique বই খানি পড়ে ইসলামের প্রতি আরো আকৃষ্ট হন। বইটির লেখক হচ্ছেন Malek Ben Nabi। তিনি ১৯৫৩ সনে ২০শে ফেব্রুয়ারী ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার পর তাঁর পুরা নাম হয়-আলী সেলমাঁ বেঁয়োস্ত (Ali Selman Benoist)। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এখানে অস্ত্রের জোরে কাজ হয়নি।

১৯ শতকে অধ্যাপক লিওন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের বহু সংস্থার সভ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানী এবং সু-গ্রন্থকার। ভূবিজ্ঞান ও শব্দ বিজ্ঞান (Etymolgy) তাঁর বিষয় ছিল। তাঁর ডিগ্রী ছিল-এম. এ. পি-এইচ-ডি., এল. এল. বি. এফ. এস. পি। লণ্ডন থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে একটি বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশিত হত, যেটার নাম ছিল The Philomathe। তিনি সে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর তাঁর নাম প্রফেসর হারুন মোস্তফা লিওন।

জার্মানীর বিখ্যাত কূটনীতিজ্ঞ এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী মনীষী মিঃ 'হবহম' অনেক আলোচনা ও সমীক্ষা চালিয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মিঃ হবহমের মুসলমান হওয়ার পর নতুন নাম হয় Mohammad Aman Hobhom (মোহাম্মদ আমান হবহম)। তাছাড়া সাধারণ জার্মান যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখে শুধু বই-এর কলেবরই বৃদ্ধিই হবে।

ইংল্যান্ডের স্যপর লডার ব্রান্টন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে এ ইউনির্ভারসিটিতে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। তিনি একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং বেরনেট' ছিলেন। ইংল্যান্ড সরকার তাঁকে সম্মানীয় 'স্যার উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান খৃষ্টান ছিলেন। অনেক পড়াশোনা এবং রিসার্চ করার পরে তাঁকে মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাঁর মুসলমান হওয়ার পরে নাম হয় Sir Jalaiuddin Lauder Brunton (স্যার জালালুদ্দিন লডার ব্রান্টন)।

আমেরিকার মিঃ আলেকজাণ্ডার নিউইয়র্কে পড়াশোনা করে নানা পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। কিছুদিনের মধ্যে বিখ্যাত লেখক হয়ে ক্ষান্ত হলেন না বরং দুটি ভাল পত্রিকার সম্পাদক হয়ে সে দুটো পরিচালনাও করতেন। একটি হচ্ছে St. Josheph Gazette এবং দ্বিতীয় হচ্ছে Missouri Republican। জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে গবেষণাও চলতে লাগল, শেষে তিনিও স্বেচ্ছায় মুসলমান হলেন। তখন তাঁর নাম হোল মোহাম্মদ আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব।

অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও গ্রন্থকার Leopold Whiss (লিয়োপল্ড উইস) ১৯০০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ সনে বর্হিভ্রমণে বের হয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞাতা সঞ্চয় করেন। ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু মন চঞ্চল হয়ে পড়ে। অবশেষে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হন। মুসলমান হওয়ার পরেও দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। একটি হচ্ছে Islam at the Goss Road, দ্বিতীয়টি হচ্ছে Road to Mecca। মুসলমান হওয়ার পর তিনি নতুন নাম গ্রহণ করেন মোহাম্মদ আসাদ।

ইংল্যান্ডের লর্ড হেডলি যে বিখ্যাত খৃষ্টান মনীষী ছিলেন তাঁর 'লর্ড' উপাধিতেই তা বোঝা যায়। তিনি লর্ড সভার সভ্য, উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিজ্ঞ এবং গ্রন্থকার ছিলেন ১৯১৩ সনে তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি ছিলেন 4th B.N.M.F. এর নৌবাহিনীর বৃটিশ কর্ণেল। তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার। মুসলমান হওয়ার পরে তিনি নিজের নাম গ্রহণ করেছিলেন Lord Headley Faruque (লর্ড হেডলি ফারুক)।

জাপানের মিঃ তাকিউচি একজন মানবজাতিতত্ত্ব বিশারদ। তিনিও মুসলমান হয়েছিলেন নিজের ইচ্ছাতে। তিনি বলেছিলেন—আজকে জাপান এশিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশ, জাপানীরা শুধু কারিগরী বিদ্যায় উন্নত। কিন্তু যদি আমার মত এরা ইসলামকে বোঝবার জন্য একটু সময় দিত তাহলে তা গ্রহণ করে দেখত শুধু শিল্পে নয়, ইসলামের প্রকৃত চরিত্র নিয়ে অগ্রসর হলে সে সর্ববিষয়ে সুখী ও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। তিনিও নতুন নাম গ্রহণ করেছিলেন—মোহাম্মদ সুলাইমান তাকিউচি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টমাস ক্লেটন বুদ্ধিমান প্রতিপত্তিশালী ও পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। তিনিও তরবারির ভয়ে নয় বরং মানবিক প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নতুন নাম গ্রহণ করেন—টমাস মোহাম্মদ ক্লেটন (Thomas Muhammad Cleaton)।

আমেরিকার ওয়াল্ড চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা ক্যাসাইয়াসক্লের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন অস্ত্রের ভয়ে নয়, কারোর প্ররোচনাতেও নয়, নিশ্চিতভাবে স্বেচ্ছায়। বরং খৃষ্টান হতে মুসলমান হওয়ার জন্য তাঁর খেতাব সম্মান ও প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলে কিন্তু স্বদর্পে তিনি ঘোষণা করলেন, আমার নাম আর ক্যাসইয়াসক্লে নয়, আমি এখন মোহাম্মদ আলী।

আর এক হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান বক্সার মাইক টাইসনও যে খুব সম্প্রতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তা বিশ্ববাসী জেনেছে। তাঁর নতুন নাম হয়েছে আযীয।

সুলাইমান করনানীর সেনাপতি কালাপাহাড় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশীয় হিন্দু ছিলেন। তিনিও স্বেচ্ছায় মুসলমান হন। বাংলার বারভুঁইয়াদের অগ্রণী ইসাখাঁ একটা বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাম। তাঁর বাবা কালিদাস ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার পূর্বে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন।

মিঃ কেনেডি যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সে সময় আমেরিকার নিউইয়র্কের বিখ্যাত বিদুষী মহিলা মার্গারেট মারকিউস ছিলেন সম্ভ্রান্ত খৃষ্টান। তিনি অত্যন্ত ভাল লেখিকা ও সুসমালোচিকা। অনুসন্ধিৎসু মনে ঝড় উঠল তাঁর খৃষ্টান ধর্ম তাকে চরম ও পরম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে কিনা? অনেক পড়াশোনা করলেন এবং নামজাদা ভাল পণ্ডিত ও লেখকদের সাথে পত্রালাপ করলেন, তার মধ্যে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মওদুদী সাহেবের সাথেও অনেকগুলো দীর্ঘপত্র দেয়া নেয়া হয়। অবশেষে সে খৃষ্টান মহিলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নতুন নাম নিলেন—মারিয়াম জামিলা। তিনি যাঁর কাছে মুসলমান হন তাঁর নাম সেখ দাউদ আবমাদ ফাইসাল!

মিঃ ওয়েন মারিশন বিশ্ববিশ্রুত সাংবাদিক। আন্তর্জাতিক পত্রিকা 'উইকে'র সম্পাদক। যিনি নিত্য নতুন সংবাদ সারা বিশ্বে পরিবেশন করেন, তিনি নিজেই একটা সংবাদে পরিণত হলেন অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নতুন নাম গ্রহণ করলেন সালমান ওয়েল মরিশন। এটা বিগত ১৯৮৪ এর ঘটনা।

আবার যদি পিছিয়ে যাই তাহলে দেখা যাবে, বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন মুর্শিদকুলি খাঁ নতুন মুসলমান অনেকে যেমন নানাভাবে হিন্দুদের উপর বিশেষ করে জাতি ও ধর্মের উপর আঘাত দিয়েছেন বা দেয়ার চেষ্টা করছেন, মুর্শিদকুলি খাঁ কিন্তু মুসলমানদের বিশেষভাবে বাদ দিয়ে হিন্দুদের মধ্য হতে 'জমিদার' 'রাজা' 'মহারাজা' ইত্যাদি পদ সৃষ্টি করে হিন্দুজাতির অর্থনৈতিক উন্নতির সৌধ নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করেন। (দ্রঃ তারিখ-ই বাঙ্গালাহ পৃষ্ঠা ৪০৩-৪)

এক হাতে অস্ত্র ও অপর হাতে শাস্ত্রের তাৎপর্য

শান্তির ধর্ম ইসলাম কি করে বলতে পারে এক হাতে তরবারি অন্য হাতে কুরআন নিয়ে ধর্ম প্রচার করত? আমাদের পূর্ব আলোচনা থেকে যতদূর বোঝা গেল তাতে ধরে নেয়া যায়, ইসলাম যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন বা এখনো করছেন তা শুধু তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজনে বা নীতির আকর্ষণেই।

ইসলাম ধর্ম যখন আর্য ধর্মের মত ভারতে এল তখন সাথে সাথে ভারতবর্ষের লাখ লাখ মানুষ আরবী ভাষা শিখে, পড়ে, বুঝে এবং ভারতীয় ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখে পুরাতনকে বাদ দিয়ে নতুন ধর্ম ইসলামকে হৈ হৈ করে গ্রহণ করল—একথা মোটেই সত্য নয়, আর যুক্তিসঙ্গতও নয়। কারণ তখনকার মানুষ ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অশিক্ষিত। দ্বিতীয় কথা ধর্ম মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ জাতির অধিকারে ছিল, ফলে অব্রাহ্মণরা ধর্ম সম্বন্ধে কিছু পড়বার বা মাথা ঘামাবার অধিকার পায়নি, তাই সক্ষমও হয়নি।

এটা হতে পারে, তখন হিন্দু ধর্ম এমন রক্ষণশীল ছিল যে অব্রাহ্মণ আর অনুন্নত শ্রেণীর মানুষেরা নানভাবে নির্যাতন ভোগ করে সমাজে লাঞ্ছিত হয়ে বাস করছিলেন। ঠিক এ সময়ে যাঁরাই তাঁদের শান্তি ও মৈত্রীর সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁদের বরণ করে নেয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। এরকম কথা আমার পক্ষে লেখার অনেক অসুবিধা আছে, কারণ সে লেখা বাজেয়াপ্ত হতে পারে। শুধু ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্যই মুসলমানরা ভারতে আসতেন এ কথা সর্বাংশে সঠিক নয়।

ঐতিহাসিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "আমরা দেখেছি যে মালবার উপকূলে ইসলাম ধর্মের উৎপত্তির আগে থেকেই আরব বণিকদের বসতি গড়ে উঠেছিল, বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা তাঁরা বিশেষ জরুরী মনে করত এবং দেশের ভারতীয় শাসকদের এ ব্যাপারে সাহায্য করত। স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে আরব বণিকদের অসদ্ভাবের কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। এর থেকে ধরে নেয়া যায় যে নিতান্ত বাস্তব কারণেই উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল। পরে এ আরবরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তখন থেকে তাঁরা পরিচিত হয় মুসলমান বলে।" শ্রীগুপ্ত আরও লেখেন—"আরব বণিকরা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং সে ইসলামকে কেরালায় নিয়ে আসে, কেরালাস্থিত তাঁদের পরিবারবর্গের মধ্যে ইসলাম প্রচার করে তখন এ বণিকদের স্থানীয় কর্মচারীরাও, যাদের একটা বড় অংশ বণিকদের জন্য কায়িক শ্রম করত, ইসলামের আদর্শ ও বক্তব্য সম্বন্ধে জানতে পারে। তাঁরা

জানতে পারে এমন এক শাস্ত্রের কথা, যাতে বলা হয়েছে–মানুষকে আলাদা আলাদা জাতিতে জন্ম দেয়া হয়েছে বটে কিন্তু জন্ম দিয়ে নয়, মানুষের বিচার হয় তাঁর স্বভাব-চরিত্র দিয়ে (৪৯, ১৩-১৫)। বর্ণভেদ প্রথায় জর্জরিত কেরালার জনসাধারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে মানুষ হিসেবে বাঁচার ডাক শুনতে পেল।”

শ্রীগুপ্ত পরে আরও লিখেছেন, “ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যবহারিক দিকগুলোর চাপে কেরালার জনসাধারণ যখন মানুষ হিসেবে নিজেদের পরিচয় ভুলতে বসেছে তখন ইসলাম ধর্মের আগমন ও আহ্বান। এ আহ্বানে তাঁরা প্রচণ্ড উৎসাহে সাড়া দিল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল। ‘তুহফাতুল মুজাহিদিন’ এর লেখক জৈনুদ্দিন লিখেছেন, ‘যদি কোন হিন্দু মুসলমান হত তাহলে অন্যেরা তাকে এ (নিম্নবর্ণে জন্মের) কারণে ঘৃণা করত না, অন্য মুসলিমদের সাথে যে রকম বন্ধুত্ব নিয়ে মিশত, তাঁর সাথেও সেভাবে মিশত’। মানুষের মূল্য পাবে, সমাজে মানুষের মত ব্যবহার পাবে–এটা ছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রধান কারণ।” (দ্রঃ দাশগুপ্তের ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ১২৭ – ২৮)

অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যোপলব্ধি করে এটা ধরনা যায় যে, একহাতে অস্ত্র আর অন্য হাতে শাস্ত্র নিয়ে বল প্রয়োগের কথাটি মুসলিম জাতির প্রতি অন্যায় প্রয়োগ মাত্র। এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে–তাহলে এ নিয়ম অব্যাহত থাকলে কেরালা ও বাংলায় সমস্ত মানুষ মুসলমান হয়ে গেলেন না কেন? তার একাধিক উত্তরের মধ্যে অন্যতম সদুত্তর হচ্ছে, এ বাংলায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাবে এ স্রোত থেমে যায়। তিনি ইসলাম ধর্মের মূলবস্তু একেশ্বরবাদ আর সামাজিক সহজ স্বাভাবিক নিয়মনীতি সামনে রেখে যে মতবাদ আনেন সেটাকে অনুন্নত অবহেলিতরা ইসলামের বিকল্প বলে মনে করে ইসলাম গ্রহণ না করেও রেহাই পাওয়ার রাস্তা পেয়ে যান। তেমনি কেরালাতে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হয়। তিনিও ইসলাম ধর্ম সামনে রেখে সহজ মতবাদ প্রচার করেন এবং বহুদেবদেবী পূজার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

যদি এ কথাটি প্রামাণ্য ও সত্য হয় তাহলে চৈতন্য ও শঙ্করাচার্যের কথা মনে করে বহির্ভারত হতে ইসলাম আগমন তথা ইসলাম ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ক্রোধ এ দুটোর মধ্যে কোনটা সংযুক্ত হবে?

“তখন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়–তিনি দেশজ ধর্মকে এতটা বিস্তৃত করেন যে ইসলাম গ্রহণের অনেক প্রয়োজনীয়তাই তাতে মিটে যায়।” ঐতিহাসিক দাশগুপ্ত আরও লিখেছেন, “অর্থাৎ মেনে নেয়া ভাল যে শঙ্করাচার্য ইসলাম ধর্মের ভিত্তি ও বিস্তারিত বক্তব্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। বহুদেব-দেবীর পূজা মিথ্যা এবং ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এ কথাটা সমগ্র ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে শঙ্করাচার্য যেমন অমোঘরূপে ঘোষণা করেন তেমনটি তাঁর আগে ও পরে আর কেহ করেন নি। তাঁর এ আপোষহীন একেশ্বরবাদ ইসলাম ধর্মের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। এ কথা আরও বহু ধর্মে বলা হয়ে থাকলেও সে সব ধর্মের ঘোষণা নিয়ে ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। কিন্তু ইসলামের একেশ্বরবাদ আর শঙ্করাচার্যের একেশ্বরবাদ এমন একাগ্র ও সুস্পষ্ট যে তাকে ব্যাখ্যার নামে বাক্যজালে আবৃত বা জটিল করার কোনও সুযোগ নেই। শঙ্করাচার্য এ সুনিশ্চিত একেশ্বরবাদ পেলেন কোথা থেকে? সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হয় যে, এ সরল ও সুদৃঢ় একেশ্বরবাদ শঙ্করাচার্য ইসলাম হতেই পেয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য কথিত ঈশ্বরের সাথে ইসলামের বর্ণিত আল্লাহর ভেদ নাই, অন্তর্নিহিত সত্যে উভয়ই এক।” (এ পুস্তকের পৃষ্ঠা ১২৮,১২৯)

তাছাড়া ডঃ তারাচাঁদ বাবুও লিখেছেন—It may, therefore be premised without overstraining facts that, if in the development of Hindu religions in the South, any foreign elements are found which make their appearance after the 7th century and which cannot accounted for the natural development of Hiduism itself, they may with much probability be ascribed to the influence of Islam. (দ্রঃ Influence on Islam of Indian Culture by Dr. Tarachand)

ভারতে পুরোহিততান্ত্রিক অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল বলে যদি কোন সংখ্যালঘু অথবা মুসলমান লেখক লিখেন তা সত্যি হলেও কলে কৌশলে তাঁর বই বাজেয়াপ্ত হতে পারে। সুতরাং কিছু অমুসলমান ও বিদেশী লেখকদের উদ্ধৃতি দিয়ে বইটিকে বাঁচতে দেয়াই ভাল।

হয়ত মুসলিম অভিযানে বা কোন মুসলিম চরিত্রের প্রভাবে দলে দলে আকস্মিকভাবে ভারতীয়রা ইসলাদর্শ গ্রহণ করে। আবার যখন নানা কারণ, যথা ধর্মের প্রতি পূর্ব মমতা অথবা স্বার্থ পূরণে ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে সে নওমুসলিমদের আর হিন্দু ধর্মে স্থান দেয়া যেত না।

শ্রীদাশগুপ্ত লিখেছেন, "বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো। প্রথম ঝাপটা চোটে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাঁরা অনেকে পরে আবার হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু ক্রমে হিন্দুধর্মে প্রবর্তাবর্তনের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে ইসলাম গ্রহণে অনেককে যেমন বলপূর্বক বাধ্য করা হয়েছিল তেমনই ইসলাম ধর্ম দু বাহু প্রসারিত করে ভারতীয়দের আপন বক্ষে আমন্ত্রণও জানিয়েছিল-ফলে হিন্দু সমাজে নবগঠিত সংকীর্ণ ও কঠোর আইন কানুনে জর্জরিত-বিশেষ করে নিম্নবর্ণের ও অস্পৃশ্য জাতিগুলো একই সাথে মানবিক ব্যবহার লাভের ও শাসক শ্রেণীতে উন্নয়নের প্রত্যাশাতে ইসলামকে বরণ করে নিতে অগ্রসর হয়েছিল, কেননা স্বধর্মাবলম্বীদের প্রতি মুসলিম সমাজ একান্তরূপে গণতান্ত্রিক ও সমদর্শী-আপন সমাজকে সুসংহত করার জন্য হিন্দু-নেতারা অনুশাসনাদিকে যতই সংকুচিত করতে থাকলেন ততই তাঁদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যে একদল, যাদেরকে বলা হয় নির্যাতিত হিন্দু তাঁরা আরও বেশি করে ইসলামের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হল।" (এ পুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৪ দ্রষ্টব্য)

ব্রাহ্মণ্যশক্তি ভারতের বৌদ্ধদের প্রতি এত বেশি অত্যাচার করত যা অতীব দুঃখের বিষয়। বৌদ্ধরা মাথা মুণ্ডন বা নেড়া করতেন। অত্যাচার যখন সহ্যসীমা অতিক্রম করে যখন তাঁরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধদের বলা হত 'নেড়ে', তাই মুসলমানদেরকে অনেক অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ লোকেরা নেড়ে বলে থাকেন। এ নেড়ে কথাটি যতদিন থাকবে ততদিন ভারতীয় প্রাচীন হিন্দুদের বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচারের ইতিহাসকে জীবন্ত করে রাখার সামিল হবে। এ 'নেড়ে তথ্যে'র প্রমাণ এ পুস্তকের ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা।

শুধু বৌদ্ধরা নন ভারতের আর একটা বিরাট জাতি জৈন। তাঁরাও অত্যাচারের বন্যায় ভেসে গেছেন এবং হয় মুসলমান হয়েছেন অথবা মৃত্যুবরণ করেছেন।

শ্রীদাশগুপ্ত বলেন, "বাংলার বৌদ্ধের মত দক্ষিণ ভারতের জৈনরাও রক্ষণশীল শৈব হিন্দুদের হাতে নিপীড়িত হয় এবং একবার একদিনে আট হাজার জৈনকে শূলে হত্যা করার কথা তামিল পুরাণেই উল্লিখিত হয়েছে। সুস্পষ্টতই এ সময়টাতে ব্রাহ্মণ হিন্দুধর্ম পরমসহিষ্ণুতার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। এ জাতীয় অসহিষ্ণুতার সব চাইতে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত শ্রীরঙ্গমের পরম শৈবরাজা প্রথম কুলোত্তুঙ্গ স্থাপন করে গেছেন-তাঁর প্রতাপে স্বয়ং

রামানুজ তাঁর শিষ্যবৃন্দ সহ ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে মহীশুরের হয়সাল রাজা বিষ্ণুবর্ধনের আশ্রয়ে পলায়ন করেন এবং তারপরে কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি আর শ্রীরঙ্গমুখো হননি। শ্রীরঙ্গম ছেড়ে রামানুজের ১০৯৬ খৃষ্টাব্দের পলায়ন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু সে তাৎপর্য উদ্ধারের চেষ্টা বিখ্যাত ঐতিহাসিকেরা অল্পই করেছেন।" (দ্রঃ ঐ পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠা)

পুরোহিতদের বা ব্রাহ্মণ্যবাদের কথা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক দাশগুপ্ত লিখেন, 'শূদ্রকে স্পর্শ করলে সবস্ত্র স্নান ও উপবাসে শুদ্ধির প্রথাও প্রচলিত করা হয়। চণ্ডাল জাতিকে প্রাচীন স্মৃতিকারগণও অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন, কিন্তু এ কালের সমাজপতিরাই আরও কয়েক পা এগিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে চণ্ডালকে দেখা বা তাঁর সাথে কথা বলা বা তাঁর ছায়া মাড়ানো প্রভৃতিও প্রায়শ্চিত্তযোগ্য পাতক। বোধকরি এসবের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এমন যে, এ টীকাকার বৈজয়ন্তী-প্রণেতা শুধু ওসবে সন্তুষ্ট হননি; বৌদ্ধ, জৈব, লোকায়তিক বা বস্তুতান্ত্রিক ও নাস্তিককেও তিনি অস্পৃশ্যদের তালিকাভুক্ত করেন।" (দ্রঃ ঐ, ৫২ পৃষ্ঠা)

স্ত্রীর যেন কোন স্বাধীনতা না থাকে, গৃহকর্মের বাইরে কোনরকম মন দেয়ার সুযোগ না থাকে তাঁর নির্দেশ ছিল। তাছাড়া "বিজ্ঞানেশ্বর অপরার্ক ও স্মৃত্যার্থসার-প্রণেতার মতে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর আত্মদাহ (চিতায় পুড়ে মরা) অবশ্য কর্তব্য. তবে একালের সমস্ত টীকাকারই গোমাংশ ভক্ষণে গুরুত্র পাপের পরিচয় পেয়েছেন–গোমাংস ভক্ষণ কোন কালেই ভারতবর্ষে তেমন জনপ্রিয় ছিল না অথবা বহুল প্রচলিত ছিল না, কিন্তু মুসলিম সংযোগের ফলে এ বিষয়ে বিদ্বেষ জেগেছিল বলেই মনে হয়। গম বা গমজাত খাদ্যকে ম্লেচ্ছভোজ্য অতএব অবশ্য পরিহার্য বলেছেন বৈজয়ন্তী-প্রণেতা। এর থেকে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে মুসলিম সংযোগের দরুণ হিন্দু মানসে প্রতিক্রিয়া কতদূর গিয়েছিল তা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। বাস্তব প্রয়োজনের চাপে গম বা গমজাত খাদ্য (পাউরুটি, রুটি, লুচি, পরোটা) বর্জন করা সম্ভব হয়নি।' (দ্রষ্টব্য ঐ, পৃষ্ঠা ৫৩)

একটু আগে ঐতিহাসিক সুরজিৎবাবুর উক্তিতেও 'বলপ্রয়োগ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে–কিন্তু বলপ্রয়োগের তাৎপর্য জানা দরকার। ধর্মমন ও মস্তিষ্কের একটা খোরাক। জোর করে তরবারি দেখিয়ে একজন কংগ্রেসকে বলান যেতে পারে আমি আজ হতে অকংগ্রেস, জোর করে অস্ত্র দেখিয়ে কোন কমিউনিষ্টকে বলান যেতে পারে আমি আজ হতে অকমিউনিষ্ট, জোর করে মুসলমানকে বলান যেতে পারে আমি হিন্দু কিংবা জোর করে কাউকে বলান যেতে পারে আমি মুসলমান। কিন্তু এ মুখের কথাটুকু মনের গভীরে অথবা মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পেতে পারে কি?

আসলে আমাদের প্রাচীন ভারতীয় অশুদ্ধ পৌরহিত্য যেমনই উদ্ভট, অসামাজিক ও অশ্লীল হোক না কেন তাঁর বিরুদ্ধে টু শব্দ করার উপায় ছিল না হয়ত। রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন–"শারদীয় দুর্গাপূজায় বিজয়া দশমীর দিন শাবরোৎসব নামে এক প্রকার নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হত। শবর জাতির ন্যায় কেবলমাত্র বৃক্ষপত্র পরিধান করিয়া এবং সারা গায়ে কাদা মাখিয়া ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে লোকেরা অশ্লীল গান গাহিত এবং তদনুরূপ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিত। জীমূত বাহন 'কাল-বিবেক গ্রন্থে' যে ভাষায় এই নৃত্যগীতের বর্ণনা করিয়াছেন বর্তমান কালের রুচি অনুসারে তাহার উল্লেখ বা ইঙ্গিত করাও অসম্ভব। অথচ তিনিই লিখিয়াছেন, যে ইহা না করিবে ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিদারুণ শাপ দিবেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে কতিপয় অশ্লীল শব্দ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে ইহা অপরের সমমুখে উচ্চারণ করা কর্তব্য করা কর্তব্য নহে, কিন্তু আশ্বিন মাসে মহাপূজার দিনে ইহা উচ্চারণ করিবে–তবে

মাতা, ভগিনী এবং শক্তিমন্ত্রে অদীক্ষিতা শিষ্যার সম্মুখে নহে। ইহার সপক্ষে এই পুরাণে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, শ্লীলতা বজায় রাখিয়া তাহার উল্লেখ করা যায় না।" (রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাসের ১৮৯ পৃষ্ঠা)

শ্রীমজুমদার আরও লেখেন–"সে যুগের স্মার্ত পণ্ডিতগণ প্রামাণিক গ্রন্থে অকুণ্ঠিত চিত্তে লিখিয়াছেন শূদ্রাকে বিবাহ করা অসঙ্গত কিন্তু তাহার সহিত অবৈধ সহবাস করা তাদৃশ নিন্দনীয় নয়।" (পৃষ্ঠা ১৯৩)

তিনি আরও লিখেছেন, "কঠোর জাতিভেদ প্রথা তখন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে একটি সুদৃঢ় ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল।" (ঐ পৃষ্ঠা ২৩৮)

ব্রাহ্মণ্যবাদ এতই চরমসীমায় পৌঁছেছিল যে, যেটাই ঘোষিত হোত সেটাই ঈশ্বরবাক্য বলে মেনে নিতে হত সমাজকে। বিদ্রোহ, বিরোধিতা বা সমালোচনার যথেষ্ট অবকাশ ছিল বলে মনে হয় না। তাই শ্রীদাশগুপ্ত লিখেছেন, "পরে সেন রাজাদের আমলে প্রচণ্ড আগ্রহে ও প্রচারের জন্য উৎসর্গিত প্রাণের উদ্দীপনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয় এর ফলে বাঙ্গালী সমাজে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণদের প্রতাপ এত বেশি বেড়ে যায় যে তা অচিরে অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায়–যেমন প্রায়শ্চিত্তের অতীত পাপ বলে সমুদ্রযাত্রাকে নিষিদ্ধ করা হয়।" (সুরজিৎ দাশগুপ্তের ভারতবর্ষ ও ইসলাম পুস্তকের ৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তিনি লিখেছেন যে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে মানতে হবে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালী সমাজকে অসাড় ও জড়বৎ করে ফেলেছিল, দুর্বল করে ফেলেছিল সঙ্ঘশক্তিকে, উপরন্তু সমাজপতিতের প্রতি জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাকে বিরূপ করে তুলেছিল।" এমন বৈজ্ঞানিক মন্ত্রতন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছিল যদি তা আলোচনা করা হয় তাহলে আজকের মানুষ বেশ অবাক হবে। ঐতিহাসিক দাশগুপ্ত আরও লিখেছেন, "এ সময় এরূপ বিধানও দেয়া হয়েছিল যে দেশ যদি শত্রু সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়তাহলে সাদা অপরাজিতার (গাছের) মূল ধুতুরা পাতার রসে বেটে কপালে তিলজ এঁটে মন্ত্র জা করতে হবে–ওং অং হং হলিয়া হে মহেলি বিহঞ্জহি সাহিনেহি মশা নেহিত খাহিলুঞ্জহি কিলি কিলি কালি হুং ফট স্বাহা।" (পৃষ্ঠা ৯৯)

নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়া নিসন্দেহে ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। ভারতের মুসলিম অঞ্চলগুলোর মধ্যে কেরালায় আজ এত মুসলমান কেন? সেখানে অস্ত্র দিয়ে বলপূর্বক ধর্মান্তর ঘটান হয়েছে–এটা যে নিছক বাজে কথা তা আগের আলোচনায় দেখান হয়েছে–তবুও কেরালা ও রাজস্থানের সামাজিক আলেখ্য আরও দু একটি নিয়ে আসছি।

"কেরালার নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অমানুষিক ব্যবহার অকল্পনীয়। রাজস্থানে এ বর্ণভেদ প্রথা যে বাংলার চাইতে কত সহস্র গুণ ভয়াবহ তা আমার স্বচক্ষে দেখা–সাধারণত নিম্নবর্ণের লোকদের বর্ণ অনুসারে পৃথক পৃথক পোশাক ও গহণা আছে এবং নিম্নবর্ণ লোকের পক্ষে এমন সাজপোশাক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যা উচ্চবর্ণের লোকের উপযুক্ত সাজপোশাক–১৯৭৪ এর ডিসেম্বরে লক্ষ্য করেছি যে শহরাঞ্চলে কিংবা যোধপুর জেলার অন্তর্গত বোরুন্দার মত গ্রামে এসব বিধিবিচার শিথিল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ১৯৬৫ তে এসব নিয়ম অনেক কঠোর দেখেছিলাম। ১৯৭২ এর ২৭ শে নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকাতে ব্রাহ্মণদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে উত্তর প্রদেশের এক হাজার হরিজনের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের খবর প্রকাশিত হয়, এর কিছুদিন পরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের বান্দাতে ধনবান ব্রাহ্মণদের সশস্ত্র আক্রমণে গ্রামসুদ্ধ হরিজনরা ঘরবাড়ি ছেড়ে শহরে এসে জেলা কর্মকর্তার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে–সে সময় দিল্লী যাওয়ার পথে এলাহাবাদ থেকে যাত্রীদের মুখে শুনি। রাঁচি-চক্রধরপুর রোডে অবস্থিত বাধগাঁওয়ের মিশনারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাইকেল ভোদ্রা

আমায় বলেছিলেন, তাঁর বাবা একবার উচ্চবর্ণের লোকদের মত হাঁটুর নিচে ধুতি পরেছিলেন, এবং তাঁর এ স্পর্ধার জন্যে তাঁকে জমিদার বাড়ীতে ডেকে প্রচণ্ড প্রহার করা হয় এবং তারপরে তিনি খৃষ্টান হয়ে যান।" (পৃষ্ঠা ৯৪ – ৯৫)

এসব অত্যাচারিত, উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত মানুষেরা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন তখন তাঁদের আচার-ব্যবহার পোশাক পরিচ্ছদ এবং নাম পর্যন্ত পাল্টে যেত, অর্থাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত।

"আগেই বলা হয়েছে যে, নিম্নবর্ণের লোকদের উর্ধাঙ্গ অনাবৃত রাখতে হত। এককালে কেরালাতে অমুকের স্ত্রী বা মেয়ে ইসলাম নিয়েছে বলা দরকারই হত না, তার বদলে শুধু 'কুপপায়ামিড়ুক' শব্দটি ব্যবহার করা হত–কুপপায়ামিড়ুক শব্দটির অর্থ হল 'গায়ে জামা চড়িয়েছে।' অপমান-সূচক বা হীনতা-দ্যোতক এ রকম বহু আচার প্রথা ইসলামের প্রভাবে কেরালায় সমাজ থেকে দূরীভূত হয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের ফলে দাস প্রথাও বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়।" (দ্রঃ ঐ পুস্তকের ১৩০, ১৩১ পৃষ্ঠা)

'কুলীন' ব্রাহ্মণ নামে যে গোষ্ঠী সেন আমল হতে শক্তিশালী হয়েছিল তাঁদের আচার ব্যবহার জানা থাকলে এ যুগের মানুষের অবাক হওয়ার অবকাশ আছে।

মূল্যবান উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়–"কুলীন ব্রাহ্মণ হিসেবও রাখতেন না তাঁরা ক'টি মেয়েকে বিবাহ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য একটি ছোট খাতায় বিয়ের ও বিয়ের পাওয়া যৌতুকের তালিকা লিখে নিজেদের কাছে রেখে দিতেন। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্বশুরালয়ে গেলে শ্বশুররা তাঁদের কি কি জিনিস দিতেন তারও একটা তালিকা রাখতেন।" (অধ্যাপক শ্রীবিনয় ঘোষের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১২০ পৃষ্ঠা ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে ছাপা)

ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীবিনয় ঘোষ লিখেছেন–"কুলীন জামাতারা যখন শ্বশুরগৃহ যান তখনই তাঁদের সম্মানার্থে শ্বশুরকে কিছু অর্থ বা কোনও উপহার দিতে হয়। এ প্রথার ফলে বিবাহ বেশ লাভজনক পেশা হয়ে উঠেছে।

একটি ব্রাহ্মণের যদি ত্রিশটি স্ত্রী থাকে তবে প্রতি মাসে কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে গিয়ে থাকলেই ভাল খেয়ে ও উপহার পেয়ে এবং জীবিকা অর্জনের কোন চেষ্টা না করে তাঁর সারা বছর কেটে যেতে পারে। বহুবিবাহ প্রথার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণেরা এক নিষ্কর্মা, পরভুক শ্রেণী হয়ে উঠেছে এবং বিবাহের মত একটি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে নীতিহীনতার উৎস করে তুলেছে।"

শ্রীঘোষ আরও লিখেছেন, "অতএব কুলীন ব্রাহ্মণেরা জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন বহু বিবাহ করা। কুলীনরা বৃদ্ধ বয়সেও বিবাহ করে অনেক সময় স্ত্রীর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎই হয় না অথবা বড়জোর ৩/৪ বছর পরে একবারের জন্য দেখা হয়। এমন কথা শোনা যায় যে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ এক দিনে ৩/৪টি বিবাহ করেছেন। কোনও কোনও সময় একজনের সব কয়টি কন্যার ও অবিবাহিতা ভগিনীদের একই ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয়া হয়। কুলীন কন্যাদের জন্য পাত্র পাওয়ার খুব অসুবিধা থাকায় বহু কুলীন কন্যাকে অবিবাহিতা থাকতে হত। কুলীনদের ঘরের বিবাহিতা বা কুমারী কন্যাদের খুব দুঃখের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। কুলীনদের এ ধরনের বহু বিবাহের ফলে ব্যভিচার, গর্ভপাত, শিশুহত্যা ও বেশ্যাবৃত্তির মত জঘণ্য সব অপরাধ সংঘটিত হয়। ৮০, ৭২, ৬৫, ৬০ ও ৪২ টি করে স্ত্রী আছে এমন ব্যক্তিদের কথা জানা গেছে–১৮, ৩২, ৪১, ২৫ ও ৩২ টি পুত্র সন্তান ও ২৬, ২৭, ২৫, ১৫ ও ১৬ টি কন্যা সন্তান আছে। বর্ধমান ও হুগলী জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এক এক ব্যক্তির এতগুলো করে স্ত্রীর অস্তিত্ব জানা গেছে।" (এ উদ্ধৃতিগুলো 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' পুস্তকের ১১৬ এবং ১১৭ পাতা থেকে নেয়া হয়েছে)

কেহ যেন মনে না করেন এসব কাহিনী শুধু আদিম যুগের বরং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেই এসব ঘটনা ঘটেছিল বলে ১৮৬৭ সনে দেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণরকে দরখাস্ত করা হয় যাতে আইন করে বহুবিবাহ তুলে দেয়া যায়। সে দরখাস্তে এ রকম সব তথ্যের প্রমাণ ছিল সে সাথে একথাও লেখা ছিল যে এসব রীতি নীতি হিন্দুধর্মে লেখা নাই বরং এগুলো মনগড়া আইন। তাছাড়া আরও বড় কথা যে, ১৮৭১ ও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর স্বয়ং বহুবিবাহ সম্বন্ধে দু'খানি বই লিখেছিলেন। "বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে কৌলীন্য প্রথা এবং বাংলাদেশের কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে উচ্চবর্ণের কন্যা দানের বিশেষ রীতি আছে তার পিছনে কোন শাস্ত্রীয় বিধান নেই। তাঁর বিরোধী পক্ষের সমস্ত যুক্তি তিনি এভাবে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করলেন। কলকাতা শহরের সচচেয়ে নিকটবর্তী হুগলী কুলীনরা কিভাবে বহু বিবাহ করে থাকেন তার একটা তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এসব কুলীনদের নাম এবং তাঁদের স্ত্রীদের একটা সংখ্যা তালিকা তাঁর বইতে সংযোজন করেছিলেন।" (দ্রঃ শ্রীবিনয় ঘোষের ঐ বই, পৃষ্ঠা ১১৯-১২০)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই আদিম যুগের লোক নন। কারণ তাঁর জন্ম হয় ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ২৬ সেপ্টেম্বর এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জুলাই।

১৮২৬ সনে কলকাতার গোলদীঘি বা কলেজ স্কোয়ারে একটি নতুন বাড়ী তৈরি হল। এসেই একই বাড়িতে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ স্থান পেয়েছিল। সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য কোন বর্ণের ছাত্র ভর্তি হত পারত না, আর মুসলমানদের ছেলে ভর্তি শ্রীবিনয় ঘোষ আরও লিখেছেন, "সুরুতে দুই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের পারস্পরিক মেলামেশা বন্ধ করার জন্য যে উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছিল তা হাস্যোদ্দীপক বলে মনে হয়। দুই প্রতিষ্ঠানকে একটি দেয়াল দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল আর সে দেয়ালের উপর দেয়া ছিল লোহার গরাদ, উদ্দেশ্য ছিল যাতে 'দ্বিজ', 'শূদ্র' ছাত্ররা পরস্পর মেলামেশা না করতে পারে। এছাড়া তাঁদের একই ফটক-এর ভিতর দিয়ে ভিতরে ঢোকার অনুমতি ছিল, অবশ্য তেমন চওড়া ফটকের হলে এবং ঢোকবার সময় উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি না হলে তবেই। ভবনের মাঝের অংশকে বেড়া দিয়ে ঘিরে পাশের অংশ থেকে বিচ্ছিন্নকরে রাখা হয়েছিল যাতে এক কলেজের ছাত্ররা অন্য কলেজে প্রবেশ করতে না পারে। উপরন্তু দুই কলেজের সন্নিহিত উপগৃহ (আউট হাউস) ও দপ্তরগুলো আলাদা করে রাখা হয়েছিল যাতে ভারতীদের সুদৃঢ় বদ্ধমূল ধর্ম-বিশ্বাস ক্ষুন্ন না হয়'।" (পৃষ্ঠা ১৯)

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ছিলেন তিনি শুধু নিবেদন করেছিলেন কায়স্থ ছাত্রদেরও যেন এ কলেজে পড়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। "কলেজের পণ্ডিতেরা, যাঁরা বেশিরভাই বিদ্যাসাগরের শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে এ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে লাগলেন।" (পৃষ্ঠা ৪০)

তবে একটা কথা ঠিক বোঝা যায় না, ইংরেজরা বিদেশী অহিন্দু শুধু নয় অব্রাহ্মণ ও গোমাংস ভক্ষক। তবু তাঁদের সাথে মেলামেশলা করা, তাঁদের সাথে মিশতে পেরে গর্ববোধ করা এবং তাঁদেরকে সংস্কৃত শিখিয়ে দেয়ার সময় কোন প্রকার ব্রাহ্মণ্য আইন তৈরি হয়নি।

হয়ত এও হতে পারে, ইংরেজির প্রতি উদারতা প্রদর্শন্তার অন্যতম কারণ, অথবা অন্য কিছু–এসব আলোচনায় দেশের ও দশের লাভ কি?

আগেই বলা হয়েছে ভারতীয় মুসলমানদের অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত মনে করলে ভুল করা হবে। বরং হিন্দু-মুসলমানদের সম্বন্ধ মাথা আর দেহের মত; বাকী সম্প্রদায়গুলো অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত সুতরাং মুসলমানরা হিন্দু হতে পৃথক হয়ে পাকিস্তান বা বাংলাদেশ

সৃষ্টি করে হিন্দু হৃদয়কে আঘাত করেছে–একথাটা ঠিক, নাকি হিন্দু ভাইরা নিজেদের 'সৃষ্ট আইন' মুসলমানদের দূরে সরিয়ে দিয়ে এবং অনুন্নত হিন্দুদের জোর করে নিজেদের সাথে মিশতে না দিয়ে মুসলমান হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে সংখ্যা ও ধর্মভিত্তিক ভারত ভাগকে স্বাগত জানিয়েছেন?

মুসলমানদের জন্য অনেকে ইতিহাস পৃষ্ঠায় 'বলপ্রয়োগের' কথা অল্প বেশি স্বীকার করেছেন–মুসলমানরা জোর করে (বলপূর্বক) কিছু অমুসলমানকে মুসলমান করেছেন। একটু আগেই লিখেছি ধর্ম মন ও মস্তিষ্কের খোরাক। তবে কি বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ মোটেই হয়নি? আমি স্বীকার করতে পারি সহজেই যে, কোথাও না কোথাও এমন ঘটেছে যা অবিশ্বাস্য নয়। বলপ্রয়োগের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট করে না দেয়ার কারণে যে কোন সাধারণ মানুষ এটাই মনে করেন যে, এভাবেই বলা হয়েছিল হয়ত–তোমাকে মুসলমান হতে হবে, নইলে তোমার মুণ্ড কেটে নেয়া হবে। অথবা তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ না কর তাহলে তোমার জমি জায়গা সব কেড়ে নেয়া হবে ইত্যাদি। আসলে বলপ্রয়োগের ঘটনা এ রকম নয়। এটা জানতে হলে আমার চোখে দেখা অভিজ্ঞতার উল্লেখ করছি।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাপড়াথানায় মসজিদের পাশে পাশে খৃষ্টানদের চার্চ দেখতে পেলাম। অবাক হয়ে জানতে চাইলাম এখানে হঠাৎ খৃষ্টানরা কিভাবে এলেন? খোঁজ নিয়ে জানলাম মাত্র কয়েক পুরুষ আগে এঁরা মুসলমান ছিলেন। এখনো বিয়ে শাদীতে একই বংশ স্মরণ করে পারস্পরিক দাওয়াত বা নেমন্তন্ন প্রথা চালু আছে এবং এঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদও নেই। অনেক সময় কেহ কেহ এক হুকায় ধূমপানও করে থাকেন। অভাবের কারণেই তাঁরা খৃষ্টানও হয়েছেন, একথা এক্ষেত্রে মোটেই ঠিক নয়। কারণ বছরে দুবার ধান হওয়ার আগে নদীয়ায় এমন অভাব হয়েছিল যে বছরের পর বছর মুসলমান বাঙ্গালীরাও কতদিন ভাত খেতে পাননি। গমের আটা গামের মত তৈরি করে বেশি করে পানি দিয়ে তাই বাটি বাটি খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। কিন্তু পাদ্রীদের বিলেতী কাপড় আর অঢেল টাকা তাঁদের প্রলুব্ধ করতে পারেনি। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল মৌলবী বেশধারী ধার্মিক মুসলমানদের 'নিজেদের সৃষ্ট ধর্মীয় আইন' প্রণয়ন করতে গিয়েই এ অঘটন ঘটেছে।

খৃষ্টানদের যখন চাপড়া থানায় প্রথম আগমন ঘটে তখন এ মুসলমান মৌলুবীরা (?) খৃষ্টান হওয়ার কুফল বর্ণনা করে বলেন, 'খৃষ্টানরা এত পাপী যে তাঁরা যদি কোন ধান-জমিতে থুতু ফেরে দেয় তাহলে সে জমির ধান বা ফসল পর্যন্ত খাওয়া হারাম বা অবৈধ হবে।' অবশ্য উদ্দেশ্য তাঁদের মহৎ ছিল। কিন্তু এত বড় ভুল যে তাঁদের অজান্তেই হয়েছিল তাঁরা তার টেরই পাননি।

পাদ্রীরা এ নির্বুদ্ধিতার সুযোগ গ্রহণ করতে বিলম্ব করলেন না। তাঁরা দল বেঁধে মাঠে মাঠে পদযাত্রা শুরু করলেন আর প্রত্যেক জমিতে থুতু ফেলতে লাগলেন এবং নিজেরাই প্রচার করতে লাগলেন–মাঠের এমন জমি নেই যেখানে আমরা থুতু ফেলিনি। সে মওলুবীর দল তাঁদের পূর্ব নির্দেশ বহাল রাখলেন। তখন নিরক্ষর মুসলমান চাষীকে অর্থনৈতিক চিন্তা করতে বাধ্য হতে হল। কারো দশ কারো কুড়ি বিঘে জমি নষ্ট হয়ে গেছে খৃষ্টানদের থুতু নিক্ষেপের ফলে। সুতরাং এ জমি যদি ভোগ করতে না পারা যায় তাহলে পরিবারের বাচ্চা-কাচ্চাদের না খেয়ে মরতে হবে। তাই শেষে তাঁরা খৃষ্টানদের মন্ত্র উচ্চারণ করে জমি রক্ষা করেন।

তারপর বহুদিন পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের নামও পরিবর্তন করেননি এবং ছেলে-মেয়েদের নামও মুসলমানের মতই রেখেছিলেন। বর্তমানে এঁদের শুকরের মাংস খাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এবং নামও পাল্টে দেয়া হয়েছে। অবশ্য এ অঞ্চলে প্রকৃত মওলুবী-মাওলানা তৈরি হয়ে যাওয়ার কারণে আর এ রকম বিভ্রান্তিকর ঘটনা আশা করা যায় না।

বলপ্রয়োগে ইসলামধর্ম প্রচারের কথাটি পাইকারী ভাবে বেশিরভাগ ইতিহাসেই স্থান পেয়েছে। এ বলপ্রয়োগের পদ্ধতিকে বলা হয়েছে 'তুর্কানা তরিকা বা বলপ্রয়োগ পদ্ধতি'।

গরু হিন্দুদের কছে বিশেষ ভক্তিপূর্ণ সম্পদ। তা ধর্মীয় কারণেও বটে আর রাজনেতিক কারণেও বটে। গরুকে বর্তমান ভারতে ধর্মের নিরিখে দেবতার দৃষ্টিতে দেখা হয়, সুতরাং গরু হিন্দুদের কাছে শ্রদ্ধার বস্তু। তাই গরুর দুধও পবিত্র খাদ্য। কিন্তু মাংসের বিষয় বলতে হলে পবিত্র ও অপবিত্রের উর্ধ্বের কথা বলতে হয়। যেমন পিতা ও মাতর মাংস পবিত্র হলেও তা খাদ্য হওয়া উচিত নয়। নিহত পিতা ও মাতার মাংস যদি কেহ দেখতে পান তাহলে তা কখনো সন্তানদের কাছে অপবিত্র বা বর্জনযোগ্য বস্তু হবে না বরং সে মাংসখণ্ড বুকে মুখে মাথায় স্পর্শ করে কাঁদতে থাকবেন, হায় হায় করবেন শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার কথা স্মরণ করে। যদি নিহত মাতা-পিতার এক টুকর মাংস পুত্রের গায়ে ঠেকিয়ে দেয়া হয় তাহলে নিশ্চয় তা পুত্রের দুঃখ ও কান্নার কারণ হবে, কিন্তু তাঁর হিন্দুত্ব বা ধর্ম চলে যাওয়ারও কারণ হবে না। অবশ্য যদি সন্তানরা বাবা-মাকে হত্যা করে তার মাংস ছোঁয় তাহলে ধর্ম যেতে পারত। মনগড়া আইনের মত আর এক আইন তৈরি হয়েছিল সেটা হচ্ছে, যদি কোন হিন্দুর দেহে গরুর মাংস ঠেকে যায় তাহলে সে আর হিন্দু থাকবে না। তাই যাঁরা নতুন মুসলমান হয়েছিলেন তাঁদের আত্মীয় বা প্রতিবেশীদের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে ঠাট্টা ও বিদ্রুপের ছলে আবার কোন ক্ষেত্রে আকস্মিক গোমাংস গায়ে ছুঁয়ে দেয়ান হত ফলে সাথে সাথে আইন বলবৎ হত–তাকে আর জাতে নেয়া হবে না। তিনিও উপায়ান্তর না দেখে মুসলমান হতেন। আমার মতে এটুকু অন্যায়, তথাপি ইতিহাসে যেটুকু পাওয়া যাবে সেটা অস্বীকার করলে ঐতিহাসিকতা বলে কিছু থাকে না।

শ্রীদাশগুপ্তের উদ্ধৃতি দিচ্ছি–"ইংরেজ আমলে, বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রাজানুগ্রহ লাভের আশায় যেমন ইংরেজি শেখার হিড়িক পড়ে যায় তেমনি মধ্যযুগের বাংলাতে বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলায় একই কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্যেও জনসাধারণের মনে প্রবল উৎসাহ সঞ্চারিত হয় বলে সন্দেহ জাগে। শাসন ক্ষমতার অধিকারী মুসলমানরাও বাংলার জনসাধারণের এ উৎসাহের সদ্ব্যবহারে কোনরূপ ত্রটি রাখেনি এবং সত্যি সত্যি ধর্মান্তরিতরা বহু ক্ষেত্রেই উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অপেক্ষা শাসন ব্যবস্থায় উচ্চতর পদ লাভ করেছে।

এছাড়া তুর্কানা তরীকা অর্থাৎ বলপ্রয়োগ দ্বারা বহু হিন্দুকে মুসলিম করা হয়েছে। অবশ্য কোন হিন্দুকে মুসলমান করার জন্য সেকালে যা বলপ্রয়োগ করা হত তাকে আধুনিক মানদণ্ডে পর্যাপ্ত বলপ্রয়োগ বলা যাবে কিনা সন্দেহ। বলপ্রযোগ মানে অস্ত্রপ্রয়োগ নয়, কোন মতে কারো মুখে শুধু গোমাংস স্পর্শ করিয়ে দেয়ার জন্য যেটুকু বল প্রয়োগের দরকার সাধারণত সেটুকু প্রয়োগ করা হত।"

শ্রীদাশগুপ্ত প্রমাণ করেছেন, যখন এ রকম মাংস নিয়ে স্পর্শ করিয়ে দেয়ার জন্য বলপ্রয়োগ হত তখন "কিন্তু কেহই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসত বলে মনে হয় না। কারণ কোন রকমে সাহায্যকারীরও গোমাংসের স্পর্শ লেগে যেতে পারত এবং তা লাগলেই তাঁরও ধর্মনাশ হত–মুহূর্তের জন্যে আন্তরিকতম অনিচ্ছাতেও গোমাংস-স্পৃষ্ট হলে কারো আর হিন্দু ঘরে ফিরে যাওয়ার কোনও দরজা খোলা থাকত না।" (প্রমাণ ঃ সুরজিৎ দাশগুপ্তের লেখা ঐ পুস্তকের ১০২ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের সাথে তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে কোন মুসলমানকে যদি নিষিদ্ধ শূকর মাংসের দ্বারা ঢেকে দেয়া যায় তবুও তিনি মুসলমান থাকেবন। আর যদি কেহ কাউকে জোর করে শূকর মাংস খাইয়েও দেয় তবুও তাঁর ধর্মের দরজা বন্ধ নেই। সুতরাং ভারতের দুটি মুসলমানবহুল স্থানঃবঙ্গদেশ ও কেরেলার আলোচনায় সারা ভারতের অবস্থা জানতে পারা যাচ্ছে।

বর্তমানে যেকোন মানুষ জানেন যে, সাধারণ ঐতিহাসিকদের চেয়ে একজন পর্যটক ঐতিহাসিকের দাম অনেক বেশি। কিন্তু ভারতে ধর্মীয় বিধানের নামে যা চালান হয়েছিল তাতে নিজের সীমানা ছেলে কোথাও যাওয়া নিষেধ ছিল। যদি কেহ দেশ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ইত্যাদির জন্য গণ্ডি হতে বেরিয়ে পড়তেন তাহলে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।

আর্যরা বঙ্গদেশের অধিবাসীদের দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ ও অসুর বলতেন। এক্ষেত্রে শ্রীদাশগুপ্ত শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের উদ্ধৃতি দিয়েছেন–"আর্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক উত্তর ও মধ্য ভারতের লোকেরা পূর্বতম ভারতের বঙ্গ পুন্ড্র, রাঢ়, সূক্ষ্ম প্রভৃতি কোম্‌দের সাথে পরিচিত ছিল না, যেকালে এসব কোম্‌দের ভাষা ছিল ভিন্নতর, আচার-ব্যবহার অন্যতর। এ অন্যতর জাতি, অন্যতর আচার-ব্যবহার, অন্যতর সভতা ও সংস্কৃতি এবং অন্যতর ভাষাভাষী লোকদের সে জন্যেই বিজাতীয় সুলভ দর্পিত উল্লসিকতায় বলা হয়েছে 'দস্যু' 'ম্লেচ্ছ', 'পাপ', 'অসুর' ইত্যাদি।" (দ্রঃ ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ৯৭)

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অবিভক্ত বঙ্গদেশ জয় করলেন। এটা যদিও ঐতিহাসিক সত্য তবুও অসম্ভব। আমাদের মতে ওটা যুদ্ধই ছিল না। জনসাধারণের মধ্যে রাজার প্রতি রাগ, দুঃখ, ঘৃণা, অভিমান ও আক্রোশ এত বেশি পুঞ্জীভূত ছিল যে, তাঁদের দিক থেকে কোন বাধা পায়নি এ ঘোড়সওয়ারের দল। আর অশ্ব ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁরা প্রবেশ করলেই রাজার প্রজারা যোগসাজস করে সংবাদ দেয় রাজাকে ঘোড়া কেনার জন্য। রাজা কিছু টের না পেয়ে ঘোড়া দেখতে গিয়েছিলেন। ওদিকে রাজবাড়ীতে সৈন্য প্রবেশ করে। সেখানে প্রহরীদের সাথেও তেমন লড়াই হয়নি তাহলে এও হতে পারে–ব্রাহ্মণ্য শাসন, কৌলীন্য প্রথা, বর্ণ বিভাগ প্রভৃতিতে অতিষ্ঠ হয়ে দেশবাসী প্রতীক্ষায় ছিল বাইরের কোন শক্তির।

সে জন্য রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "যখন নগর রক্ষীগণের মুর্খতায় বা অন্য কোন কারণে বিনা বাধায় তুরস্ক সৈন্যগণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল তখন অতর্কিতে সহসা আক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধ রাজার পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না। সুতরাং ইহাকে কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত বলা যায় না।" (দ্রঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা ৯৭)

পূর্ণভাবে বিচারান্তে এ কথা বললে ভুল হবে না যে–ভারতে মুসলিম আগমন ভারতের জন্য অভিশাপ নয়, বরং আশীর্বাদ। তাই শ্রীদাশগুপ্ত সুস্পষ্ট করে বলেছেন–"সামগ্রিক বিচারে মানতে হবে যে ইসলাম স্বাতন্ত্রে গৌরবান্বিত বাংলার জনসাধারণকে অজ্ঞাতপূর্ব মুক্তির স্বাদ দিল। বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণীর তথা শ্রমজীবী জনসাধারণকে দিল ব্রাহ্মণ্য নির্যাতন ও কঠোর অনুশাসনাদির থেকে মুক্তি, প্রতি পদে সামাজিক অপমানের থেকে মুক্তি, পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রস্পৃহ জনসাধারণকে দিল ভৌগোলিক বিধি-নিষেধের বন্দীদশা থেকে মুক্তি, বহু আয়াসসাধ্য সংস্কৃত ভাষার বন্ধন কেটে জনসাধারণকে দিল মাতৃভাষাতে আত্মপ্রকাশের অধিকার।" (ঐ পৃষ্ঠা ১০৭)

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' বাংলা অনার্স বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক। তাতে দেখান হয়েছে মুসলিম শাসকদের অত্যাচারের কাহিনী। সরকারের সর্বদা সজাগ থাকা দরকার শিক্ষার কুফল ও সুফল সম্বন্ধে। ক্লাসে একত্রে থাকে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতির ছাত্র। মুসলমান অত্যাচার করেছিল জেনে হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি হবে উত্তেজনা! আর মুসলমান ছাত্ররা পাশাপাশি পাবে বেদনার কশাঘাত। ভারতের কি কল্যাণ আছে তাতে?

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত নাম করা ঐতিহাসিক পর্যন্ত এগুলোর কোন সমীক্ষা না করে একরকম বিশ্বাসই করে গেছেন।

কিন্তু আধুনিককালের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক লিখেছেন—"তবে বোনবিবির জহুরানামা'র কথা পরীক্ষার্থী-পাঠ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। সেসব ইতিহাসে পাওয়া যাবে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখা 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবির আত্মপরিচয় অংশে মুসলিম শাসকদের অত্যাচারের কাহিনী। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তকারগণ মুকুন্দরামের আত্মপরিচয়ের প্রথম থেকেই মুসলমান অত্যাচারের এক জ্বলন্ত সমকালীন দলিল আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁদের এ আবিষ্কারের ভিত্তিতে রামেশচন্দ্র মজুমদারের মত ঐতিহাসিক কাব্যের মর্মে প্রবেশ না করে সমকালীন তথ্যাবলী যাচাই না করে ভাসা ভাসা ধারণার বশবর্তী হয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ গ্রন্থে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'সাধারণ কৃষক ও প্রজাগণের দুঃখ দুর্দশার অবধি ছিল না। ইহার অনেকগুলো কারণ ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম রাজকর্মচারীদের অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়ন। কবিকঙ্কন চণ্ডীর গ্রন্থকার মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দামিন্যায় ছয়-সাত পুরুষ যাবৎ বাস করিতেছিলেন—কৃষি দ্বারা জীবন-যাপন করতেন। ডিহিদার মামুদের অত্যাচারে যখন তিনি পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইলেন তখন তিন দিন ভিক্ষার্থে জীবন ধারণের পর এমন অবস্থা হইল যে ' তৈল বিনা কৈল স্নান করিলু উদক পান শিশু কাঁদে ওদনের তরে'। একই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্য শীর্ষক পরিচ্ছেদের লেখক সুখময় মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন, 'ডিহিদার মামুদ বা মুহম্মদ শরিফ প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে থাকেন এবং মুকুন্দরামের প্রভু গোপীনাথ নন্দীকে বন্দী করেন। তখন মুকুন্দরাম হিতৈষীদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশ ত্যাগ করেন; অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া এবং ঠিকমত স্নানাহার করিতে না পাইয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হয়, ইত্যাদি।" (ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ১০৪)

আমারে মনে রাখা দরকার কাব্য, উপন্যাস বা ঐতিহাসিক উপন্যাস, নাটক আর ইতিহাস পৃথক পৃথক বস্তু। তবুও ঐতিহাসিকগণ যখন কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন না তখন কাব্য, লোককথা, কিংবদন্তী যা কিছু পান তাই ইতিহাসে ঢুকিয়ে দেন। ইতিহাসে ঢোকার পরেই সে অসার পদার্থ তখন পদার্থে পরিণত হয়। ঠিক চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেরও এ অবস্থা। অবশ্য বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্ষ ২৫, সংখ্যা ২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত ক্ষুদিরাম দাসের লেখা 'মুকুন্দরামের গ্রামত্যাগ ও কাব্য রচনা প্রসঙ্গ' নামে যে মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে প্রমাণ করা হয়েছে—"মুকুন্দরাম বিধর্মী শাসকের অত্যাচারে বিতাড়িত হন নাই। কিন্তু কেন্দ্র হতে নির্দিষ্ট সামগ্রিক পরিবর্তনমূলক নূতন ভূমি ও শাসন ব্যবস্থায় নানা অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় গোপনে পালিয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবেও নিপীড়িত হন নাই।"

ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগো 'শেরশাহ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন শেরশাহ ভূমি সংস্কার আইন এমনভাবে তৈরি করেন যাতে প্রকৃত চাষী চমির মালিক হতে পায়। ফলে তাঁদের উপর যারা সর্দারী করে রোজগার করত তাঁদের আঁতে ঘা লাগে।

এ প্রসঙ্গে বক্তব্য হচ্ছে–"তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা মুঘল শাসকরা করেছিল তা স্বভাবতই কায়েমী স্বার্থের আঁতে ঘা দিয়েছিল এবং মুকুন্দরাম কায়েমী স্বার্থকে বিপন্ন হতে দেখে স্বগ্রাম ত্যাগ করেছিলেন, কেননা তিনি নিজে পরিপুষ্ট ছিলেন কায়েমী স্বার্থের দ্বারাই এখানে বিরোধটা ছিল সম্পূর্ণতই অর্থনৈতিক এবং এ অর্থনৈতিক বিরোধকে ধর্মীয় বিরোধের রং দেয়ার প্রয়াসটা এ যুগের সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির একটা প্রকাশ।" (পৃষ্ঠা ১০৬)

সাম্প্রদায়িতকতার বিষ ছড়াবার জন্য বর্তমান কালের লেখকরা যাই-ই লিখেছেন তাই মেনে নেয়া যায় না। আসল সত্য এটা যে, মুসলমান আগমন ভারতীয়দের জন্য এমনকি বাংলার জন্যও ছিল একটা প্রতীক্ষিত সুযোগের মত। কারণ পুরাতন দলিলাদি যা যাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে তখন যে সমস্ত কবিতা ও কাব্য রচনা করা হয়েছে তাতে মুসলমান বিজয় ভারতীয়রা বা বাঙ্গালীরা নিজেদের পরাজয় মনে না করে বিজয়ই মনে করেছিলেন। কবিতার নমুনা ঃ

'ব্রহ্মা হইল মোহাম্মদ
বিষ্ণু হইল পেগম্বর
মহেশ হইল আদম
গণেশ হইল গাজী
কার্তিক হইল কাজী
ফকির হইল মুনিগণ
তেজিয়া আপন ভেক
নারদ হইল শেখ
পুরন্দর হইল মৌলানা
চন্দ্র সূর্য আদি যত
পদাতিক হইয়া শত
উচ্চস্বরে বাজায় বাজনা।'

হিন্দু মুসলমান মাঝে যে সাম্প্রদায়িক প্রাচীর তা পূর্ব হতে এভাবে ছিল না। তখন কবি ও কাব্যকারদের লেখার মধ্যেও মিলিত হিন্দু-মুসলমানকে মুগ্ধ করার চেষ্টার চিহ্ন থাকত। যেমন–

গাজী মিঞার হাজোত সিন্নি সম্পূর্ণ হল।
হিন্দুগণে বল হরি মোমিনে আল্লা বলো॥

বর্তমান ঐতিহাসিকদের মতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য আজ ভারতের পাঠ্যপুস্তক না হয়ে 'জহুরনামা' কাব্যকেও তো পাঠ্যপুস্তক করা যেত, কিন্তু তা হয়নি। জহুরনামার লেখকের নাম বয়নদ্দী। তাতে এভাবে কাহিনীটি সাজান আছে–বনবিবি ও তাঁর ভাই শাহজঙ্গলী মক্কা থেকে সুন্দরবন জয় করতে আসেন। সুন্দরবনের রাজা দক্ষিণরায় যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলে তার মা নারায়ণী বললেন, যুদ্ধ তিনি নিজেই করতে চান বনবিবির সাথে। যুদ্ধ শুরু হল। কিন্তু বনবিবির শক্তি হঠাৎ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে বেড়ে গেল। তখন নারায়ণী তাঁকে সই বলে ডাকলেন। এই রাজনৈতিক কৌশল, উদারতা ও বুদ্ধির শক্তি প্রয়োগে বনবিবি আকৃষ্টা হলেন এবং যুদ্ধ থামালেন। নারায়ণীর পুত্র দক্ষিণরায়ের সাথে বনবিবি মিলিতভাবে সুন্দরবন শাসন করতে লাগলেন।

শ্রীদাশগুপ্ত তাই ইতিহাসে আবেগ সৃষ্টি করে বলেছেন, “তবে ‘বনবিবির জহুর নামা’র কথা॥‘পরীক্ষার্থী পাঠ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না, যেসব ইতিহাস পাওয়া যাবে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখা ‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্যে কবির আত্মপরিচয় অংশে মুসলিম শাসকদের অত্যাচারের কাহিনী।” (পৃষ্ঠা ১০৪)

আমরা ছোট্ট দাবী রেখেছিলাম যে-হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কুসাম্প্রদায়িকতা দূর হয়ে যেত যদি মুসলমান আক্রমণ আর আর্য আক্রমণকে এক দৃষ্টিতে দেখা যেত।

‘হিন্দুজাতি’, হিন্দুধর্ম’ এ শব্দগুলো নিয়ে একটু চিন্তার অবকাশ আছে। মুসলমানকে হিন্দুর শত্রু, বিদেশী, অত্যাচারী, ম্লেছ ও যবন প্রভৃতি উপাধিতে প্রচর করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ‘হিন্দু’ প্রথমে কোন জাতি ও ধর্মের নাম ছিলনা। “কেহ কেহ ভারবর্ষকে হিন্দুস্তান বলে উল্লেখ করে থাকেন। সংক্ষেপে এ উপমহাদেশকে ‘হিন্দ’ বলাও হয়েছে।” ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর ফারসী হিন্দুস্তান শব্দটি হিন্দি ‘হিন্দুস্তান’ শব্দে রূপান্তরিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন হিন্দুস্তান হিন্দুর দেশ অথবা হিন্দুস্তানে যাঁরা বাস করেন তাঁরাই হিন্দু। আবার একদল মনে করেন মুসলমান এবং আর দু-একটি জাতি ছাড়া সকলেই হিন্দু বা হিন্দুস্তানী।

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যাকে আগে আর্যাবর্ত বলা হত সে উত্তর ভারতকেই হিন্দুস্তান বলা হত।

১৮৫৭ সনের মহা অভ্যুত্থানের পরে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান নেতারাই ‘ভারতীয়’ অর্থে ‘হিন্দুস্তানী’ শব্দ ব্যবহার করা শুরু করেছেন। “এসব দৃষ্টান্ত অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করে যে হিন্দুস্তান শব্দটির কোনও ধর্মীয় তাৎপর্য নেই, যা আছে তা বিশুদ্ধ ভৌগোলিক তাৎপর্য।” [ঐ পুস্তকের ২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

পারস্যের ইরানের লোকেরা সর্বশক্তিমান উপাস্যকে বলতে অহুর। ভারতীয় জিহ্বায় অহুরের ‘হ’ ‘স’ হয়ে অসুর হয়ে যায়। তেমনি পারিসকরা ভারতের সিন্ধু নদের ‘স’ বা ‘সিন’কে পরিবর্তন করে ‘হ’ করে দেয়, ফলে সিন্ধু হয়ে যায় হিন্দু। এভাবে তাঁরা সিন্ধু নদের তীরবর্তী অধিবাসীদের হিন্দু বলতে শুরু করে। ‘সিন্ধুর উচ্চারণ যেমন পারসীদের যেমন পারসীদের জিহ্বায় হিন্দু হয় তেমনই গ্রীকদের জিহ্বাতে ইন্দু এবং ইন্দু থেকেই ইন্ডিয়া শব্দটির উৎপত্তি।’

হিন্দুর হিন্দুত্ব ও এ শব্দের গৌরবের সাথে পারস্য বা ইরান এবং আবরদের অবদান মিশে আছে। তাই রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন॥

As is well known, Hindu, a modified form of Sindhu, was originally a geographical term used by the western foreigners to denote, first the region round the Sindhu river, and then the whole of India. The Indians, however, never called themselves by this name before the Muslim conquest. (The History and Culture of the Indian People : R. C. Majumder)

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে অবশ্য ভাল হওয়া চাই নতুবা ভারতের ক্ষতিরোধ করা সম্ভব হবে না। তাই মনে রাখা ভাল, শুধু আর্য, মুসলমান ও খৃষ্টান জাতিই বাইরে থেকে আসেনি বরং বহু জাতিই এসেছে এই ভারতের মাটিতে। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে বিদেশীদের আগমন ঘটেছে। এটা পৃথিবীর মানবজাতির একটি স্রোতস্বতী চিরন্তন নীতি।

ভারতের বাইরে থেকে এসেছে যেমন বৈদিক আর্য ও মুসলমান জাতি তেমনি এসেছে যবনগ্রীক, রোমান, গুর্জর, কুষাণ, হাবসী, ইহুদী, কাফ্রী, নিষাদ, দ্রাবিড়, কিরাত প্রভৃতি বহু গোষ্ঠী। কিন্তু শুধু মুসলমান-হিন্দুদের মধ্যে এত গণ্ডগোল, কেন, কিভাবে তার সূত্রপাত হয়, কেমনভাবে তাঁর লালনপালনের ব্যবস্থা হয়, তারপর তাঁর বিকাশে ভারতের কি অবস্থা হয় তার আলোচনা এবং আগামীতে কি হতে পারে তা চিন্তায় এখনও যদি সাবধানতা অবলম্বন না করা হয় তাহলে ইতিহাস শেখার যৌক্তিকতা কোথায়?

বৈদিক আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বে ভারতের একটি সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। সেই জনপদগুলো প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। যার প্রমাণ মাটির নিচে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলো ছিল অনার্য সভ্যতা। যদিও ধ্বংস হয়েছে তবু আর্যদের দ্বারাই তা হয়েছে আর এ ধ্বংসাবশেষ দেখে প্রমাণ হয় তখন ধ্বংস করার নীতি ছিল বলেই জনপদগুলো প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছিল।

আর্যরা পুরাতন বা অনার্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শক্তি ধ্বংস করতে এবং তাঁদের হত্যা করার দিকে খুবই অগ্রসর ছিলেন। প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো মধ্যে ঋগ্বেদের বর্ণনা ও প্রার্থনা মিলিয়ে দেখলে সুস্পষ্ট হয় যে প্রাচীনতর ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্মীয় বিশ্বাসকে ধ্বংস করার দিকে এবং পুরের (নগরের) অধিবাসীদের হত্যা করার দিকে বৈদিক আর্যদের প্রবল প্রবণতা ছিল–এসব কাজে তাঁরা উল্লাস ও গৌরব বোধ করত। যারা এভাবে বৈদিক আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তাঁদের নাগরিক বাসস্থানগুলো ত্যাগ করে চলে যায় তাঁরা ভারতবর্ষের গভীরতম অঞ্চলগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে রক্ষা করতে থাকে, কিন্তু আর পুর গড়ে তোলেনি সম্ভবত এ কারণে যে তাতে ধ্বংসকারী বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। অথাৎ সিন্ধু নদের উপত্যকা থেকে তাঁদেরকে উৎখাত করতে সমর্থ হলেও বিশাল ভারতবর্ষ থেকে তাঁদের নির্মুল করতে বৈদিক আর্যরা সফল হয়নি। অধিকৃত জনপদে যারা থেকে যায় তাঁরা বিজয়ীদের সেবায় নিযুক্ত হয় এবং এভাবে দাস শব্দটার অর্থান্তর ঘটে, সেবার জন্য নিযুক্ত ভৃত্যের অর্থে দাস শব্দটার ব্যবহার হতে থাকে।" (দ্রঃ শ্রীদাশগুপ্তের ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ৯)

অনার্যদের মেরে ফেলা আর্য ধর্মে ছিল। আমি যদি এ তথ্য পরিবেশন করি তাহলে বিরাট আপত্তি আসতে পারে তাই ইতিহাস হতে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়–"আর রামায়ণ থেকে জানতে পাই যে, জনৈক ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রের কাছে বলেন, তাঁর পুত্র অকালে মারা গেছে, কারণ দেশের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গভীর অনাচার চলছে। এরপর রামচন্দ্র অনাচার অনুসন্ধান করতে দক্ষিণ দিকে এসে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণস্থিত শৈবলগিরির উত্তর পাশে এক বিমাল সরোবর দেখলেন, সে সরোবর তীরে অধোমুখে লম্বমান তপঃপরায়ণ তাপসকে দেখে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক নানা সম্ভাষণ করে তাঁর জাতি জানতে চাইলেন। যেই সেই উৎকৃষ্ট তপোনিরত তপস্বী নিজেকে শূদ্র বলে পরিচয় দিলেন, অমনই রামচন্দ্র সুরুচিরপ্রভ বিমল খরগ নিষ্কাশিত করে শূদ্রের মস্তক ছেদন করলেন। শূদ্র নিহত হলে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেববৃন্দ সাধু সাধু বলে কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের প্রশংসা করতে করতে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। রামচন্দ্রের কাছে যেমন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের সমান হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণের আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে তেমনি বুদ্ধদেবের কাছে আর্য সমাজের বহু বিচারই ঘোর নিন্দার যোগ্য বিষয় বলে মনে হয়েছে। কিন্তু বৈদিক আর্যরা এক সময় যে কৌশলে প্রাচীনতর তথা অনার্য ধর্ম সংস্কৃতিকে গ্রাস করেছিল সেই কৌশলেই আস্তে আস্তে বিদ্রোহের থেকে উদ্ভূত মনোভঙ্গি এবং তার ধর্ম সংস্কৃতিকে গ্রাস করে।" (ঐ পুস্তকের ১০-১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

Goto List

নালন্দা মহাবিহার তুর্কী আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু নালন্দা ও মহাবিহারগুলো দুর্গের মত এমনভাবে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল যে বিদেশী তুর্কীরা সেগুলোকে দুর্গ মনে করে আক্রমণ করেন এবং তার পত্তন ঘটান। কিন্তু পরে তাঁরা জানতে পারেন ওগুলো দুর্গ ছিল না। তাই ঐতিহাসিক দাশগুপ্ত বলেন-"তুর্কীরা দুর্গ বলে ভুল করেই নালন্দা ধ্বংস করেছিল। অবশ্য ময়নামতী ধ্বংস হয় ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বীদের হাতে ভোজবর্মার শিলালিপি থেকে জানা যায় যে পরম বিষ্ণুভক্ত জাতবর্মা সোমপুরের মহাবিহার (মন্দির) ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' থেকে জানা যায় যে কাশ্মীরের হিন্দু রাজারা পররাজ্য জয় করার সময় বিজিত রাজ্যের মন্দির ধ্বংস করে ধন সম্পদ লুঠ করত।" (ঐ, পৃষ্ঠা ১২)

এসব প্রকৃত ইতিহাস যাঁদের জানা না থাকবে শুধু তাঁরাই ভাববেন-মুসলমানদের কাজই ছিল শুধু হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করা। তখনকার দিনে মন্দিরগুলোকে দুর্গের মত মজবুত করে তৈরি করা হত। তার কারণ তাতে থাকত রাজা এবং প্রজদের প্রচুর ধন-সম্পদ। অথাৎ ধর্ম মন্দিরগুলোকে ধনাগার বা রাজনৈতিক ঘাঁটি করে রাখার ফলে সাধারণভাবে রাজনৈতিক কারণে সেগুলোর উপর আক্রমণ বা আঘাত আসত। তাই ঐতিহাসিক গুপ্ত লিখেছেন—"এ ধর্মস্থানগুলিতে দেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের ধনসম্পদ জমা রাখত অথবা ধর্মস্থানগুলো ছিল স্বকীয় মাহাত্ম্যে দেশের প্রধান ধনাগার। হরিণ যেমন নিজের মাংসের গুণে শিকারীকে প্রলুব্ধ করে তেমনি এ ধর্মস্থানগুলিও ধনাগার রূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে পরাক্রান্ত পুরুষদের প্রলুব্ধ করত এবং এর ফলে ধর্মস্থান ধ্বংসের সাথে বিদ্বেষের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা অন্ধ সংস্কার প্রণোদিত হয়ে যায়, যার পিছনে বাস্তবতার সমর্থন নেই।" (ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ১২)

ধর্মপ্রচারক রামানুজের কথা আগেও বলা হয়েছে এখানে আরও বলা যেতে পারে—তাঁর সহজ ধর্মমত হিন্দু রাজার কাছে এত অন্যানয় বলে বিবেচিত হয়েছিল যে, তাঁর প্রাণদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছিল। তাই তাঁকে শিষ্যবৃন্দ নিয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

"বৈদিক আর্য ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে ভারতবর্ষে এসেছিল অনেকটা সেভাবেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও এখানে আসে, তবে বৈদিক আর্য ধর্মাবলম্বীরে সাথে ভারতবর্ষে বসবাসকারী বিভিন্ন অনার্য ধর্মাবলম্বীদের প্রথম পরিচয় ধ্বংস ও সংঘাতের মাধ্যমেই হয়েছিল মনে হয়। কিন্তু ইরানী, আরব, তুর্কী প্রভৃতি মধ্য ও পশ্চিম প্রাচ্যের অধিবাসীরা, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আনেক আগেই তাদের সাথে ভারতীয়দের পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটে ভিন্নতর মাধ্যমে। তাছাড়া তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরেও তাদের সাথে ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং ভারতবর্ষে মুসলিম সশস্ত্র অভিযানগুলো শুরু হওয়ার আগেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী বণিকরা ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ কেরলে, একটা নিজস্ব সমাজ গড়ে তুলেছিল। যেমন মুসলিম সৈনিকদের অভিযান শুরু আগেই মুসলিম বণিকদের আসা যাওয়া শুরু হয় তেমনই উত্তর ভারতে মুসলিমদের প্রথম অনুপ্রবেশ নিরস্ত্র ও প্রমিক সুফি সাধুসন্তদের মাধ্যমে শুরু হয়ে যায়। তবে অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য আর্যরা যতখানি সাফল্য দাবী করতে পারে মুসলিম যোদ্ধারা ততখানি সাফল্য দাবী করতে পারে না।" (দ্রঃ ঐ, পৃষ্ঠা ১৫)

ইসলাম ও মুসলমান সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে একটা কু-ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, যা বর্তমান অদূরদর্শী ঐতিহাসিক ও লেখকদের পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের ফল। যদি এ শ্রম ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি না লাগিয়ে মিল মৈত্রীর পথে পরিচারিত হত, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যায়, ভারতবর্ষ তিনভাগে ভাগ হয়ে ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হত না।

সুদীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে ভারতে হিন্দু ধর্ম ধ্বংসও হয়নি, হিন্দু জাতিও ধ্বংস হয়নি আর ধর্মীয় কারণে আর্য ও ইংরেজদের মত ধ্বংসাত্মক ঘটনাও ঘটেনি। অবশ্য বর্তমান ইতিহাসে যা ঘটান হয়েছে তা ঘটনা নয় বরং রটনা। সুদীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের অধীনে থাকা সত্বেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসী, এমনকি মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্রগুলোর অধিবাসীও হিন্দু থেকে যায়, কিন্তু ইউরোপে পেগান ধর্মের বিরুদ্ধে এমন সর্বব্যাপী অভিযান চালানো হয় যে পেগান ধর্মালম্বী ইউরোপীয়দের চিহ্নমাত্র রাখা হয়নি। মুসলমানরা যদি সত্যিই একহাতে অস্ত্র নিয়ে ধর্মপ্রচারের অভিযানে নামত তাহলে ইউরোপের মত ভারতবর্ষেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চিহ্নমাত্র থাকত না।' (দ্রঃ ঐ, পৃষ্ঠা ১৬)

খৃস্টান ধর্মেও প্রথমে এ নীতিই প্রকাশ হয় যে, 'ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কাউকে বাধ্য করা যাবে না।' কিন্তু ধর্মের সাথে যেদিন রাজশক্তি যোগ হল সেদিন সহিষ্ণুতার মাথা খাওয়া গেল। অখৃষ্টানরা সাধারণ অপরাধীদের চেয়েও বড় অপরাধী বলে গণ্য হত। এমনকি তাদের নিষ্পাপ কচি বাচ্চাদের জন্য বলা হয়েছিল, ওরা যদি মরে যায়, যদিও শিশু তবুও খৃষ্টান হওয়ার সুযোগ পায়নি, তাই তারা নরকের মেঝেতে অনন্তকাল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবে। চার্চের যাজকদের মধ্যে সবচেয়ে নামজাদা যাজক সন্তু আগাষ্টাইন। তিনি সকলকে জোর করে খৃস্টান করার নীতির প্রতিষ্ঠাতা।

১২০০ খৃস্টাব্দের কয়েক বৎসর পূর্বে তৃতীয় ইনোসেন্ট প্রধান ধর্মযাজক হন। তাঁরই আমল থেকে ইউরোপে অখৃস্টানদের জোর করে খৃষ্টান করার অভিযান চলে।

দক্ষিণ পশ্চিম ফ্রান্সের এক ধনী জমিদার কাউন্ট তুলোস এবং তাঁর প্রজারা অলবিজোয়া নামে অভিহিত ছিলেন। তাঁরা খৃস্টান ছিলেন না। তাই এক হাতে অস্ত্র ও অন্য হাতে বাইবেলের নীতিও নামে যে নৃশংশভাবে শিশু-নারী সহ তাদের নিহত হতে হয়েছে তার ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাবে মিঃ জে. বি. বিউরীর লেখা A History of Freedom of Thought পুস্তকে। 'এ অভিযানে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হয় ধর্মীয় উল্লাসে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট অব তুলোসের শোচনীয় পরিণাম থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন রাজার রাজা হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারিত হবে রাজ্য থেকে খৃস্টানদের নির্মূল করার সম্মতিতে ও সামর্থ্যে এবং যে রাজা আপন রাজ্য থেকে উৎখাতে সম্মত ও সমর্থ হবে না তার রাজা হওয়ার কোনও যোগ্যতা বা অধিকার নেই।'

১২২৩ খৃষ্টাব্দে প্রধান ধর্মযাজক নবম গ্রেগরীর আদেশ অনুসারে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে অখৃষ্টানদের খুঁজে বের করার একটা অভিযান চলে, যেটা ইনকুইজিশন নামে কুখ্যাতি লাভ করেছে। ১২২০ খৃস্টাব্দ হতে ১২৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক একটা আইন প্রবর্তন করেন। তাতে বলা হয়, যারা অখৃষ্টান তারা যদি খৃস্টান পাদ্রী বা যাজকদের মতে মত দিতে না পারে তবে তারা সমাজ বিরোধী আর যদি খৃস্টান না হওয়ার জন্য তারা অনুতপ্ত হয় তাহলে তাদের বন্দী করা হবে আর যারা স্বধর্ম ছেড়ে খৃস্টান হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করবে না তাদের জীবন্তু পুড়িয়ে মারা হবে।

১২৫২ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ ইনোসেন্ট যাজকীয় আইন অনুসারে প্রত্যেক নগরের আবশ্যিক উন্নয়নমূলক কার্য্যের মধ্যের অখৃষ্টানদের নির্যাতন ও হত্যা করার নীতি প্রবর্তিত হয়। অবশ্য চার্চ বা যাজকরা নির্যাতন বা হত্যাটা স্বহস্তে করত না, কে খৃষ্টান কে অখৃষ্টান সেটা বিচারের পরে অপরাধীকে তুলে দেয়া হত রাষ্ট্রীয় বা পৌর কর্তৃপক্ষের হাতে।' যীশুখৃষ্ট মানুষকে হত্যা করা নিষেধ করে গেছেন, তাই নর-রক্তপাত খৃষ্টান ধর্মে নিষেধ। সেই জন্য বিশাল কড়াই-এ ফুটন্ত জলে অভিযুক্ত আসামীকে বেঁধে ফেলে দেয়া হত এবং সেদ্ধ হয়ে যেত। বেশির ভাগ হত্যা আগুনে পুড়িয়েই করা হত তাতে মানুষ মারাও হত অথচ রক্তপাত হত না।

এসব লোমহর্ষক ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনাগুলোর সাথে মুসলমানদের অভিযানের তুলনা করলে দেখা যাবে–তাদের হাতে ধর্ম ও রাষ্ট্রশক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা যে ব্যবহার ভারতের মাটিতে দেখিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

মাইকেল সার্ভেতুস একজন বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর একটি কথা বাইবেলের সাথে অমিল হওয়ার কারণে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে বন্দী করা হয় এবং জজের বিচারে প্রাণদণ্ড হয়। অবশ্য রক্তপাত করা হয়নি, পুড়িয়েই মারা হয়েছিল।

ইতালির বিখ্যাত দার্শনিক জোরদানে ব্রুনোকে একই কারণে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে হত্যা করা হয় ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে লুসিলিও ভানিনি অবিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত হন। তাঁর জিভ ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

এভাবে অভিযুক্ত হন কবি ও সাহিত্যিক মিঃ মার্লো। তাঁর প্রাণদণ্ড হবার পূর্বেই সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাণী এলিজাবেথের আমলে কর্পাস ক্রিষ্টির ফেলো ফ্রানসিস্ কেটের মত বিজ্ঞ ব্যক্তিকেও পুড়িয়ে মারা হয়।

বিজ্ঞানী গ্যালিলিও একবার অভিযুক্ত হন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে মুক্তি পান। দ্বিতীয়বার 'ডায়ালগস' নামে বই লেখার জন্য প্রাণদণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত হলে বেচারা বিজ্ঞানী প্রাণের দায়ে স্বীকার করলেন, আমার লেখা তথ্য ভুল। অথচ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতে তাঁর ভুল মোটেই ছিল না।

'এর মধ্যে পেগান ধর্মাবলম্বী অথবা ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় জীবন যাপন করার অপরাধে কত হাজার হাজার ইউরোপীয় নর-নারীকে আগুনে পোড়ান হয় তার সঠিক হিসেবে পাওয়া যায়নি। তবে এটা দেখা যায় যে একটা গোটা মহাদেশ থেকে পেগান ধর্মাবলম্বীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।'

এক্ষেত্রে বৈদিক আর্য ও খৃষ্টানদের আলোচনার সাথে মুসলিম শাসন ও অভিযানকে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে ভারতে মুসলমানদের কারণে কোন একটি ছোট্ট সম্প্রদায়ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। সতীদাহ প্রথা, দেব-দেবী পূজা, শুকরের মাংস খাওয়া প্রভৃতি ইসলাম ধর্মে অনুমোদন না থাকলেও কোনকালে কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করার নজির নেই। মুসলমান শাসকরা ধর্মে বলপ্রয়োগ নিষেধ আছে বলেই এটাকে তুলতে পারেননি। যদি কোথাও বল প্রয়োগ হয়ে থাকে তা ধর্মের জন্য নয়, হিংস্রতা ও লালসা চরিতার্থই তার কারণ।

ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের বড় মাধ্যম ছিল মুসলিম সাধু-সন্তু সুফী আওলিয়াদের ভূমিকা, যা প্রত্যেক ঐতিহাসিক অল্প-বিস্তর স্বীকার করে গেছেন। তাঁরাও যে এক হাতে অস্ত্র এবং অন্য হাতে শাস্ত্র নিয়ে ধর্ম প্রচার করেছেন তা নয়। তাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের পক্ষপাতী হলেও সকলেই যে ইসলামধর্ম প্রচারের জন্যই এসেছিলেন তাও নয়। এ

মুসলমান সাধু-ফকিররা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েও এসেছিলেন। কারণ ইসলাম ধর্মে নবী, খলিফা, ইমাম ও মহাপণ্ডিতদের দেখা গেছে তাদের জীবিকার জন্য কারো মুখাপেক্ষী থাকতেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন বা নিজে বৈধ রুজী সংগ্রহ করতেন।

নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক আধুনিক ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে, "প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রচার এসব সাধু-সন্ত পীর-ফকিরদের মাধ্যমেই হয়েছে, অর্থাৎ আমীর-ওমরাহ, রাজা-বাদশাহের চাইতে ধার্মিক মুসলিমরাই ইসলামের ব্যাপক প্রচার অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছেন।" (ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭)

অরাজনৈতিক ইসলাম প্রচারক হিসেবে প্রথম যিনি ভারতে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন শেখ ইসমাইল। তারপরে এলেন শেখ আলি ওসমান ওরফে দাতা গঞ্জবখশ্। এঁরা দুজনেই লাহোরে অবস্থান করেন। ১০৭২ খৃষ্টাব্দে দাতা গঞ্জবখশ্ পরলোক গমন করেন। লাহোরের 'ভাটী দরোজাতে' তাঁর কবর হয়। হিন্দু মুসলমান তাঁর প্রতি বিমুগ্ধ ছিলেন। তাঁর ইচ্ছাকৃত দারিদ্র এবং চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁকে বরণীয় ও স্মরণীয় করে। ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে প্রত্যেক বছর শ্রাবণ মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার হিন্দু-মুসলমান এমনভাবে মিলিত হতেন যে মিলনমেলা স্মরণ করিয়ে দেয়, জোর জুলুম করে ইসলাম প্রচার করলে, তাঁর মৃত্যুর পর হয়ত মুসলমানরা ভক্তি জানাতে পারে, হিন্দুদের পক্ষে মোটেই তা সম্ভব হত না।

ঠিক এমনিভাবে গজনী থেকে হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি ১১৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতের লোহারে আসেন। কিছুদিনি এখানে অবস্থান করে তিনি আজমীরে পুষ্করের কাছে অবস্থান করেন। বিনা অস্ত্রে ও উত্তেজনায় দলে দলে হিন্দু মুসলমান তাঁর শিষ্য হন। যেসব ব্রাহ্মণরা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁরা পরবর্তীকালে হুসেনী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন।' মৈনিউদ্দীনের দরগাহ (কবর) হিন্দুদের একটা বড় তীর্থ।'

এভাবে খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী, শেখ ফরিদ গঞ্জ-ই-শকর, নিজামুদ্দিন আওলিয়া ও আরও অনেকের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রত্যেক মহান মানুষের কবর আজও হিন্দু এবং মুসলমানদের জন্য পবিত্র স্থান। উপরোক্ত আওলিয়া দরবেশ ছাড়া জুনাইদ, মনসুর হাল্লাজ, তাপসী রাবেয়া প্রভৃতির নাম উল্লেখ করে প্রমাণ করা যায় তাঁদের উদার আহ্বান মানুষ জাতির জন্য ছিল, শুধু মুসলমানদের জন্য নয়। কুসাম্প্রদায়িকতার সেখানে জন্মই হয়নি।

ভারতবর্ষে উপরোক্ত মহামান্য আওলিয়াগণ ছাড়া আরও বহু মুসলমান আওলিয়া-ফকিরের দ্বারা প্রেম, প্রীতি ও উদারতার মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। যেমন হাজী এমদাদুল্লাহ মহাজেরে মক্কী, হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া, হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী প্রমুখ।

তাছাড়া শুধু অবিভক্ত বঙ্গদেশেও বহু সুফি সাধকদের দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। যেমন হযরত শাহ ইসমাঈল গাজী। তিনি মান্দারন, কামরূপ প্রভৃতি স্থানে বিশেষ প্রতিপত্তি ও প্রতিভার পরিচয় রেখে ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

হযরত মোজাদ্দেদ আহমাদ ফারুকী সিরহিন্দিও বিদ্যাবুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ পুরুষ ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও শক্তি দিতে কুণ্ঠা করেন নি। তিনি ১০৩৪ হিজরী সনে দেহত্যাগ করেন।

হযরত হামিদ বাঙ্গালী দানেশমান্দ ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবর বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে আছে। এমনিভাবে মখদুম শাহ গজনবী, বীরভূমের শাহ্ আবদুল্লাহ, ঢাকার সৈয়দ আলী তাবরেজী, সিলেটের শাহ জালাল, শেখ বাহারউদ্দিন জাকারিয়া, নূর কুতুবুল আলম, শেখ হেসামুদ্দিন, পশ্চিম দিনাজপুরের উলুগই-আজম, শাহদৌল্লা ও শেখ বদরুদ্দিন সাহেব উল্লেখযোগ্য ইসলাম ধর্মপ্রচারক ছিলেন।

এছাড়াও মুহাম্মদ আতা, শাহ মোয়াজ্জাম, মখদুম জালালুদ্দিন, শরীফ জিন্দানী, শাহ কলন্দর, শাহ কুর্কান, শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী, শাহ কামাল, সৈয়দ মীরন শাহ, মালেক ইয়ামিন কুতুব শাহ, শাহ আলী বাগদাদী, শাহ মান্নাহ জালাল হালবী, বদর শাহ, সেখ ফরিদ, শাহ আদাম, হাজী সালেহ সাহেব প্রভৃতি বুজুর্গ ইসলামের শান্তির দূতের মত হিন্দু মুসলমান তথা ভারতবাসীকে সাফল্য ও চরিত্র দৃঢ়তায় মুগ্ধ করেন।

আরও অনেক মুসলিম সাধকের মধ্যে শাহ সুফী আনোয়ার কুলি, সৈয়দ আব্বাস, বেগম রওশন আরা, বখান গাজী, মুবারক গাজী, শরীফ শাহ গাজী, শাহ মাহমুদ [রঃ আঃ] প্রভৃতি বিখ্যাত আল্লাহ্ প্রেমিক মানুষের জন্য অনেকে হিংসা অথবা অজ্ঞতাবশতঃ গুপ্তচর, পঞ্চম বাহিনী প্রভৃতি কটূক্তি করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তীব্র প্রতিবাদ করে লিখেছেন–

We have no reason to hold that these warriors in the path of Allah were so degenerate as to act as fifth columinst of the Muslim State against the other. [History of Bengal Vol–2. P. 76]

অর্থাৎ আমরা এ কথার সমর্থনে কোন কারণই খুঁজে পাই না যে, আল্লাহর পথেই এ সমস্ত পরিশ্রমী সাধকেরা অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের পঞ্চম বাহিনীর ন্যায় বিরুদ্ধবাদী।

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের দ্বিতীয় শত্রু হইয়াছিল মুসলমান ধর্ম। এক শ্রেণীর লোক পীর ও তাপসগণের মহান ধর্ম প্রবণতায় আকৃষ্ট হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়ছিল।" [দ্রঃ 'বৈষ্ণব সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ' (প্রবন্ধ), লেখক বিমানবিহারী মজুমদার]

এ প্রসঙ্গে আধুনিক যুগের লেখা দিয়েই বিষয়টিকে সীমিত করতে চাইছি : "মামলুকদের শাসনকালে ত্রয়োদশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই মুসলিম সাধকরা ভারতবর্ষের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, রাজনীতির সাথে সম্পর্কশূন্য জনসাধারণের জীবনে উপনীত হয়েছিলেন এবং তার ফলে ভারতীয় জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামকে গ্রহণ করেছিল নিতান্তই আন্তরিক আধ্যাত্মিক আকর্ষণে। [ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৯]

ঐতিহাসিক ও লেখকদের ক্ষমতা আছে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করার, একটা ভাল মানুষকে মন্দ অথবা একজন মন্দ মানুষকে ভল বলে চিহ্নিত করার। কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রের ওটা মস্তবড় ডাকাতি। ইতিহাসে ঐতিহাসিকদের সৃজনশীলতা ও নিপুণতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কিন্তু তা তথ্র ও সত্যভিত্তিক হওয়া চাই।

আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন বিদেশীর মতই এবং রক্তপাতের ভিতর দিয়েই তা হয়েছিল। অথচ আলেকজান্ডারের উপর ভারতের কারো এ রকম রাগ, দুঃখ, ঘৃণা নেই যেমন আওরঙ্গজেবের উপর আছে। এরকমভাবে পর্তুগীজ নেতা ভাস্কো-ডা-গামার কথা

Goto List

কে না জানে? কিন্তু কি জানে, কতটুকু জানে? যতটুকু জানান হয়েছে ততটুকুই। মোট কথা ভাস্কো-ডা-গামার উপও ভারত-জনসাধারণের কোন ক্রোধ, দুঃখ বা ঘৃণা নেই; যেহেতু তাঁদের প্রকৃত ইতিহাস যে কোন ইঙ্গিতে ঢেকে রাখা হয়েছে।

কেরল ও মালাবার অঞ্চলে বাণিজ্যিক কারণে মুসলমান জাতি সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং ভারতবাসীর সাথে একান্তভাবে মিলেমিশে শুধু বসবাসই করেননি তাঁরা ব্যবসা ও বাজার পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। সোজা কথায় বললে বলতে হয়, কেরল বা মালাবারের ব্যবসাগুলোর উপর প্রথম স্তরের কর্তৃত্ব ছিল মুসলমানদের। দ্বিতীয় স্তরে ছিল ভারতীয় অমুসলমানদের কর্তৃত্ব।

এ মুসলমানদের একটা নাম ছির মোপলা। বিভিন্ন ইতিহাসে মহাপিলাহ, মোইপিলাহ, মোপলা, মোপলাহ্ প্রভৃতি লেখা হয়েছে। তাঁরা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। শুধু ব্যবসা ও চাকরি ছাড়া ভারতীয় হিন্দুদের হাত থেকে রাজশক্তি কেড়ে নেয়ার কথা তাঁদের কল্পনাতেও ছিলনা। এ মোপলারা অত্যন্ত সাহসী, সৎ এবং কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। তাই হিন্দু রাজারা তাঁদের সৈন্য হিসেবে ব্যবহার করতেন। ভারতীয় রাজাদের কাছে সুদক্ষ সৈন্য এবং বিশ্বাসভাজন হিসেবে তাঁরা বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে তাঁরা ছিলেন জন্মগতভাবেই অত্যন্ত তেজস্বী ও উগ্র বিপ্লবী।

বিদেশী পর্তুগীজ নেতা ভাস্কো-ডা-গামার ভারত আগমনে এবং ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি স্থাপন করাকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় সাথে আরবদের মনোমালিন্য হয়। ভারতীয় রাজা জামোরিন ও মুসলমান মোপলাহ্ গণ সম্মিলিতভাবে বিদেশী পর্তুগীজদের পরাস্ত করতে সক্ষম হন।

ইংরেজি ইতিহাসে বেশিরভাগ ইউরোপীয় লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, ধর্মান্ধ মুসলমান মোপলাদের নিষ্ঠুর আক্রমণে পর্তুগীজরা অন্যান্যভাবে বিতাড়িত হন। অথচ একথা ঠিক নয়। তাই শ্রীদাশগুপ্ত ইউরোপীয়দের জন্য লিখেছেন, "তাই নিজেদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখার জন্যে ভারতীয় ও আরবদের এ সম্মিলনকে ধমান্ধতার ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছে এবং যে অভিযোগের অনুক্ত তাৎপর্য হল নিজেদের ইউরোপী সাধুতা প্রমাণ করা।"

কালিকটের রাজবংশকে জামোরিন বলা হত। এ জামোরিনের শক্তির উৎস ছিল তখন মুসলমান মাইপিলাহ। তাছাড়াও মালাবারের প্রত্যেক হিন্দুরাজা এ মাইপিলা বা মোপলাদের সৈন্য, দেহরক্ষী অথবা পরামর্শদাতা হিসেবে চাকরি দিয়ে রাখতেন এবং তাদের ছেলের মত ভালবাসতেন। সম্ভবতঃ এ মহাপিলাহ নামটি হিন্দুরাজাদেরই সৃষ্টি। পূর্ববঙ্গে পোলাহ মানে সন্তান, পশ্চিমবঙ্গেও (ছেলে) 'পিলে' বা 'পুলে' মানে সন্তান। সুতরাং মহাপিলাহ মানে 'বিখ্যাত পুত্র' বা বড় ছেলে আর মাইপিলাহ অর্থে 'দুধবেটা' বা দুগ্ধপুত্র। কারণ 'মাই' দুধ বা স্তনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

'তেমনই মালাবারের রাজারাও ইসলাম ধর্মাবলম্বী দুর্দান্ত জওয়ানদের পুষত এবং আপন আপন রাজ্যে তাদের বসবাসের সুবন্দোবস্ত করে দিত। বড় ছেলের মত এদেরকে খাতির করা হত বলে এদেরকে মইপিলাহজ বা মহাপিলাহ বলা হল।' (দ্রঃ ঐ, পৃষ্ঠা ১৩২)

এসব মোপলারা ভারতীয়দের সাথে অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করতেন। তাঁদের বীরত্ব চরিত্র মাধুর্যে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, অস্ত্র ও ভয় দেখিয়ে নয়। শ্রীদাশগুপ্ত লিখেছেন, "এখানকার কোন রাজবংশ ইসলাম ধর্মের আদর্শে প্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ

করেছে এবং (তারা) ইসলামের প্রচারে উদ্যোগ হয়েছে, এ বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের অন্য কোনখানের ইতিহাসে দেখা যায় না। বর্ণভেদ প্রথায় জর্জরিত নিম্নবর্ণের লোকেরা মানুষের মর্যাদা পাওয়ার জন্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে।" (দ্রঃ ঐ, ১১৩ পৃষ্ঠা)

ভাস্কো-ডা-গামার নেতৃত্বে পুর্তুগীজ বাহিনী ভারতবর্ষে অশান্তির হাওয়া বয়ে আনে। পর্তুগীজরা ক্যাথলিক খৃষ্টান—এরা সশস্ত্র হয়ে ধর্ম প্রচারের জন্য আসে। কিন্তু প্রথমে যিনি খৃষ্টান ধর্মের বাণী এনেছিলেন তিনি হচ্ছেন সেন্ট টোমাস। সেটা ছিল ৫১ খৃষ্টাব্দ ৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ১২৭ই মে ভাস্কো-ডা-গামা গোলমরিচের ব্যবসা করবার নামে মাদ্রাজের কালিকটে আসেন। কালিকটের রাজা জামোরিন গোলমরিচের নতুন খরিদ্দার হিসেবে তাঁর সম্মান দেন এবং স্বাগত জানান। সেখানকার রাজাদের ধারণা ছিল এরা মুসলমানদের মত ব্যবসা করবেন এবং তাদের সাথে সহযোগিতা করবেন।

এ সময়ে বিচক্ষণ মুসলমানরা বা মোপলারা তাদের চালচলন এবং কাজকর্ম দেখে অনুমান করেন--খৃষ্টানদের ব্যবসাই উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য অন্য কিছু। তাই তারা রাজাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, একটা সমৃদ্ধ জাতির সুদূর প্রাচ্যে শুধু ব্যবসার জন্য আগমন নাও হতে পারে, খবরা-খবর নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে আবার সশস্ত্র রূপ নিয়ে ফিরে আসতে পারে। রাজা তাদের কথা বিশ্বাস করেন এবং সাবধান হন।

ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে আগস্ট এ দেশের মানচিত্র এবং নানা সংবাদ ও তথ্য নিয়ে স্বদেশ রওনা হলেন। ঠিক বছর দুই পর ১৫০০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর কালিকটে আর একটি পর্তুগীজ দল পৌঁছে নিজেদের কুঠী স্থাপন করলেন। মুসলমানদের উপর আগেকার রাগ ছিলই। তাই তাঁরা হঠাৎ আরবদের মাল বোঝাই জাহাজ দখল করেন। ফলে আরবরাও বীরবিক্রমে তাঁদের কুঠি আক্রমণ করে কুঠীর অধ্যক্ষ আইরস কোরীয়াকে খতম করেন। এ ঘটনায় অভিযানের নেতা মিঃ কাব্রাল ক্ষিপ্ত হয়ে কালিকটের উপর জাহাজ হতে ৪৮ ঘণ্টা গোলাবর্ষণ করেন। ফলে বহু মানুষ আহত ও নিহত হয়। তারপর মিঃ কাব্রাল কোচিনে চলে এসে সেখানকার রাজাকে কালিকটেরও রাজা করে দেয়ার লোভ দেখালেন।

এবার সে ভাস্কো-ডা-গামা ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ভারতে সামরিক নৌবহর নিয়ে এসে যা করলেন তা জানলে চমকে যেতে হয়।

কালিকটে পৌঁছে রাজা জামোরিনকে আদেশ দিলেন 'সমস্ত মুসলমানকে দেশ হতে বের করে দিতে হবে'—অবশ্য ন্যায়পন্থী রাজা তা অস্বীকার করলেন। কারণ রাজা জানতেন মুসলমান মোপলারা সাহায্য সহযোগিতা করেছে বলেই তাদের রাগ। ফলস্বরূপ ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ থেকে গোলমরিচের পরিবর্তে অবিরাম গোলাবর্ষণ হতে দেখা গেল। বহু নিরাপরাধ মানুষ ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ থেকে গোলমরিচের পরিবর্তে অবিরাম গোলা বর্ষণ হতে দেখা গেল। বহু নিরপরাধ মানুষ ভাস্কো-ডা-গামার গোলায় মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তিনি গোটা শহরের অর্ধেকটা শ্মশান করে ছাড়লেন।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামার স্বদেশে ফেরা সম্ভব হত না যদি একজন বড় রাজকর্মচারী ব্রাহ্মণের সীমাহীন প্রীতি এবং পক্ষপাতিত্ব না পেতেন। এও হতে পারে, ব্রাহ্মণ বেচারা ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্র অনুধাবন করতে পারেন নি।

এবার ভাস্কো-ডা-গামা সে ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠালেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিনা দ্বিধায় সাক্ষাত করতে গেলেন। অতঃপর ভাস্কো-ডা-গামা তার হাত দুটি ও কান দুটি কেটে একটি বাক্সে ভরে রাজা জামোরিনকে একটি চিঠিতে লিখে পাঠালেন—ভাস্কো-ডা-গামার অনুরোধ, রাজা যেন এ মাংস রান্না করে খান। (দ্রঃ ঐ, পৃষ্ঠা ১২১)

Goto List

উপরোক্ত চরিত্রগুলো যদিও মুসলমানদের মধ্যে এভাবে পাওয়া যায়নি তথাপি, ভাগ্যের পরিহাস, মুসলমান চরিত্রগুলোর বেশিরভাগই এ অভিযোগে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত।

একটু আগেই বলা হয়েছে মিঃ কাব্রাল যেভাবে লোভ দেখিয়েছিলেন কোচিনের রাজাকে, ঠিক তেমনি কান্নানোর ও কুইলনের রাজাকেও ধোকা দিয়েছিলেন। উত্তরের রাজা চিরাক্কল এবং দক্ষিণের ত্রিবাঙ্কুর রাজার সাথেও এভাবে বন্দোবস্তের ফলে ভারতের রাজায় রাজায় লেগে গেল যুদ্ধ আর প্রত্যেক রাজার মিত্র হল পর্তুগীজরা ১৫০০ খৃষ্টাব্দে কোচিনে তাঁরা নিরাপদে দুর্গ এবং গীজা তৈরি করলেন—অর্থাৎ অস্ত্র ঘর এবং ধর্ম ঘর। এটাই বোধহয় ‘একহাতে অস্ত্র আর অন্য হাতে শাস্ত্রের ভিত। ক্যাথলিক খৃস্টানরা গুপ্তচর দিয়ে খবর নিতে লাগলেন কোন সময় রাজা জামোরিন বাইরে যান। সময় উপস্থিত হল ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি কালিকটে লুটপাট শুরু হল। ‘শহরবাসীরা রুখে দাঁড়াল এবং প্রধানত আরব বণিক ও মোপলাদের বীরত্বের ফলেই পোর্তুগীজদের পালিয়ে আসতে হল।’

খৃস্টানরা বুঝতে পারলেন মুসলমানদের না হটালে খৃস্টান ধর্মের প্রচার এবং তাদের ব্যবসার প্রসার কোনটাই সম্ভব নয়।তাই প্রথমে মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে শুরু করলেন এবং ভারতবর্ষের মানুষের সাথে মুসলমানদের অনুকরণে কিছু বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করলেন। এদিকে ১৫২৪ খৃস্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা মারা গেলেন।

ভাস্কো-ডা-গামার এত বড় কাণ্ড মোটামুটি গোপন আছে। তাঁর উপর কু-ধারণা জন্মানোর প্রয়োজনও হয়নি। শুধু মুসলমানদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলে, ভারতের বুকে দেয়া দিয়ে তিনটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে বঙ্গদেশ মুসলমান প্রধান হল কেন? এর উত্তরে যাঁদের মনে হবে এক হাতে শাস্ত্র অন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে হিন্দুদের মুসলমান করা হয়েছে তাঁদের জেনে রাখা ভাল, আসল কথা তা নয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর অবিচার ও অত্যাচার, অপরদিকে মুসলমানদের সাম্য ও সমতাবাদ প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতেই মুসলিমরা সংখ্যায় বেশি হয়ে পড়ে। তাছাড়া অভিনব তথ্য হচ্ছে, বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতা মুসলমান জাতিকে যত বেশি দূরে ঠেলে দিয়েছে তত বেশি মুসলমান সংখ্যাধিক্য হয়েছে।

কালকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী অমলেন্দু দে-র লেখা ‘রুটস অফ সেপারিটিজিম ইন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী বেঙ্গল’ গ্রন্থে এ বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে অনেক তথ্য উদঘাটন করা হয়েছে। ‘নোটস অন দ্যা রেসেস, কাস্টস এ্যান্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল’ প্রণেতা ডঃ জেমস ওয়াইজের সাক্ষ্য থেকে মিঃ দে দেখিয়েছেন—‘Previous to the eighteenth century the Hindu inhabitants of Bengal far exceeded the Muhammadan in numbers.’

তাহলে বোঝা যাচ্ছে মুসলমানদের হাতে যখন বাদশাহী ছিল, যখন তাদের হাতে রাজনৈতিক শক্তি পুরোপুরিভাবে ছিল, তখন মুসলমানরা সংখ্যায় লঘু ছিলেন যখন তাদের হাতে রাজনেতিক শক্তি আর নেই, সে সময়ে অর্থাৎ ১৮৭১ খৃস্টাব্দে দেখা গেল মুসলিম সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে এঠছে। প্রমাণিত সত্য তথ্যও হল এটা—১৮৭১ খৃস্টাব্দেরও দেখা গেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যেখানে সংখ্যা ছিল ১৮১ লাখ পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরে সংখ্যা তখন ছিল ১৭৬ লাখ অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যা যদিও বেড়ে চলেছিল তবুও এ সময় পর্যন্ত মুসলিমরা পাঁচ লাখ কম ছিলেন।

তারপর ১৮৯১ তে যখন লোক গণনা হল তখন দেখা গেল, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ১৮,৯৬৮,৬৫৫ আর অপরদিকে মুসলমানদের সংখ্যা ১৯,৫৮২,৩৪৯। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১৮৭১ খৃস্টাব্দে যে মুসলমানরা পাঁচ লাখ কম ছিলেন, ১৮৯১ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ মাত্র বিশ বছর পরে যখন লোক গণণা হল তখন মুসলমানরা সংখ্যা কম তো দূরের কথা, অনেক বেশি হয়ে গেলেন।

Goto List

এ প্রসঙ্গে অমলেন্দু দে ‘সেনসাস অফ ইন্ডিয়া ১৮৯১’ এর প্রণেতা সি. জে. ও. ডোনেলের যে মন্তব্য উল্লেখ করেছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ডোনেল সাহেব লিখেছেন, “The slight increase of Hindus between 1872 and 1881, amounting to only 141,135 persons or 0.8 Percent, that of Musalmans being 7.1 percent, was a sufficiently noticeable fact, but from the foregoing figures it appears that nineteen years ago in Bengal proper Hindus numbered nearly half a million more than Musalmans did, and that in the space of less than tow decades, the Musalmans have not only overtaken the Hindus, but have surpassed them by a million and a half.’ এখানেও দেখা যাচ্ছে মাত্র কয়েক বৎসরেই মুসলমানদের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে গেছে।

‘এ সাথে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, যখন বাংলার হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এক নতুন উত্থান ও জাগরণের চেতনাতে, গৌরবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সে ঘটনার কালেই বাঙ্গালী মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার গৌরব অর্জন করে ’

একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা কর্তব্য যে, যাঁরা নতুন মুসলমান হয়েছিরেন তাঁদের দ্বারাতেই তথাকথিত অত্যাচারের শতকরা ৯৫ ভাগ ঘটেছিল। যুক্তিস্বরূপ সুরজিৎ দাশগুপ্তের একটি উদ্ধৃতি পূর্বে যদিও দেয়া হয়েছে আলোচনার জন্য আবার তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন, “এখানকার কোন কোন রাজবংশ ইসলাম ধর্মের আদর্শে প্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং ইসলামের প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে।”

সম্ভ্রান্ত হিন্দু রাজবংশের ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলান হওয়া এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। যুক্তি হচ্ছে এ, যাঁর যে বিষয়ে শক্তি আছে, তার বহিঃপ্রকাশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কমবেশি পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং একজন রাজা, তাঁর সারা রাজ্যে বিশেষ প্রভাব থাকে। অতএব তাঁর মুসলমান হওয়াটা যে বেঠিক, তা প্রমাণ করার জন্য অথবা বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য বন্ধ করার জন্য তাঁকে তাঁর পরিষদ, কর্মচারীবৃন্দ ও অনুগতদের অনুগত রাখার জন্য বুদ্ধি ও সামান্য সম্ভাব্য বলপ্রয়োগ যে করতে হয়েছে তা স্বীকার করে নেয়াই ভাল। দ্বিতীয় কথা মানুষের রক্তের সম্বন্ধ যেখানে, অর্থাৎ যাঁরা নিকটাত্মীয়, তাঁদের ত্যাগ করা অথবা ভুলে যাওয়া কখনই সহজ সম্ভব নয়। সুতরাং কোন হিন্দু রাজা মুসলমান হলেই তার প্রাণ চাইত তিনি যেন তাঁর নিকট আত্মীয়-আত্মীয়াদের পেতে পারেন পূর্বের মতই। কিন্তু তার উপায় কি ছিল? হয় রাজাকে আবার হিন্দু হতে হয় নতুবা আত্মীয়দের মমতা বা ক্ষমতা প্রয়োগে তাঁদেরকে নিজেরে মধ্যে টেনে নিতে হয়। সুতরাং কাল যিনি হিন্দু ছিলেন আজ তিনি মুসলমান, এ রকম লোকের দ্বারাতেই অল্প হলেও হিন্দুরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা পেয়েছেন, তা অস্বীকার করা যায় না।

উত্তরবঙ্গে রাজা যদুর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখন তার একটু বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি পাঠ্যপুস্তকগুলো যে সমস্ত ঐতিহাসিকদের রচনা, তাঁদের মধ্যে শ্রীবিনয় ঘোষ একজন রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।তাঁর লেখা নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ‘ভারতজনের ইতিহাস’ পড়লে জানা যায় যে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা জালালুদ্দিন সিংহাসন লাভ করেন। তিনি হিন্দু প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন। ঐ ইতিহাসে আরও পাওয়া যায়, তিনি ব্রাহ্মণদের জোর করে গোমাংস খেতে বাধ্য করেছিলেন। এসব তথ্য শুনলে হিন্দু ছাত্রদের মুসলিম বিদ্বেষী হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক।

তাহলে কি ইতিহাস থেকে এগুলোকে বিয়োগ করতে হবে? আমাদের মতে, ভারতের কল্যাণে তথ্য সঠিকভাবে লেখা উচিত। জালালুদ্দিন ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনপ্রাপ্ত হন। তিনি নানা কারণে হিন্দুদের এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মুসলমানদের মত সমদৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। আর যদি ব্রাহ্মণদের জোর করে গরুর মাংস খাইয়েছিলেন লিখতেই হয় তাহলে ঘটনাটি পুরোপুরি বলতে হয়।

শ্রীবিনয় ঘোষ লিখেছেন, "জালালুদ্দিন নামে রাজা সিংহাসনে বসিয়া তিনি ব্রাহ্মণদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু বিদ্বেষ সারা জীবন তীব্র ছিল। তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের দেহাবশেষ পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত একলাখী সমাধিত প্রোথিত রহিয়াছে। একলাখী সমাধির স্থাপত্যকলা বাংলার মুসলমান আমলের অন্যতম কীর্তি বলিয়া স্বীকৃত। হিন্দু দেবালয় ও বৌদ্ধ বিহারের অনেক ভগ্নাবশেষ এই সমাদি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।" (দ্রঃ ভারতজনের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩৫০)

তাহলে সহজেই মনে করা যেতে পারে হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মন্দির ভাঙ্গাই ছিল ইসলাম ধর্মের অন্যতম কাজ। শ্রীঘোষের লেখা যদিও ক্ষতিকারক বলে মনে করা হয় তবুও তা সত্য বলে স্বীকার করা কর্তব্য। এর বিস্তারিত বললে বলতে হয়—

ইতিহাসে উত্তরবঙ্গে একজন রাজার নাম পাওয়া যায় যাঁর তিনটি নাম ছিল রাজা কংস, রাজা গণেশ এবং রাজা দনুর্জন। এ রাজা দনুর্জন মুসলমান সুফী সাধু আওলিয়াদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করেন। তখন একজন সুফী কুতুবুল আলম নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি জৌনপুরের রাজা ইব্রাহিম শাহ'র সাহায্য প্রার্থনা করে একটা পত্র পাঠান। সে সাথে আর এক মুসলমান সাধন আশরাফ জাহাঙ্গীরও একটা পত্র লেখেন। ইবরাহিমের দরবারে কুতুবুল আলাম সাহেবের সম্মান ছিল অপরিসীম। তাই তিনি একটা সুদক্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে এরেন রাজা কংসের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য।

রাজা কংস বা গণেশ চিন্তা করে দেখলেন যুদ্ধের জেতা সম্ভব নয়, তার চেয়ে কৌশল অবলম্বন করাই উত্তমতর কাজ হবে। তাই তিনি জানালেন 'ইসলাম ধর্ম ও ধার্মিকদের উপর আমার কোন বিরোধ নাই। আমি মুসলমান হতে চাই, আর আমার পুত্র যদুকেও মুসলমান করে তাকে সিংহাসন দিয়ে দিন। তাহলে আমাকে সিংহাসনচ্যুত করাও হল আর নতুন মুসলমানকে সিংহাসনে বসানও হল।' এ পরিকল্পনা বিরুদ্ধ পক্ষ কোন কথা বলতে না পেরে তা মেনে নিলেন। কুতুবুল আলাম সাহেব যদুকে ইসলাম ধর্মের দীক্ষিত করে জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ নাম দিয়ে সিংহাসনে বসালেন।

তারপর ইবরাহিম শাহ সৈন্যসহ জৌনপুরে ফিরে গেলেন। রাজা গণেশ বেশ কায়দায় জয়লাভ করলেন। এবার তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণদের ডাকলেন এবং প্রস্তাব দিলেন যদুকে আবার হিন্দু করে নেয়ার ব্যবস্থা করতে। ব্রাহ্মণরা বললেন একটি সোনার বড় গাই তৈরি করতে হবে। 'স্বর্ণ ধেনু ব্রত পালন করে এ সোনার গ্যাভীটির সমস্ত সোনা ব্রাহ্মণদের ভাগ করে দিলে তবেই যদুর হিন্দু হওয়া সম্ভব। তাই করা হল। জালালুদ্দিনকে পুনরায় 'হিন্দু' বা 'যদু'-তে পরিণত করা হল।

রাজা গণেশ ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে মারা গেলেন। এবার তিনি (রাজা যদু) পুণরায় মুসলমান হতে চাইলেন। তার অন্যতম কারণ হিন্দুরা তাকে অন্তর থেকে হিন্দু বলে মেনে নিতে পারেন নি। তাই রাজা যদু আবার জালালুদ্দিন শাহ নাম নিয়ে মুসলমান হলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের উপর তার দুঃখ হওয়ার কারণ, সোনার গরু কেটে ভাগ করে অবস্থা ফিরিয়ে নিলেন যাঁরা, তারা পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না তাকে। সুতরাং এটা ছিল তার কাছে

অমার্জনীয় অপরাধ। তাই সেসব ব্রাহ্মণদের ডাকলেন এবং গো-মাংসের তরকারি দিয়ে তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করলেন। ব্রাহ্মণরা আপত্তি জানালে তিনি তাদের মাংস খাওয়াতে বাধ্য করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, সোনার গরু ভাগ করে যদি খাওয়া চলে আসল গরু ব্রাহ্মণদের খেতে হবে। 'মিরআতুল আশরার' নামক ফার্সী পুস্তক অবলম্বনে জানা যায় সে সাধু বা কুতুবুল আলামের পরলোগমন হয় ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে। আর যদু ওরফে জালালুদ্দিন শাহ মারা যান ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে।

এজন্য আমরা আগেও বলেছি নতুন মুসলমানদের জীবনেই কিঞ্চিত বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়, নতুবা ইসলাম-শিক্ষিত সাধু-সন্ত সুফী ও বণিক বেশে যারা এসেছিলেন তাঁদের চরিত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রেম প্রীতিই পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত ইতিহাসে আমাদের শেখান হয়েছে, বহির্ভারত থেকে মুসলমান আক্রমণ হল, সাথে এল অস্ত্রশস্ত্র, হাত-ঘোড়া আর নিষ্ঠুর অত্যাচারীর দল। ভারতে তাঁরা নাকি করলেন ভারতীয়দের হত্যা, মন্দিরগুলোর ধবংস সাধন, হিন্দুদের মুসলমান করা ইত্যাদি। আমাদের আলোচনায় প্রমাণ হল যে, ওগুলো ভিত্তিহীন, অসত্য ও কুপরিকল্পিত সম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। এত তথ্য মনে রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। শুধু ছোট্টমাত্র একটি কথা মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, যে সব রাষ্ট্র, দেশ বা দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রথম প্রচারের মুতূর্তে যেখানে যায় নাই কোন সৈন্যদল, যান নাই কোন শাসক, বাদশাহ বা সুলতান, পাঠন হয়নি কোন অস্ত্রশস্ত্র অথচ সেসব জায়গা মুসলমানে ভরপুর হয়ে রয়েছে। যেমন মালয়েশিয়া, মালয়, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, আন্দামান, জাভা, হাবস, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি। এ ইন্দোনেশিয়ায় শতকরা ৯০ জন মুসলমান বর্তমান। এমনি আরও আছে, যেমন বোর্ণিও দ্বীপ—যেখানে শতকরা ১০০ ভাগই মুসলমান।

বহুল প্রচারিত অসত্য বা বিকৃত ইতিহাসের বিরুদ্ধে সত্য ইতিহাসের ধারাকে খাড়া করতে যে কঠোর পদক্ষেপ তা কঠিন হলেও তার আবির্ভাবে মুহূর্তের মধ্যে মিথ্যা নিষ্প্রভ হতে বাধ্য। সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বলা যায়—১০০ বছর ধরে ইতিহাসে যা শেখান হল চিনি খুব ঝাল বা তিতা, চিনি থেকে সাবধান থেক। কিন্তু ১০০ বছর পর চিনির কয়েকটি দানা জিভের উপর যদি ফেলে দেয়া হয় সাথে সাথে বিকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে তার ধারণা সুস্পষ্ট হবে। বুঝতে পারবে চিনি সুমিষ্ট, মুখরোচক ও কল্যাণকর। তেমনই প্রকৃত বিজ্ঞান-ভিত্তিক সত্য তথ্য পৌঁছালে অসত্য বিকৃত তথ্যের উপর সত্য অনুসন্ধিৎসু মানুষের মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠবে নিঃসন্দেহে।

* * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুহাম্মদ বিন কাসিম

ইতিহাসের রক্ত মাংস হচ্ছে বিষয়বস্তুকে সংরক্ষিত করা, ইতিহাসের প্রাণ হচ্ছে সদুদ্দেশ্যেকে সফল করা। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসে কেন জানি তা হয়নি।

ভারতে মুসলমান অভিযানের কথা উঠলেই মনে পড়বে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কথা, অবশ্য তার অনেক আগে কিভাবে কেন মুসলমানদের আগমন ঘটে তা বলা হয়েছে।

শ্রীবিনয় ঘোষ মুহাম্মদ বিন কাসিমের জন্য তার লেখা সরকারি পাঠ্য পুস্তক 'ভারতজনের ইতিহাসে' লিখেছেন—"বিধর্মীদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' ঘোষণা করা এবং তাঁহাদের ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তররিত করা ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার যুগে অন্যায় বলে গণ্য হত না। সে জন্য ইসলামের বিস্তারের পথ আরও সুম হয়েছে এবং তার জন্য দুর্ধর্ষ শক্তি সঞ্চয় ও প্রয়োগ করতে কোনও বাধার সৃষ্টি হয় নাই"। (দ্রঃ ভারতজনের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৭৭)

পরে শ্রীঘোষ আরও লিখেছেন-হিন্দু রাজা "দাহিরের দুই কন্যাকে বন্দী করিয়া কাসিম খলিফার হারেমের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁরা খলিফার কাছে অভিযোগ করেন যে, কাসিম তাঁদের ইজ্জত বিনষ্ট করে। ইহাতে খলিফা ক্রুদ্ধ হইয়া হুকুম দেন যেন কাঁচা গোচর্মে আপাদ-মস্তক মুড়িয়া সেলাই করিয়া কাসিমকে তাঁহার কাছে অবিলম্বে পাঠান হয়। খলিফাকার আদেশ আল্লাহ্‌র আদেশের মত। কাজেই কাসিম নিজেই এভাবে মৃত্যুবরণ করেন......এ কাহিনীর সবটুকু হয়ত ঐতিহাসিক সত্য নয়." (ঐ, পৃষ্ঠা ২৭৯)

আমরা আগেও বলেছি আবার বলছি, মুহাম্মদ বিন কাসিমের অনেক আগে হতেই ভারতের মুসলমান আগমন হয়েছিল এবং সশস্ত্র অভিযানের কোন ব্যাপার ছিলনা।

তাই ঐতিহাসিকরা বেসরকারি ইতিহাসে লিখেছেন, "আরবীয়দের সাথে ভারতীয়দের বাণিজ্য যেমন স্বাভাবিক চলছিল ৬৬৩ খৃষ্টাব্দের পরেও অর্ধশতাব্দী ধরে তেমনই ভাবে চলতে থাকে। বাণিজ্যের সূত্রে সিন্ধুনদের মোহানা থেকে সিংহল পর্যন্ত অর্থাৎ আরব সাগরের ভারতীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলে, প্রধান বন্দরগুলিতে, ছোট ছোট মুসলিম বসতিও গড়ে উঠেছিল। শত্রুতার সূত্রপাত হল ৭০৮ খৃষ্টাব্দে। এ সময় সিংহল থেকে এক জাহাজ ভর্তি মুসলিম রমণী ইরাকে যাওয়ার পথে দেবল নামক বন্দরের কাছে অপহৃতা হয়। সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ইরাকের শাসক হাজ্জাজ অপহৃতা রমণীদের প্রত্যার্পণের দাবী জানালে দাহির প্রত্যুত্তরে জানান যে অপহরণকারীরা যেহেতু তাঁর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জলদস্যু তাই হাজ্জাজের দাবী পূরণে তিনি অক্ষম।" (দ্রঃ ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৫)

এ নিরপেক্ষ উদ্ধৃতি কি প্রমাণ করে না যে এক জাহাজ মুসলিম নারী ধর্ষিতা বা নিহত হওয়ায় তাদের পাঁচ দশ গুণ আত্মীয় আত্মীয়াও রাজদরবারে পর্যন্ত কান্না ও ক্রোধের আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করেছিল? রাজা নিজেই অভিযুক্ত ছিলেন এ অপকর্মের পিছনে যেটাকে তিনি জলদস্যু কর্তৃক বলে ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। যদি এটা সত্য নাও হয়, তবুও আক্রমণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল না কি? অত্যন্ত যখন এক রাষ্ট্রের আক্রমণ করা বীরত্ব বলে বিবেচিত হত।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভারত অভিযানের কারণ একাধিক—

(১) হাজ্জাজ ইরান বা পারস্যের যুদ্ধে যখন প্রাণপণে লড়ছেন, মরাবাঁচা হারজিতের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে রাজা দাহিরের হাজ্জাজের শত্রুকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

(২) হাজ্জাজের শাসনকালে পারস্য হতে একটি বিদ্রোহী দল ভারতে পালিয়ে এলে রাজা দাহির তাঁদের আশ্রয় দেন।

(৩).জাহাজ ভর্তি মহিলাদের ধর্ষণ এবং প্রাণনাশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনসাধারণ এবং পরিষদবর্গের পরামর্শে ভারত আক্রমণে বাধ্য হতে হয়।

(৪) হাজ্জাজ পরপর দুটি অভিযানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরাজিত বন্দী মুসলমানদের ভারতীয়রা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।

তৃতীয়বারে মুহম্মদ বিন কাসিমকে পাঠান হয় ভারত অভিযানে।।

রাজ কন্যাদের কাহিনী একেবারে কল্পনা-গল্প ছাড়া কিছু নয়। কারণ 'কাঁচা গোচর্মে আপাদমস্তকে মুড়িয়া' লিখেছেন শ্রীঘোষ, মনে হয় এটা কোন এমন লেখকের সৃষ্টি করা গল্প যাঁর কাছে গরুর চামড়া খুবই অপবিত্র। কিন্তু মুসলমানদের নিকট কাঁচা গোচর্ম কোন অপবিত্র বস্তু নয়। সুতরাং গল্পস্রষ্টা ভুল করেছেন, তাঁর লেখা উচিত ছিল শুকরের চর্ম।

শ্রীঘোষ লিখেছেন, "নারীর মর্যাদা কলঙ্কিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি (রাণী) এবং দুর্গের ভিতরের অন্যান্য মহিলারা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জীবন বিসর্জন দেন।"

একথা যদি সত্যি হয় তাহলে প্রশ্ন আসে, দাহিরের স্ত্রী সমস্ত নারীদের নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন আর সুন্দরী কুমারী কন্যাদের বাঁচিয়ে রেখে দিলেন সৈন্যদের অপহরণ করার জন্য এটা কি একটু সত্য বলে মনে হতে পারে? সুতরাং এ সব তথ্যে না আছে সত্যের বন্ধন আর না আছে তাতে দেশের মঙ্গল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে, সমগ্র মুসলমান জাতি যেন তাঁর জন্য অভিযুক্ত।

হাজ্জাজ ইসলাম পরায়ণ ছিলেন। তার মস্ত বড় একটা দলিল হল, যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম বিজয়ী হলেন তখন বিজিতদের প্রতি কি ব্যবহার করতে হবে তা তিনি লিখে পাঠালেন—"যেহেতু বিজিতরা এখন আমাদের জিম্মি, অতএব তাদের জীবন ও সম্পত্তিতে আমাদের হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার নেই। সুতরাং তাদেরকে আপন আপন উপাস্যের মন্দির গড়তে দাও। স্বধর্ম পালনের জন্য কেহ যেন বাধা বা শাস্তি না পায়, স্বদেশের সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাসে তাদের যেন কেহ কোনও বাধা না দেয়।" (দ্রঃ ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৬)

আগেই বলেছি প্রকৃত ঐতিহাসিক হতে হলে ফারসী, আরবী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা না জানলে মূল ইতিহাস বোঝা বা বুঝে উদ্ধার করা অসম্ভব। হয়ত শ্রী ঘোষের পক্ষে ওকালতি করে কেহ কেহ বলতে পারেন—তিনি যে আরবী ফারসী জানতেন না তারই বা প্রমাণ কি? প্রমাণ তাঁরই লেখা এ ইতিহাসের ১৭৯ পৃষ্ঠায় মজুদ আছে। তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিম নামের পরিবর্তে শুধু মাত্র কাসিম' ব্যবহার করে একটু সংক্ষেপ করা হয়েছে তাতে ক্ষতি কি? ক্ষতিটা অযোধ্যার ইতিহাস লিখতে গিয়ে রামচন্দ্রের স্থানে দশরথ চন্দ্র লিখলে যা হয়, তাই। মান্যবর শ্রীঘোষকে শ্রদ্ধার সাথে দেশের ছাত্র-সমাজ যদি প্রশ্ন করেন—সিন্ধু বিজয়ে ভারতে প্রথমে কোন মুসলমানের আগমন ঘটেছিল? উত্তরে প্রথম ভুল হয়ত এ হবে যে যাঁরা আগেই ইতিহাসের পাতায় সিন্ধু অভিযানের জন্য অমর হয়ে আছেন তিনি তাঁদর নামোল্লেখ না করেই বলবেন—'কাসিম'। কিন্তু প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা নির্বিশেষে প্রত্যেক ইতিহাস অনুরাগীরই

জেনে রাখা ভাল যে, সিন্ধু বিজয়ী ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের প্রতিদ্বন্দ্বী এ মুসলমানের বাবার নাম ছিল কাসিম। তার নিজের নাম মুহাম্মদ। মুহাম্মদ বিন কাসিমের অর্থ হল—মুহাম্মদ, কাসিমের পুত্র। অর্থাৎ কাসিমের পুত্র মুহাম্মদ। এখন যদি নামের সংক্ষেপই করতে হয় তাহলে মুহাম্মদ লেখা উচিত ছিল। বিন বা ইবন মানে ছেলে, তাদের বা আরবরে নিয়ম ছিল, যোগ্য পিতার নামে নিজের নাম যুক্ত করা।

পুনরায় আমি পূর্বের আলোচনায় আসছি। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে হাজ্জাজ একদল সৈন্যসহ একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে পাঠিয়েছিলেন সিন্ধু অঞ্চলে। এ যুদ্ধ আরব সভ্যতা, শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণী প্রচারের জন্য করা হয়েছিল বলা যাবে না বরং ক্রোধের উপর নির্ভর করেই ছিল এ অভিযান। যুদ্ধ হল সিন্ধুবাসীদের সাথে মুসলমানদের। প্রাথমিক অবস্থায় সিন্ধীরা পরাজয়ের দিকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁদের ধর্মের বিধানদাতাদের পরামর্শে দেবমূর্তি যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হলে যুদ্ধে কিন্তু মুসলমানদের ভাগ্যে দারুণভাবে পরাজয় নেমে আসে। যুদ্ধশেষে বিরাট মুসলিম সৈন্যবাহিনী এমনকি সেনাপতিকে পর্যন্ত সে ঠাকুরের সম্মুখে নির্মমভাবে টুকরা টুকরা করে হত্যা করা হয়। বন্দী জীবনযাপন করার সৌভাগ্য কোন মুসলমান সেনার হয়ে ওঠেনি।

শ্রীবিনয় ঘোষও তাঁর ইতিহাসের ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "কিন্তু এ অভিযান ব্যর্থ হয়, দেবলের তথাকথিত দস্যুদের শায়েস্তা করা সম্ভব হয় না, সিন্ধীদের প্রবল প্রতিরোধে আরব সেনাপতি পর্যন্ত নিহত হন।"

অতপর হাজ্জাজ তাঁর আর এক অল্প বয়স্ক সুদর্শন বীরকে সেনাপতি নির্বাচিত করে পুনরায় সিন্ধু অভিমুখে মুসলমান বাহিনী পাঠালেন। ইনিই ইতিহাসে মুহাম্মদ বিন কাসিম নামে পরিচিত। এ তরুণ সেনাপতি হাজ্জাজের আপনজন—পিতৃব্য-পুত্র। শুধু তাই নয়, আরও গভীর সম্পর্কে এ যুবক ছিলেন তাঁর জামাতা।

'সালাতুল হাজাত' নামক উপাসনা অন্তে মাওলানা ও আওলিয়াদের পরামর্শ ও শুভাশীষ নিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম এবার ধর্মনৈতিক কারণেই অভিযান চালালেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম জলপথে এবং স্থলপথে উভয় দিক থেকেই তখনকার বিখ্যাত দেবল মন্দির আক্রমণ করলেন। সিন্ধীরা ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের আদেশে প্রবল বাধা দেয়ার জন্য বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আবার পূর্ব সমরের ন্যায় জনসাধারণ ঠাকুরদের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। কিন্তু এবার নিমেষে দাহিরের সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেললেন। মুসলমান সৈন্যরা আল্লাহু আকবর বলে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। যুদ্ধ পুরোদমে চলতে লাগল। রাজা দাহির হাতির উপর উপবিষ্ট হয়ে যুদ্ধ করছিলেন, এমন সময় বিপক্ষ বাহিনীর একটা তীর রাজার হাতির পিঠে হাওদায় পড়ে ও সাথে সাথে হু হু করে আগুন জ্বলে ওঠে। হাতি প্রাণের ভয় ও আতঙ্কে জলাশয়ে নেমে পড়ে। দাহির মাটিতে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। তখন একটা কথা রটে গেল—মুসলমানেরা অগ্নিতীর ব্যবহার করে, যা লেলিহান শিখা নিয়ে জ্বলে ওঠে। শ্রীবিনয় ঘোষও তাঁর ইতিহাসে এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "দাহিরের হাতির হাওদায় আরবদের একটি অগ্নিতীর বিঁধিয়া আগুন জ্বলে ওঠে, হাতি দৌড়াইয়া জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে।"

অনেকের মতে অলৌকিক বা দৈব ঘটনা ওটা যাহোক, দাহির যুদ্ধে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হলেন। দাহিরের স্ত্রী সৈন্যদের সাহস যোগাতে এবং ফের একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু রাণীর কথায় কোন ফল হল না। অবশেষে রাণী ও তার সঙ্গিনীগণ আরো বিপদগ্রস্ত হবার পূর্বেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

৭১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ব্রাহ্মণ রাজা দাহির সাহসের সাথে যুদ্ধ করেও নিহত হন। তারপর এক বছরের মধ্যেই দাহিরের গোটা সাম্রাজ্য মুহাম্মদ বিন কাসিমের দ্বারা মুসলমানদের অধিকারে চলে যায়।

হযরত মুহাম্মদ ৬৩২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন আর কাসিমের পুত্র মুহাম্মদ ৭১২ খৃষ্টাব্দে এ ঐতিহাসিক যুদ্ধে ইসলামের বিজয় কেতন ভারত ভূমিতে উড্ডীন করেন। তিনি ইচ্ছা করলে হয়ত ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল করতলগত করতে পারতেন। কিন্তু অনেকের কাছে এ যুদ্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও আরবদের কাছে সেটা সাধারণ একটা যুদ্ধ ছিল মাত্র। কারণ পৃথিবীর প্রত্যেক দিকেই তাঁদের অভিযান ছিল এর চেয়েও নাটকীয় ও আশ্চর্যজনক। মারাত্মক প্রতিকূল অবস্থাতেও নিশ্চিত পরাজয় হতে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তা জয়ে পরিণত হয়েছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় সংকীর্ণতা তথা পক্ষপাতিত্ব ও অবিচারের ফলে ভারতের 'জাঠ' সম্প্রদায় এবং 'মেড' সম্প্রদায় রাজার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তদুপরি তথাকথিত নীচ জাতি বা শোষিত, অবহেলিত, অনুন্নত সম্প্রদায় রাজাদের উপর ভাল ধারণা রাখতেন না। যুদ্ধের সময় তাদের সহযোগিতা স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় নি। তবে 'জাঠ' ও মেড' সম্প্রদায় অত্যন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ। তাঁরা মুসলমানদের পক্ষ প্রকাশ্যে সমর্থন করে দাহিরের বিরুদ্ধে তাঁদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন। দাহিরের শোচনীয় পরাজয়ের এটিও একটি অন্যতম কারণ।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মন্দির আক্রমণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন করা হল, মুহাম্মদ বিন কাসিম মন্দির আক্রমণ করতে গেলেন কেন? উত্তরে বলা যায়, তাঁর পূর্বে ভারত অভিযানকারী পরাজিত মুসলমানগণ নির্মূল হয়েছিলেন। তাতে জনসাধারণের ধারণা হয়েছিল যে, দেবল মন্দিরের ঠাকুরের দ্বারাই এ জয় সম্ভব হয়েছে। তার উপর যাঁরা নতুন মুসলমান হয়েছিলেন তাঁদেরও ধর্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাই মানব জাতিকে সৃষ্টির কাছে মাথা নত না করিয়ে, ঠাকুর-দেবতার কাছে যথাসর্বস্ব বিলিয়ে না দিয়ে স্রষ্টার কাছে মাথা নত করার প্রেরণা যোগানোর জন্যই এ মন্দিরের সম্মুখে যুদ্ধের আয়োজনের প্রয়োজন হয়েছিল।

দেবতা-ঠাকুরের উপর ব্রাহ্মণদের আনুগত্য স্বাভাবিক ভাবেই ছিল, তার উপর গত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই এ মন্দিরের প্রতিমা বা দেবতাদের উপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। তাই রাজার মূল্যবান ধনাগার স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এ মন্দিরে। ফলে যুদ্ধ শেষে বহু মূল্যবান ধনাগার স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এ মন্দিরে। ফলে যুদ্ধ শেষে বহু মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী মুসলমানদের হাতে অতি সহজেই এসে গিয়েছিল।

ইসলাম ধর্মে বহু হিন্দু আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন দেবতার পূজা নিষ্ফল মনে করার কারণে। অতএব মুহাম্মদ বিন কাসিম যদি এ মন্দিরের প্রাঙ্গণে, পক্ষান্তরে দেবশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যদি বিজয়ী না হতেন তাহলে হয়ত এসব নব-মুসলিমদের ধর্মান্তরিত হওয়া ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হত।

আগেই বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলারা মৃত্যু বরণ করেন। এ ঘটনা সত্য। তাই বলে বিকৃত ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের চারিত্রিক দুর্বলতার কারণ বর্ণনা করা নিসন্দেহে পক্ষপাতিত্বের নামান্তর। আসল ব্যাপার হল হিন্দু ধর্মের বিধান মতে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলাদের আগুনে পুড়ে মৃত্যু বরণ করাটা খুবই মহৎ কাজ বলে বিবেচি

হত। যেমন ছিল সতীদাহ প্রথার প্রাবল্যে স্বামীর মৃত্যুর পর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেয়া। এক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুরপর সন্তান, শ্বশুর, দেবর ও ভাসুরদের চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে পুড়ে মরতে হত–একথা ঠিক নয়। আসলে দুর্বলা নারীদের চারিত্রিক দুর্বলতা, দুশ্চিন্তা ও ধর্মীয় সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বর্গের কথা মনে করেই আত্মহত্যা করা ছিল বীরাঙ্গনার পরিচয়। আর তাই দেখাদেখি দুর্বল মুহূর্তে মৃত্যুবরণের হিড়িক পড়ে যেত। অবশ্য এ প্রথা যে একটা অসভ্যতা বা বর্বরতা এ বিষয়ে অনেকেরই কোন সন্দেহ নেই।

যাহোক, মুহাম্মদ বিন কাসিম যুদ্ধান্তে কিছুদিন নিজের মুখ্য পদগুলোতে নিজেরই নিয়োজিত লোকদেরকে বহাল করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর দাহিরের সময়ে যে হিন্দু কর্মচারী যে পদ নিয়ে থাকতেন তাঁকে সে পদে পুনর্বহাল করে চরম উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা এটা যে, 'ব্রাহ্মণদের উপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।'

বিশেষভাবে মনে রাখার কথা হল, এ সময় ভারতে কুরআন শরীফ ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণী বা হাদীস হিন্দুদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত, পঠিত ও সমাদৃত হয় এবং মুসলমান রাজার প্রবল আগ্রহে ভারতের পুরাতন পুঁথিপত্র এবং ধর্মগ্রন্থাদি অনুবাদের দ্বারোদ্‌ঘাটনও সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, হিন্দু-ধর্মের পুস্তক-পত্র তুরস্ক ও আরবেও নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের ধারণা ছিল, যে দেশে থাকতে হবে সে দেশের পরিবেশ ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে না জানতে পারলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই অত্যন্ত অধ্যাবসায়ী হয়ে তাঁরা ভারতীয় প্রাচীন ভাষা শেখার জন্য বেসারসে এসেছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আমীর খুসরু লিখিত ইতিহাসে আছে–'আবু মুসা' দশ বছর ধরে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র পড়বার জন্য পরিশ্রম করেছিলেন।

শ্রীঘোষ ভারতের ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায় একটা কিংবদন্তীর ছাপ কেমন ভাবে এঁকে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তা লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, উল্লিখিত দুই কন্যার 'কাহিনীর সবটুকু' 'ঐতিহাসিক সত্য নয়'; তা সত্ত্বেও সন্দেহজনক ও সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিকর এ মারাত্মক কথা ইতিহাস বলে চালিয়ে যাওয়ার পিছনে যে লাভ কতটুকু তা তিনি চিন্তা করে দেখলেই ভাল করতেন।

তিনি ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "দাহিরের দুই কন্যাকে বন্দী করে কাসিম খলিফার হারেমের জন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা খলিফার কাছে অভিযোগ করেন যে কাসিম তাঁহাদের ইজ্জত বিনষ্ট করিয়া তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন এতে খলিফা ক্রুদ্ধ হইয়া হুকুম দেন যেন কাঁচা গোচর্মে আপাদমস্তক মুড়িয়া সেলাই করে কাসিমকে তাঁর কাছে অবিলম্বে পাঠান হয়। খলিফার আদেশ আল্লাহ্‌র আদেশের মত। কাজেই কাসিম নিজেই এভাবে মৃত্যুবরণ করেন।" এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, 'নিজেই' অর্থে কি 'আত্মহত্যা' যদি তাই ধরে নেয়া হয় তাহলে এর উত্তরে বলা যেতে পারে—ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায়, অনেক জাতির মধ্যেই রাজা রাণীদের বিপদের সময় আত্মহত্যা করার ঘটনা আছে। কিন্তু একমাত্র মুসলমান রাজত্বে বাদশা-বেগমদের আত্মহত্যার ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যার কারণে পরকালে স্বর্গে যাওয়া সহজ সম্ভব নয়। তাই মুসলমান জাতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ কুকর্ম হতে মুক্ত। অবশ্য ইদানিং ভারতে সাধারণ মুসলমান যারা দু-একজন আত্মহত্যা করছে, হয় তারা ধর্মের তত ধার ধারে না, অথবা তারা প্রতিবেশীর প্রভাবেই প্রভাবিত। কিন্তু এ সময় মুহাম্মদ বিন কাসিমের পক্ষে আত্মহত্যা করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না।

এছাড়া আরও একটি কারণে এরূপ ঘটনা মিথ্যা বলে বিবেচিত হচ্ছে। সেটা হচ্ছে এ যে. ইসলাম ধর্মের সংবিধানে আসামী, বাদী ও সাক্ষী ছাড়া অপর কারও মুখ থেকে কিছু শুনে আসামীর বক্তব্যকে ব্যক্ত করতে না দিয়ে দূর থেকে আদেশ বা নির্দেশ পাঠিয়ে কোন কিছু নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ নীতি বহির্ভূত কাজ। অতএব যদি এ ঘটনা সত্যিই হত তাহলে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে জানান হত এবং তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তা জানিয়ে সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্য শোনার পর সুবিচার-অবিচার যা-ই হোক হতে পারত। কিন্তু তাঁকে জীবন্ত আসতেই দেয়া হল না বরং কাঁচা গোচর্মে মুড়িয়ে তাঁর মৃতদেহ আনান হল–এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। তবে হ্যাঁ, যদি শূয়োরের চামড়ায় মুড়িয়ে আনার নির্দেশ থাকত তবে খলিফার ক্রুদ্ধ হওয়া প্রমাণ হত। কিন্তু অসত্য ইতিহাসে অর্থাৎ ইংরেজদের দালাল দ্বারা লিখিত ইতিহাসে গরুর চামড়ার কথা বলাই স্বাভাবিক।

আসল তথ্য হল, মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বাভাবিকভাবেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর মত বিখ্যাত বীরের মৃতদেহ রাজকীয় মর্যাদার সাথে কবর দেয়ার জন্যই মমি করার মত চামড়া সদৃশ মূল্যবান সাদা মখমল কাপড়ে মুড়ে কাঠের বাক্সে করে উপযক্ত স্থানে পৌঁছেছিল। তাছাড়া তার মৃত্যুও রাজনৈতিক কারণে নয়, বরং আকস্মিকভাবেই হয়েছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আজও একমত নন। কেহ কেহ মনে করেন তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত, আবার কেহ মনে করেন তাঁকে খলিফার চক্রান্তে হত্যা করা হয়েছে। অবশ্য অল্প বয়সেই যে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয় তাতে কারো সন্দেহ নেই। সন্দেহ শুধু এ পদ্মাদেবী আর সূর্যদেবীর কেচ্ছাকাহিনীতে। এ মিথ্যা ঘটনায় এও উল্লেখ আছে—মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর সুন্দরীদ্বয় খলিফার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, "মুহাম্মদ বিন কাসিম সাধু চরিত্রের লোক, আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য আমরা তার উপর মিথ্যা অভিযোগ করেছি।" তখন খলিফা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে দুই বোনকে হত্যার আদেশ দিলে উভয়কেই প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

শ্রীঘোষ তার ইতিহাসে লিখেছেন, 'দাহিরের দুই কন্যাকে বন্দী করিয়া কাসিম খলিফার হারেমের জন্য পাঠাইয়াছিলেন।' শ্রীঘোষের এ শব্দগুলোতে এ কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, খলিফা ব্যাভিচারী বা নারী ভোগী ছিলেন, তাই কুমারী নারী পেলেই সেনাপতিরা খলিফার ভোগের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ আজ চিন্তা করতে শিখেছেন–তাঁরা এটা কি সহজেই মেনে নেবেন যে, নারী ভোগী মুসলমান রাজকন্যাদের মত দুইজন সুন্দরী শিকার হাতে পেয়ে শুধু তাদের মায়াকান্না আর অভিমানের বায়না মেটাতে গিয়েই মুহাম্মদ বিন কাসিমকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন! শুধু তাই নয়, মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর তিনি যখনই এ সুন্দরীদ্বয়ের স্বীকারোক্তিতে বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের উপর মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

আবার যদি তাঁদের অভিযোগের কারণেই, যদি লম্পট ব্যাভিচারীদের কাছে বিজাতি, কুমারী, অকুমারী ভেদাভেদ থাকে না তবুও যদি মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল বলে ধরে নেয়া যায়, সুন্দরীদ্বয়ের মৃত্যুদণ্ডের ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। রূপলাবণ্য, সৌন্দর্য আর আভিজাত্যের জীবন্ত প্রতীক এ সুন্দরীদের হত্যা করা লম্পট চরিত্রের পক্ষে অবশ্যই অস্বাভাবিক।

সুতরাং নিশ্চয়ই আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খলিফার চরিত্রের উপর অভিযোগ এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতি নারী সরবরাহের অভিযোগ কল্পিত অসত্য ইতিহাস মাত্র।

সুলতান মাহমুদ

সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্যতম পুত্র সুলতান মাহমুদ আবির্ভূত হন ৯৯৭ থেকে ১০৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর উদয় ও অন্তকাল নির্ধারিত।

শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর জন্য লিখেছেন, "পিতাকে রাজা জয়পালের সহিত সন্ধি করিতে তিনিই নিষেধ করিয়াছিলেন। সুতরাং আরও দ্বিগুণ উৎসাহে হিন্দুস্থান অভিযান ও লুঠতরাজ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। ১০০০ – ১০২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ ২৬ বছর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত অভিযান করেন।"

'কিন্তু কাথিওয়াড়ের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন (১০২৫ খৃষ্টাব্দে) মাহমুদের নিকৃষ্ট অপকীর্তি বলিয়া ইতিহাসে নিন্দিত হইয়াছে। 'মন্দিরের ভিতরে কত যে মণিমুক্তা ও সোনার জিনিস ছিল তাহার হিসাব নাই। রাজপুত রাজারে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল এই মন্দির। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া মন্দির রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। গুজরাটের রাজা ভীমদেব প্রতিরোধ-সংগ্রামে অগ্রণী হন। প্রায় ৫০০০ হিন্দু যোদ্ধা এই মন্দির রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। কিন্তু মন্দির রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। মাহমুদ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সব ধ্বংস করিবার আদেশ দেন। ব্রাহ্মণরা প্রচুর ধনসম্পদের বিনিময়ে মন্দিরটি ভিক্ষা চান, কিন্তু মাহমুদ তাহার উত্তরে বলেন যে তিনি হিন্দু দেবমূর্তি বিক্রেতা হইতে চান না দেবমূর্তি বিনাশী হইতে চান।'

"বিধর্মীর উচ্ছেদ-সাধন ইসলামধর্মে প্রশংসনীয় কর্ম হইলেও তাহার ব্যাখ্যা মামুদের দৃষ্টান্ত দিয়া করা সঙ্গত নহে।"

সুলতান মাহমুদ খুব উৎসাহী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, শ্রেষ্ঠ সৈন্যাধ্যক্ষের অন্যতম এবং শ্রেষ্ঠ বিজেতা ছিলেন। তাঁর সতর বার ভারত আক্রমণ করার পশ্চাতে ভারতীয় রাজন্যগণ কর্তৃক সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ, তাঁর আনুগত্য অস্বীকার এবং ভারতীয় মিত্রবর্গকে উৎপীড়ন প্রভৃতি ছিল অনিবার্য কারণ।

তাঁকে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠনকারী এবং অনেক অনাচারের নায়ক বলে অভিহিত করা হয়েছে ইতিহাসে। একথাও আমরা বলতে চাই না যে, তাঁর কোন ভুল ত্রুটি ছিল না বা তাঁর দ্বারা কেহ কোনদিন কোনভাবে কষ্ট পাননি। তাহলে আরও পরিষ্কার করে বলতে হয়-গজনীর আমীর আলপতিগীণের মৃত্যুর ১৪ বছর পর তাঁর জামাতা সুবুক্তিগীন সুলতান হন। তিনি খুব প্রতাপশালী শাসক ছিলেন। এ সময় ভারতের পাঞ্জাব শাহী রাজা জয়পালের চিন্তা হল, কাবুল হতে যদি তিনি ভারত আক্রমণ করেন তাহলে তাঁকে ঠেকান একা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং রাজা জয়পাল উত্তর ভারতের প্রায় প্রত্যেক হিন্দু রাজাদের সংগঠিত করে একযোগে সুবুক্তগীনকে আক্রমণ করবেন বলে ঠিক করলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, জয়পালের এ সংগঠন ক্ষমতা প্রশংসার দাবীদার। যাই হোক, সম্মিলিত শক্তি নিয়ে সুবুক্তগীনের সাথে গজনী এবং লাঘমানের মাঝামাঝি ঘুজুক নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। জয়পালের সম্মিলিত বাহীনীকে সুবুক্তগীন সাংঘাতিকভাবে পরাজিত করেন। জয়পাল প্রাণ বাঁচিয়ে বিজয়ী মুসলমান রাজার সঙ্গে কয়েকটা সন্ধিতে সই করে দলবল নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন ও বাড়ি এসেই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করলেন। এ সংবাদে সুলতানের জয়পালের উপর রাগ হয়, তাই তিনি প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করেন। ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এ কাজের দায়িত্ব সুযোগ্য বীরপুত্র মাহমুদের উপর দিয়ে পরলোকগমন করেন।

"কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে দলবলসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই জয়পাল স্বীকৃত সন্ধি ভঙ্গ করেন। জয়পালের আগ্রাসী মনোভাব ও বিশ্বাসঘাতকতা সুলতান সবুক্তগীনের মনে স্বভাবতই উন্মত্ত উষ্মা জাগাল, কিন্তু শঠ জয়পালকে শাস্তি দিয়ে যাওয়ার সুযোগ তিনি পেলেন না, সে দায়িত্ব একাধারে অসাধারণ জ্ঞানী ও যোদ্ধা পুত্র মাহমুদের উপর অর্পন করে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা গেলেন।" (শ্রীদাশগুপ্তের ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩০)

সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে নাকি বলেন, এ আক্রমণ ধর্মীয় কারণেই কিন্তু ধর্মীয় কারণেই যদি মন্দির আক্রমণের ইচ্ছা বা নিয়ম থাকত তাহলে ১৭ বারের মধ্যে প্রথম বারেই তা হত, শেষবারে অর্থাৎ ১৬ বার আক্রমণের পরে তা ঘটত না। আসলে ওগুলো ভরা মৌচাকের মত ধনভাণ্ডার হয়ে থাকত, আর মধুলোভীর দল তা খাওয়ার জন্য বারবার ফিরে আসত। বর্তমান যুগের মন্দিরগুলো শুধু দেবতা কেন্দ্রিক হলে আক্রমণের ব্যাপার থাকত না।

১০০০ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ প্রাথমিক অভিযানের ফলস্বরূপ সীমান্তস্থিত কয়েকটি দূর্গ অধিকার করেন। পরের বছর তিনি জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে জয়পাল তাঁর পুত্র-পৌত্রসহ বন্দীত্ব বরণ করেন, কিন্তু করের প্রতিশ্রুতিতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে পরাজয়ের গ্লানি থেকে আত্মরক্ষার নামান্তরে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেন। ১০০৫ খৃষ্টাব্দে মুলতান অধিকৃত হয়। অতপর মুলতানের শাসনকর্তা দাউদকে বিদ্রোহাত্মক কার্যে সহায়তার অভিযোগে মাহমুদ জয়পালের পুত্র আনন্দপালের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযান প্রেরণ করেন। আনন্দ পালের সন্ধি-নীতির ফলে সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েও পরিশেষে মাহমুদের জয় হয়। ১০০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নারায়ণপুরের রাজাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ১০১২ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তা অধিকার করেন। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে এক বৃহৎ সেনাবাহিনী পুরোভাগে থেকে তিনি গজনী রওনা হলেন। এ সময় বারণের রাজা দশ হাজার সৈন্যসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এক কথায় তাঁর সুদীর্ঘ ৩৩ বছর কালব্যাপী ক্রমাগত যুদ্ধে তিনি একবার জন্যও পরাজয় বরণ করেননি।

সুলতান মাহমুদের ইতিহাসে সোমনাথ মন্দির অভিযান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১০২৫ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে গজনী ত্যাগ করে সুলতান ১০২৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি সোমনাথের দ্বারে উপস্থিত হলে হিন্দুরা প্রবল বাধা প্রদান করেও পরাজিত হন। এ সোমনাথকে কেন্দ্র করেই আধুনিক সরকারী ইতিহাসে মাহমুদের ন্যায় স্বচ্ছ-চরিত্র বীরের উপর ভারতের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করে ইসলামধর্ম প্রচারক, মূর্তিভঙ্গকারী, অর্থলোলুপ, নরহন্তা ও লুণ্ঠনকারী ইত্যাদি অসংখ্য অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। অথচ প্রকৃত ইতিহাস এ সমস্ত ধারণার একটিও সত্য বলে প্রমাণ করেনা। তাঁর ভারত আক্রমণ ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার। তদানীন্তন সময়ে ভারতের ধন সম্পদ, এমনকি অনেকের মতে জলদস্যুরাও তাদের লুণ্ঠিত অর্থ সোমনাথ মন্দিরে গচ্ছিত রাখত। এসব নানান কারণে সোমনাথ যখন মন্দিররূপী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল তখন আর মাহমুদের আক্রমণে কোন বাধা ছিলনা।

ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদও এ কথার সমর্থনে বলেন, "The temples of India which Mahmud raided were store houses of enormous and untold wealth and also some of these were political centres." যার মর্মার্থ হল—মাহমুদ ভারতের যে মন্দিরগুলো আক্রমণ করেছিলেন সেগুলো বিপুল ও বর্ণনাতীত ধনরত্নে পূর্ণ ছিল এবং তাদের মধ্যে আবার কয়েকটি ছিল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল।

প্রত্যক্ষদর্শী বিখ্যাত ঐতিহাসিক আলবিরুনী বলেন, "বিদেশী বণিকদের কাছে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থে যে সমস্ত হিন্দুরা ধনী হয়েছিল, তাদের দানের প্রাচুর্য দিয়েই এ সমস্ত ধনরত্ন সঞ্চিত হয়েছিল।"

অতএব, ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণেই তিনি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, একথা আদৌ সত্য নয়–ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার ডব্লিউ হেইগ বলেন, "His religious policy was based on toleration and though zealous for Islam, he maintained large body of Hindu troops and there was no reason to believe that conversion was a condition of their services." যার ভাবার্থ হল–তাঁর ধর্মীয়নীতি সহিষ্ণুতার উপর গড়ে উঠেছিল এবং যদিও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তার উৎসাহ যথেষ্ট ছিল তথাপি তিনি এক বিরাট হিন্দু সৈন্যদল পোষণ করতেন এবং একথা বিশ্বস করারবা কোন হেতু নেই যে, ধর্মান্তর তাঁদের চাকরির জন্য একটা শর্ত স্বরূপ ছিল। Prof. Habib-ও বলেছেন, "The non-religious character his expedition will be obvious to the critic who has grasped the salient features of the age. It is impossible to read a religious motive in them." যার অর্থ হল—তাঁর অভিযানের পিছনে কোন ধর্মীয় মনোভাবই যে বিদ্যমান নেই তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে সে সমালোচকের কাছে যিনি যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহকে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন। মাহমুদ এবং তাঁর সৈন্যবন্দের মধ্যে ধর্মীয় উদ্দেশ্যের ছিটে-ফোঁটা পাওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। সুলতান মাহমুদের ধর্মনীতি সম্বন্ধে মিঃ এলফিনষ্টোন বলেন, "এরকম ঘটনা কোথাও দেখা যায়নি যে. যুদ্ধ ব্যতীত কোথাও কোন হিন্দুকে তিনি প্রাণদণ্ড দান করেছেন।" তাঁর সামরিক বাহনীর ইতিহাসে তিলক রায়, হাজারী রায় এবং সেনানীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি গজনীতে হিন্দু সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানের জন্য একটি কলেজ, জনসাধারণের সুবিধার্থে একটি বাজার ও একটি মিউজিয়াম বা জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধর্মান্ধ হলে এ সমস্ত কাজ কি করে তাঁর দ্বারা সম্ভব হত? এও উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতে হিন্দু রাজন্যবর্গ ও মধ্য এশিয়ার মুসলমান রাজাদের সাথে তাঁর ব্যবহারের কোন তারতম্য ছিলনা।

তদুপরি ভারত অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠনের জন্য যে সমস্ত অভিযোগকারীরা তাঁকে লুণ্ঠনপ্রিয় ও হিন্দু বিদ্বেষী বলে প্রচার করতেন বা আজও করেন তাঁদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এ সমস্তই যুদ্ধের ন্যায় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয়েছিল এব তাঁর পূর্ববর্ত্তী ও তদানীন্তন যুগে তা আদৌ অসঙ্গত ছিলনা। তদানীন্তন প্রচলিত নীতি অনুসারে বিজিত জাতির লুণ্ঠিত ধন-সম্পত্তিতে বিজয়ী সৈন্যদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করা হত–মাহমুদ এ প্রচলিত নিয়ম পালন করেছেন মাত্র, এটা তাঁর নতুন কিছু আবিষ্কার নয়।

আধুনিক সহজলভ্য ইতিহাসে সুলতান মাহমুদদের চরিত্রে যে সমস্ত কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে তার অনেকটাই অবিজ্ঞানপ্রসূত ও স্বপরিকল্পিত মন্তব্য ছাড়া কিছু নয়। সামগ্রিকভাবে তিনি ছিলেন দেহ মনে নানাবিধ গুণের সমাবেশ অবিস্মরণীয় ব্যক্তি। তিনি বড়দেরকে মানতে জানতেন। অন্যায়ভাবে নিজ ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে কখনো স্বেচ্ছাচারিতা করতেন না। খলিফার বৈধ প্রতিনিধি ছিলেন তিনি, সুতরাং ভালমন্ত সব কাজের কৈফিয়ত তাঁকে দেয়ার মত প্রস্তুতি তাঁর ছিল। এ সবের প্রমাণ মূল ইতিহাসে, যেমন কেরাইশীল সুলতানাত আ্যডমিনিষ্ট্রেশনের ২৫ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার লেখা আছে। তিনি নিয়মিত কুরআন পাঠ ও মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়তেন। এছাড়াও তাঁর রাজসভা কবি-সম্রাট ফিরদৌসী, মহাপণ্ডিত আলবিরুনী, ঐতিহাসিক উত্বী, দার্শনিক ফারাবী প্রভৃতি মনীষীদের দ্বারা অলঙ্কৃত থাকত।

তিনি অত্যন্ত উদার ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন। একটি ঘটনা দিয়ে বলা যায়–একবার দরিদ্র হিন্দু প্রজা সম্রাটের কাছে অভিয়োগ নিয়ে এলেন যে, সম্রাটের ভাগ্নে নাকি তাঁর অসহায় স্ত্রীর উপর প্রতি সপ্তাহে পৈশাচিক অত্যাচার চালায়। সম্রাট তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে নির্দেশ দিলেন, এবার যখনই তাঁ ভাগ্নে তাঁর বাড়ীতে যাবে সাথে সাথে তিনি যেন সম্রাটকে তা অবগত করান। তাঁর হাতে একটা কার্ড দিয়ে জানালেন, এটা দেখালে যে কোন মুহূর্তেই রাজভৃত্যরা তাকে সরাসরি সম্রাজের কাছে পৌছে দেবে। পরে একদনি রাত্রে সম্রাটের ভাগ্নে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হল। হিন্দু প্রজারা এ সুযোগের অপেক্ষাতে ছিলেন। তাঁরা পরখ করবেন মুসলমান বাদশার ইসলামিক বিচার পদ্ধতি। তৎক্ষণাৎ বাদশাহের কাছে খবর পৌঁছাল। বাদশাহ তরবারি হাতে সেই দরিদ্র প্রজার বাড়িতে উপস্থিত হ'লেন। টিমটিমে আলোয় দেখলেন এক উন্নত মস্তক যুবক ঘরের ভিতরে হিংস্র মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ইশারায় আলোটি নিভিয়ে দিতে বলে উলঙ্গ তরবারি দিয়ে পিছন দিকে এক চোটে তাকে দ্বিখন্ডিত কররেন। তারপর গৃহকর্ত্রীকে আলো জ্বালাতে নির্দেশ দিয়ে এক গ্লাস জল চাইলেন ও গ্লাসটির জল বসে তিন নিঃশ্বাসে শেষ করলেন। অতঃপর দুরাকাত নামায পড়ে আল্লাহ্র কাছে মোনাজাত করলেন, 'ওগো আল্লাহ্, আমি যে তোমার পছন্দনীয় ইসলামের নিয়মানুযায়ী আমার এ হিন্দু প্রজার বিচারের ভার নিজ হস্তে সুসম্পন্ন করতে পারলাম তার জন্য তোমার অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।' পরে হিন্দু প্রজা তাকে আলো নেভান ও জল পান করার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, স্নেহসিক্ত ভাগ্নের শিরচ্ছেদের পথে মায়া মমতার কোন বাধা সৃষ্টি না হয় তার জন্যই ছিল আলো নেভানোর নির্দেশ। আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার অভিযোগের সুবিচার করতে পারছি ততক্ষণ জল স্পর্শ করব না, তাই এর মাথা কেটেই জলপান করতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি তখনও অভুক্ত ও পিপাসায় কাতর ছিলাম। আরও অবাক হবার কথা এটা যে, হতভাগ্য যুবক আমার কোন ভাগ্নে নয়, সামান্য একজন রাজকর্মচারি মাত্র। ইসলামের এরক বিচার পদ্ধতি দেখে সম্রাটের প্রজারা সেদিন আশ্চর্যান্বিত ও হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

আজ পৃথিবীর সে রাষ্ট্রের তত মর্যাদা দেয়া হয় যে রাষ্ট্র যত শক্তিশালী, আবার এ শক্তির পরিমাপ হয় সামরিক শক্তির উপর, আর তা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই বিপুল অর্থ। সুলতান মাহমুদ এ সত্যটুকু জানতেন। অথচ আমাদের ভারতীয় রাজাদের এ বিষয়ে ছিল কিছুটা অবহেলা। তখন বৈজ্ঞানিক অস্ত্র, ট্যাংক ও বিমান ছিলনা, ছিল হাতি ঘোড়া ও সৈন্যদের যুদ্ধ। সে হাতি ঘোড়াদের বিশেষভাবে ট্রেনিং দেয়ার ক্ষেত্রে ছিল ভারতীয়দের শৈথিল্য, আর মাহমুদ এ বিষয়ে ছিলেন ভয়ানক সজাগ। তাঁর বাহিনীতে শুধু একহাজার ছয়শত সত্তরটি শিক্ষিত হাতি ছিল যার প্রমাণ বাইহাকীর লেখা তারিখি বাইহাকি ইতিহাসের ৩৪৯ পাতায় রয়েছে। সুলতানারা জানতেন একটা হাতি ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যের সমান। এ মূল্যায়নের প্রমাণ পাওয়া যাবে ইবনে বতুতার লেখা রিসালাতের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫ পাতায়।

হাদি দিয়ে যে কাজ হয় ঘোড়া দিয়ে তা হয় না। আবার ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণ প্রভৃতিঘোড়ার দ্বারা যেভাবে হয় হাতি দিয়ে তা হয় না। মাহমুদের সময় সার্কাসের ঘোড়ার মত সুদক্ষ টেপ্রনিং প্রাপ্ত ঘোড়ার সংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার।

সুলতান মাহমুদ ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতেন। যদিও এর প্রমাণ তারিখি বাইহাকীর মত আকর গ্রন্থে রয়েছে (পৃষ্ঠা ৬১৩, ৭৫৬) তবুও অনেক বাংলা অনুবাদক ও লেখকের তা লিখতে মনে থাকে না। মাহমুদ হিন্দুদের বিচার হিন্দু আইনমত করবার ব্যবস্থা মেনে চলতেন এবং এ নিয়মকে করেই ভারতীয় সংবিধান চলত–কোরাইশীর লেখা সুলতানাত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ১১ পাতায় এর প্রমাণ রয়েছে।

(ক) মাহমুদের গঠনমূলক প্রতিভা ছিল অত্যন্ত অধিক, (খ) তাঁর রাজ্যবিস্তৃত ছিল দু'হাজার মাইল লম্বা পূর্ব-পশ্চিমে আর উত্তর-দক্ষিণে চৌদ্দ শত মাইল (গ) তাঁর রাজ্যে প্রত্যেকে সুখ ও শান্তির ছায়ায় আরামে থাকত, (ঘ) সে যুগে মাহমুদের মত এত ভাল রাজা আর কেহই ছিলেন না।

'ক'-এর প্রমাণ ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদের Mediaeval India-র ৯০ পৃষ্ঠা, 'খ'—নাযিমের ইতিহাসের ১৬৯ পৃষ্ঠা, 'গ'—গীবন, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৩ ও 'ঘ'-এর প্রমাণ মিঃ এলফিনষ্টোন এর ইতিহাসের ৩৩৪ পাতায় পাওয়া যাবে। মিঃ গীবন তাঁকে আলেকজান্ডার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেছেন— "The Sultan of Gazani surpassed the limits of conquest of Alexander." (Gibbon, Vol. VI, P. 241)

কেমব্রিজ হিষ্ট্রী অফ ইন্ডিয়ার ৩য় খণ্ডের ৫৭৪ পাতায় স্যার জন মার্শাল লিখেছেন, "মহামতি মাহমুদ তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী সুলতানদের আমলে স্থাপত্যের আড়ম্বরে গজনী খেলাফতের সমস্ত নগরের মধ্যে বিখ্যাত হইয়া দাঁড়ায়।" Mr. Keene বলেছেন—মাহমুদ যেমন বিরাট রাজ্য জয় করতেন তেমনি বিজ্ঞতার সঙ্গে সুশাসন করতেও সক্ষম হয়েছেন। [History of India, Vol. 1, P. 30]

"স্থূলদর্শী ঐতিহাসিকদের অন্ধ অনুকরণের ফলে সুলতান মাহমুরে ন্যায় আর কারোর চরিত্র সম্ভবত এত বিকৃতপ্রাপ্ত হয় নাই"—ডক্টর এম, আবদুল কাদের। ডক্টর নাযিমও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রবন্ধ লিখে পি-এইচ. ডি. উপাধি পেয়েছেন তাতে বলেছেন, "মাহমুদ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।" অথচ ইতিহাসে আছে, মাহমুদ সোমনাথের মূর্তি ভাঙতে চাইলে মন্দিরের সেবকরা অনেক টাকা দিয়ে তাঁকে বিরত করবার চেষ্টা করলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি প্রতিমা ভঙ্গকারী হিসেবে পরিচিত হতে চাই, প্রতিমা বা ঠাকুর বিক্রেতা হিসেবে নয়'। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে এসব তথ্য সত্য নয়—'অন্ধকূপ হত্যার মতই সাজান কথা। যে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কৃপায় আমরা অসত্যের বেলুন ইতিহাসে পেয়েছি তা আবার ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ফুৎকারেই ফাটিয়ে দেয়া যায়-যেমন ঃ উইলিয়াম হান্টার। তিনি অনেক তাথ্যিক বই লিখেছেন, তার মধ্যে History মত India বইটিও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বইটির ৯৩ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাকে অসত্য বা গল্প বলা হয়েছে— "There was a story ... once extensively belived, but now discovered to be untrue ... the whole story about Mahmud and his breaking of the image is a fabrication...." যার মর্মার্থ হচ্ছে.ম এক সময়ে লোকে গল্পটি খুব বেশি বিশ্বাস করলেও এখনকার গবেষণায় এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাহমুদ এবং তাঁর মূর্তি ভাঙ্গার গোটা গল্পটাই সাজান।

ইতিহাসে একথাও আছে-মাহমুদ সোমনাথের দরজাগুলো খুলে নিয়ে অন্য অট্টালিকায় লাগিয়েছিলেন। সত্য ইতিহাসে মন্দিরের দরজাগুলো খাঁটি চন্দন কাঠের ছিল বলে জানা যায়, কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে সে অভিযুক্ত দরজাগুলো দেবদারু গাছের। যদি ঘটনা সত্য হত তাহলে দরজাগুলোকে চন্দন কাঠের হত। এ তত্ত্বের প্রমাণ মিঃ ফার্গুসনের লেখা Indian and Eastern Architecture পুস্তকের ৩য় খণ্ডের ৪৯৬ পাতায় রয়েছে। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং দু'একজন মুসলমান ঐতিহাসিক তার বিরুদ্ধে উল্টোপাল্টা মিথ্যা কথা লিখলেই তা বিশ্বাসকরা যায় না। তাছাড়া ঐতিহাসিকরা মানুষ, যদি কোন অপরাধের জন্য কোন ঐতিহাসিক কারো কাছ হতে স্বয়ং বা তাঁর কোন নিকটাত্মীয় শাস্তি পেয়ে থাকেন তাহলে তাঁর কলমের গতি সত্য থেকে পিছলে যাওয়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে আরও ইতিহাস

সামনে রেখে গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আসলে সুলতান মাহমুদ ছিলেন সামাজী পরহেজগার দাড়িওয়ালা নিষ্ঠাবান মুসলমান–এটাই অনেকের কাছে বিরাট অপরাধ।

"ইতিহাসে মাহমুদের স্থান নির্ধারণ করা কঠিন নয়। সমসাময়িক মুসলমানরা তাঁকে গাজী ও ইসলাম-নেতা বলে জানতেন। হিন্দুরা অনেকে আজ পর্যন্ত তাঁকে নিষ্ঠুর, অত্যাচার, আদি হুন এবং মন্দির ও মূর্তি ভঙ্গকারী বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু যিনি সে যুগের খবর রাখেন, তিনি অন্য মত পোষণ করতে বাধ্য। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের চোখে মাহমুদ একজন শ্রেষ্ঠ জননেতা, ন্যায়পরায়ণ সুলতান, সাহসী ও প্রভাবশালী সেনাপতি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পকলার উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বাদশাহদের এক আসনে বসার জন্য সমকক্ষ।" (ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের Mediaeval India গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১১১ দ্রষ্টব্য)

সবশেষে আর একজন হিন্দু ঐতিহাসিকের মূল্যবান উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই–"এটাই সঠিক কথা যে মাহমুদের যে সমর প্রতিভা ছিলতার তুলনা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসেই বিরল এবং প্রাকমুসলিম ভারতীয় রাজাদের দ্বারা প্ররোচিত না হলেও মাহমুদের সমরপ্রতিভা কোন না কোনভাবে প্রকাশের পথ খুঁজে নিতই, হয়ত সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে ভারতবর্ষের বদলে চীন তথা পূর্বদিকেই আক্রমণ চালনা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু জয়পাল প্রমুখ ভারতীয় রাজন্যদের স্পর্ধা, শঠতা ও সন্ধিভঙ্গের অপরাধ তাঁর ওই প্রতিভাকে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের দিকেই বিকাশের অনুকূল পরিবেশ করে দিয়েছিল। পাঞ্জাবে কর্তৃত্ব বিস্তার ছাড়া ভারতীয় ভূখণ্ডে কোন স্থায়ী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অথবা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কোন ধর্মপ্রচারের পরিকল্পনা তাঁর ছিলনা, তা তিনি করেনও নি।" (শ্রী সুরজিৎ দাশগুপ্তের ভারতবর্ষ ও ইসলাম', পৃষ্ঠা ৩১)

মুহাম্মদ বিন তুঘলক

গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জুনা খাঁ মুহাম্মদ বিন তুঘলক' নাম দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৩২৫ থেকে ১৩৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন ভারতের ইতিহাসে এক অতি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন বাদশাহ। ধর্মের দিক দিয়ে তিনি যেমন স্বচ্ছ জ্ঞানের অনুসারী ছিলেন, তেমনি রাজনীতিতে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত ছিল এবং হিদায়ার মত ফিকাহ শাস্ত্রের কঠিন গ্রন্থও কণ্ঠস্থ ছিল (মাসালিকুল আবসার, পৃষ্ঠা ৩৭ দ্রষ্টব্য)। তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে কুরআনের শ্লোক উদ্ধৃত করতেন। বারণী লিখেছেন, যখন আজানের শব্দ তার কানে যেন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং আযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা সুলতানের নফল এবং মুস্তাহাব (অতিরিক্ত উপাসনাসমূহ) আগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য ঃ মআসির রহিমি, ১ম খণ্ড ৩৪৫ পৃষ্ঠা ও তারিখে ফিরিস্তা)

তিনি শুধুমাত্র রমযান মাসে নয়, অসুস্থ অবস্থাতে, গ্রীষ্মের দারুণ ক্লান্তিতে ও মহররম মাসের দশ তারিখে রোযা রাখতেন। ছোটখাটো ব্যাপারেও ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতেন শরীয়তসম্মত ভাবে যবেহ করা হয়নি বলে মনে হলে সে পশুর মাংস খেতেন না (আজায়েবুল আসফার, ১৭৬ পৃষ্ঠা)। শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দিস দেহলবীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, সিংহাসনে বসার পর তিনি কোন উপাধি ধারণ করেন নি। মুহাম্মদ নামই তাঁর কাছে মানব সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম হিসেবে বিবেচিত ছিল। তবে তিনি নিজেকে মুহীয়ে সুনানে খাতামিন্নাবিইন অর্থাৎ শেষ নবীর সুন্নাতকে জীবিতকারক বলে অভিহিত করতেন। ব্যাভিচার ইত্যাদি অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র নজর দিতেন ও অপ্রয়োজনীয়, অশ্লীল

এবং কুৎসিত দ্রব্য থেকে যতদূর সম্ভব নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। হারেমে প্রবেশের সময় মোহরেম অর্থাৎ যাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ এমন মেয়েরা তাঁকে দেখে পর্দা করতেন এবং তিনিও তাঁদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া অত্যন্ত দোষের মনে করতেন। (তারিখি ফিরোজশাহী, ৫০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সুলতান তাঁর মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর কোন আদেশেরই তিনি বিরোধিতা করতেন না। মদের ঘোর শত্রু ছিলেন তিনি। মদপানের অপরাধে একজন আমীরের তিনি সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। শাহাবুদ্দিন আল আমীর শিবলী বলেন, সে সময় দিল্লীতে প্রকাশে মদ পাওয়া যেত না। তিনি মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য খুব জোর দিতেন। ইবনে বতুতাও একথা স্বীকার করেছেন। জামাতের সাথে নামায না পড়ার অপরাধে তিনি তাঁর একজন নিকট আত্মীয়কে কঠোর শাস্তি দান করেন। ভারতে ইনিই প্রথম বাদশাহ যিনি শাসন ব্যবস্থায় নামাযকে অঙ্গীভূত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নাচ গান করা মেয়েরাও নামাযে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তবলীগের সমর্থক এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সে যুগে তিনি সতীদাহ প্রথা তুলে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা বা হস্তক্ষেপ হবে বলেই তা থেকে বিরত হন।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক কি পাগল ছিলেন?

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন সর্বগুণের সমন্বয়ে এক অদৃশ্যপূর্ব ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় আল্লাহ্ ভক্ত এবং নিরলস সংগ্রামী বাদশাহ–অতএব এ রকম এক মধুর চরিত্র সম্রাটের ঘাড়ে 'পাগল', 'বিকৃত' আর 'রক্তলোলুপ' এর স্ট্যাম্প না লাগালে ঐতিহাসিক হওয়া যাবে কি করে?

তাই তাঁকেও দুর্নামের শিকার হতে হয়েছে। অবশ্য একথা প্রকাশ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ছিল যে, ভারতীয় মুসলমান বংশধররা যেদিন ইসলামের ছায়াবলম্বনে গঠিত হবে, হযরত মুহাম্মদের আদর্শে আদর্শবান হবে, উন্নত আদর্শে রাজা বাদশাহদের চরিত্র মাধুর্যের রঙে রঙিন হবে, সেদিনই ভারতপ্রভু ইংরেজদের লোটা কম্বল কাঁধে নিয়ে এ ভারতভূমি ছেড়ে সুদূর পশ্চিমি দেশে পাড়ি দিতে হবে। তাই জেনে ইংরেজ প্রভু ও তাঁদের পোষ্যপুত্রের দল প্রায় সমস্ত আদর্শ মুসলিম রাজা বাদশাহদের চরিত্রেই কলঙ্কের বিষাক্ত ইনজেকশন প্রয়োগ করেছেন, এমনকি অনেক স্থানে পবিত্র ইসলামের উপরেও নির্মম আঘাত হেনেছেন।

প্রধানতঃ চারটি কারণে মুহাম্মদ বিন তুঘলককে ইতিহাসে পাগল, নিষ্ঠুর এবং খামখেয়ালি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে।কারণগুলো এরূপ—(১) রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা, (২) রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরকরণ, (৩) দোয়াব এলাকায় করভার স্থাপন ও (৪) তাম্র মুদ্রার প্রচলন। এবার কারণগুলোর যথার্থতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

(১) ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারণী লিখেছেন, খোরাসান অভিযানের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ বিন তুঘলক ৩৭০০০০ সৈন্য সংগ্রহ করে অবশেষে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন, তাতে তাঁর বাস্তব জ্ঞানের অভাব ও অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে, বারণী সাহেবের লেখা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। কারণ তিনি তাঁর রচনায় খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা কেন ত্যাগ করা হয়েছিল তা বলেননি। তবে সে তথ্য আমাদের হাতে জমা আছে–পারস্য ও মিশরের মধ্যে মনোমালিনের পরিপ্রেক্ষিতেই এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে পারস্যের আবু সায়ীদ ও মিশরের আন নাসিরের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে উঠে। তখন বাধ্য হয়েই মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। অতএব এক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের অভাব বা অদূরদর্শিতার পরিচয় তো পাওয়া যায় না বরং তাঁর শান্তিকামী মনের পরিচয় ফুটে

ওঠে। তাছাড়া তাতে দেশের ক্ষতির পরিবর্তে যে বিরাট একটা লাভ হয়েছিল তা হচ্ছে এ যে, যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য অনভিজ্ঞ প্রজাবৃন্দের বিরাট একটা অংশ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিল, যা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে এক উল্লেখযোগ্য অবদান।

এছাড়া ঐতিহাসিক বারণী তাঁর রচনায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চীন অভিযানের অসত্য ঘটনাকে স্থান দিয়ে ইতিহাসকে দূষিত করেছেন। অথচ বাস্তবে মুহাম্মদ বিন তুঘলক চীন অভিযান তো করেনই নি, চীন অভিযানের পরিকল্পনাও তাঁর মস্তিষ্কে কোনদিন স্থান লাভ করেনি। অবশ্য চীন ও ভারতের সীমান্তবর্তী কারাচল ও কুর্মাচলে তিনি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তার পশ্চাতেও যথেষ্ট বাস্তব যুক্তি রয়েছে–উদ্ধত পার্বত্য সর্দারকে আয়ত্তাধীনে আবার জন্যই তাঁর এ অভিযান। শুধু তাই নয় এ অভিযানের ফলস্বরূপ কারাচলের রাজা সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

(২) দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ন্যায় এক অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে যেভাবে কলঙ্কের কালি ছিটান হয়েছে তাতে অনেক ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা ও দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে পারেননি। রাজধানী পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐতিহাসিক ইবনে বতুতা যেভাবে কল্পনার তুলি দিয়ে চমকপ্রদ উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন তাতে সত্যতার লেশমাত্র নেই। তিনি বলেছেন, "দিল্লির লোকদিগকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি দাক্ষিণাত্যে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।" কিন্তু এ উক্তি ভিত্তিহীন এবং প্রকৃতপক্ষে সত্যের অপলাপ। ঐতিহাসিক বারণীও অনুরূপ উপন্যাসিক কৃতিত্বের পরিচয় দিতে ভোলেননি। কিন্তু আসলকথা হচ্ছে এ যে, পিতার শাসনকালে বরঙ্গল অভিযানে নিযুক্ত থাকার সময় মুহাম্মদ বিন তুঘলক দাক্ষিণাত্যের বিপজ্জনক সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সিংহাসন লাভের পরেই এ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি দেবগিরিতে দৌলতাবাদ নামক একটি রাজধানী স্থাপন করতে প্রয়াসী হলেন। অবশ্য এর পিছনে কারণ ছিল, কেননা দেবগিরি ছিল সাম্রাজ্যের অপেক্ষাকৃত মধ্যবর্তী এবং দাক্ষিণাত্যের শাসন প্রণালী পর্যবেক্ষণ করবার অধিকতর নিকটবর্তী স্থান। সুদূর দিল্লিতে অবস্থান করে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতি সুলতানের পক্ষে সমগ্র দেশ পরিচালনা করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল, তাছাড়া দিল্লী ভারত সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ায় মোঙ্গল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এসব নানান কারণে সুলতানের নতুন রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনাকে নিছক পাগলামী বলে উড়িয়ে দেয়া চলে না বরং এর পশ্চাতে তাঁর যোগ্য শাসন ক্ষমতা ও দূরদর্শী মনের কৃতিত্ব লুকিয়ে রয়েছে।

মুহাম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমান গতানুগতিক ইতিহাসে পাওয়া যায়–তিনি নাকি জোর করে সমস্ত দিল্লীবাসীদের ঘটিবাটি শিশুসন্তানসহ ৭০০ মাইল পথ অতিক্রম করে দৌলতাবাদ যেতে বাধ্য করেছিলেন। ফলে অপারগ অনেক শিশু বৃদ্ধবৃদ্ধা নানা কষ্টে পথে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে বতুতার বর্ণনায়–"দিল্লী নগরী তখন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল।" তিনি আরও বলেন, "এক পঙ্গু ব্যক্তিকে পথে নিক্ষেপ করা হয় এবং একজন অন্ধকে দিল্লী হতে দৌলাতাবাদে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এ সমস্ত উক্তি প্রকৃত সত্যের বিপরীত। ১৩২৭ এবং ১৩২৮ খৃষ্টাব্দের দুটি সংস্কৃত অনুশীলন-লিপি হতে জানা যায়, সুলতান সাধারণ প্রজাবর্গ অথবা হিন্দুদের রাজধানী ত্যাগ করতে আদেশ দেননি। প্রকৃত ঘটনাবেশ কয়েক বছর পরে ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে এসে হাটুরে গল্পের ভিত্তিতে তিনি তার মত প্রকাশ করে গেলেন। দিল্লি কখনও জনপরিত্যক্ত ছিলনা অথবা কোন দিন রাজধানীর মর্যাদা হারায়নি, এ আমোঘ ঐতিহাসিক সত্য সমীক্ষাই তাঁর উক্তির অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে। তাছাড়া ইবনে বতুতার উক্তি সঠিক হলে ১৩২৯ খৃষ্টাব্দে মুলতানে যে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করা এ জনশূন্য দিল্লী থেকে সুলতানের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিলনা।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এ যে, রাজধানী পরিবর্তনের যে কথা খুব জোর দিয়ে প্রচার করা হয়ে থাকে সেটাই আসলে সঠিক নয়। তিনি রাজধানী পরিবর্তন করেননি। তবে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য দৌলতাবাদকে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন মাত্র। আর দিল্লীবাসীকে দেবগিরি প্রেরণের পশ্চাতে আসল তথ্য হচ্ছে এ যে, দাক্ষিণাত্যের মুসলমানেরা সে সময় ধর্মবিমুখ হয়ে অত্যাচারী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। তাই তাদেরকে ইসলামের আলো দেখানর জন্য দিল্লী হতে শুধুমাত্র একদল মুসলমানকেই দেবগিরি পাঠান হয়েছিল। এছাড়া আরও অন্যান্য অঞ্চলে তিনি প্রচারক দল পাঠিয়েছিলেন। বিখ্যাত আলেম শামসুদ্দিন ইয়াহইয়াকে ডেকে বলেছিলেন, আপনি এখানে বসে কি করছেন? কাশ্মীরে যান এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে স্রষ্টার দিকে ডাক দিন।' তাই মনে হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে ইবনে বতুতা সাহেব কিংবদন্তীর ভিত্তিতেই এ সমস্ত উপাদানগুলোরকে বিকৃত ইতিহাস স্থান দিতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে বসেছেন।

তবে একথাও ঠিক যে ঐতিহাসিকরা কোন নবী বা অবতার নন, তাঁরাও রক্ত মাংসের মানুষ। অতএব ভুল ত্রুটি তাঁদেরও কিছ কিছু থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়; ঐতিহাসিক বারণী বা ইবনে বতুতার ক্ষেত্রেও এ সত্য প্রযোজ্য।

ইবনে বতুতা খ্যাতনামা ঐতিহাসিক হয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে কেন অঘটন ঘটালেন তার উত্তরে বলা যায়, ইবনে বতুতা ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এসে প্রায় আটবছর কাল ধরে মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক দিল্লির প্রধান কাজী বা চিফ্ জাষ্টিসের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এমন এক অমার্জনীয় অপরাধ তাঁর দ্বারা হয়ে যায়, যার বিচার সুলতানকেই করতে হয়। বিচারে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। কারামুক্তির পর যদিও তিনি সুলতানের প্রীতি ফিরে পেয়েছিলেন তথাপি শাস্তির কথা ভুলতে পারেননি। তিনি তাঁর পুস্তকে সুলতানের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞাকে তিনি শত চেষ্টা করেও কোনমতে চাপা দিতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, অপরাপর পর্যটকদের মত তিনিও ঘটনার সাথে গল্পের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং অলীক জনশ্রুতিকেই অধিক প্রাধান্য দান করেছেন। কারণ অধিকাংশ ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ দেখার সুযোগ পাননি। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁকে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে তাঁর শোনা কথার তদন্ত না করার অপরাধকে অস্বীকার করা যায় না।

তবুও আমরা দ্বিধামুক্ত চিত্তে একথা বলতে পারি যে, তাঁর রচনায় সে যুগের অনেক মুল্যবান সংবাদ বা তথ্য ইতিহাসকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

(৩) নিরপরাধ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রের নিষ্ঠুরতার আরও একটি অপবাদের আলেখ্য অঙ্কন করা হয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, দোয়াবে সুলতান দশ বিশ গুণ কর বৃদ্ধি করে রায়ত শ্রেণীকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করাতে বাধ্য করেন এবং কৃষক শ্রেণীর উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালিয়ে গেছেন। বলা যেতে পারে, প্রবাদ বাক্যের মত এ মতকেই সাদরে গ্রহণ করে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা তাতে আরও কল্পনার রঙ চড়িয়ে প্রকৃত ইতিহাসকে হজম করে ফেলেছেন। কিন্তু তারা তো আর নীল কণ্ঠ নন, তাই আবার তার উদ্গিরণ শুরু হয়ে গেছে বর্তমান লেখনী জগতে। এও জানিয়ে রাখা বাল যে, জিয়াউদ্দিন বারণী কদাচ সুলতানের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তাছাড়া তাঁর ইতিহাসের ঘটনাবিন্যাসও ধারাবাহিকভাবে নয়, যখন যে শোনা ঘটনা তাঁর কল্পনাকে উদ্দিপ্ত করেছে তখন সেটাকেই তিনি অগ্রে স্থান দিয়েছেন। ফলে তাঁর বর্ণনায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সমস্ত কার্যকলাপই কার্যকারণ নীতি-বিবর্জিত এক পাগলামি ক্রিয়াকাণ্ড বলে মনে হয়েছে।

খলজী বংশের পতনের পর অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে দোয়াব অঞ্চল হতে কর আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, তাই মুহাম্মদ বিন মুঘলক আলাউদ্দিন খলজী অপেক্ষা কম হারে পূর্ব আরোপিত করের পুনঃপ্রবর্তন করেন মাত্র। যেমন স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে দু-দিন বছরের অনাদায়ীকৃত করকে এক সাথে আদায় করা হয়। এটা যদি শিক্ষিত যুগে শিক্ষিত মানুষের কাছে দোষণীয় না হয় তবে মুহাম্মদ বিন মুঘলকই বা দোষী হবেন কেন? কৃষি প্রধান রাষ্ট্রে পর পর দুবছর বৃষ্টিপাত না হলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে দোয়াব অঞ্চলে দু এক বছর নয়, পর পর সাত বছর অনাবৃষ্টি হয় এবং এর ফলে সেখানকার জনসাধারণকে এক দারুণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পড়তে হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মত এক উদারচেতা ও অসীম সাহসী বাদশাহের পক্ষেই এরকম ভীষণ সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তিনি এ বিপদে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন না করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের সাহায্যের নিমিত্তে খাদ্য দান, ঋণ দান, কূপ খনন, চাষের বীজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে জনকল্যাণকামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। কথিত আছে, হাতেমতাঈ এবং অন্যেরা এক বছরে যা দান করতেন তিনি একবারেই তা করতেন। তাই ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ দুঃখ করে বলেছেন, “প্রায় এক যুগ স্থায়ী মারাত্মক দুর্ভিক্ষ তাঁর রাজত্বের গৌরব অনেকখানি বিনষ্ট এবং প্রজাদিগকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাঁকে নীরো এবং ক্যালিগালের মত নিষ্ঠুর এবং রক্তপিপাসু দানব বলে অভিহিত কররে তাঁর মহান প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হয় এবং দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধের জন্য তাঁর প্রকৃত চেষ্টা ও বিভিন্ন উন্নতিমূলক সংস্কারের পরিকল্পনা হেতু মহান কৃতিত্বের দাবীকে অবজ্ঞা করা হয়।”

(৪) মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর রাজত্বের প্রথ- ভাগে স্বর্ণ রৌপ্যের পরিবর্তে তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। মিঃ টমাসের মতে তিনি ছিলেন ‘Prince of Moneyers’ অর্থাৎ তঙ্কা নির্মাতার রাজা। “তাঁর প্রবর্তিত মুদ্রা নূতনত্ব এবং গঠন বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। নমুনা এবং কার্যকারিতার দিক দিয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। নমুনা এবং কার্যকারিতার দিক দিয়ে এ মুদ্রার শিল্পসম্মত পরিপূর্ণতা প্রশংসনীয়।”

সাধারণত এ কথাই বলা হয়ে থাকে যে, সুলতানের অপরিমিত উদারতা, দুর্ভিক্ষ, রাজধানী স্থানান্তরকরণজনিত ব্যয় বাহুল্য, দিল্লিতে পুনর্বাসনের ব্যয় প্রভৃতির ফলে রাজকোষ শূন্য প্রায় হয়ে পড়লে সুলতান এ সমস্যার সমাধানের জন্য তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। কিন্তু এ অভিযোগ সত্য নয়। কারণ তাম্র মুদ্রার অসাফল্যের ফলে সমস্ত তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে জনসাধারণকে দেয়ার জন্য তখনও সুলতানের হাতে যথেষ্ট স্বর্ণ ছিল–যেহেতু তারপরেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে রাষ্ট্রের সমস্ত তাম্র মুদ্রাকে তিনি ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেটা আজ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এক অকল্পনীয় বিজ্ঞানময় কীর্তি।

এছাড়া আরও বলা যায়, তাঁর যথার্থ সতর্কতা অবলম্বনের অভাব তাম্র মুদ্রা প্রচলনের কারণ, আমরা এ কথার সাথেও একমত নই। কেননা, যদি একথা সত্যিই হত, তাহলে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সমস্ত তাম্র মুদ্রা ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হলেন কিভাবে? বলাবাহুল্য, তাঁর এ অভিনব পদ্ধতিতে জনসাধারণের ভুল বোঝাবুঝির কারণেই ছিল এ ব্যর্থতা। কিন্তু আজকের শিক্ষিত জনসাধারণ তাঁর যুগের তদানীন্তন উৎকট মুদ্রাস্ফীতিকে মত্র কয়েক মাসের মধ্যেই আয়ত্বে আনার ঐতিহাসিক ঘটনার প্রশংসা না করে পারেন না।

মোটকথা মুহাম্মদ বিন্ তুঘলকের সামগ্রিক জীবনী আলোচনা করে আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারি, তিনি একদিকে যেমন আদর্শ বাদশাহ, উন্নতচরিত্র সাধক, প্রতিভাশালী শাসক, যুগোত্তীর্ণ পণ্ডিত, অসাধারণ বক্তা ও অতুলনীয় দাতা ছিলেন তেমনি অপর দিকে তর্ক শাস্ত্র জ্যোতিষবিদ্যা, দর্শন, গণিত এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানেও তাঁর বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য ছিল। বারণী বলেছেন, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় মুহাম্মদ ছিলেন 'সৃষ্টির বিস্ময়'। বাদাউনী তাঁকে 'বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ' বলেছেন। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেছেন-'Muhammad Tughlak was unquestionably the ablest man among he crowned heads of the Middle ages.' অর্থাৎ মধ্যযুগের রাজা বাদশাহদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন মুঘলক প্রশ্নাতীতভাবে সর্বাধিক সুযোগ্য সুশাসক ছিলেন।

তাঁর সময়ের হিন্দুদের লেখা হতেও পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তৎকালীন হিন্দু প্রজারা সুলতানের উপর খুব ভাল ধারণা পোষণ করতেন। চৌদ্দ শতকের শেষের দিতে বিহারের বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের লেখা বিখ্যাত বই 'পুরুশা পরিশকা'তে মুহাম্মদ বিন মুঘলকের অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছে। (Vidyapati Thakur's Purusa Pariska P. 20-24)

১৩২৭ খৃষ্টাব্দের শ্রীরাধারানী ব্রাহ্মণের বই-এ মুহাম্মদ বিন মুঘলকের রাজত্বকে 'হীরা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁকে সাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। (Catalogue of the Delhi Museum of Archaeology : J. P. Vagel. Calcutta 1908, P. 29)

আজায়েবুল আসফার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সুরতান মুহাম্মদের হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রয়াস ও উদারতার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠা হতে জানা যায়, রতন নামে জনৈক হিউকে তিনি সিন্ধু প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন।

এমনিভাবে মহাপণ্ডিত হাফেজে-কুরআন মুহাম্মদ বিন্ তুঘলক তাঁর হিন্দু-মুসলিম প্রজাবৃন্দের মধ্যে এক মিলন ঐক্য গড়ে তুলে মূল ইতিহাসে চির অমর ও অক্ষয় হয়ে আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণ ইতিহাসে তিনি আজ তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মোঘল আলোচনার পূর্বকথা

যদুনাথ সরকারের মতে, মোগল শাসকরা ছিলেন স্বরতন্ত্রী, তাঁদের লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং উচ্চ আদর্শহীন-কথাগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল আলীম সাহেব তাঁর ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে'র ১২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। অবশ্য লেখক এ মতের সমর্থক নন।

বাবর হতে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সম্রাটদের আমরা বা সরকার মশায় কেউই দেখিনি। শুধুমাত্র মূল কাগজপত্র দেখে, তার বিচার করতে হয়। বেচারা যদুনাথ সরকার তাঁর মোঘল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পুস্তকের ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন মূল ইতিহাসে তার বিপরীত জিনিসই পাওয়া যায় এবং তার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, মোঘল শাসন ছিল অত্যন্ত জনহিতকর এবং নিরপেক্ষ (দ্রষ্টব্য হুসাইনি ঃ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন আন্ডার দি মুঘলস, পৃঃ ২৩)। তাহলে যদুনাথ সরকার ইংরেজদের আমলে উল্টা করে লিখলেন কেন? অবশ্য এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, যাঁরা তাঁকে স্যার উপাধি দিয়েছেন তাঁদের মর্যাদার প্রতি তিনি অন্যায় কিছু করেন নি।

প্রত্যেক মোঘল সম্রাটই অমুসলমানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নিয়োগ করতেন। (বাইহাকীর লেখা তারিখী বাইহাকী এবং ইলিয়ট ও ডওসনের লেখা হিষ্ট্রী অফ ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় খাণ্ডের ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

স্যার যদুনাথ মোগলদের সর্বাপেক্ষা দুর্বল, কালের পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করতেও অগ্রগতির উন্নতি সাধনে ব্যর্থ বলে উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য যদুনাথ সরকার ঃ মুঘল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, পৃষ্ঠা ৯)। এ পুস্তকে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, মোগলেরা ছিল স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক (পৃষ্ঠা ১১)। অথচ মূল ইতিহাসে রয়েছে, মোগলেরা বিচার বিবেচনার ক্ষেত্রে জাতি, আত্মীয়, কর্মচারী, বন্ধু বান্ধব বা অন্য কারো পদমর্যাদার প্রতি কোনও রকম দুর্বলতা দেখাতেন না। (শরণের লেখা প্রভিনশিয়াল গভর্ণমেন্ট পুস্তকের ৩৬৭ পৃষ্ঠা; তুজুক্ই জাহাঙ্গীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২১১ পৃষ্ঠা এবং রজার ও বেভেরিজের 'মেমোয়ারস অফ জাহাঙ্গীর' দ্রষ্টব্য)।

সুমহান সম্রাট বাবর

এশিয়ার বিখ্যা দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুরলঙ্গ ও মাতার দিক দিয়ে চেঙ্গিস খাঁর রক্তসন্ধিক্ষণে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বাবর।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্বন্ধে ইতিহাসে অনেক মিথ্যাকে সত্য ও অনেক সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবরিত করা হয়েছে যার আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহ তুঘলক বংশের মর্যাদা বা পূর্ব সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সক্ষম হননি। সে সময় ইবরাহিম লোদীর সাথে আফদান সামন্তদের বিবাদ-কোন্দল খুব জোরালো রূপ ধারণ করে। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী ইবরাহীম রোদীকে পরাজিত ও পদচ্যুত করার জন্য বাবরকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি বার হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গেলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথে যুদ্ধ হয় বাবরের সাথে ইবরাহিমের বিপক্ষে লক্ষাধিক সৈন্য থাকা সত্ত্বেও বাবর দারুণভাবে জয়লাভ করলেন। ইবরাহিমের ভরসা ছিল তাঁর সৈন্যাধিক্যের উপর, আর বাবরের ভরসা ছিল অদৃশ্য এক শক্তির উপর। বাবর সারারাত্রি নামায শেষে সৈন্যদের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং সার কথা জানালেন ঃ জয় পরাজয় সব আল্লাহ্‌র হাতে, তবে আমাদের প্রাণপণে লড়তে হবে। এ অসাধারণ ব্যক্তির কান্না বিফল হয়নি। যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করেছিলেন।

বাবর সম্বন্ধে আমরা জানি যে, তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ন্যূনতম নামায বা পঞ্চোপাসনার তিনি অবহেলা করতেন না। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ একজন প্রকৃত মুসলমানের মতই ছিল। দাড়িও তিনি নবীর সুন্নাত মতই রাখতেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, বীরত্ব, বিচার ক্ষমতা, ও দানশীলতা ও ধৈর্যের পরিচয় প্রকৃত মূল ইতিহাসে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। ভারতীয় অনুবাদেও অবশ্য তা দেখা যায়, কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর মদপানের দোষ ছিল বলে অভিযোগ করেছেন। অথচ এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অবিশ্বাস্য।

তিনি একজন অসাধারণ মুসলমান ছিলেন। আধ্যাত্মিক শক্তিরও অধিকারী ছিলেন তিনি। প্রমাণ স্বরূপ একটি ঘটনা দিয়ে বলা যায়, তাঁর পুত্র হুমায়ূন যখন মৃত্যুযোগ্য অসুখে শয্যাশায়ী তখন তিনি তাঁর শয্যার পাশে দু হাত তুলে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে কেঁদে বলেছিলেন, হুমায়ুনের সুস্থতা ও আয়ু বৃদ্ধির জন্য। যে রাজকুমারকে রাজচিকিৎসকরা 'মৃত্যুরোগ' বলে জবাব দিয়েছিলেন সে রাজকুমার হুমায়ূন মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের মত সুস্থ্যতা বোধ করলেন, ধীরে ধীরে উঠে বসলেন, কথা বললেন এবং পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করলেন। যাঁ

Goto List

ডাকে আল্লাহ্ মুহূর্তের মধ্যে সাড়া দেন–অর্থাৎ রোগী সুস্থ হয়, তিনি যে নিশ্চয়ই অসাধারণ উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান তাতে সন্দেহ নেই। আসুন দেখা যাক কিভাবে বিকৃত করা হয়েছে এসব নির্মল চরিত্রের ঐতিহাসিক পুরুষদের চরিত্র!

বাবর জানতেন তাঁর সৈন্যদের মধ্যে অনেকে মদপান করতেন, যা, ধর্মে মহাপাপ। তাই যুদ্ধের পূর্বাহ্নে মদপানের বিরুদ্ধে তাঁদের জোর করে ক্ষেপিয়ে না তুলে বার হাজার সৈন্য সহ আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ্ তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর জীবনে মদ পান করব না, পূর্ব অপরাধ ক্ষমতা কর এবং তার পরিবর্তে যুদ্ধে ইজ্জত রক্ষা কর। এ বলে জোরে জোরে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন বাবর। তাতে সমস্ত সৈন্যদের ভাবান্তর হয় এবং তাঁদেরও বেশির ভাগের চক্ষু অশ্রুপ্লুত হয়। দলের মধ্যে যারা মদপানে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা সকলেই সেদিন হতে মদপান ত্যাগ করেন। এটা বাবরের সুন্দর ধর্মীয় কৌশল বা কঠিন কূটনীতির নিদর্শন বল যায়। এ ঘটনা দ্বারাই অনেক ঐতিহাসিক মনে করে বাবার নিজেও মদপায়ী ছিলেন। কিন্তু তা একেবারেই ভুল। বাস্তবিক তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান উপাসক মুসলমান।

মুসলমানদের ইতিহাস বিকৃতকরণের মূল নায়ক যদি ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তবুও অনেক সত্যের সন্ধান ও স্বীকৃতি-চিহ্নও তাঁদের লেখায় পাওয়া যায়। যেমন জানা যায় সুলতান ইবরাহিমের সাথে বাবরের যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞানপূর্ণ ও বীরত্বপূর্ণ, যাতে ইবরাহিম সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। মিঃ আর ব্রুক লিখেছেন, "Babur had definitely seated himself upon the throne of Sultan Ibrahim and the sign and seal of his achievements had been the annihilation of Sultan Ibrahim's most formidable antagonist." যার অর্থ হল, নিশ্চিতভাবে নিজেকে ইবরাহিমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন এবং তাঁর কৃতিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল ইবরাহিমের প্রবল শত্রুর বিলোপ সাধন।

মিঃ ভিনসেন্ট স্মিথ বাবরের প্রশংসা করে বলেছেন, "The most brilliant Asiatic prince of his age and worth of high place among the sovereigns of any age or country." যার মর্মার্থ হলো, 'এশিয়ার তদানীন্তন রাজাদের মধ্যে বাবর ছিলেন খুব উন্নত এবং যে কোন যুগ অথবা যে কোন দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একজন সম্রাট।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, রাজনীতি এবং কূটনীতিতেও তিনি খুব পটু ছিলেন। মিস্টার লেইনপুলও বলেছেন, "He is the link between central Asia and India."

বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের অনেক দোষত্রুটিও বর্ণনা করতে দ্বিধা করেননি। এটা তাঁর সততার পরিচয় বলা যায়। এ মহান মানুষটির সাথে স্রষ্টার মহামিলন অর্থাৎ পরলোকগমন হয় ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে।

তুরকী ভাষায় বাবর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। বাবর সম্বন্ধে ইতিহাসে খুব বেশি বিকৃতি ঘটান হয়নি; তবে মদপানের ব্যাপারটি বেশ মারাত্মক। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন, মদপান তত দোষের নয়–যদি হত তাহলে অত বড় সুনাম, বিজয় আর অলৌকিকতা পরিলক্ষিত হত না বাবরের জীবনে। কিন্তু সূক্ষ্ম সমীক্ষক ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কাছে তা ঠিক নয়। অসত্য বা অঘটিত ঘটনাকে সত্য ঘটনা বলে চালান কুপ্রয়াস অন্যত্র থাকলেও থাকতে পারে।, ইতিহাসে থাকবে কেন? (হুসাইনীর লেখা মোঘল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও আরও মূল্যবান তথ্য বাবর নামায় দ্রষ্টব্য)

সম্রাট হুমায়ুন

বাবরের পুত্র সম্রাট হুমায়ুন ২৩ বছর বয়সে পিতাকে হারান। হুমায়ুনও সাধু চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চেহারা ও পোশাক পরিচ্ছদ পিতার মতই ছিল। তিনি ছিলেন নবী (সাঃ)-এর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। ১৫৩০ থেকে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাদশাহ ছিলেন। তিনি একজন পরহেযগার মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তাঁকে আফিমখোর বলে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি একজন বিশিষ্ট বীর ও নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। কঠিন রোগমুক্তির পরেই পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত হুমায়ুন দেখলেন, গুজরাটে বাহাদুর শাহ নামে এক প্রতাপশালী রাজা নিজ শক্তি বৃদ্ধি ও রাজ্যসীমা বৃদ্ধিতে চলমান, অন্যদিকে বিহারে পাঠনবীর শের আফগান প্রচল শক্তিতে দন্ডায়মান। বাহাদুরের বিরুদ্ধে হুমায়ুন যুদ্ধ করে তাঁকে পরাস্ত করলেন। তারপর বিপুল বিক্রমে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে শের আফগানকে পরাস্ত করার চেষ্টা করলে, কিন্তু নিজেই পরাজিত হলেন। আসলে এ যুদ্ধ ধর্মের জন্য বা শৃঙ্খলার জন্যে ছিলনা, যুদ্ধে ছিল শুধু বংশীয় মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন। তাই ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে আবার উভয়ে যুদ্ধ করলেন এবং শের আফগান দিল্লি ও আগ্রা দখল করলেন। একথা সঠিক যে শের আফগানের ধর্মগুণ, বীরত্ব, মহত্ব, চরিত্র, কূটনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হুমায়ুন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না বরং উৎকৃষ্টই ছিল। যাই হোক, হুমায়ুনকে পারস্যে পলায়ন করতে হয়। এ দুরবস্থার মধ্যে অমরকোট নামক স্থানে আকবর নামে তাঁর এক পুত্রের জন্ম হয়।

পারস্য সম্রাটের সাহায্য পেয়েই হুমায়ূন ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন দিল্লি ও আগ্রা দখল করে পূর্ব মর্যাদা ফিরিয়ে আনলেন। বিজয়ী হবার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি তাঁর লাইব্রেরীতে সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে পড়ে আহত হন। আল্লাহ্র নাম বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন আর জানালেন সকলকে শেষ বিদায়। সেটা ছিল ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ।

উদারতা এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার হুমায়ূনের চরিত্রগত গুণ ছিল। একবার হুমায়ুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ফলে প্রাণ বাঁচান দায় হয়েছিল। সে সময় এক ভিস্তিওয়ালা তাঁর ছাগল-চামড়ার ভিস্তিটি তাঁকে সাঁতার কেটে পৌঁছে দিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করে উপকার করেছিলেন। হুমায়ুন বলেছিলেন, 'আমি যদি দিল্লীর সিংহাসন পাই তুমি দেখা করবে, আমি তাই-ই উপহার দেব যা তুমি চাইবে।' যখন হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পেলেন সে সময় ছেঁড়া ময়লা জামা পরিহিত কাঁধে ছাগল-চামড়ার ভিস্তি নিয়ে ভিস্তিওয়ালা হুমায়ুনের ফটকপ্রহরীকে প্রস্তাব করলেন, 'আমায় বাদশাহর কাছে যেতে দাও।' প্রহরী ক্রুদ্ধ হয়ে গুপ্তচর অথবা পাগল মনে করে আটক রেখে বাদশাহকে জানাতেই কর্মরত হুমায়ুন জানালেন, 'খুব সম্মানজনকভাবে একেবারে আমার কাছে নিয়ে এস।' অদ্ভুত ভেবে ভিস্তিওয়ালা রাজপ্রাসাদে হুমায়ুনের কক্ষে প্রবেশ করতেই হুমায়ুন ছুটে গিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আমি আপনার দ্বারা উপকৃত। বলুন আপনি কি চান? আমি ইনশাআল্লাহ্ বিনা দ্বিধায় আপনাকে তাই দেব।' ভিস্তিওয়ালা বলেন, 'আমি চাই তোমাকে সরিয়ে সিংহাসনে বসতে।' সমস্ত সভাসদ অবাক। হুমায়ুন মাথার মুকুট খুলে ভিস্তিওয়ালার মাথায় পরিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে সভাসদকে জানিয়ে দিলেন, 'আজ থেকে ইনিই বাদশাহ। আমি এঁর নগণ্য খাদেম।' গোটা দিল্লিতে তোলপাড়। হুমায়ুন বহুভাবে জিজ্ঞাসিত হলেন কেন তিনি এরকম করলেন? হুমায়ুন উত্তর দিলেন, 'পবিত্র কুরআনে আছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অবৈধ। আমি তো ডুবে মরেই যেতাম, তাঁর উপকারে তিনি যা চাইবেন তাই বলে অস্বীকার করেছিলাম। যাই হোক, এক দিন এক রাত্রি যাপনের পর মহামান্য ভিস্তিওয়ালা হুমায়ুনকে

আলিঙ্গন করে তার মাথায় আবার মুকুট পরিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে হাত তুলে দোয়া ও করমর্দন করে বলে গেলেন৷ 'আমি বড় পুরস্কার পেয়েছি, তা হচ্ছে আপনার মানবতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা।'

আর একবার বিধবা রাণী কর্ণবতী তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে রাজ্য সামলাতে পারছিলেন না। ঠিক সে সময় তাঁকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি চলে। তিনি তখন কয়েক গাছি সূতার বৃত্তাকার, যাকে 'রাখী' বলা হয়, পাঠিয়ে হুমায়ুনকে লিখেছিলেন, 'আমি আপনাকে ভাই হিসেবে এ রাখী পাঠালাম, আপনি হাতে পরবেন এবং আমাকে বোন হিসেবে ও আমার শিশুপুত্রকে ভাগ্নে হিসেবে সসৈন্যে এসে রক্ষা করবেন।' হিন্দু রমনীর সে সূতা হুমায়ুন অশ্রু সজল নয়নে হাতে পরলেন এবং স্বয়ং একদল সৈন্য নিয়ে হিন্দু বোন ভাগ্নে আর তাঁদের রাজ্য রক্ষা করতে। একটি যুদ্ধ যাত্রায় লাখ লাখ টাকা খরচ–কিন্তু তা অল্প মূল্যের সুতার চেয়ে কম দাম মনে করে দীর্ঘদিন পর পৌঁছালেন সে বোনের রাজ্যে। কিন্তু তাঁর পৌঁছাবার পূর্বেই রাণী ভয়ে ভীত হয়ে বিষপান করে দেহত্যাগ করেছিলেন। হুমায়ুন সে সংবাদে এত কেঁদেছিলেন যে হঠাৎ কেহ দেখলে অবাক না হয়ে পারত না– একজন প্রাপ্ত বয়স্ক বীর বাদশাহ তাঁর পাতান বোনের জন্য এমন শিশুর মত কাঁদতে পারেন। ঠিক এ সুযোগেই শেরশাহ শক্তি সঞ্চয় করে হুমায়ুনকে পরাস্ত করে দিল্লী ও আগ্রা দখল করেছিলেন। (শিবরতন মিত্রের লেখা 'প্রসাদ কুসুম' দ্রষ্টব্য)

অতএব এরকম এক মহান বাদশাহের চরিত্রে আফিমখোরের অভিযোগ আরোপ করে ইতিহাসের পাতাকে যেভাবে কলুষিত করা হয়েছে তা আজ আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ কোন সন্দেহ নেই।

(হুমায়ুনের পুত্র আকবর ১৫৫৬ – ১৬০৫ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ সম্পর্কে আধুনিক গবেষণামূলক সুদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে এটা আওরঙ্গজেবের পাশাপাশি আলোচিত হবে।)

সম্রাট শের শাহ

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ হতে ১৫৪৫ পর্যন্ত শের শাহ রাজত্ব করেন। এ অল্প সময়ের মধ্যেই শুধু যুদ্ধ নয় সর্ববিষয়ে তিনি যে রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা চমকপ্রদ। তিনি গোটা রাষ্ট্রকে কতকগুলো প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটি সরকার, প্রত্যেক সরকারকে আবার কয়েকটা পরগণায়, প্রত্যেক পরগণা কতকগুলো গ্রাম নিয়ে গঠিত হত। প্রদেশের শাসককে বলা হত ইকতেদার। ইকতেদারের অধীনে ছিলেন 'সিকদার-ই-সিকদারান। রাজস্ব ও বিচার বিভাগের নেতা ছিলেন 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান। এমনিভাবে মুনসিফম, ফোতাদার, কারকুন, আমিন, দেওয়ান প্রভৃতি প্রচুর পদ বিন্যাস করেছিলেন, আর সব উপরে ছিলেন শের শাহ স্বয়ং। তাঁর চারজন বিশিষ্ট মন্ত্রী ছিলেন চারটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চারজনই ছিলেন নিজের বিভাগের সুপণ্ডিত এবং সৃজনী শক্তিধর–(১) 'দেওয়ান-ই-ওজারত' বা রাজস্ব মন্ত্রী, (২) 'দেওয়ান-ই-রিসালাত' বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী (৩) 'দেওয়ান-ই-আরজ' বা সামরিক বিভাগের মন্ত্রী ও (৪) 'দেওয়ান-ই-ইনসা বা দলিল ও ভূমন্ত্রী। সমগ্র রাষ্ট্রের জমি জরিপ, প্রজাদের 'পাট্টা' এবং কবুলিয়াত দান, শস্য হতে কর প্রদানের সুবিধা দান এবং ভারতে চিঠিপত্র আদান প্রদান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রথম চালু হয় এ শের শাহের আমলেই। ভারতীয় মুদ্রা 'তঙ্কা'কে রূপেয়া নাম তাঁরই দেয়া। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, শের শাহ নীচুতলা থেকে উপরতলা পর্যন্ত যে শাসনব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা আজও শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বের কোথাও সামগ্রিকভাবে কোথাও বা আংশিকভাবে

প্রচলিত রয়েছে। শের শাহের শাসনব্যবস্থা এত সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ ছিল যে তখন নিরাপত্তার জন্য কাউকে ঘরে খিল লাগাবার বা তালা লাগাবার প্রয়োজন হত না। রাস্তায় লুটপাট বা ছিনতাই তিনি বন্ধ করেছিলেন। ছোট বড় অনেক রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত নির্মিত বিখ্যাত রাস্তার ধারে ধারে বরাবর হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের জন্য পৃথক পৃথক সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। সে রাস্তার ধারে বসেই আজ চেপে রাখা ইতিহাস লিখছি। এ বড়ই পরিতাপের বিষয় ঐতিহাসিক রাস্তাটির নাম শেরশাহ রোড না হয়ে ইতিহাসের পাতায় তার ইংরেজি নাম হয়েছে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড–যেখানে শের শাহ নামের চিহ্নমাত্র নেই।

তিনি একবার বলেছিলেন, "যদি আমার 'হায়াত' (আয়ু) আল্লাহ্ আরও বাকি রাখেন তাহলে আমি এমন একটা রাস্তা তৈরি করতে চাই যেটা ভারত হতে স্থলপথে একেবারে আরব দেশের মক্কা শরীফ পর্যন্ত লম্বা হবে, যেটার উপর দিয়ে আমার ভারতীয় যে সাধ পূরণ হয়নি। হঠাৎ একদিন বারুদের স্তূপে আগুন লেগে তিনি তাতেই মৃত্যু বরণ করেন। এ মহৎ ও চরিত্রবান বাদশাহের জন্য শ্রীবিনয় ঘোষ ভারতজনের ইতিহাসে ৩৯৪ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তাতে তিনি ইসলাম ধর্ম অমান্যকারী ছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে–"সম্রাটই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত শক্তির আধার ও উৎস এ রাজত্ব শেরশাহও মানিতেন।" উপরোক্ত কথা আদৌ সত্য নয়, কেননা কোনও মুসলমান এ রকম ধারণা রাখতে পারে না।

মোঘল সাম্রাজ্য কয়েক মাসের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেত যদি সম্রাট শের শাহ রাজ্য চালানর পথ প্রস্তুত করে না যেতেন। সুতরাং আধুনিক চিন্তাশীলদের কাছে এটা সুস্পষ্ট যে, আকবরের রাজত্ব ও তাঁর স্থায়িত্ব পরোক্ষভাবে শের শাহের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

শের শাহ হুমায়ুন অপেক্ষা আরও শক্তিশালী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু না হলে মোঘল ইতিহাসের ধারা অন্য পথে প্রবাহিত হত। একথা ইংরেজ ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন–"If Sher Shah had been spared he would have established his dynasty and the Great Mughals would not have appeared on the stage of history." V. Smith Oxford History of India.

তিনি জনগণের ইচ্ছার প্রতি দৃষ্টি রেখে জনগণের সহযোগিতায় বিশাল সাম্রাজ্য গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে মিঃ ডবলিউ ক্রুক বলেছেন–"Sher shah was the first who attempted to found an Indian Empire broadly based upon the people's will" যার মর্মার্থ হল, তিনি সর্বপ্রথম জনগণের ইচ্ছা ও সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে ভারতে একটি সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

পরিশেষে বলি, 'মহামতি' উপাধিটির যোগ্য পাত্র শেরশাহ, কিন্তু তা না করে আকবরকে দেয়া হল এ উপাধি। আকবরের শাসন প্রণালী নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু তা কি শেরশাহের অনুরূপ ছিল না? তবুও আকবরকে কেন উপাধি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে তার চমকপ্রদ আলোচনা পরে আসছে।

Goto List

সম্রাট জাহাঙ্গীর

আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভ করেন। তিনি চরিত্রে, চেহারায়, পোশাক-পরিচ্ছদে পুরোপুরি ইসলাম বিরোধী ছিলেন।

মুজাদ্দিদ আলফেসানী হযরত আহমদ সাহেবকে তিনি কারাগারে বন্দী করেছিলেন। কারণ আকবরের মতের বিরুদ্ধে অভিযান তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন এবং আকবরের নূতন ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রকারান্তরে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন এ আলফেসানী সাহেবই।

দেখা যায় পৃথিবীর বেশির ভাগ নবী রাসূলগণ দরিদ্র হয়েও হাজার হাজার শিষ্যের নেতা আর যাঁর হাতে ছিল সারা ভারতের চাবিকাঠি, যিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, সারা জীবনে তাঁর মাত্র ১৮ জন শিষ্য–তাও তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই বিকল ধর্মের অচল অবস্থা। এর পিছনেও হাত ছিল শিরহিন্দের হযরত মাওলানা আহমদ মুজাদ্দিদ আলফেসানীর ধর্মীয় প্রচার অভিযানের।

(১) জাহাঙ্গীরকে আশফজাহ পরামর্শ দিলেন, বাদশাহী কর্মচারী উজীর নাজীর যেভাবে মুজাদ্দিদ আহমদ সাহেবের শিষ্য হতে শুরু করেছেন, তাতে একদিন রাজনৈতিক বিপ্লব আসতে পারে, তাই তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। মদ্যপ জাহাঙ্গীর বড় বড় সেনাপতি ও রাজকর্মীদের তাঁর পরামর্শে দূরে দূরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মুজাদ্দিদ আহমদ সাহেবকে রাজ দরবারে আসতে সংবাদ পাঠালেন। তিনি জানতেন জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রত্যেককে সিজদা বা প্রণিপাত করতে হত, আর করতে হত সম্মুখে নত হয়ে, দুহাত কপালে ঠেকিয়ে কুর্নিশ। জেনে শুনেই আহমদ সাহেব জাহাঙ্গীরের দরবারে ঘৃণাভরে সদর্পে মাথা উঁচু করে গিয়ে দাঁড়ালেন। জাহাঙ্গীর জানতে চাইলেন তিনি দরবারের আইন অনুসারে সিজদা বা কুর্নিশ করলেন না কেন? আর অন্ততঃ আসসালামু আলাইকুমও তো করতে পারতেন? কপর্দকহীন হযরত আহমদ সাহেব বলেন, 'আমি জাহাঙ্গীরের দরবারের ভৃত্য নই, আমি আল্লাহ্‌র দরবারের ভৃত্য। তাই তাঁর আইন আমার কাছে আইন, বাকি সব কিছু আমার কাছে বেআইন। আর তোমাকে সালাম দিই নাই এ জন্য যে তুমি অহঙ্কারী, হয়ত উত্তর দেবে না। তখন আমার সালাম দেয়ার অর্থ হবে প্রিয় নবীর একটা সুন্নাতকে পদদলিত করান।'

জাহাঙ্গীর রেগে তাঁকে বন্দী করে গোয়ালিয়র দুর্গের কারাগারে পাঠান। এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই জাহাঙ্গীরের উপর লোক আরও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। মহব্বত খাঁন কাবুলে জাহাঙ্গীরের কর্মী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনিও মুজাদ্দিদ সাহেবের শিষ্য। তাই ক্রোধে আগুন হয়ে তিনি বিদ্রোহ করলেন। শুধু তাই নয়, নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন এবং জাহাঙ্গীরকে বন্দী করলেন। এদিকে মুজাদ্দিদ সাহেব মহব্বত খাঁনকে জাহাঙ্গীরের সাথে ভাল ব্যবহার করতে জানালেন এবং তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে বললেন। মহব্বত খাঁন তাই করলেন।

(২) জাহাঙ্গীর এবার মুজাদ্দিদ সাহেবকে সসম্মানে দরবারে আমন্ত্রণ জানালেন, কিন্তু মুজাদ্দিদ সাহেব জানালেন তাঁর কতকগুলো শর্ত পালন করলে তবে জাহাঙ্গীরের সাথে তিনি সাক্ষাত করতে পারেন, নচে দেখা হবার কোন উপায় নেই।(ক) দরবার হতে ইসলাম বিরোধী সিজদা ও কুর্নিশ প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে, (খ) ধ্বংস করে দেয়া মসজিদগুলো পুনর্নির্মাণ করতে হবে, (গ) যুদ্ধকরের পুনপ্রবর্তন করতে হবে, (ঘ) জাহাঙ্গীরকে নিজে ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী চলতে হবে এবং রাজ্যও ইসলামের আইনমত চলবে এব (ঙ) বিচার আগের মতই কাজী বা মুফতি, মৌলবীরা করবেন (১ ও ২ নং তথ্য Mujaddid's Conception of Tawhid গ্রন্থের ১৬ -১৭ পৃষ্ঠা হতে নেয়া)। জাহাঙ্গীর সমস্ত শর্ত মেনে

নিলেন, নিজে মুজাদ্দিদ সাহেবের শিষ্য হলেন এবং মদপান পরিত্যাগ করলেন। পাঁচবার নামায, কুরআন পাঠ প্রভৃতি শুরু করলেন। মুজাদ্দিদ সাহেবকে প্রধান পরামর্শদাতা করে মদ্যপ চরিত্রহীন ধর্মত্যাগী জাহাঙ্গীর ইসলামের স্নিগ্ধ আলোকে নব শিশুর মত নির্মল জীবন আরম্ভ করলেন। মাত্র পঞ্চাশ বছর তঁর এ নূতন জীবন স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। তিনি নূরজাহানকে পূর্বের মত প্রকাশ্য ভূমিকা পালন করতে নিষেধ করলেন। একটি কূপের মত গর্ত করে সেটা সোনা রূপার টাকা দিয়ে ভর্তি করলেন। তা থেকে জাহাঙ্গীর দীন, দুঃস্থ, অনাথ, বিধবা হিন্দু মুসলমান প্রজাদের দান করতেন।

একদিন যে জাহাঙ্গীর ছিলেন নূর জাহানের হাতের পুতুল, প্রজাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের কোন অবকাশ ছিলনা, আজ তিনি মুজাদ্দিদ সাহেবের পরামর্শে দরবারের বাইরের ফটকে একটি শিকল রাখলেন, যেটি একবারে জাহাঙ্গীরের শয়নকক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আর সাথে একটা ঘণ্টা বাঁধা ছিল। যে কোন অত্যাচারিত, উপাবাসী, অবহেলিত বা রাজকর্মচারিদের দ্বারা যাঁরা কাজ সমাধা হয়নি এমন মুসলমান-অমুসলমান প্রজা সে শিকল টানলেই বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁকে সাথে সাথে কক্ষে ডাকতেন এবং তার সন্তোষজনক সমাধা করে তবে ক্ষান্ত হতেন।

একদিন রূপ লাবণ্যের জীবন্ত প্রতীক নূর জাহান আয়নার সামনে তাঁর রূপচর্চা করছিলেন। এমন সময় এক বিকৃত মস্তিষ্ক হিন্দু প্রজা কেমনভাবে একেবারে নূরজাহানের কক্ষে উপস্থিত, হয়ে পড়েন। নূরজাহান সাথে সাথে তাকে গুলি করলে হিন্দু প্রজা মারা যান। মৃতের আত্মীয় শিল টানলেন এবং জাহাঙ্গীরের কাছ বিচারপ্রার্থী হলেন নূরজাহানের বিরুদ্ধে। জাহাঙ্গীর তাঁর প্রিয়তমা বিশ্ব সুন্দরী নূরজাহানের বিচার করে রায় দিলেন—প্রাণদণ্ড। সকলেই অবাক হলেন। সেদিনের জাহাঙ্গীর আর আজকের জাহাঙ্গীরের মধ্যে অনেক দূরত্ব, অনেক ব্যবধান; আগে ছিলেন ধর্মমুক্ত রাজা আর এখন হচ্ছেন ধর্মযুক্ত বাদশাহ। সারা ভারতে সব থেকে যিনি বেশি অবাক হয়েছিলেন তিনি তাঁর সহধর্মিণী নূরজাহান। নূরজাহান কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'হে স্বামী, পুরানা দিনের কোন কথা কি আপনার মনে নেই! আমার প্রেম, ভালবাসা, মায়া, সেবা, সমস্ত কিছু একটু মনের তুলাদণ্ডে কি ওজন করলে হত না?' জাহাঙ্গীর চোখ ভরা অশ্রু নিয়ে বলেন, 'প্রিয়া নূরজাহান আমি আমার মনের তুলাদণ্ডে তোমার সারাজীবনের সবকিছু এক পাল্লায় চাপিয়েছি, আর অন্য পাল্লায় চাপিয়েছি হযরত মুহাম্মদের (সঃ) আইনকে; বারে বারেই আমার কাছে ভারী হয়েছে ইসলামের আইনের নির্দেশ। ইসলামের আইনে তুমি তাকে হত্যা করতে পারতে কারোর প্রাণনাশের বা ব্যাভিচারের অপরাধে, কিন্তু সে দোষ তো তার ছিল না। সে ছিল বিকৃত মস্তিষ্ক। অতএব আবার বলছি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত—তোমার প্রাণদণ্ড।' বিচারপ্রার্থী স্বপ্ন দর্শকের মত নাটকীয় ইসলামী বিচার ব্যবস্থা দেখে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'হে বাদশাহ আমরা আর প্রাণদণ্ড দেখতে চাই না, নূরজাহানকে আমরা ক্ষমা করলাম। আমরা আজ বুঝলাম ইসলাম সত্যিই শান্তি ও সত্যের নিরপেক্ষ ধর্ম।'

কান্নাপুত নূরজাহান তাঁদেরকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিয়ে ও ক্ষমা ভিক্ষা করে তবে প্রাণ ফিরে পেলেন। (মইজুদ্দিনের লেখা আদর্শ জীবনের ১১২-১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

জাহাঙ্গীর একবার শিকার করতে গিয়ে পথ ভুলে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাড়িতে ওঠেন; বিধবা ব্রাহ্মণী তাঁকে কিছু আহার করান, তারপর তাঁর ছোট মেয়ে বাদশাহর হাতে একটি পত্র তুলে দেয়, যাতে লেখা ছিল ঃ 'বাদশাহ দীর্ঘজীবী হন, আমার কন্যা রেখে আমি মরে গেলে আপনি প্রতিপালন করবেন। বাদশাহ সে মেয়েকে কোলে তুলে আদর করে তার মৃত পিতার

জন্য অশ্রু ফেললেন আর সেদিন থেকে এ বালিকা ও তার মায়ের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করলেন। পরে একজন ব্রাহ্মণ সুপাত্রের সাথে বিয়ে দিলেন। এ রূপকুমারী নামক ব্রাহ্মণ কন্যার। অনেক টাকা পয়সা দিলেন বাদশাহ আর নূরজাহান নিজের দেহ হতে অনেক গহনা খুলে তাকে পরিচয় দিয়ে বললেন 'রূপকুমারী, আমি তোমার মা। তাইত তোমায় গহনা পরিয়ে আমার এত আনন্দ! এত তৃপ্তি!' (মইজুদ্দিনের লেখা পুস্তকের ১২৬-১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

জাহাঙ্গীরের চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছিল মাওলানা আহমদ শিরহিন্দির প্রভাবে। প্রায় ছয় বছর সম্রাট তাঁর পরামর্শে চলেছিলেন। যদি জাহাঙ্গীরের জীবনের গতি আহমদ সাহেব পরিবর্তন না করতেন তাহলে শাহজাহান, আওরঙ্গজেব হতে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ পর্যন্ত মুসলমান শাসকদের চরিত্রে কিছু মাত্র মুসলিম চিহ্ন থাকত বলে মনে হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, মুজাদ্দিদ আহমদ সাহেবের প্রভাব সারা ভারতে মুসলমান ও ইসলাম টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট সহায়ক ছিল। (দ্রঃ মাওঃ আকরাম খাঁর মোঃ বঃ সাঃ ইতিহাসের ১৪৯ পৃষ্ঠা; তাছাড়া জাহাঙ্গীরের পূর্ণ তথ্য জানতে তুজুকে জাহাঙ্গীরী গ্রন্থকে আকবর গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।)

সম্রাট শাহজাহান

১৬২৭ খৃস্টাব্দ হতে ১৬৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল। তখন বুন্দেলখণ্ডের আফগান সর্দার খাঁনজাহান লোদী বিদ্রোহী হলে সম্রাট তাঁকে দমন করে তারপর ১৬৩২ খৃস্টাব্দে আহমদনগর দখল করেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের তিনি শান্তিপূর্ণভাবে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তাঁরা যুদ্ধই পছন্দ করলে তখন সম্রাট একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। অবস্থা অশুভ বুঝে বিজাপুরের সুলতান বছরে ২০ লাখ টাকা কর দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্ধি করেন। এমনিভাবে ১৬৩৪ খৃস্টাব্দে বিজাপুরের আদিলশাহী ও গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী সুলতানদ্বয়ের সাথে সন্ধি করে শাহজাহান নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। এ সময় বঙ্গদেশে পর্তুগীজরা ঘাঁটি তৈরি করে বাণিজ্য ও অত্যাচারে বেশ উন্নতি করেছিল। তখন বাংলার সুবেদার ছিলেন কাসিম আলী খাঁ। সম্রাট শাহজাহানকে আদেশ দিলেন হুগলী অবরোধ করে পর্তুগীজদের যেন উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হয়। সম্রাটের আদেশে যুদ্ধ ঘোষিত হল। পর্তুগীজরা পরাজিত ও বহু নিহত হয় এবং অজস্র পর্তুগীজ বন্দী হয়ে আগ্রায় প্রেরিত হয়।

শাহজাহানের চেহারা পোশাক-পরিচ্ছদ একজন পূর্ণ মুসলমানের মতই ছিল এবং জাহাঙ্গীরের ধর্মীয় ভাবান্তর ও ইসলামে আত্মসমর্পণের ছাড়া শাহজাহানের উপরও পড়েছিল। তিনি যদি মাতাল, ধর্মহীন, দাড়ি মুণ্ডিত আকবরের মত বা জাহাঙ্গীরের প্রথম অবস্থার সাথে নিজেকে মেলাতে পারতেন তাহলে প্রচলিত ইতিহাসে তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ (?) থাকত না বরং তিনি বহু সুনামের অধিকারী হতে পারতেন। শ্রীবিনয় ঘোষ খৃস্টান লেখক মিঃ ভিন্সেন্ট স্মিথ প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর ইতিহাসে যা লিখেছেন তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ—"স্মিথ বলিয়াছে, এবং ঠিকই বলিয়াছেন যে, বাদশাহ শাহজাহানের ঐশ্বর্যবিলাস, স্থাপত্য প্রীতি, প্রাসাদ-দূর্গ, বিশেষ করিয়া তাজমহল নির্মাণ অনেককে অবাক করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই বিলাসিতার অন্তরালে অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নৃশংস হত্যালীলার কদর্যতা লুকাইয়া আছে" (ভাঃ জঃ ইঃ ৪৩১ পৃঃ দ্রঃ)। কিন্তু দাড়িওয়ালা সম্রাটকে সুস্পষ্ট ভাষায় চরিত্রহীন না বললে সরল পাঠক সহজে বুঝবেন না সেজন্য আবার লেখা হয়েছে, "মমতাজের মৃত্যু হয় ১৬৩১ খৃস্টাব্দে এবং তার পর জীবনের বাকি ৩৫ বছর শাহজাহান

Goto List

তাজমহলে সমাধিস্থ প্রিয় পত্নী মমতাজের ধ্যান করে কাটান নাই। স্মিথ বলিয়াছেন, 'during the remaining thirty five years of his life he disgraced himself by gross licentiousness.' বাকী ৩৫ বছর নির্বিচার উচ্ছৃঙ্খলতায় শাহজাহান নিজের জীবনকে কলুষিত করতে কুণ্ঠিত হন নাই।"

এ ব্যাপারে আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, মমতাজের মৃত্যু জনিত শোকে শাহজাহানের মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিয়েছিল এবং মমতাজের মৃত্যুর পর তিনি শুধু শোকে নয়, নানা শারীরিক ও মানসিক পীড়ায়ও পীড়িত ছিলেন। তাই দূরবর্তী শ্রেষ্ঠতম শাহজাদা আলমগীরের মূল্য নির্ধারণ করতে না পেরে নিকটবর্তী অপদার্থ দারাশেকোহকেই আশাতিরিক্ত স্নেহ ও সুযোগে সিক্ত করে তাঁকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

বস্তুত আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর লালকেল্লা, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, মোতি মসজিদ, দিল্লীর জুমআ মসজিদ, ময়ুর সিংহাসন প্রভৃতি শাহজাহানের অক্ষয় কীর্তি; যার সাথে তাঁর স্থাপত্যশিল্প প্রীতি ও ধর্মানুরাগী মনেরও পরিচয় বিজড়িত।

একবার শাহজাহান রাত্রে স্বপ্নে একটি মসজিদ দর্শন করলেন। ঘুম ভাঙ্গার পর তাঁর স্থপতিদের ডাকলেন এবং আদেশ দিলেন, 'আমার বর্ণনা অনুযায়ী আপনারা এ মসজিদের ছবি এঁকে আমায় দেখান।' সকলেই বহুরূপে বহুভাবে কল্পিত মসজিদের একটা করে ছবি আঁকলেন বটে, কিন্তু একটি ছবিও বাদশাহের মনের মত হল না। সে সময় মস্ত বড় এক সাধক বা দরবেশ খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। অবশেষে তাঁরই শরণাপন্ন হতে হল বাদশাহকে এ ছবির জন্য। দরবেশ বাদশাহকে জানালেন, 'আমার অপেক্ষাও বড় দরবেশ যিনি আপনার রান্না করেন।' বাদশাহ অবাক হয়ে দাড়িওয়ালা ছোট জামা পরা রাধুনিকে ডেকে ছবির কথা বলতেই তিনি বলেন, 'আমার চেয়ে বড় বুজুর্গ যিনি আপনার পায়খানা পরিষ্কার করেন।' বাদশাহ অবাক হয়ে মেথরকে ডেকে বলেন, 'আপনার মত মহান মানুষ নিজেকে গোপন রাখার এ কৃচ্ছ্র সাধনার উপর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আর ক্ষমা চাইছি আপনাকে এর আগে চিনতে না পারার জন্য।' মেথর ফকির তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে বলেন, "এটা মোফাত্তেশরা ইঞ্জিনিয়ার আঁকতে পারবে কেন? এটা যে বেহেস্তের মসজিদ।' মেথর ফকির একজন শিল্পীকে ডেকে আনালেন এবং নিজে একটি মসজিদের ছবি এঁকে তাঁকে দেখালেন। বাদশাহ খুব অবাক হলেন যে, এ ছবি তাঁর স্বপ্নে দেখা ছবির সাথে হুবহু সংগতিপূর্ণ। ফকির শেষ কথা বলেন, 'ভ্রাতঃ স্মরণ থাকে, যে ব্যক্তির কখনও নামায ক্বাযা হয় নাই কেবল তিনিই এ মসজিদের প্রথম প্রস্তরখানি প্রোথিত করবেন' (দ্রঃ রাজমুকুট, পৃষ্ঠা ১৩,১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত)। আরও কথিত আছে, এ ঘটনার পরের দিন হতে সে ফকিরকে আর লোকালয়ে দেখা যায়নি।

দিল্লির জুমআ মসজিদ নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনায় সম্রাট বহু আলেম সুফী আমির ওমরাহদের বলেন, আমি এমন লোক দ্বারা মসজিদের প্রথম ইট বসাতে চাই যাঁর বার বছর কোনদিন তাহাজ্জুদের নামায ক্বাযা হয়নি।' প্রতিদিন গভীর রাত্রে নিয়মিতভাবে এ নামায পড়া কঠিন কাজ; তাই নানা কারণে কেহ এগিয়ে আসলেন না। বাধ্য হয়ে বাদশাহ নিজেই প্রথম ইট বসালেন এবং কেঁদে ফেললেন, 'হে আল্লাহ্ আমি জানতাম না যে তুমি আমাকে এমনিভাবে প্রকাশ করে লজ্জিত করবে। হে আল্লাহ্ তোমার শোকর (কৃতজ্ঞতা) যে আমার বার বছর তাহাজ্জুদ বাদ যায়নি।' অনেকে প্রশ্ন করলেন, বাদশাহ দিল্লির শাহী মসজিদ এত উঁচু জায়গায় নির্মাণ করছেন কেন? উত্তরে সম্রাট বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমার ছোট বড় প্রজারা যখন উচ্চ স্থানে স্থাপিত মসজিদে আল্লাহ্‌কে সিজদা করবেন আমি তখন আমার প্রজাবৃন্দের পায়ের নীচে, অনেক নীচে কবরে তাঁদের দোয়ার ভিক্ষুক হয়ে প্রতীক্ষায় থাকব।' দিল্লীর বুকে আজও সে মসজিদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ আমাদের সূক্ষ্ম বিচারদণ্ড ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা করে দেখতে হবে যে, সারা ভারতের সর্বাধিনায়ক যে সম্রাট শাহজাহান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মমতাজকে কাছে বা পাশে পেয়েও, আল্লাহ্‌র স্মরণে তাঁর সমস্ত আকর্ষণ উপেক্ষা করেও তাহাজ্জুদে নামাযে নিমগ্ন হতে পারেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে উচ্ছৃঙ্খল, না তাঁরাই উচ্ছৃঙ্খল যাঁরা তাঁর চরিত্রের উপর মিথ্যা কলঙ্কের কালিমা লেপন করতে দ্বিধা করেন নি?

শাহজাহানের শাসনকালে দু-একটি বিদ্রোহ ছাড়া শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়নি। B.P. Saksena বলেন, "In Shahjahan's reign the Mughal Empire attained to the zenith of prosperity and affluence." অর্থাৎ শাহজাহানের রাজত্বকালে মোঘল সাম্রাজ্য সমৃদ্ধি এবং প্রাচুর্যের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। ডঃ ভি. স্মিথও বলেছিলেন—"Shahjahan's reign marks the climax of the Mughal dynasty and Empire."

'শাহজাহান তাঁর পিতার অপেক্ষা রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় অধিক সতর্ক ও যত্নবান ছিলেন' (দ্রঃ যদুনাথ সরকারের স্ট্র্যাডিজ ইন মুঘল ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ১৫)। ফরাসী ঐতিহাসিক ও পর্যটক তাভার্নিয়ের যা বলেছেন, তাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, শাহজাহান "রাজা হিসেবে প্রজাদের শুধু শাসন করা নয়, পরিবার এবং সন্তানদের পিতার ন্যায় তিনি প্রজা শাসন করিতেন।"

সম্রাট আওরঙ্গজেব

একপক্ষ বলেন, আওরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান, হিন্দুবিদ্বেষী এবং অত্যাচারী–প্রমাণ স্বরূপ ভ্রাতাদের হত্যা করা, বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করা এবং হিন্দু প্রজাদের ধর্মের নামে অত্যাচার করা যথা জিজিয়া কর নেয়া, হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র করা বা ভেঙ্গে ফেলা ইত্যাদি অনেক কিছুর উদাহরণ তাঁরা পেশ করেন। আর অপরপক্ষ বলেন, আওরঙ্গজেব বা আলমগীর সমস্ত মুসলমান নৃপতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, সমগ্র কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থকারী, আলেম, সাধক, নিরপেক্ষ, উদার দূরদর্শী এবং উপযুক্ত আদর্শ বাদশাহ ছিলেন। তিনি 'জিন্দাপীর' বলেও পরিচিত।

প্রথম পক্ষের বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য স্কুল, কলেজ ও ইউনিভারসিটির সাধারণ ইতিহাস যথেষ্ট। আমাদের অনেকের মগজে এবং কাগজেও তার প্রমাণের প্রাচুর্য অব্যর্থভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের উক্তি বহু দলির ও ঐতিহাসিক সমর্থন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্ত তর্ক ছাড়া মেনে নেয়া সম্ভব নয়; তাছাড়া উচিতও নয়।

এখানেও আমরা 'ভারতজনের ইতিহাস' হতে উদ্ধৃতি রাখব। ভারতের হাজার হাজার পাঠ্য পুস্তক ও ইতিহাসের উদ্ধৃতি দেয়াও যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য ইতিহাসের সমস্ত কথা বাদ দেয়া যায় না। প্রসঙ্গত হৃদয়ে গেঁথে নেয়ার মত একটা কথা হচ্ছে এটাই যে, শিশু অবস্থায় শিশুর কচি মনের কোমল স্মৃতিপটে যে ছবি আঁকা যায়, তা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে স্পষ্টতর ও আরও গভীর হয়ে মস্তিষ্ক আলোকিত করে তোলে। যদি মাথায় এ কথাটুকু প্রবিষ্ট হয় যে, আকবর 'মহামতি', তিনি হিন্দু মুসলমানকে সমান চোখে দেখতেন, আর আওরঙ্গজেব ধর্মভীরু পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তিনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন, হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ও ভাইদের হত্যা করে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন ইত্যাদি, তাহলে সাধারণতঃ বয়োবৃদ্ধির পর অন্যান্য ইতিহাস পড়লেও বাল্যকালের এ প্রভাবটুকু যে কাটিয়ে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। আজ নিরপেক্ষ চিন্তাশীল পাঠক পাঠিকাদের কাছে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ 'ভারতজনের 'ইতিহাস'-এর ৪৩৮পৃষ্ঠায় শ্রীবিনয় ঘোষ বলেছেন, (১) "শাহজাহানের মৃত্যুর আগেই ঔরঙ্গজীবের দুই বার রাজ্যাভিষেক হয় (জুলাই ১৬৫৮ ও জুন ১৬৫৯)। শাহজাহানের মৃত্যুর পর তৃতীয়বার ঔরঙ্গজীব মহাসমারোহে আগ্রার দুর্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন (মার্চ ১৬৬৬)। তিনবার অভিষেক কোন মোঘল সম্রাটের হয় নাই। কিন্তু ঔরঙ্গজীব যে মোঘল সম্রাটদের মধ্যে বহুদিক হইতে অদ্বিতীয় হইবেন, একাধিক অভিষেক হতে তারই আভাস পাওয়া গিয়েছিল।"

(২) "রাজপুতদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়, ঔরঙ্গজীব মারওয়াড় দখল করেন এবং নানাস্থানে মোঘল ফৌজদার নিযুক্ত করেন। তাঁর আদেশে হিন্দু দেবালয় ধ্বংস করে বহু মসজিদও প্রতিষ্ঠিত হয়।"

(৩) "১৬৭৯ খৃষ্টাব্দেই ঔরঙ্গজীব জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন।"

(৪) "ইসলামধর্মের আদর্শ অনুসারে মুসলমান রাষ্ট্রে ভিন্নধর্মীর কোন স্থান হতে পারে না। পাঠান ও মোঘল সম্রাটদের মধ্যে যাঁরা ভিন্নধর্মীদের প্রতি, বিশেষ করে হিন্দুদের প্রতি উদার ব্যবহার করেছেন, তাঁরা ব্যক্তিগত মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন সত্য, কিন্তু ইসলামের আদর্শ সেবক করে গোঁড়া মুসলমানদের কাছে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করতে পারেন নাই। ঔরঙ্গজীব নিজেকে ইসলামের আদর্শ সেবক বলে মনে করতেন এবং রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে তিনি ইসলামের অনুশাসন বর্ণে বর্ণে পালন করার চেষ্টা করতেন। সে জন্য তাঁর রাষ্ট্রনীতিতে মুসলমান ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর দাবী বা অধিকার স্বীকৃত হইত না। বিধর্মীর অধিকার স্বীকার করা ইসলাম ধর্মবিরুদ্ধ।" (ভারতজনের ইতিহাস, ৪৪১ – ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এ সমস্ত সাংঘাতিক কথায় এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, 'ঔরঙ্গজীব' পূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলতেন। আর ইসলাম মেনে চললেই তাঁকে পশু প্রকৃতির বর্বর, অনুদার এবং হিন্দুবিদ্বেষী হতেই হবে। তারপর এ ইতিহাসে আরও যা লেখা হয়েছে তাও খুব গভীর চিন্তার বিষয়।(৫) "চিন্তামন মন্দিরে গোহত্যা করিয়া তিনি সারম্বরে তা মসজিদে পরিণত করেছিলেন। সে সময় গুজরাটে বহু হিন্দু দেবালয় তিনি ধ্বংস করেছিলেন।" ৪৪৩ পৃষ্ঠায় আরও লেখা আছে, (৬) "তিনি বিধর্মী হিন্দুদের সমস্ত টোল-চতুষ্পাঠী দেব দেউল ধ্বংস করতে বলেন। সে আদেশ অনুসারে হিন্দুদের বড় বড় তীর্থস্থানে বিখ্যাত সব মন্দির ধ্বংস করা হয়।"

এ পৃষ্ঠাতেই এও লেখা হয়েছে–(৭) "গুজরাটে হিন্দুদের সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি তাঁর আদেশে বাজেয়াপ্ত করা হয়।" এ ইতিহাসে লেখক আরও লিখেছেন–(৮) "আগেই বলেছি যে ইসলামধর্ম অনুসারে মুসলমানরাষ্ট্রে বিধর্মীর বসবাসের অধিকার নাই। অর্থাৎ হিন্দুরা বিধর্মী বলিয়া মুসলমানী ভারতরাষ্ট্রে তাদের বাস করিবার অধিকার নাই। তা সত্ত্বেও হিন্দুদের বাস করতে দেয়া হচ্ছে বলে মুসলমান সম্রাটরা হিন্দুদের মাথাপিছু জিজিয়াকর দিতে বাধ্য করতেন।" তারপরেই ইতিহাসে যা লেখা হয়েছে তাতে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তেজিত করার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে বলে অনেকের অনুমান বা ধারনা। যেমন লেখক বলেছেন (৯) "ভারতবর্ষ যাদের চিরকালের মাতৃভূমি সে হিন্দুদের পরদেশবাসীর মত অপমান ও অত্যাচার সহ্য করে লাখ লাখ টাকা জিজিয়া কর দিতে হত, এদেশে বাস করার জন্য। ইতিহাস এতবড় নিষ্ঠুর পরিহাস কখনও সহ্য করে না।" এ ইতিহাসের ৪৪৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে (১০) "নতুন করিয়া জিজিয়া প্রবর্তনের পর দিল্লীর বিক্ষুব্ধ হিন্দু জনতা সম্রাটের কাছে

তা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাতে বিচলিত হন নাই। উপরন্তু তিনি জনতার উপর দিয়ে হাতী চালিয়ে তাদের পদদলিত করে পেশে মারবার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অসহায় হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করা।"

(১১) "হিন্দুরা মুসলমান হলে তাদের হাতীর পিঠে বসিয়ে, রাজপথের উপর দিয়ে ব্যান্ড কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে শোভা করে নিয়ে যাওয়া হত।" এতদ্ব্যতীত ৪৪৯ পৃষ্ঠায় আরও লেখা হয়েছে৷(১২) "ঔরঙ্গজীবের ধর্মান্ধ নীতির ফলে রাজপুত-শক্তিও মোঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল।" (১৩) "দাক্ষিণাত্যেও বিরাট হিন্দু পুনরভ্যুত্থান হয়েছিল মারাঠা বীর শাহজী-শিবাজী-শম্ভুজীর নেতৃত্বে।"

প্রথম ইসলাম ধর্মে কোথাও বলা হয়নি যে, বিধর্মীর অধিকার স্বীকার করা ইসলাম ধর্মবিরুদ্ধ। বরং হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) ইতিহাস একথাই স্মরণ কবিয়ে দেয় যে, তিনি অমুসলমানদের পাশাপাশি বাস করেছেন এবং মিলেমিশে থাকার জন্য ঐতিহাসিক সন্ধিস্থাপন করেছেন। আজও আরবে বহু ধর্মের মানুষ বাস করেছেন। সারা পৃথিবীতে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে এ অলীক আজগুবি অবান্তর আলেখ্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

এমনিভাবে 'চিন্তামন মন্দিরে গোহত্যা' করার কথা ও কুচিন্তা বা কুকল্পনার নামান্তর। 'হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস', 'সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত', জোর করিয়া মুসলমান করা' ইত্যাদি কতটুকু সত্য আর কতটুকু অসত্য তা একজন অমুসলিম ঐতিহাসিকের বর্ণনায় পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, "ভোগ ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিয়া কেবলমাত্র পার্থিক জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে মোসলেম নরপতিগণ অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁহারা সহস্র কাজে লিপ্ত হইয়াও কখনও বিস্মৃত হন নাই যে, তাঁহাদিগকে একদিন আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কার্যাকার্যের বাদশাহর ন্যায়ের সীমার মধ্যে অবস্থিতি করতঃ তাঁহাদের অধীন সমস্ত প্রজাবৃন্দকে সমচক্ষে দেখিতেন। নরপতিদের ন্যায়বিচারে প্রজার সন্তোষ এবং অসন্তোষের উপর রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্টিত, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে এই সত্য যেন সুবর্ণ অক্ষরে খচিত ছিল। ধর্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে কেহ কখনও বলপ্রয়োগ করেছেন-এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। মুসলমান বাদশাহদের যদি সে উদ্দেশ্য থাকিত-তাহলে এতদিন রাজত্ব করবার পর হিন্দুস্থানে হিন্দুর সংখ্যা কখনও মুসলমানদের চতুর্গুণ হইত না। হিন্দু ও মোসলমান একই দেশে একই পল্লীর ভিতর এই সুদীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান রাজত্বের মধ্যে পরম সুখে পরম শান্তিতে বসবাস করিয়াছিল। বিদেশী স্বার্থান্ধে ঐতিহাসকিগণের কাল্পনিক চিত্রে অঙ্কিত মোসলেম নরপতিগণের স্বেচ্ছাচারিতা, নৃশংসতা ও ধর্মান্তরতার বিষয় পাঠ করে এবং কতিপয় স্বার্থপর বিদ্বেষপরায়ণ লোকের প্রচারিত জনরবের উপর আস্থা স্থাপন করে এখনও সেসব মহানুভব নরপতিগণের নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করিয়া থাকেন। রাজকার্যে যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করে মোসলেম শাসনকর্তাগণ ন্যায়পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। এমনকি হিন্দু বিদ্বেষী বলিয়া অভিহিত সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুকেই প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজকার্যে যোগ্য ব্যক্তি তাঁর নিকট বিশেষরূপে সমাদৃত হত। সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের কলঙ্ক কেহ তার উপর আরোপ করতে পারে নাই। রাজ্যে শুভাশুভের দায়িত্ব হিন্দুগণের উপর ন্যাস্ত ছিল। তাঁর রাজত্বকালে দু'জন অমুসলমান কর্মচারী রাজস্ব বিভাগে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কয়েকজন ধর্মান্ধ তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিল রাজস্ব বিভাগে হিন্দুকে এরূপ বিশ্বাস করা অনুচিত। সম্রাট তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি শরীয়তের (ধর্মনীতির) বিধি প্রতিপালন করে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পদে নিযুক্ত করেছেন। পবিত্র কোরআন-এ উক্ত হয়েছে, যারা বিশ্বাসের উপযুক্ত তাদের উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ন্যায়ের উপর ভিত্তি স্থাপন করে বিচারকার্য সম্পাদন করবে।

এক একজন বাদশাহের ত্যাগের দৃষ্টান্ত পাঠ করলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাঁরা অনেক সময় রাজভাণ্ডার মুক্ত করে দান করতেন। কি দীন-দুঃখী, কি অভাবগ্রস্ত কখনো বিফল মনোরথ হত না। কোন কোন বাদশাহ প্রাচীন যুগের খলিফাগণের অনুকরণে বিলাসবর্জিত অতিসাধারণ জীবনযাত্রা করতেন এবং কায়িক পরিশ্রম দ্বারা তাঁদের পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করতেন।

বাদশাহ ফিরোজশাহ তোঘলক বহু জনহিতকর কার্যে রাজকোষ হতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন, কৃষিকার্যের সুবিধার্থে তিনি পঞ্চাশৎ জাঙ্গান, চত্বারিংশৎ মসজিদ, ত্রিংশৎ শিক্ষালয়, শতাধিক পান্থশালা, ত্রিংশৎ তড়াগ, শতাধিক দাতব্য চিকিৎসালয়, একশত স্নানাগার এবং শতাধিক সেতু ও বহু জনহিতকর কার্য করে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর কায়িক পরিশ্রম লব্ধ অর্থ দ্বারা তাঁর সাংসারিক ব্যায় নির্বাহ করতেন। তিনি টুপি সেলাই ও পবিত্র কোরআন শরীফ লিখিয়া তাঁর শেষ জীবনে আট শত পাঁচ টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। তার মধ্যে মাত্র চারি টাকা আট আনা তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য রেখে অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ দীন-দুঃখীকে দান করার জন্য উইল করে গিয়েছিলেন। সম্রাট বাবার তাঁর উপাসনা বলে বিশ্বনিয়ন্তাকে হৃদগত করে তাঁর নিজের জীবনের পরিবর্তে জীবনাধিক পুত্র হুমায়ুনের জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। যে সমস্ত ঐতিহাসিক কি উপন্যাস কি মোসলেম বাদশাহদিগের অন্তঃপুরে সুরার তরঙ্গ প্রবাহিত করেছেন তাঁদের মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করতে আমরা ঐতিহাসিক লেনপুল প্রণীত 'আওরঙ্গজেব' পাঠ করতে পাঠকবর্গকে অনুরোধ করছি। সম্রাট নিজেও কখনও মদ স্পর্শ করেন নাই এবং আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণকে সুরা পান করতে কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। ধর্মপরায়ণ আওঙ্গজেব তাঁর প্রজাবর্গের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।"

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সচ্চরিত্রের উপর যাঁরা কলঙ্কের কালিমা লেপন করে ইতিহাস তাঁদের কখনো ক্ষমা করবে না।

শ্রীবিনয় ঘোষের লেখা এ সরকারি পাঠ্য ইতিহাসে আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যত বিষাক্ত কথাই থাক, তবু এটুকু দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করা হয়েছে যে, "ভারতবর্ষ যদি ইসলাম ধর্মের দেশ দেশ হত তাহলে সম্রাট ঔরঙ্গজীব হয়ত ধর্মপ্রবর্তক মুহাম্মদের বরপুত্ররূপে পূজিত হইতেন। বাস্তবিক তাঁহার মত সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান মুসলমান ইসলামের জন্মভূমিতেও দুর্লভ।" তাতে আরো লেখা হয়েছে।সম্রাট বলিতেন, "বিশ্রাম ও বিলাসিতা রাজার জন্যে নহে।" ৪৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে-"বাস্তবিক বিলাসিতার অভ্যাস ঔরঙ্গজীবের একেবারেই ছিলনা। বাদশাহের বিলাসিতা তো দূরে কথা, সাধারণ ধনীর বিলাস স্বাচ্ছন্দ্যও তিনি ব্যক্তিগত জীবনে এড়াইয়া চলিতেন। লোক তাঁহাকে যে রাজবেশী 'ফকির ও 'দরবেশ বলিত তাহা স্তুতি নহে, সত্য। পোশাক-পরিচ্ছেদে, আহারে-বিহারে তিনি সংযমী ছিলেন, সুরানারী বিলাস তাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না।" শ্রীঘোষ আরও লিখেছেন।"ঔরঙ্গজীব বিদ্যানুরাগী তো ছিলেনই, নিজে বিদ্বান ও সুপণ্ডিত ছিলেন।"

“আরবী ও ফার্সী ছাড়া তিনি তুর্কী ও হিন্দু ভাষাতেও বেশ সহজভাবে কথাবার্তা বলতে পারিতেন। ভারতবর্ষে মুসলমান আইনগ্রন্থ প্রণয়নে ‘ফতোয়া-ই-আলমগীরী রচয়িতা হিসেবে তাঁর কীর্তি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।” এমনিভাবে সম্রাটের নিজের উদর পূরণ ও উদারতার উদাহরণ স্থাপনে নিজ হাতে টুপি সেলাই আর নিজ হাতে লেখা কুরআন শরীফ পরিবেশন রাজা বাদশাহের ইতিহাসে আশ্চর্যতম ঘটনা। শ্রীঘোষের ইতিহাসে আছে–“নিজের হাতে তিনি ‘কোরআন’ কপি করিয়াছেন।” তাছাড়া ভাইদের মধ্যে আলমগীরের তুলনামূলক যোগ্যতা প্রমাণেও শ্রীঘোষ তাঁর বড় ভাই দারাশিকোর জন্য লিখেছেন–“পিতার অত্যধিক স্নেহের ছায়ায় মানুষ হইয়া তিনি যুদ্ধবিগ্র ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলা চলে।” শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজার জন্য বলেছেন, “কর্মবিমুখতা ও আলস্য তাঁহার চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল, স্থিরভাবে কোন কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।” আর আলমগীর বা আওরঙ্গজেবের জন্য লিখেছেন–“তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীবের চরিত্র ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনি স্থির ধীর ও হিসেবী। কর্মক্ষম ও তৎপরও ছিলেন তিনি যথেষ্ট। রাজনীতির জটিলতা সম্বন্ধে তাঁর যে অভিজ্ঞতা ছিল তা আর কাহারও ছিলনা। শাহজাহানের পরিষদরা জানিতেন যে এই তৃতীয় পুত্রই সিংহাসনের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে হয়ত শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হইবেন।” চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য লিখেছেন, “মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসক। কোন দিক দিয়া তিনি ঔরঙ্গজীবের সমকক্ষ ছিলেন না।”

এখানে পরস্পর বিরোধী উক্তির প্রতি প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া স্বাভাবিক।

আশ্চর্যের কথা, যে মুখে বলা হয়েছে ‘ক’ সারা জীবন বন্ধ্যা ছিলেন আবার সে মুখেই বলা হচ্ছে ‘ক’ দুই সন্তানের মা ছিলেন। এর নাম ইতিহাস না পরিহাস? এর নাম ইতিহাস না উপন্যাস? এর উদ্দেশ্য কি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা না হিংস্রতার তালিম দেয়া? সে সবের সঠিক সমীক্ষা সমাজেরই দায়িত্ব।

মুসলমানদের নিকট বড় অপরাধ হলেও তাঁকে হযরত মুহাম্মদের বরপুত্র রূপে পূঁজি হইতেন’ বলে লিখতে দ্বিধা হয়নি আবার সে কলমেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করে হাতির পিঠে চাপিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা বের করতেন। অথচ সকলেই স্বীকার করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভোগবিলাসের জন্য বাজনা একেবারে নিষিদ্ধ করেছেন। আলমগীরও মুসলমানদের মধ্যে বাজনা গীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। অতএব ব্যান্ড বাজিয়ে কি করে ‘বরপুত্রের দ্বারা নব দীক্ষিত মুসলমানদের নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় মিছিল বের হতে পারে”

ইসলাম ধর্মে শাস্তি বিধান আছে নরহত্যার বদলে প্রাণদণ্ড–প্রাণদণ্ড বলতে শিরচ্ছেদ, ব্যাভিচারের প্রমাণে প্রাণদণ্ড, চুরির জন্য হাত কাটা ও মদ পানের জন্য চাবুক প্রয়োগ প্রভৃতি। হযরত মুহাম্মদ এঁর আইনে বা তাঁর সামগ্রিক জীবনে কাউকে শূলে চড়িয়ে, না খেতে দিয়ে, বিষ প্রয়োগ করে অথবা কোন ভারী বস্তুর চাপ দিয়ে শাস্তি দেয়ার নিয়ম ছিলনা বা আজও নেই। অতএব জিজিয়া করের প্রতিবাদে হিন্দু জনতার উপর হাতি চালিয়ে দেয়ার হুকুম দিতে পারেন কি করে মুহাম্মদের (সাঃ) ‘বরপুত্র’?

অনেকের ধারণা এ প্রকার ঐতিহাসিকতা শুধুমাত্র আওরঙ্গজেবের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার অপকৌশলই নয় বরং হযরত মুহাম্মদ সম্বন্ধেও কুৎসিত ধারণা জন্মিয়ে দিয়ে শিক্ষিত সমাজকে ইসলাম-বিমুখ করে দেয়ার এক উৎকট প্রচেষ্টা এবং জঘণ্য ষড়যন্ত্র। অতএব হযরত মুহাম্মদের ভক্ত সারা বিশ্ব মুসলিম এরূপ চক্রান্ত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতাকে ক্ষমা করতে পারে না।

অবশ্য আকবরের জিজিয়া প্রথার বিলোপ সাধন আর আওরঙ্গজেবের জিজিয়া করের পুনঃপ্রচলন কথাটুকু সত্য হলেও জিজিয়া কাদের জন্য, কতটুকু পরিমাণে নেয়া হত তার আলোচনা কিছু পরেই করা হবে।

ঐতিহাসিক শ্রীঘোষ ইতিহাসের পাতায় লিখেছেন, "ঔরঙ্গজীব কেবল 'আলমগীর' নহেন, 'জিন্দাপীর'ও।" আবার সেখানেই লিখেছেন, "সৎনামীর জাদুমন্ত্র জানে মনে করিয়া তিনি নিজের হাতে বাণী লিখিয়া জাদুমূর্তি আঁকিয়া দিলেন মোগল সৈন্যদের পতাকাতে আটিয়া দিবার জন্য।" আলমগীর যদি হযরত মুহাম্মদ-এর একনিষ্ঠ ভক্তই হলেন অর্থাৎ শ্রীঘোষের উক্তিতে তিনি যদি মুহাম্মাদের 'বরপুত্রই হলেন এবং ইসলাম ধর্মের অনুসরণকারীই হলেন তাহলে তিনি জাদু করলেন কি রূপে? ইসলাম ধর্মে কি জাদু করা একেবারেই হারাম বা অবৈধ নয়? তাছাড়া জাদুরূপী কোন নর বা নারীমূর্তি অথবা কোন জীবজন্তুর ছবি অঙ্কন ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। সুতরাং জাদুর প্রয়োগ এবং মূর্তি অঙ্কন–এ অপবাদ দুটি যৌক্তিক না অযৌক্তিক, মিথ্যা না সত্য তার উত্তরে দেবে নূতন সমাজ, নূতন শব্দাব্দী।

এমনিভাবে 'আওরঙ্গজেব'কে বাংলায় লেখা হয়েছে 'ঔরঙ্গজীব'; 'জীব' নামে 'জন্তু'। হয়ত 'ঔরঙ্গজীব' বলেই অনেকে শান্তি পেয়েছেন বা পান, তাই শান্তি ধারা সারা ভারতে ছাড়বার জন্যই এ ব্যবস্থা। কিন্তু আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ইতিহাস হতে বাংলায় অনুবাদ করতে হলে 'ঔরঙ্গজীব' হতে পারে না বরং 'আওরঙ্গজেবই লেখা হত কিন্তু কালের চক্রে চারিত্রিক উন্নতি বিকাশের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমান অনেক লেখকই 'ঔরঙ্গজীব' লিখতে শুরু করেছেন।

এছাড়াও তাঁর উপর যে সমস্ত মারাত্মক অভিযোগ আরোপিত তা নিয়ে এবার একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যায়। (১) তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না, (২) তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন, তাই হিন্দু কর্মচারীরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, (৩) হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, (৪) বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ও ভাইদের হত্যা করেছিলেন, (৫) কেবল হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন ও (৬) তাঁর অযোগ্যতাই মোঘল সম্রাজ্যের পতনের কারণ–সে জন্য ইতিহাসে আওরঙ্গজিব চরমভাবে কলঙ্কিত। এ সমস্তর উত্তরে কিছু বলা যায় বা লেখা যায় নয়, বরং প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর সুবিস্তৃত আলোচনা করলে এক একটি ইতিহাস লেখা যায়। কিন্তু তা বাহুল্য মনে করে, সমাজের চিন্তাধারার গতি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রামাণ ইতিহাসের উদ্ধৃতি ও তথ্য সংক্ষেপে পরিবেশিত হল।

(১) 'তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না'–এ কথাই যদি সত্যি হয় তাহলে তিনি কখনই বা এত নামায পড়তেন কখনই বা টুপি সেলাই করতেন, কখনই বা কুরআন নকল করতেন আর কখনই বা তিনি রাত্রে এত ইবাদত করতেন আর কি করেই বা আকবর অপেক্ষা বিরাট বিচিত্রময় ভারতবর্ষ শাসন করতেন ও সামলাতেন? যদি তিনি কাউকে বিশ্বাসই না করতেন তবে নিশ্চয়ই সকলেই তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন; আর অসন্তুষ্ট কর্মচারি ও চাকরদের নিয়ে ধমকে ধামকে কিছুদিন বা কয়েক মাস অথবা কোন প্রকারে কয়েকটা বছর গোঁজামিল দিয়ে কাটান যেতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তিনি পাঁচ দশ বছর নয় অর্ধ শতাব্দীকাল বা পঞ্চাশটি বছর রাজত্ব করেছেন। এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে, রাজকর্মচারিরা তাঁর উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন না, অর্থাৎ তিনি সকলকে অবিশ্বাস করতেন না।

যশোবন্ত সিংহ একবার নয় কয়েকবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তবুও দয়ালু সম্রাট তাঁকে প্রত্যেকবার ক্ষমা করেছিলেন। যদিও যশোবন্ত সিংহ মুসলমান ছিলেন না, শুধু ক্ষমা নয়, উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপনে তাঁকে কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেও দ্বিধা করেননি।

মারাঠা নেতা শিবাজী শুধু অমুসলমানই ছিলেন না রাষ্ট্রদ্রোহীও ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাঁকে তিনি বিশ্বাস করে পাঠিয়েছিলেন–তিনি ছিলেন একজন অমুসলমান–জয়সিংহ। তাছাড়া শিবাজী যখন আওরঙ্গজেবের দরবারে ক্ষমা চাইলেন বা আত্মসমর্পণ করলেন তখন তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন। ইচ্ছা করলে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে অথবা মোঘল সৈন্যদের রাতের অন্ধকারে এবং অতর্কিত আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগে হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে পরম ও চরম শত্রুকে হাতের মুঠায় পেয়েও তাঁকে ক্ষমা করে মহানুভব বাদশাহ ক্ষমাধর্মের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। শিবাজীকে একবার নয় কয়েকবার বন্দী করে ছিলেন। অবশেষে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, শিবাজীর দেখাশুনার ভার দিয়েছিলেন এ জয়সিংহেরই উপর। যখন তিনি তাঁর ধর্মের দোহাই দিয়ে মিষ্টান্ন পাঠাবার অনুমতি চাইলেন, সম্রাট তাও দিলেন। আজ বিশ্বে কোন এমন রাষ্ট্র আছে কি যেখানে জেলখানায় কয়েদীকে আত্মীয়দের মিষ্টি পাঠাবার অনুমতি দেয়া হয়? তাও এক এক ঝুড়িতে দু এক মণ করে মিষ্টি!–এক কিলো দু কিলো মিষ্টির ঝুড়িতে ঢুকে পলায়ন নিশ্চয়ই সম্ভব ছিলনা। শিবাজীর পলায়নের পর জয়সিংহকে সন্দেহ করাই স্বাভাবিক ছিল, যেহেতু তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ সত্ত্বেও শিবাজীর পলায়ন সম্ভব হয়েছিল। তাই আজ অনেকেই মনে করেন, জয়সিংহের সঙ্গে শিবাজীর গুপ্ত যোগাযোগ ছিল। বাইরে যুদ্ধ যা হয়েছে সেটা বাহ্যিক, ভিতরে ভিতরে যুক্তি ও চুক্তি ছিল অন্য রকম। সে যাই হোক সম্রাট আলমগীর নিশ্চয় সন্দেহ করতে পারতেন, কেননা শিবাজী ও জয়সিংহ উভয়েই ছিলেন অমুসলমান বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, কিন্তু তা তো তিনি করেননি? তাহলে কোন অধিকারে বলা যায় সম্রাট কাউকে বিশ্বাস করতেন না?

(২) তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন' কি না তার উত্তর প্রথম নম্বরেই বেশ কিছুটা অনুমেয়। তবুও আজ আমরা ঐতিহাসিকদের অনুগ্রহে জানতে পারছি তিনি নাকি হিন্দু কর্মচারিদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের স্থানে মুসলমান কর্মচারি নিয়োগ করেছিলেন। এসব কথাগুলোর অসত্যতা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই, শুধু পাশাপাশি সত্যের আলোকবর্তিকা আনলেই মিথ্যার অন্ধকার নিমেষে বিদূরিত হবে।

মুসলমান বিদ্বেষী কোন রাজা যেমন মুসলমান মন্ত্রী বা সেনাপতি রাখতে পরেন না, তেমনি হিন্দু বিদ্বেষী কোন মুসলমান সম্রাটের পক্ষেও হিন্দু সেনাপতি নিয়োগ সম্ভব নয়। কেননা তাতে সেনাপতির দ্বারা সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা সততই লেগে থাকবে। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁর সেনাপতি পদে বরণ করেছিলেন অমুসলমান জয়সিংহ এবং যশোবন্ত সিংহকে। শুধু তাই নয় রাজা ভীম সিং, যিনি উদয়পুরের মহারাজা রাজসিংহের পুত্র ছিলেন, তিনিও আলমগীরের উচ্চমানের সামরিক কর্তা ছিলেন। তাঁর অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য ছিল। ইন্দ্রসিংহের মর্যাদাও আওরঙ্গজেবের কাছে অল্প ছিলনা।

দেশদ্রোহী শিবাজীর আপন জামাতা অচলাজী পাঁচ হাজারী পদের অধিকারী ছিলেন, অর্থাৎ পাঁচ হাজার সৈন্য তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় থাকত। আর্জুজী, ইনিও শিবাজীর আত্মীয় ছিলেন। তাঁকে দুই হাজারী পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। এখন যদি আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, শিবাজীর মত সামান্য একজন সৈনিককে আওরঙ্গজেবের অঙ্গুলি হেলনেই নিঃশেষ করা যেত, তাই তিনি এত লোককে এত বেশি বিশ্বাস করতেন, এমনকি বিধর্মী এবং শত্রুর আত্মীয়-স্বজনের হাতেও এত ক্ষমতা দিয়েছিলেন আর সে জন্যই তাঁদের স্নেহ, মমতা ও

Goto List

স্বজাতিপ্রীতির পরিপ্রেক্ষিতে আরওঙ্গজেবকে কষ্ট পেতে হয়েছে, তাহলে আসল ইতিহাসটাই বাদ পড়ে যাবে। আসল কথা হচ্ছে যে, আলমগীর নিজে ছিলেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তাই তিনি কাউকে বিনা প্রমাণে সন্দেহ করাকে কল্পনা করতেও পারতেন না। কিন্তু ধন্য আমাদের ঐতিহাসিকতা! আমরা আসল ইতিহাসটাকে হজম করে উল্টোটা লিখেছি–তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ইত্যাদি।

(৩) 'তিনি হিন্দু দেবালয় বা মন্দির ধ্বংস করেছিলেন' বলে যে অপবাদটি নিরপরাধ আওরঙ্গজেবের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হয়, আওরঙ্গজেব নিশ্চয় ইসলাম ধর্মের আইন মানতেন না। অথচ সমস্ত ইতিহাসে শত্রু ও মিত্র ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন যে, তিনি কুরআনের নীতি 'বর্ণে বর্ণে' মেনে চলতেন। তাহলে দুটি কথার মধ্যে মিল হচ্ছে কোথায়? আসলে অনেক জায়গায় লেখকের লেখায় এমন ফাঁক থেকে গেছে যে তাতে ব্যাপারটা মিথ্যা প্রমাণ করতে কোন অসুবিধাই হয় না।

আওরঙ্গজেবের পক্ষে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা কোন মতেই সম্ভব ছিলনা। কারণ তাঁর আদর্শের উৎস এ কুরআনেই আছে–'ধর্মে জবরদস্তি নেই।' আবার অন্যত্র হযরত মুহাম্মদকে বলতে বলা হয়েছে–'হে অমুসলমানগণ, তোমরা যার উপাসনা কর আমরা তার উপাসনা করি না, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম।' তাছাড়া হযরত মুহাম্মাদ কোন মন্দির ভেঙ্গেছিলেন বা ভাঙ্গিয়েছিলেন এ কথা আজ পর্যন্ত কেহ প্রমাণ করতে পারেন নি, পারা সম্ভবও নয়। অতএব এখানেও সে একই প্রশ্ন হযরত মুহাম্মদের 'বরপুত্রে'র পক্ষে মন্দির ধ্বংস করা কি করে সম্ভব হল?

বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের ভারতবর্ষের এ বঙ্গদেশেই কয়েক বছর আগে স্কুলের পাঠ্য ইতিহাসে অনেক কিছু সত্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেত। প্রমাণ স্বরূপ ১৯৪৬ সনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক, হিন্দুস্থান প্রেস ১০, রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা হতে মুদ্রিত 'ইতিহাস পরিচয়' হতে কিছুটা অংশ তুলে ধরছি–"জোর করিয়া মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যেই যদি আওরঙ্গজেবের থাকিত, তবে ভারতে কোন হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্বই বোধহয় আজ দেখা যাইত না। সেইরূপ করা ত দূরের কথা, বরং বেনারস, কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থানের বহু হিন্দুমন্দির এবং তৎসংলগ্ন দেবোত্তর ও ব্রাহ্মোত্তর সম্পত্তি আওরঙ্গজের নিজের হাতে দান করিয়া গিয়াছেন; সে সকল 'সনদ' আজ পর্যন্ত বিদ্যমান।"

স্কুলের এ পাঠ্য পুস্তকের ১৩৮ পৃষ্ঠায় আরও লেখা আছে, "আওরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর রাজত্বের মধ্যে এমন কোন প্রমাণ কেহ দেখাইতে পারেন নাই যে, তিনি কোথাও কোন হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছেন বা তাহার ধর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এমনকি, শিবাজীর পৌত্র শাহুকে তিনি আট বছর কাল মোঘল দূর্গে বন্দী করে রেখেও কোনদিন তাকে 'মুসলমান' করেন নাই; হিন্দু বেশেই শাহু মারাঠাদিগের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন।"

এ পুস্তকে আরো লেখা আছে, "মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য যে সমস্ত মন্দিরে ব্রাহ্মণগণ প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন, কেবলমাত্র সেইগুলোই আওরঙ্গজেব ধ্বংস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মন্দির তলে সমবেত হইয়া বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিলে দেবতার আশীর্বাদ লাভ করা যাবে, এই প্রলোভন দেখাইয়া কুচক্রীগণ কোন কোন মন্দিরকে রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। কাজেই তাদের ধ্বংসের প্রয়োজন হইয়াছিল।" কিন্তু আজকের স্কুল-কলেজের ইতিহাসের ধারা সম্পূর্ণ বিকৃত। শ্রীঘোষের উদ্ধৃতি দিয়ে সে বিকৃতির ধারা প্রমাণ করা কঠিন নয়।

উল্লেখ্য করা যেতে পারে যে, শ্রীঘোসের এ 'ভারতজনের ইতিহাস' মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য ১৯৬২ সনে লেখা, আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য এ 'ইতিহাস পরিচয়' বইখানি ১৯৪৬ সনে লেখা। মাত্র ষোল বছরের মধ্যেই আমাদের ঐতিহাসিকতার এত উন্নতি অথবা এত অবনতি।

যাহোক, সত্য সিদ্ধান্ত এটাই গ্রহণযোগ্য যে, বিধর্মী বা হিন্দুদের ধর্মে হস্তক্ষেপ অথবা মন্দির ধ্বংস আওরঙ্গজেবের নীতি ছিল না। তবে কিছু মন্দির তাঁর সময়ে ভাঙ্গা গিয়েছিল, অবশ্য তার পশ্চাতে কিছু কারণও ছিল। প্রথমতঃ মন্দিরগুলো রাজনৈতিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল যা পূর্ব আলোচনাতেই উদ্ধৃতিসহ প্রমাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আকবরের সময়ে অনেক মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির তৈরি করা হয়েছিল এবং অনেক মসজিদকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেও মন্দির তৈরি হয়েছিল। যেমন–'মুনতাখাবুত্তাওয়ারিখ' ও 'মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী' নামক দুটি গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হতে যথাক্রমে পাওয়া যায়–

"Mosques and prayer-rooms were changed into store rooms and into Hindu guard rooms."

"A number of mosques were destroyed by Hindus and temples erected in their place."

আওরঙ্গজেবের সময়ে সৎনামী দল নামে হিন্দুদের এক দুধর্ষ সন্ন্যাসী দল বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অনেক বাদশাহী সৈন্য তাদের দ্বারা নিহত হয়, অনেক মসজিদও তারা ধ্বংস করে। এ দলের নায়করা প্রচার করত যে, যারা তাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করবে তারা মরবে না, আর যদি ভাগ্যচক্রে মরেই যায় তবে এক একজনের রক্তে আশি জন করে লোক তৈরি হবে। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ ছিল অসভ্য ও অদ্ভুত ধরণের। দাড়ি গোঁফ এমনকি চোখের ভ্রু পর্যন্ত মুণ্ডিত থাকত, তাই তাদের আর এক নাম ছিল 'মুণ্ডিয়'। এদের পরিচয় শ্রীঘোষের লেখা ইতিহাসেও কিছু পাওয়া গেছে–"দিল্লি হইতে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে নারনোল জেলায় সৎনামী সম্প্রদায়ের বড় ঘাঁটি ছিল। ...যদি কোন বীর সৎনামীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার রক্ত হইতে আরও আশিজন বীরের উৎপত্তি হইবে। দেখিতে দেখিতে প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) সৎনামী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল। স্থানীয় রাজকর্মচারীরা যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজিত হইলেন। নারনোলের ফৌজদারকেও বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল, শহরও সৎনামীরা দখল করিয়া লুটতরাজ করিল, মসজিদ ধ্বংস করিল, এমনকি নিজেরা শাসন ব্যবস্থা চালু করিয়া ফেলিল।' [ভারতজনের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৪৪৭]।

অতএব নিরুপায় আওরঙ্গজেব কয়েক হাজার সৈন্য পাঠিয়ে তাদের রক্তে ৮০ জন করে বীর তৈরি হওয়ার ধোকাপ্রদ অপপ্রচারকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেন এবং তাদেরই নির্বিবাদ অত্যাচারে ধ্বংস হওয়া মসজিদগুলো পুনর্নির্মাণ করেন ও তাদের প্রবর্তিত নূতন শাসন ব্যবস্থারও অবসান ঘটান। আজ এ রাজদ্রোহী দল সৎনামীদের উপর কোন অত্যাচার, অনাচার নিরপেক্ষ মানুষদের কাছে নিন্দনীয় হওয়া উচিত নয় অথচ শ্রীঘোষের ইতিহাসে লেখা হয়েছে, "মোঘল সৈন্যদের বিরুদ্ধে সৎনামীরাও বীরের মত যুদ্ধ করিয়া হাজারে হাজারে নিহত হইল।"

তাছাড়া যাঁরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা অনেকে কার্যসিদ্ধির এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রাক্তন ধর্মের উপর কত বিরাগী এবং নূতন ধর্মে কত আস্থাশীল তা প্রমাণের জন্য কিছু মন্দিরেরও ক্ষতি সাধন করেছিলেন। যেমন উত্তরবঙ্গের নব-মুসলমান রাজা যদুর গোঁড়ামির কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু মহানুভব সম্রাট সেগুলোর সংস্কার সাধন করে যে উদারতার পরিচয় দেখিয়েছেন তা আজকের রাজারের ইতিহাসে দারুণভাবে দুর্লভ বলা যায়।

(৪) আওরঙ্গজেবের প্রতি আর এক অপবাদ আরোপ করা হয়েছে–তিনি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ও ভাইদের হত্যা করেছিলেন।

পিতাকে বন্দী করা নিঃসন্দেহে দোষণীয়। কিন্তু বন্দী কাকে বলে, তার স্বরূপ কি, বন্দী কেন করা হয় এবং তার উদ্দেশ্যই বা কি ইত্যাদি বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার, নচেত আমারও বন্দী শাহজাহানকে ও 'মহানুভব' আওরঙ্গজেবকে সঠিকভাবে চিনতে পারব না।

বীরত্ব প্রকাশের অভিলাষে শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বিকে শৃঙ্খলিত করে কারারুদ্ধ করার নাম বন্দী। বন্দী সাধারণত নানা কষ্টের মধ্যে উপলব্ধি করে তার পরাজয় ও বিজয়ীর জয়ের দাপট। বন্দীদের খাওয়া-শোয়ার সুব্যবস্থার পরিবর্তে তাকে অব্যবস্থা। কিন্তু শাহজাহান বন্দী ছিলেন কোথায়? তেপান্তরের মাঠেও নয়, আর অন্ধকূপ বা বদ্ধকক্ষেও নয়, বরং সে সুরক্ষিত সুসজ্জিত অট্টালিকায় যেটা ছিল আকবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর, মমতাজ প্রভৃতি খ্যাতনামা সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীদের আরামকক্ষ, কর্মক্ষেত্র ও গার্হস্থ্যক্ষেত্র। যেখানে ছিল শাহী পালঙ্ক, ইয়েমেনী চাদরে ঢাকা শাহী কোমল পালংকের গদি। যেখানে তাঁর খাওয়া-দাওয়া সেবা-শুশ্রুষা করার জন্য ২৪ ঘণ্টা ভৃত্যেরা প্রস্তুত থাকত। শাহজাহানের পিতা জাহাঙ্গীর নেই, স্নেহময়ী মাতাও নেই আর স্ত্রী মমতাজ তো বিদায় নিয়ে চলে গেছেন তাজমহলের নীচে; তাঁরা বেঁচে থাকলে হয়ত তাঁরাও থাকতেন ঐতিহাসিক পরিবেশে। আছেন শুধু তাঁর অত্যন্ত স্নেহ-ধন্যা কন্যা আর আত্মীয় স্বজন। প্রায় সমস্ত আত্মীয় স্বজনই শাহজাহানের সাথে ইচ্ছামত সাক্ষাত করতে পারতেন। আর তাঁর স্নেহসঞ্চিতা কন্যা রৌশনআরা অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া প্রতি মুহূর্ত পিতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। শুধু তাই নয়, আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, আওরঙ্গজেব সারা দিনে রাত্রে অন্তত একবারও রাজকার্য ছেড়ে স্বহস্তে পিতার পদসেবা করতেন–এ হল আওরঙ্গজেবের অত্যাচার আর শাহজাহানের 'বন্দীত্ব'।

তাঁর এ ঐতিহাসিক বিশ্রামের অনেক কারণের মধ্যে একটি হল–শাহজাহানের জন্য যখন চারদিকে রব উঠে যায় শাহজাহান পরলোকগমন করেছেন তখন পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। সবশেষে যখন আওরঙ্গজেবের জয় হল তখন দেখা গেল শাহজাহান মৃত নন, মৃত্যুর হাত হতে ভগ্নদেহ নিয়ে তিনি প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তখন তিনি বিশ্রাম না করে অন্ধ স্নেহে বড় ছেলে দারাশিকোকে সিংহাসন দিতে মনস্থ করেন এবং বহু সমস্যার সম্মুখীন হন, যেমন বেশির ভাগ হিন্দু প্রজা দারাকে আর মুসলমানেরা চায় আওরঙ্গজেবকে। তবুও তিনি গভীর চিন্তাসহ সমাধানের পথ খুঁজতে যাচ্ছিলেন–যা ছিল রাজনীতির নামান্তর। এ অবস্থায় তাঁকে রাজনীতি করতে দেয়ার অর্থ জোর করে মৃত্যুপথে নিক্ষেপ করা। অতএব সেক্ষেত্রে পিতার পৃথক অবস্থান আধুনিক বিচক্ষণ ঐতিহাসিকদের মতে অনুপযুক্ত কর্ম ছিলনা, বরং তা ছিল বিচক্ষণ সন্তানের উপযুক্ত পিতৃসেবা।

শাহজাহানের সাথে সকলে সাক্ষাৎ করতে পেলেও বিশ্রামে বিঘ্ন যাতে না ঘটে সেজন্য তাঁর রাজপ্রাসাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। তাই একদিন তিনি আলমগীরকে ডেকে বললেন, 'আলমগীর। তোমার মত হাফেয সন্তানের কাছে আমি কি বন্দী?' উত্তরে আওরঙ্গজেব বলেছিলেন, 'আপনি সারা জীবন রাজনীতি করে অন্তরের প্রকৃত শান্তি কি পেয়েছেন' উত্তরে তিনি বলেন, 'কোনও দিন পাইনি আর আজও পাচ্ছি না, তার উপর মমতাজও নেই।' আওরঙ্গজেব তখন বলেন, 'আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কুরআন-এ জানিয়েছেন, অন্তরের শান্তি আল্লাহ্‌র স্মরণেই সম্ভব। অতএব আমি চাই না, আপনি এ বৃদ্ধ বয়সে অশান্তির

Goto List

রাজনীতি করুন। আপনার ইবাদত আর আল্লাহ্র স্মরণের জন্যই এ পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা।' শাহজাহানের কণ্ঠস্বর আরও কর্কশ হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'তাহলে আমার প্রিয়া, তোমার মা মমতাজের স্মৃতিসৌধ তাজমহলও কি আমার ইচ্ছামত দেখতে পাবনা?' আওরঙ্গজেব উত্তরে খুব বিনম্রভাবে নিবেদন করেছিলেন-'আব্বজান, সত্যই কি আপনার তাজমহল দেখার সাধ, নাকি তাজমহল দেখার নামে অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে?' শাহজাহান অশ্রুপ্লুত নয়নে বলেছিলেন, 'যেমন করে হোক আমাকে অন্ততঃ একবার করে প্রতিদিন তোমার মায়ের স্মৃতিসৌধটা দেখতে দাও, আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই।' উত্তরে আওরঙ্গজেব বলেছিলেন, 'যদি এখানে আপনার শয়নকক্ষের মধ্যে থেকেই আপনার ইচ্ছামত তাজমহল দেখতে পান তাহলেও আপনাকে বাইরে যেতে হবে?' শাহজাহান বলেছিলেন, 'পুত্র, বাইরে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়, শুধু চোখে দেখতে চাই তাজমহল।' তখন টেলিভিশন ছিলনা, তাই শাহজাহানের ধারণা ছিল বাইরে না গিয়ে তাজমহল দেখা অসম্ভব। কিন্তু আওরঙ্গজেব পৃথিবীর এক মূল্যবান মণি আনিয়ে বিজ্ঞানময় কৌশলে দেয়ালের সাথে এমনভাবে তা সংযুক্ত করিয়ে দিলেন যে, তাতে দৃষ্টি দিলে দূরের তাজমহল সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যেত। এখন অবশ্য ইংরেজরা সেটা খুলে নিয়ে চলে গেছে। অবশ্য নকল যে পাথরটি লাগিয়েছে তাতেও তাজমহল মোটামুটি দেখা যায়।

অনেকের কাছে আসল সত্য আরও উহ্য হয়ে আছে। যেমন শাহজাহান ভয়াবহ মৃত্যুপীড়া হতে প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন বটে কিন্তু মমতাজের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে তাঁর বিশুদ্ধ বিবেক ও জ্ঞান প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। কারও মতে মমতাজের গর্ভ হতে গর্ভস্থ শিশুর কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল বলে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আবার কেহ বলেন ওটা ভ্রূনস্থ শিশুর কান্না নয়, পেটের পীড়াজনিত শব্দ। সে যাহোক, সমস্ত চিকিৎসক ও সাধারণের কাছে ওটা ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

মমতাজের মৃত্যুর পর শাহজাহান শিশুর মত কেঁদে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ্ আমার অর্থবল, জনবল, মনোবল সবকিছুর বিনিময়েও মমতাজকে ফেরাবার কোন উপায় নেই। কারণ তোমার শক্তির সামনে আমাদের অস্তিত্ব কত অসার, কত অকেজো।' তাই প্রিয় মমতার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য সে যুগে বিশ কোটি বার লাখ টাকা ব্যয়ে বাইশ বছর ধরে বহু লোকের পরিশ্রমে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য তাজমহল তৈরি হয়েছিল। এর ফলে রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য হয়ে পড়লেও তাতে বৃদ্ধ শাহজাহান মানসিক অসুস্থতা হেতু শান্তি পাননি। তুষার শুভ্র আকাশ ছোঁয়া তাজমহল যথেষ্ট নয় ভেবে আর একটি ভ্রমর কাল কৃষ্ণ পাথরের তাজমহল তৈরি করার ইচ্ছা করলেন। আর ভিতরে থাকবে পান্না, হীরা, চুণী, পদ্মরাগ, মণি প্রভৃতি অমূল্য ধাতুর অদ্ভুত সংস্থাপন, আর শুভ্র ও কৃষ্ণ তাজমহলের মাটির নিচে দিয়ে থাকবে সংযোগ রাস্তা। শাহজাহান বিশেষ কোন প্রস্তুতি এবং পরামর্শ না করেই কাজ শুরু করেছিলেন বলে কিছু ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন। আওরঙ্গজেব বুঝেছিলেন, আবার যদি দ্বিতীয় তাজমহল সৃষ্টি হয় তাহলে দিল্লির রাজ দরবার অর্থনৈতিক পতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। তার উপর শাহজাহান পুত্রদের কলহ বিবাদের কারণে ও মমতাজের মৃত্যুর শোকের প্রভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রতি মুহূর্তে মত পরিবর্তন করতে এবং ভুলক্রমে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর অনুমতি এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিতে দ্বিধা করতেন না। তার অন্যতম কারণ ছিল, শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্যের জন্য তিনি তদন্ত বা সমীক্ষার পরিবর্তে সংবাদদাতা যা প্রথমে শোনাতেন তাই তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে যেত। তারপর তা মুছে ফেলা এবং আসল কথা বোধগম্য করান বেশ কষ্টকর ছিল।

শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শাহজাহানকে নিজের পিতার প্রতি আনুগত্য এবং সারা ভারতে তাঁর কত জনপ্রিয়তা ও মনপ্রিয়তা আছে তা বার বার তুলে ধরে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, অথচ গোটা ভারতবর্ষের মুসলিম জাতি বিশেষ করে মুসলমান মন্ত্রী সেনাপতি এবং উচ্চ পদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারিদের দারার প্রতি দারুণ অনাস্থা আর অবিশ্বাস ছিল, যেহেতু তিনি তাঁদের কাছে ধর্মত্যাগী বলে বিবেচিত হতেন। সুতরাং সে অবস্থায় দারাকে সিংহাসন দিলেই বিদ্রোহের দাবানল হু হু করে জ্বলে উঠত। সারাদেশে একাধিক বিদ্রোহ দমন করা সহজ, কিন্তু নিজের দরবারের বিদ্রোহ দমন করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, বরং অসাধ্য। অতএব নানা দিক দিয়ে চিন্তা করে দেখলে এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হয় যে, যদি শাহজাহানের বন্দী মার্কা বিশ্রামের ব্যবস্থা না করা হত তাহলে অবস্থা হত অত্যন্ত বিপজ্জনক ও লোমহর্ষক। তাই বিচক্ষণ ইতিহাস বিজ্ঞানীদের মতে-শাহাজাহানকে আরাম কক্ষে আটকে রক্তনদীর গতিকে স্তব্ধ করা হয়েছে।

বিশ্রামের পূর্বে শাহজাহান এক দুঃসাহাসিক কুৎসিত পদক্ষেপ নিতে গিয়েছিলেন, যা তাঁর খ্যাতি ও যশের মৃত্যু ঘটাত যদি তিনি অসুস্থ, অতিবৃদ্ধ এবং স্ত্রীর বিয়োগ ব্যথায় মস্তিষ্ক বিকৃত রোগী বলে গণ্য না হতেন। সে ঘটনা সত্যের খাতিরে উল্লেখ করা প্রয়োজন ঃ আওরঙ্গজেব যখন দিল্লি থেকে দূরে ছিলেন তখন তাঁর পুত্র মুহম্মাদকে সিংহাসন দেয়ার লোভ দেখিয়ে সে কিশোরকে বিদ্রোহী করতে চরম চেষ্টা করেছিলেন শাহজাহান। কিন্তু শাহজাহানের এ চক্রান্ত সফল হয়নি। তাই অন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল-আওরঙ্গজেবের সুনাম ও সদ্‌গুণাবলীর কারণে দেশ-বিদেশে, ঘরে বাইরে তিনি 'ফকির', 'জিন্দাপীর', 'দরবেশ', 'আলমগীর' এবং 'মহীউদ্দিন' প্রভৃতি বহু নামে পরিচিত ছিলেন। তার চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল বজ্রের মত, বিশেষত নারীর প্রতি আকর্ষণ হেতু তিনি কোনও দুর্বল ছিলেন না। তাই দারা এবং তাঁর সমর্থকদের পরামর্শে আওরঙ্গজেবকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। তবে পরামর্শদাতারা এটা বুঝেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে নূতন অগ্নি বিপ্লব ও বিদ্রোহ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তাই তাঁরা ঠিক করেছিলেন যে, আওরঙ্গজেবকে রাজপ্রাসাদে বা হেরেমে আসতে বলা হবে। তাঁর আসার সাথে সাথেই দুর্ধর্ষ তাতার যুবতীরা তাঁকে জোর করে মদপান করনের চেষ্টা করে সকলে মিলে হত্যা করবে। পরে রটিয়ে দেয়া হবে তিনি বাইরে মদপান এবং ব্যভিচারের কপট বিরোধী ছিলেন বটে কিন্তু হেরেমে তিনি স্বয়ং তা পান করে উন্মত্ত হয়ে তাতার রমণীদের ব্যভিচারে বাধ্য করাতে গিয়ে নিহত হন। এর ফলে প্রমাণ হবে আওরঙ্গজেবকে যদিও হত্যা করা হয়েছে, ঠিকই হয়েছে। হয়ত কেহ কোন প্রতিবাদ না করে এটাই মেনে নেবে যে, 'চকচক করলেই সোনা হয় না'। সমস্ত চক্রান্ত ঠিকঠাক। শাহজাহানকে শুধু শোনান হয়েছিল যে, আওরঙ্গজেব পিতৃ হত্যার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছেন কিন্তু তাঁর সুযোগ্য পুত্র দারা এবং তাঁর অনুচরবর্গের চেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়। অতএব নিজে নিহত হওয়ার পূর্বেই আওরঙ্গজেবের উপযুক্ত শাস্তির প্রয়োজন আছে।

আওরঙ্গজেবকে শাহজাহানের স্বাক্ষর করা পত্র পাঠান হল। তিনি সেদিন অসুস্থতা সত্ত্বেও পিতার আদেশে আগমন করতে প্রস্তুত হলেন। রাজ দরবারে পৌঁছেও পিতার আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে কখনও কোন ত্রুটি হয়নি, যদিও কুপরামর্শদাতাদের পরামর্শে তিনি আওরঙ্গজেবের প্রতি অনেকবার অবিচার করেছেন। কিন্তু তবুও আওরঙ্গজেব সমস্ত কিছু ভুলে পিতার পদপ্রান্তে হাজির হয়ে শুভাশীষ নেবেন আর প্রত্যক্ষ শুভাশীষ নেবেন বিখ্যাত বিদূষী ভগ্নি জাহানারার-সমস্ত কুরআন যিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। এ সত্যের প্রতিচ্ছবি বোনেরা আজও মৌলিক ইতিহাসে চরিত্র দৃঢ়তায় স্বচ্ছ সুন্দর তারকার ন্যায় অমর হয়ে

Goto List

আছেন। তাঁর আর এক বিদূষী বোন রওশনআরা এ চক্রান্তের গোপন সংবাদ অবগত ছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন, আওরঙ্গজেবের মৃত্যু অবধারিত তখন তিনি বিশ্বস্ত দূত দ্বারা আওরঙ্গজেবকে সমস্ত চক্রান্তের সংবাদ জানিয়ে দিলেন। আওরঙ্গজেব চক্রান্তকারীদের উপর অতিশয় দুঃখিত হলেন এবং সে সাথে তাদের দমন করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

প্রতিনিয়ত পিতার ঘন ঘন ভুলভ্রান্তির অবসান ঘটানর একটা পথ ছিল পিতাকে হত্যা করা অথবা বন্দী করা। কিন্তু পিতৃহত্যা যেহেতু আওরঙ্গজেবের প্রাণপ্রিয় ধর্মের বিপরীত এবং মানবতা বিরোধী তাই তাঁর পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব ছিলনা। তাই বাধ্য হয়ে তিনি সমস্ত ফিতনা-ফাসাদের মূলোৎপাটনের জন্য সহজ সরল স্বাভাবিক পথে সম্মানজনক ও আরামদায়কভাবে তাঁকে আটকে রাখার ব্যবস্থা করলেন—আর এরই নাম নাকি 'বন্দীত্ব'।

এবার সামান্য আলোচনা হওয়া প্রয়োজন যে, এত বড় সন্ন্যাসী, ফকির, জিন্দাপীর, সত্যের প্রতীক বিখ্যাত পণ্ডিতের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়েছিল সিংহাসনকেন্দ্রিক কোন্দল? কিরূপে সম্ভব হয়েছিল ভাইদের সাথে কলহ? আর এ কথা কি সত্য যে, তিনি তাঁর ভাইদের হত্যা করেছিলেন?

প্রকৃত সমীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ভাল। আওরঙ্গজেব শৈশবেই সমগ্র কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করেছিলেন। ত্রিশ অধ্যায়যুক্ত সমগ্র কুরআন মুখস্থ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি একজন পূর্ণ আলেম হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আওরঙ্গজেব সারা দিন-রাতে খুব বেশি কুরআন পাঠ করতেন—তার প্রমাণ মূল ইতিহাস। আর যুক্তি হচ্ছে, তিনি নিজ হাতে কুরআন 'কপি' করতেন। তখন প্রেস ছিল না, অতএব অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং জোরাল স্মরণ না রাখলে তা অনর্গল লেখা যায় না। উপরন্তু কুরআনের শুধু একটি অক্ষর নয় বরং একটি 'জবর' 'জের' অর্থাৎ আ-কার ই-কার পর্যন্ত গোলমাল হলে তা বাতিল বলে গণ্য হয়।

আওরঙ্গজেব চেয়েছিলেন তিনি রাজ্য রাজনীতি ত্যাগ করে শুধুই ইবাদত ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাবেন। কিন্তু শাহজাহান জানতেন সমস্ত ভাইদের মধ্যে আওরঙ্গজেবই একমাত্র যোগ্য। সেজন্য যৌবনে পদার্পণের পর হতেই এ বিষয়ে মৃদু উপদেশ, আদেশ আর তিরস্কারের কষাঘাত সহ্য করতে হয়েছে আওরঙ্গজেবকে অনেকবার। শেষে জয় হল পিতা শাহাজানের। পিতার শেষ যুক্তি ছিল এটাই—তুমি আমার চেয়ে ধর্মের শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে অধিক অগ্রসর। আর পিতার সব আদেশ শিরোধার্য, যদি সে আদেশ ধর্মের প্রতিকূল না হয়। অতএব রাজনীতি করা ধর্মে অনুমোদিত না নিষিদ্ধ তুমিই ঠিক করে নাও। আমার দ্বিতীয় কথা—আমার অপেক্ষাও তুমি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বেশি ভক্ত বলে আমার ধারণা। তিনি কি ঘর সংসার, স্ত্রী পুত্র পরিজন, সমস্ত ত্যাগ করে ধার্মিকতা প্রদর্শন করেছেন, নাকি সমস্ত কিছুর ভারসাম্য বজায় রেখে ধার্মিকতা শ্রেষ্ঠতম কীর্তি স্থাপন করেছেন? এ সুচিন্তিত এবং সূক্ষ্ম অথচ তীব্র প্রশ্নের উত্তরে আওরঙ্গজেবকে পরাস্ত হতে হয় এবং পার্থিব জনকল্যাণকর বিষয়ে তাঁকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়।

সে সময়ে ভারত বিখ্যাত একজন মুসলমান ফকির এবং খুব উচ্চপর্যায়ের সাধকের দরবারে 'দোয়া' নেয়ার জন্য অনেকেই যেতেন। বাল্যকালে আওরঙ্গজেব স্বয়ং তাঁর পর্ণকুটিরে পদার্পণ করে তাঁকে দেখে অবাক হলেন। ছিন্ন তালি দেয়া বস্ত্র, নির্ভয়চিত্ত, প্রফুল্লবদন, উদাস আর প্রশ্নের সাথে সাথে অবিলম্বে উত্তর দান যেন পাগল বা শিশুর উত্তর প্রদানের মত। আওরঙ্গজেব তাঁকে সালামপূর্বক বলেন, 'আমার কিছু বিশেষ কথা আছে।' সাধক সাথে সাথে উত্তর দিলেন, 'আগে বস পরে কথা।' তিনি ছেঁড়া পুরাতন মখমলের উপর তাঁর পাশে বসিয়ে বলেন, 'আমি দিল্লির সিংহাসনের জন্য দোয়া নিতে এসেছি—যেন সারা

ভারত জুড়ে অশান্তি আর রক্তপাত না হয়, আর আমার মধ্যে যেন রাজকার্য পরিচালনার যোগ্যতা থাকে।' উত্তরে তিনি বলেন, 'তুমি তো দিল্লির সিংহাসন পেয়ে গেছ–তার উপরেই তো তুমি বসে আছ।' তারপর তাঁর সে ময়লা মখমলে হাত চাপড়ে বলেন, 'দেখ এইটাই হল দিল্লির সিংহাসন।'

দারা, সুজা, মুরাদ সকলেই এ জীবন্ত দরবেশের কাছে হাজির হলেন। প্রত্যেকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্বক দিল্লির বাদশাহী পাওয়ার অনুকূলে দোয়া প্রার্থনা করলেন। স্বনামধন্য দরবেশ প্রত্যেককে বসতে বলেন। তখন সকলে মাটির উপর বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর দরবেশ বললেন, 'তোমরা তোমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে নিয়েছ। সকলে এক বাক্যে উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন তাঁদের ভাগ্যফল। দরবেশ বলেন, 'মাটিতে যারা বসেছে তারা বাদশাহী পাওয়ার যোগ্য নয়।'

আওরঙ্গজেব অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন বলেই সম্রাট শাহজাহান তাঁকে অনেকবার জোর করেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহ দমনে ও প্রশাসন কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। সব ঐতিহাসিকেরা একমত যে সুদীর্ঘদিন যাবত আদিল শাহের সাথে শাহজাহানের যুদ্ধ চলেছিল। শাহাজাহান শিবাজীর পিতা শাহজী ও আদিল শাহের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেন। দাক্ষিণাত্য সম্রাটের করতলগত হল। এ শত্রুভাবাপন্ন দুধর্ষ দাক্ষিত্যের শাসনভার কোন্ শাহজাদাকে দেয়া যায় তা অনেক চিন্তা ভাবনার পর আওরঙ্গজেবের উপরেই ন্যস্ত হয়। অতএব এখানেও অন্যান্য ভাইদের তুলনায় আওরঙ্গজেবের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল। শাহজাহান অন্যান্য পুত্রদেরও দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দারা, সুজা একেবারে মাতাল, অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন। অবশ্য মুরাদের মধ্যে কিছু যোগ্যতার আভাস পাওয়া যেত। ১৬৪৬ খৃস্টাব্দে আলিমর্দান নামে একজন সুদক্ষ বীর সেনাপতিকে মুরাদের অধীনে বলখ বিজয়ে পাঠালেন। সম্রাট শাহজাহান মুরাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সজাগ যদিও ছিলেন তা সত্ত্বেও যুদ্ধে অধ্যাবসায়ী ও দূরদর্শী হওয়ার মানসেই তিনি এ সমরায়োজন করেছিলেন। আলিমর্দানের যুদ্ধ-কৌশলে বলখ মোঘলদের দখলে আসে। আয়েসী মুরাদ পার্বত্য প্রদেশে থাকতে চাইলেন না। সুষ্ঠু মোঘল প্রশাসন কায়েম না করেই মোঘল হেরেমে ফিরে এলেন। সাথে সাথে উজবেগগণ শক্তিশালী হয়ে মোঘলদের বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বলখ মোঘলদের হাতছাড়া হল। সম্রাট শাহজাহান তখন তাঁকে তিরস্কার করে বলেন, 'আমার আদেশ অগ্রাহ্য করে ফিরে এসে যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছ, তাতে আমার চেয়ে তোমারই ভবিষ্যত বেশি অন্ধকার হয়েছে।'

যাহোক এবার তিনি আওরঙ্গজেবকে পাঠালেন বলখ বিজয়ে। আওরঙ্গজেব পিতার আদেশে দু রাকাত নামাযান্তে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে রওনা হলেন। এখন বলখ হাতছাড়া, আবার নতুন করে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলখ দখল করা সহজসাধ্য নয় তবুও আওরঙ্গজেবের উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই। ১৬৪৭ খৃস্টাব্দে তিনি বীর বিক্রমে পুনরায় বলখ অধিকার করে বিদ্রোহের মুলোচ্ছেদ করে দেশে আবার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন।

এদিকে বুখারা হতে আবদুল আজিজ এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আওরঙ্গজেবকে আক্রমণ করলেন। আওরঙ্গজেব আবার দু রাকাত নামায শেষে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে এক উৎসাহব্যঞ্জক ভাষণে সৈন্যদের অপরাজেয় মনোবলের অধিকারী করে তুললেন। শেষে এ আক্রমণকারী দলকে প্রতিহত করে তিনি তৈমুরাবাদের দিকে সসৈন্যে অভিযান করলেন। এ সময়ে তাঁর বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা, রণনিপুণতা ও দূরদর্শিতায় ভীত বা প্রভাবিত হয়ে বুখারার সুলতান সন্ধির প্রস্তাব দেন।

ঠিক এ সময়ে মোঘল বাহিনী ভারতে ফিরে যেতে চাইলে বিচক্ষণ আওরঙ্গজেব তা মেনে নিয়ে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে কাবুল এসে পৌঁছালেন। ভারত সীমান্ত পেরিয়ে এশিয়া মহাদেশের এ বিপদসংকুল স্থানে আওবঙ্গজেবের অভিযানের কারণ ছিল। সম্রাট শাহজাহান এক সময় পুত্রদের তৈমুরের বাসভূমি ও পূর্বপুরুষদের অধিকৃত সমরকন্দ দখলের অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন। পিতার এ মনস্কামনা পূরণের জন্য আওরঙ্গজেব মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করে সৎসাহস ও পিতৃআনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সৈন্যবাহনী দীর্ঘকাল বিদেশে কাটার ফলে যুদ্ধবিমুখ হয়ে দেশে ফিরতে চাইলে আওরঙ্গজেব এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন।

উপরোক্ত আলোচ্যাংশে মুরাদের অযোগ্যতা আর পিত্রাদেশ অবহেলা বিশেষ লক্ষণীয়। অপর দিকে আওরঙ্গজেব যোগ্যতা, ধর্মপ্রবণতা এবং পিতৃভক্তির আদর্শ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্য এশিয়ায় দ্বিতীয় শাহআব্বাস কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলে, এবারেও সাহসী যুদ্ধনীতি বিশারদ আওরঙ্গজেবকেই যেতে হল মৃত্যুর মুখোমুখি হতে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আওরঙ্গজেব পতিপক্ষকে পরাস্ত করে বিজয়ী হলে শাহজানই শুধু নন, সর্বজন মনে আকর্ষিত হন তিনি।

আওরঙ্গজেবের এ বীরত্ব ও সুখ্যাতি অপরাপর ভাইদের চিন্তিত করে তুলেছিল। বিশেষ করে দারাকে। তাই তিনি পিতা শাহজাহানের কানে নানাভাবে বিষ বর্ষণ শুরু করেছিলেন। ঠিক এ সময়ে এক ঘটনা ঘটে যায়। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে আওরঙ্গজেব পারসিকদের সাথে যুদ্ধে আপ্রাণ চেষ্টা করেও পরাজিত হন। অমনি অপরের প্ররোচনায় শাহজাহান আওরঙ্গজেবের উপর ক্রোধান্বিত হয়ে পত্র লেখেন–'পত্রপাঠ পত্যাবর্তন কর, আমার আদেশ এটাই। কারণ তোমার ত্রুটিতেই পরাজয় হয়েছে।'

আওরঙ্গজেব কোন দুঃখ, অভিমান বা ক্রোধ প্রদর্শন না করে পিতার পদপ্রান্তে উপস্থিত হলেন। সিংহসান, বিজয়মাল্য, নেতৃত্ব কিছুই রাজপুত্রের প্রয়োজন নেই, শুধু চান ইবাদত করার সুযোগ, পড়ার আর লেখার অবাধ ফুরসত।

সম্রাট লোকের কথা শুনেই যে ভুল করেছিলেন একথা তাঁকে কেহ হয়ত বলেনি, কিন্তু ঠিক তার পরেই সম্রাট নিজেও চেষ্টা করলেন। কিন্তু এবারেও পারলেন না। তিনবার আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়ে মুখে স্বীকার না করলেও বুঝতে বিলম্ব হল না যে, আওরঙ্গজেব ত্রুটিমুক্ত। তাছাড়া জয়ের সাথে পরাজয়ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।

ইতিমধ্যে দারা সম্রাটের মৃত্যুর সংবাদ রটিয়ে সিংহাসনে বসলেন। তখন সম্রাট অবশ্য মৃত নন, তবে সত্তর বছরের বৃদ্ধ, শয্যাগত মুমূর্ষ রোগী। সনটি ছিল ১৬৫৭।

আবার উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, শ্রীঘোষ তাঁর ইতিহাসে দারার প্রতি দারুণ দরদ সত্ত্বেও লিখেছেন, "পিতার অত্যধিক স্নেহের ছায়ায় মানুষ হইয়া তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলা চলে।" দ্বিতীয় পুত্র সুজার জন্য লিখেছেন, "কর্মবিমুখতা ও আলস্য তাঁহার চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল।" আরও লিখেছেন, "স্থিরধীরভাবে কোন কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল।" অন্যদিকে আওরঙ্গজেব সম্পর্কে লেখক বিভিন্ন স্থানে বহু প্রকার অসংযত অপবাদ সৃষ্টি করলেও অন্যত্র আবার যা বলা আছে তা বিশ্বাস করলে লেখকের নিজেরই লেখা অভিযোগগুলো অসত্যে পরিণত হয় অর্থাৎ আওরঙ্গজেব যে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন শ্রীঘোষ লিখেছেন, "আওরঙ্গজেবের চরিত্র ছিল ইহার ঠিক বিপরীত। যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তেমনি স্থিরধীর ও হিসেবী। কর্মক্ষম ও অৎপর ছিলেন তিনি যথেষ্ট। রাজনীতির জটিলতা সম্বন্ধে তাঁর

যে অভিজ্ঞতা ছিল তাহা আর কাহারও ছিল না। শাহজাহানের পরিষদেরা জানিতেন যে, এ তৃতীয় পুত্রই সিংহাসনের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে হয়ত শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হবেন।" তিনি মুরাদের জন্য লিখেছেন, "কোন দিক দিয়া আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ ছিলেন না।"

তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা-মারামারির যে সব অভিযোগ আছে সে ব্যাপারে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল বিবাদ-ঝগড়া কাটাকাটি হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা নিঃসন্দেহে দোষণীয়। কিন্তু রাজরাজাদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, অশোকের নরহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ও দেশকে শ্মশানে পরিণত করার ইতিহাস সাধারণ দৃষ্টিতে মন্দ হলেও রাজাবাদশাহের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। বিগত ও বর্তমানের হতভাগ্য ইতিহাস সে সাক্ষ্যই বহন করছে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে এ দোহাই দিয়ে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করার ওকালতি করে তাঁর উজ্জ্বল ইতিহাসকে অনুজ্জ্বল না করাই ভাল।

শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার পরাজয় ও মৃত্যুর জন্য দায়ী যশোবন্ত সিং এবং অনেক রাজপুতের বিশ্বাসঘাতকতা। অবশ্য প্রথমেই দারার বিরুদ্ধে তিন ভাইই একমত হয়েছিলেন যে, দারাকে কোন মতেই দিল্লির সিংহাসনে রাখা যাবে না। আওরঙ্গজেব সিংহাসনলোভী ছিলেন না বরং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেককে অকল্যাণ হতে রক্ষা করতেই তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

অবিভক্ত বঙ্গে ১৯৪৬ সালের স্কুলের পাঠ্য পুস্তক 'ইতিহাস পরিচয়', ইংরেজ ঐতিহাসিক Lanepole-এঁর Analas of Rajasthan, প্রফেসর এইচ, যদুনাথ সরকারের History of Aurangjeb, ১৯৬৩ সালে ছাপা প্রফেসর এইচ, আর চৌধুরী ও এ, বি, সিদ্দীক লিখিত 'পাক ভারতের মুসলমানের ইতিহাস' এবং 'তারিখে আলমগীর' ইত্যাদি পুস্তক হতে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

"তাঁহার (দারার) চঞ্চল স্বভাব এবং রুক্ষ মেজাজের জন্য দরবারের অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধাভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার উদার মতবাদ(হিন্দুবাদ) অনেকের মনে বিরুদ্ধভাব এবং ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল। তাঁহার হিন্দুদের সাথে মিত্রতা এবং শিয়া মতবাদের প্রতি অনুরাগ সিংহাসন লাভের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দ্বিতীয় পুত্র এবং বাংলার শাসনকর্তা সুজা বুদ্ধিমান এবং কৌশলী শাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ছিলেন এবং মদপানের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি তাঁহার অনেক সদগুণ বিনষ্ট করিয়াছিল।"

মিঃ ঘোষের ইতিহাসের উদ্ধৃতি উপরে দিয়েছি তাতে তাঁরা যে মদপানের চূড়ান্ত মাতাল ছিলেন এটা গোপন রাখা হয়েছে। আর শেষের উদ্ধৃতির মধ্যে সুজার স্বেচ্ছাচারিতা, নারী লোলুপতা ও ব্যভিচারের দোষ গোপন করে শুধু লেখা হয়েছে 'অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ছিলেন'।

অধ্যাপক চৌধুরী ও সিদ্দিকের ইতিহাসে ঠিক তার পরেই লেখা আছে–"সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসনকর্তা। তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি চরিত্রহীন এবং ঘোর মদপায়ী ছিলেন। শাসকের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার তাঁহার মধ্যে তাহার অভাব ছিল।" আর রাজপুত্র চরিত্রহীন মদপায়ী হলে রাজ্যের পরিণতি কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। একজন খুব ধনী ও বিত্তবান ব্যক্তি মদপায়ী ও চরিত্রহীন হলে বাড়ির পরিচারিকা ও অধিনস্থ নর-নারীর ভাগ্যে কি ভয়াবহ দুর্ভোগ নেমে আসে তা অনেকের জানা আছে। অতএব আওরঙ্গজেব মাথা তুলে তখন সৌভাগ্যসূর্যের মত উদিত না হলে অন্যায়ের অন্ধকার ভারতের নির্মল নীলাকাশের গায়ে যে ভয়াবহ রূপ নিত এ বিষয়ে সন্দেহ খুব অল্প ছিল।

দারা তাঁর পিতার স্নেহের সুযোগে আওরঙ্গজেবের উপর যে অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত নমুনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

(ক) ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য হতে আওরঙ্গজেবকে আকস্মিক আহ্বান যা অন্য কোন রাজকুমারের পক্ষে সহ্য করা সহজসাধ্য ছিলনা।

(খ) কান্দাহারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার যুদ্ধের পূর্ণ আয়োজন করে আক্রমণ করার ঠিক পূর্বে সংবাদ পৌছাল নিষেধাজ্ঞার। তাও তরুণ শাহজাদা মুখ বুজে সহ্য করলেন।

(গ) মুলতান শাসনের সময় সৈন্যদের ব্যয়ভারের জন্য পিতার কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু অসহায় অবস্থায় তাঁকে কোন রকম সাহায্য করা হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হল। আওরঙ্গজেব তাও মুখ বুজে সহ্য করলেন।

(ঘ) আওরঙ্গজেব নিজের পুত্রের বিবাহ সুজার এক সুন্দরী কন্যার সাথে দেয়ার মনস্থ করেন কিন্তু তাতেও তিনি বাধা প্রদান করেন।

ইতিহাসে আজও মজুত আছে যে, এ সমস্ত অপকর্মের মূলে দারার কারসাজি ছিল সাংঘাতিকভাবে। যেমন প্রফেসর চৌধুরী ও সিদ্দিকের ইতিহাসে লেখা আছে– "আওরঙ্গজেবের প্রতি শাহজাহানের এ ব্যবহারের মূলে দারার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রকট।" 'পাক ভারতে মুসলমানের ইতিহাস' পুস্তকের ২৮৬ পৃষ্ঠা থেকেও কিছু অংশ তুলে ধরছি–"দারা তাঁহার ভ্রাতাদের ভকিলগণের (Vokil) নিকট হইতে এই মর্মে আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন যে, দূর প্রদেশে অবস্থানরত শাহজাদাদের নিকট তাঁহারা সম্রাট অথবা দরবারের কোন সংবাদ পাঠাইবেন না। কেন্দ্রের সহিত সকল যোগাযোগ তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং পথিকগণ যাহাতে কেন্দ্রের কোন খবর প্রচার করিতে না পারে তার জন্য বাংলা, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তাঁহার ভ্রাতাগণের ভকিলদের সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন এবং আওরঙ্গজেবের অধীনে বিজাপুরে সংগ্রামরত কর্মচারীদের তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য আদেশ দান করিয়াছিলেন। শাহজাদাগণ রাজধানীতে প্রবেশের পূর্বেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি সৈন্যদের আদেশ দিয়াছিলেন। দারাশিকোর এই সমস্ত কার্যাবলী ভ্রাতৃসংগ্রামকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল।" দারাশিকোর ভিতরে এত নোংরামি, অবিচার, অন্যায় ইতিহাসে না জানিয়ে শুধুমাত্র আওরঙ্গজেবের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুদের বীর এবং সজ্জন বলে মানুষের মনে বিরুদ্ধ ধারণা জন্মিয়ে দিয়ে কাজ শেষ করে গেছেন অনেকেই। কিন্তু এখন সমস্ত চক্রান্ত শিক্ষিত উদারচেতা মানুষদের কাছে আস্তে আস্তে ধরা পড়ছে এবং পড়তেও থাকবে।

আওরঙ্গজেবের উপর এত অবিচার আর অপমানজনক অনাচার প্রয়োগ সত্ত্বেও তিনি কোন্ চিরিত্রের মানুষ ছিলেন সেটা জানার জন্য বিখ্যাত ইতিহাস 'আদব-ই-আলমগীরী' হতে আওরঙ্গজেবের নিজের হাতের লেখা একটি মূল্যবান পত্র যা তাঁর বোন জাহানারাকে তিনি লিখেছিলেন, সেটির অনুবাদ উদ্ধৃত করা হচ্ছে–"...যদি সম্রাট তাঁর সমস্ত চাকরদের মধ্যে কেবল আমারই অবমাননার জীবন-যাপন এবং অগৌরবময় মৃত্যু দেখতে ইচ্ছা করেন তাতেও আমি তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারব না। ...কাজেই সম্রাটের অনুমতিক্রমে যাতে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি না হয় এবং অন্য লোকের (দারার) মনে শান্তি ব্যাহত না হয় সেজন্য এ বিরক্তিকর জীবন-যাপন হতে মুক্তি নেয়াই উত্তম। দশ বছর পূর্বে আমি এ সত্য উপলব্ধি করেছিলাম এবং জীবন বিপদাপন্ন বুঝতে পেরেই অন্য লোকের (দারার) ক্ষতির কারণ না হওয়ার জন্যই পদত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলাম...।" এ পত্রটি গবেষকদের জন্য চিন্তার খোরাক হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

শাহজাহান মৃত্যু ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ করে নভেম্বর মাসেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু তার আগেই দারা পিতার অন্ধ ভালবাসা পেয়ে সিংহাসাহন দখল করে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেছিলেন। মুরাদও লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই আহমদাবাদে রাজমুকুট ধারণ করে নিজেকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। সুজাও সোজা পথ ধরলেন অর্থাৎ তিনিও বাংলাদেশের স্বাধীন রাজা বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। আওরঙ্গজিব তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, শুধু ভাবছিলেন এ অপদার্থ ভাইদের হাতে সিংসাহন যাওয়া মানেই বাচ্চাদের হাতে ধারাল অস্ত্র তুলে দেয়া। তাই তিনি 'ইস্তিখারা'র নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে তাঁকে নাকি বলা হল, 'তুমি তোমার লক্ষ্যস্থানে পৌছার চেষ্টা কর। তোমার সাধুতা ও রাজ্য পরিচালনা দুই-ই এক সাথে সম্ভব হবে।'

তিনি এবার মীরজুমলাকে সেনাপতি করে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে উজ্জয়িনীতে তিনি সৈন্যসহ মুরাদের সাথে মিলিত হলেন। এ সময়ে মুরাদকে যুদ্ধে নিহত করে পথ নিষ্কণ্টক করা কষ্টসাধ্য ছিলনা। কিন্তু কোন যুদ্ধই করলেন না, বরং মিলনের কথাই হল।

এদিকে দারার সাথে সুজার সসৈন্যে যুদ্ধ হল ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ। সুজা পরাজিত হলেন। এবার মুরাদ এবং আওরঙ্গজিবের বাহিনীকে শায়েস্তা করার জন্য দারার দুই সেনাপতি যশোবন্ত সিং এবং কাশেম খাঁ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তুমুল যুদ্ধ হয় উজ্জয়িনীর নিকট ধর্মাট নামক স্থানে। যুদ্ধে দারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। পরাজিত হওয়ার অন্য তম কারণ ছিল চরম মুহূর্তে রাজপুত সেনাপতি যশোবন্ত সিং এর বিশ্বাসঘাতকতা। মিঃ ঘোষও তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন—"মোঘল শিবিরে হিন্দু সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ ও মুসলমান সেনাপতি কাশেম খাঁর মধ্যে মতবিরোধের ফলে ঔরঙ্গজীব যুদ্ধে জয়ী হন।" এ যশোবন্ত সিংহ পলাতক দারার দরদে দরদী হয়ে তাঁকে পত্র পাঠালেন—"তিনি যদি আজমীরে আসিতে পারেন, তবে তিনি এবং অন্যান্য রাজপুতেরা তাঁকে সাহায্য করবেন। এ আশ্বাসের উপর নির্ভর করে দারা আজমীরে এসে উপনীত হলেন। কিন্তু ইত্যবসরে যশোবন্ত সিংহ আওরঙ্গজিবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর পক্ষভক্ত হয়ে পড়লেন। কাজেই দারা আজমীরে এসে প্রতারিত হলেন।" (ইতিহাস পরিচয়, পৃষ্ঠা ১২৭)

এর চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাসে আর কি হতে পারে? সাহায্য তো দূরের কথা, একেবারে শত্রুপক্ষের সাথে হাত মিলিয়ে চরম কপটতা প্রদর্শন করে ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করেছেন। সে অবস্থায় যুদ্ধ হল আওরঙ্গজেবের সাথে। কিন্তু দারাকে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য হতে হল। এ দারুণ সঙ্কট সময়ে দারার যাবতীয় ধনরত্ন ও মাল সামগ্রী একদল রাজপুত লুট করে দারার প্রতি মানবতা বিরোধী ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত তথ্যগুলো এ 'ইতিহাস পরিচয়' হতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রসেফর যদুনাথ সরকার তাঁর 'History Of Aurangjeb' নামক গ্রন্থের ৫০৫ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তাও গভীর কৃতজ্ঞতারসাথে পরিবেশিত হল ঃ

> "Of all the actors in the drama of the War of Succession Jasawant emerges from it with the worst reputation : he had run away from a fight where he commanded in chief, he had breacherously attacked an unsuspecting friend and to abandoned an ally whom he had plighted his word to support and whom he had lured into danger by his promises. Unhappy was the man who put faith in Jasawant Singh, lord Marwar and chieftain of the Rathor clan."

দারা গুজরাটে পলায়ন করলেন। মুরাদ এতদিন পর্যন্ত আওরঙ্গজিবের পক্ষের লোক ছিলেন। হঠাৎ তাঁকে বিশেষ কিছু পক্ষ হতে প্রলোভন ও উৎসাহ দেয়া হল। আওরঙ্গজিব তাঁকে মোটেই অবিশ্বাস করতে পারেন না। এ সুযোগে যদি তিনি আওরঙ্গজেবকে নিহত বা পরাজিত করতে পারেন তাহলে জনসাধারণের কাছে প্রমাণিত হবে মুরাদ আওরঙ্গজেবের চেয়েও সুযোগ্য, সুতরাং তাঁর ভবিষ্যত হবে উজ্জ্বল। মাতাল মুরাদ এ ভুল ধারণাকে এক অপূর্ব সুযোগ মনে করে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। আওরঙ্গজেব অবাক হলেন বটে, কিন্তু কালবিলম্ব না করে সাহস ও নিপুণ কৌশলে মুরাদের দুঃসাহস ব্যর্থ করে তাঁকে বন্দী করে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন।

ওদিকে ভ্রাতা সুজা সুলেমানের কাছে পরাজিত হয়ে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে আওরঙ্গজিবের উপর সসৈন্যে আক্রমণ করলেন। খাজোয়া নামক স্থানে দুপক্ষের তুমুল সংঘর্ষ হল। এবারে এ যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি হয়ে এসেছেন বিশ্বাসঘাতক নীতিহারা আওরঙ্গজিবের ক্ষমাপ্রাপ্ত যশোবন্ত সিংহ। এবারও যশোবন্ত সিংহের নূতন কীর্তি ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়–যদিও তা যবনিকার অন্তরালে বিরাজমান। 'ইতিহাস পরিচয়' থেকে তুলে দিচ্ছি–"কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যশোবন্ত সিংহ গোপনে গোপনে সুজার সহিত যোগ দিয়া একদিন রাত্রিকালে আওরঙ্গজিবের শিবির আক্রমণ করিয়া বসিলেন। এরূপ বিপদের মধ্যেও আওরঙ্গজিব বিচলিত হইলেন না, শীঘ্রই তিনি যশোবন্ত সিংহকে পরাজিত করিলেন। তখন যশোবন্ত সিংহ প্রাণভয়ে পলাইয়া গেলেন; যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়নপূর্বক সুজাও আরাকানে আশ্রয় লইলেন। অতঃপর তাঁহার আর কোনরূপ সন্ধান পাওয়া গেল না। খুব সম্ভব আরাকানবাসীদের হস্তে তিনি সপরিবারে নিহত হইয়াছিলেন।" উদ্ধৃতিটুকুতে এও বোঝা গেল যে, তাঁর মৃত্যুর জন্য আওরঙ্গজেবের উপর ভ্রাতৃহত্যার দোষারোপ শুধু মিথ্যা তথ্য পরিবেশন নয় বরং তা যে ইতিহাস না জানার, না বোঝার তথ্য অযোগ্যতার চরম পরিচায়ক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

যশোবন্ত সিংহের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল তা গবেষক ও ঐতিহাসিকদের সমীক্ষার বিষয়। এত অপরাধ করার পর যশোবন্ত আওরঙ্গজেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আওরঙ্গজেব সাথে সাথে তাঁর পবিত্র কুরআনের আদর্শে ও হযরত মুহম্মাদ (সাঃ)-এর বাণী স্মরণ করে পুনরায় তাঁকে ক্ষমা করলেন এবং শাসনকর্তারূপে কাবুলে পাঠিয়ে দেন। আজ বোঝবার দিন এসেছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুধু মৌখিক ক্ষমা নয়, আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ কাবুলের শাসনকর্তা করে পাঠান, অন্ততঃ একজন হিন্দুকে, কোন 'হিন্দু বিদ্বেষী' 'গোড়া মুসলমানের ' পক্ষে সম্ভব ছিলনা। এও দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, তাঁকে হিন্দু বিদ্বেষী, তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না, হিন্দুদের রাজকর্ম হতে অপসারণ করতেন প্রভৃতি কথা যাঁরা বলেছেন আজ তাঁরাই বরং ইতিহাসের আদালতে আসামী প্রতিপন্ন হবেন। তবে নতুন লেখক না জানার কারণে যা করেছেন তা ক্ষমা পাওয়ার দাবী করতে পারে।

মুরাদ হত্যার সহজ অপবাদ আওরঙ্গজেবের উপর যেভাবে বরাবর চাপিয়ে আসা হয়েছে তাতে এ তথ্যও অনেকের কাছে সত্য বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তা মূল ইতিহাস, যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধি ও বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই না করলে ইতিহাস হিসেবে তা স্থায়ী মর্যাদা পায় না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আওরঙ্গজেব কুরআন ও হাদীসপন্থী সহজ, সরল, সত্যবাদী ও সদাচারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি কাজী বা মুফতিপদে ছিলেন না। বরং বিচার, 'ফাতওয়া', মীমাংসা, সমাধান, 'ইজমা ও কিয়াসে'র জন্য কাজী, মুফতি, আল্লামা ও উলামাদের কমিটি প্রস্তুত ছিল। তাঁদেরই কাজ ছিল বিচার ও সমস্যার সমাধান করা। আর মুরাদের মৃত্যুও ছিল এ সমস্ত বিচারকের বিচারের পরিণাম।

আওরঙ্গজেবের সময়ে একজন সাধারণ প্রজা তাঁর আত্মীয়কে হত্যা করার অভিযোগে মুরাদের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য বিচার প্রার্থনা করেন। বাদশাহ নিজে বিচার করার যোগ্যতার নীতি অনুসারে বিচার বিভাগীয় প্রধান বিচারপতির কাছে মুরাদের বিচার হল এবং সাক্ষী ও প্রমাণে অন্যায় হত্যা বলে প্রমাণিত হল। ইসলাম ধর্মের আইনানুসারে প্রাণনাশের শাস্তি প্রাণদণ্ড-অবশ্যই তা প্রমাণের পূর্বে নয়। আজ ইতিহাসে সোজাসুজি আওরঙ্গজেব কর্তৃক মুরাদের নিহত হওয়ার সম্পূর্ণ ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে সত্য কথা হচ্ছে এ যে, বিচারকের বিচারে প্রাণনাশের অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। যাঁকে মুরাদ হত্যা করেছিলেন তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষিত। সে বিশিষ্ট নিহত কর্মচারির নাম ছিল আলী নকী খাঁ।

আওরঙ্গজেব তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে হত্যা করছিলেন-এ রকম কথাও ইতিহাসে সহজ সরলভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু দারার বিরুদ্ধেও একটা ঐতিহাসিক অভিযোগ ছিল, যার শাস্তি প্রাণদণ্ড। তিনি রাজদ্রোহীতা, গুপ্তচরবৃত্তি, শত্রু রাষ্ট্রের সাথে আঁতাত প্রভৃতি আরও অনেক অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। ইসলামের আইনে কিন্তু যখন তখন মনগড়া কোন শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা নেই। যেমন বৈদ্যুতিক আঘাত দেয়া, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা, পানিতে ডুবিয়ে কিংবা গরম পানিতে বা তেলে সিদ্ধ করা, মলদ্বারে লৌহ শলাকা প্রবিষ্ট করিয়ে মাথা অবধি তা পৌঁছে দেয়া, বিষপান করান ইত্যাদি শাস্তিগুলো নিষিদ্ধ। ইসলামের আইনে কেহ কারো প্রাণনাশ করলে, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে এবং 'মোরতাদ' হলে তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। দারারও প্রাণদণ্ড হয়েছিল আওরঙ্গজেবের আদেশে নয় বরং আইনের অনুকূলে, জজের বিচারে। মদপান, ব্যভিচার ও স্বধর্ম ত্যাগ প্রভৃতি একাধিক কারণে বিচারকমণ্ডলী তাঁকে প্রাণদণ্ডে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য অনুসন্ধিৎসা থাকা স্বাভাবিক যে দারা সত্য ধর্মত্যাগী ছিলেন কি না?

অনেক হিন্দু রাজপুত নেতার প্ররোচনায় যেমন আকবরকে বেশ বশ করে মুসলমান নামধারী শ্রেষ্ঠ হিন্দুতে পরিণত করা গিয়েছিল, যুবক অবস্থায় জাহাঙ্গীরের অবস্থা অনুরূপ ছিল এবং পরবর্তী সময়ে দারাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ পথের পথিক হয়েছিলেন। দারা ছিলেন আকবরের মত বাইরের কাঠামোধারী ছদ্মবেশী। দারা সম্বন্ধে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আকরাম খাঁ লিখিত দুর্লভ গ্রন্থ মোঃ বঙ্গের ইতিহাস হতে সংগৃহীত কিছু তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে ঃ

দারারও ধারণা হয়েছিল ভারতে হিন্দু জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং তাদের হাতে রাখার অর্থই হচ্ছে বিনা বাধায় দিল্লির সম্রাট হওয়া। অতএব আকবরের নীতি অনুসরণ করে দারার নিজের ভূমিকা আরও হৃদয়গ্রাহী করতে 'দীনে ইলাহী'র ন্যায় তিনিও এক নূতন ফরমূলা আবিষ্কার করেন। এছাড়া একটি 'ধর্মগ্রন্থ'ও লিখলেন। বইটির নাম 'মাজমাউল বাহরাইন', এর অর্থ হচ্ছে 'সাগরদ্বয়ের মিলন'। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম দুটি যেন দুটি সাগর আর সে দু'টির সন্ধি ঘটিয়ে খিচুড়ি তৈরি করাই ছিল দারার পরিকল্পনা। দারা দস্তুরমত সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষতঃ উচ্চ পর্যায়ের হিন্দু শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

একজন অমুসলমান পণ্ডিত বেশ ধারণ করে দারার সাথে সাক্ষাত করেন এবং নিজেকে 'ফকির-মাওলানা' বলে পরিচয় দেন। বলাবাহুল্য এ পণ্ডিত মশাই দারাকে বিভ্রান্ত করবার জন্য মুসলমানের কিছু বই পত্র পড়ে সামান্য কিছু মুন্সীয়ানা হাসিল করেছিলেন। তিনি দারাকে উপনিষদের মহিমা বর্ণনা করে তার শিক্ষা নিতে উৎসাহিত করেন। ফকির মাওলানার কথায় তিনি বেনারস হতে কয়েকজন সুপণ্ডিতকে আহ্বান করেন এবং মনোযোগ দিয়ে উপনিষদ শিক্ষা করেন। এখান থেকেই দারার হৃদয়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণের বীজ রোপিত

হয়। মাত্র ছয় মাসের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ রাষ্ট্রভাষা ফারসীতে উপনিষদের অনুবাদ করে নিজের যোগ্যতা প্রদর্শন ও হিন্দু জাতির প্রিয়পাত্র হতে সক্ষম হন। বইটি শুধু উপনিসদের অনুবাদ মাত্রই ছিলনা, তাতে ছিল তাঁর নিজের সৃষ্টধর্মের নানা টীকা টিপ্পনী। আর উপনিষদ ও তাঁর 'সাগরদ্বয়ের মিলন' গ্রন্থকে প্রমাণিত করতে গিয়ে কষ্ট-কল্পনা করে কুরআন ও হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করতেও দ্বিধা করেননি। তাঁর 'মাজমাউল বাহরাইন' গ্রন্থের অনুবাদ করেন ফরাসী কবি 'মুসাআকতাই দুর্পেয়া'।

যুবরাজ দারা সিংহাসন দখলের জন্য লড়াইয়ের পূর্বে সমাজের নেতৃস্থানীয় হিন্দু নেতাদের সহযোগিতা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন। অনেকেই তাঁকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। দারার প্রতি যাতে বিশ্বাস আরও গাঢ় হয় সে অভিপ্রায়ে হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র মথুরায় একটি মন্দির করেছিলেন। মথুরার মন্দিরে বহু মূল্যবান কারুকার্য খচিত পাথরের রেলিং স্থাপন করেন। দারার দ্বারা সজ্জিত সে মন্দির গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। তার মারাত্মক একটা দিকও ছিল–হিন্দুদের তীর্থস্থানে হিন্দু তীর্থ যাত্রীর ভীড় তেমন কিছু নূতন নয়, কিন্তু দারার সাহায্যপুষ্ট কেশব রায়ের মন্দির, গুজরাটের মন্দিরগুলোকে কেন্দ্র করে অনেক আশ্চর্য অলীক গল্প প্রচারিত হয়েছিল। যেমন শাহজাহান একবার অসুস্থ হলে দারা ঠাকুর দেবতার শরাণাপন্ন হন এবং এক ঠাকুরের বরে বৃদ্ধ শাহজাহান সুস্থ হয়ে ওঠেন। সে দেবতার শক্তিকে অভিভূত হয়ে তিনি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মে মুর্তিপূজা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু সম্রাট দারার অর্ঘের ঘনঘটার বহর লক্ষ্য করে সাদাসিধে রোগগ্রস্ত বিপদগ্রস্ত নর-নারীর এমন সমাবেশ হতে তাকে যে তীর্থকেন্দ্রগুলো মুসলমান ও হিন্দুদের যুগ্ম তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এবং এখান থেকে দারার রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হত, এ সমস্ত ধর্মীয় পুরোহিতদের দ্বারা। আওরঙ্গজেব সম্রাট হওয়ার অনেক দিন পরে কাজী মুফতির দরবারে দারার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়। সে মোকদ্দমায় তাঁর স্বহেস্ত লিখিত পত্র, সনদযুক্ত লেখা, পুস্তকাদি ও প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষ্যে দারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। সে রায় প্রকাশে সংবাদে আওরঙ্গজেব বলে পাঠিয়েছিলেন–আপনাদের রায়ের উপর কোন প্রতিবাদ করার স্পর্ধা আমার নেই। কোরআন হাদীসের আলোয় যে বিচার হয়েছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলার অর্থ হচ্ছে ইসলাম ধর্মে হস্তক্ষেপ করা।

উপন্যাসে মার্কা সস্তা হেটো ইতিহাসে 'সিংহাসনের জন্য ভাইদের হত্যা করিয়াছিলেন' বলে যে তথ্যটি বহুল প্রচারিত, একটু গভীর চিন্তা করলেই তার অসারতা প্রমাণ হয়। কারণ সিংহাসনের জন্য হত্যা করলে তা সিংহাসন পাওয়ার পূর্বেই করা হত। কিন্তু তাঁর সিংহাসন পাওয়ার পরে তখন তিনি সম্রাট হয়ে সিংহাসনে সম্পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী যখন হাতের মুঠায় বন্দী যখন এত কলাকৌশল করে হত্যা করার প্রহসন সৃষ্টির প্রয়োজন ছিলনা। তাঁকে মেরে ফেলার পর 'রোগগ্রস্ত হয়ে মারা গেছে'–বললেই যথেষ্ট ছিল। অতএব বলাবাহুল্য যে, 'সিংহাসনের জন্য ভাইদের হত্যা' করার অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য।

(৫) 'কেবল হিন্দুদেরই উপর জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন' বলেও যে অপবাদটি ব্যাপক প্রচারিত তা নিঃসন্দেহে সম্রাট আলমগীরের চরিত্রের উপর এক জঘণ্যতম আক্রমণ। অবশ্য বিস্তারিত আলোচনার পরেই তার সত্যাসত্য প্রমাণ হবে।

আকবর জাহাঙ্গীর প্রভৃতি বাদশাহরা জিজিয়া তুলে দিয়েছিলেন বলে সহজেই মনে হয় তা তাঁদের উদারতা। আর আওরঙ্গজেব আবার তা প্রবর্তন করে যেন হিন্দু বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছেন। আসলে আকবর ও জাহাঙ্গীরের জিজিয়া প্রথার বিলোপ সাধন ছিল গুরুতর ইসলাম বিরোধী কাজ। সেহেতু আওরঙ্গজেব যদি তা পুনঃপ্রচলন না করতেন তাহলে তাও

হত ইসলাম বিরোধী নীতি অবলম্বন। তাই তাঁকে জিজিয়া কর আবার ধার্য করতে হয়েছিল। এবং জিজিয়া শুধু হিন্দুদের দিতে হত, কোন মুসলমানকে নয়। তার কারণ হচ্ছে এ যে, জিজিয়া একটি সামরিক কর মাত্র, এটি 'মাথা গণতি' কর নয়। কোন (হিন্দু) মহিলা, বালক বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু, অন্ধ, খঞ্জ, ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসীকে এ কর দিতে হতনা। অমুসলমানদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধ করার শক্তি রাখতেন বা সক্ষম অথচ যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক শুধু তাঁরই দিতে হত এ কর। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্যতামূলক যুদ্ধ করার জন্য অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের সাহায্য ও শুশ্রূষা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। অপরপক্ষে ইসলাম ধর্মে এরূপ কোন সংবিধান নেই যে, জোর করে কোন অমুসলমানকেও যুদ্ধে যোগদান করান যাবে।

মুসলমানদের জন্য মাল বা অর্থের ১/৪০ ভাগ একটা কর বাধ্যতামূলক ছিল, তার নাম যাকাত। এতদ্ব্যতীত ওশর অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের ১/১০ অংশ, ফিতরা, খুমুস, সদকা ও ফিদিয়া প্রভৃতি আরও ছোট বড় অনেক কর শুধু মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ছিল, হিন্দুদের ক্ষেত্রে এ সমস্ত কর নেয়া নিষিদ্ধ ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য কথা হল, হিন্দু প্রজাদের কাছে যে জিজিয়া নেয়া হত তা তাঁদের স্থাবর অস্থাবর সম্পদ সম্পত্তির রক্ষার দায়িত্বের ভিত্তিতেই নেয়া হত। প্রফেসর যদুনাথ সরকার লিখিত 'Mughal Administration' গ্রন্থে পাওয়া যায়, আওরঙ্গজেব ৬৫ প্রকার কর তুলে দিয়েছিলেন এবং এ কর তুলে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রের সেই বাজারে বাৎসরিক পাঁচ কোটি টাকার উপর ক্ষতি হত। অপর ঐতিহাসিকদের অনেকেই বলেছেন, যখন তিনি ৮০টি করের বিলোপ সাধন করলেন তখন প্রশংসা পাননি কিন্তু শুধু একটি করের জন্য চারিদিকে এত কলরব ধ্বনি। 'Vindication of Aowrangzeb' গ্রন্থে আছে–"When Aowrangzeb abolished eighty taxes no one thanked him for his generosity. But When he imposed only one, at not heavy at all, people began to show their displeasure."

এ জিজিয়া শুধু ভারতেই মুসলমান বাদশাহ কর্তৃক হিন্দুদের উপর ধার্য হয়েছিল তা নয় বরং বহির্ভারতেও এ কর মুসলমানদের উপর ধার্য হত–শুধু যাঁরা যুদ্ধে যেতে সক্ষম অথচ অনিচ্ছুক তাঁদের উপরই ছিল এ কর। অতএব জিজিয়াকে একটি হিন্দু বিদ্বেষী কর বলে মনে করা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

জিজিয়া একটি war tax বা যুদ্ধ কর মাত্র। এ জিজিয়া কোনও দিন অত্যাচার করে আদায় করা হয়নি। সম্রাট হিন্দু নেতাদের সাথে পরামর্শক্রমে এ কর আদায় করতেন। কোন ঐতিহাসিক বা লেখক প্রমাণ করতে পারবেন না যে, কোন সুস্থ সবল হিন্দু সৈন্যকেও এ কর দিতে হয়েছিল।

আরও মনে রাখার কথা হল, আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসেই প্রথম বছরেই হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর চাপাননি বরং ১৬ বছরের মধ্যে ৮০ প্রকার কর তুলে দিয়ে তারপর সামান্য জিজিয়া ধার্য করেছিলেন। আর তাই নিয়ে ইতিহাসে এত হৈ চৈ, এত আয়োজন। বোধ হয় আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু। যাকে 'ইসলামী কোড' বলা হয় সেটা আরবী 'হিদায়া' আইন গ্রন্থেরই অনুবাদ বা ছায়া সম্বলিত। তাতে লেখা আছে–"জিজিয়া কর প্রবর্তনের কারণ, এ কর সে সাহায্যের পরিবর্তে যার দ্বারা রাজা অমুসলিমদের জীবন, ধন ও মানসম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়েছেন।" এ গ্রন্থের অন্যত্র আরও আছে–"যদি তাঁরা জিজিয়া গ্রহণ করা মঞ্জুর করলেন তো তাঁদের হিফাজত এরূপভাবেই করা উচিত যেমন মুসলমানদের করা হয়, তাদের জন্য সে আইন প্রবর্তিত হবে যা মুসলমানদের প্রতি হয়। কারণ হযরত আলী (রাঃ) বলে গেছেন, অমুসলিম জিজিয়া এজন্য দান করে থাকেন যে, তাঁদের রক্ত মুদসলিমদের রক্ত এবং তাঁদের ধন-সম্মান মুসলিমদের ধন-সম্মানের সমান।"

বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত ডাঃ গাস্তাওলিবান লিখেছেন, "ইসলামের খলিফারা ভালভাবে বুঝেছিলেন যে, ইসলামকে তরবারির জোরে প্রচার করা সম্ভব নয়। কাজেই দেখা গেছে যেখানেই মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করেছেন সেখানেই পরাজিত নগরবাসীদের প্রতি খুব নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করেছেন এবং তাদের সুখ শান্তিতে রাখার সব প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করে তার বিনিময়ে যৎকিঞ্চিত কর (জিজিয়া) গ্রহণ করতেন। অমুসলিমগণ পূর্বের রাজাকে যে কর দান করত তার তুলনায় জিজিয়া কর অতি নগণ্য ছিল। এ অতি সত্য কথা যে, দুনিয়াতে এরূপ সংযমী ভদ্র রাজ্যবিজেতা পূর্বে কোন কালে জন্মে নাই এবং এরূপ নম্র ও দয়ালু জাতি ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই।"

ডাঃ জে. কে. কান্তি তাঁর 'স্পেনের ইতিহাস' গ্রন্থে যা লিখেছেন তাতে জিজিয়া সম্বন্ধে কুধারণার পরিবর্তে সুধারণারই উদ্রেক হয় ঃ "সেই শর্ত যাহা পরাজিত জাতির নিকট জয়ী মুসলমানদের তরফ হইতে আদায় করা হইত তাহা এইরূপ ছিল, ইহাতে তাহাদের কোনরূপ কষ্টের পরিবর্তে বরং তাহাদের মনে পূর্ব শান্তি বিরাজ করিত। সুতরাং পরাজিত জাতি নিজের ভাগ্যকে যাহা পূর্বে ছিল তাহা বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, মুসলিমদের স্পেনে আসা নিজেদের সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছে। ধর্ম-কর্ম তাহারা স্বাধীনভাবে পালন করিতে এবং তাহারা নিজের ধন, মান, জীবন গীর্জাগুলি রক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তিতে জীবন-যাপন করিত। তাহাদের এইসব সুখ বিজয়ী নীতির অনুগত হওয়ার ফলস্বরূপ ছিল এবং তাহাদের নিকট হইতে যে জিজিয়া কর নেওয়া হইত তাহা খুবই সামান্য ছিল। কাজেই স্পেনের সব অমুসলিমদের মনে আরবীয়গণের প্রতি এ বিষয়ে তাহারা পক্ষপাতশূন্যভাবে ন্যায় বিচার করে।"

ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পন্ডিত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ দুঃখ করে লিখেছেন, "পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস পড়াশোনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতের হিন্দু জনসাধারণ অনেকে জিজিয়া করকে বিরাট ভুল বুঝেছেন। আসলে এটা আসল তথ্যের অজ্ঞতা। ('সুলতানাতে দেহলী মেঁ গায়ের মুসলিম ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কনৌজের গহরাওয়ার বংশেও জিজিয়ার প্রচলন ছিল, সে দেশের ভাষায় তার নাম ছিল 'তুরশকী জনডা', [Medieval Hindu India lll, p. 211] তাছাড়া ভারতে ইসলাম আসার আগে রাজপুতদের মধ্যে 'ফীকস' কর আদায় হত (Early History of India by Smith)। ডাঃ ত্রিপাঠির ধারণা, ফ্রান্সে যে জিজিয়া ছিল তার নাম ছিল 'host tax', আর জার্মানীতে যে জিজিয়া ছিল তার নাম 'Commonpiny', এবং ইংল্যাণ্ডে এক প্রকার জিজিয়াসম কর ছিল তার নাম 'scontage'। (Some Aspects of Muslim Administration. Sir Tripathy দ্রষ্টব্য)

অনেকে বলেছেন জিজিয়া কর পুনঃপ্রচলন করে আওরঙ্গজেব অসহায় হিন্দু জাতির উপর নির্মম অত্যাচার করেছেন, কিন্তু আমাদের বক্তব্য অন্য। হিন্দু প্রজাদের উপর অত্যাচার করার উদ্দেশ্যই যদি আওরঙ্গজেবের থাকত তাহলে তাঁর সুদীর্ঘ ৫০ বছর ভারতে রাজত্ব করার পর দেশে সম্ভবতঃ আর একটি একটি হিন্দুরও অস্তিত্ব থাকত না। শুধু আওরঙ্গজেবই নন, বরং মুসলমান রাজা বাদশাহগণ শত শত বছর বা সহস্র বছরের কাছাকাছি ধরে রাজত্ব করে গেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও একটা জাতি তাদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। অপরপক্ষে এ ভারতে এক ধর্মের চাপে অন্য ধর্ম, এক সম্প্রদায়ের চাপে অপর সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যেমন হিন্দু ধর্মের চাপে বৌদ্ধ ধর্ম আজ বিলুপ্ত প্রায়। তাছাড়া অনেকের মতে ভারতের বহু স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব আজ লোপ পেয়েছে বা পেতে চলেছে, অথবা তাঁরা

নিজেদের হিন্দু বলেই পরিচয় দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ জৈন, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, সাঁওতাল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। অতএব আওরঙ্গজেব অত্যাচারী ছিলেন অর্থাৎ তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন এ কথার প্রমাণ কোথায়?

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক কাফি বলেছেন, "আকবরের রাজত্বকাল অপেক্ষা তাঁহার (আওরঙ্গজেব) সময়ে হিন্দু রাজকর্মচারী সংখ্যায় বেশি ছিল।" এছাড়া আরও বহু প্রমাণ ইতিপূর্বে পেশ করা হলেও প্রাসঙ্গিকতার কারণে এক্ষেত্রে আরও কিছু উদ্ধৃতির উল্লেখ করা গেল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন ভারতবর্ষ পরিদর্শন করতে এসে আওরঙ্গজেবের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সূক্ষ্মশাসন পদ্ধতি দেখে যা বলেছিলেন তা হচ্ছে এই–"Every one is free to serve and worship God in his own way." অর্থাৎ প্রত্যেকেই কাজকর্মে এবং স্ব-স্ব নিয়মে ঈশ্বরের উপাসনায় স্বাধীন। প্রমাণস্বরূপ আরও বলা যায়, আলমগীরের দরবারে বড় বড় পদে ও মর্যাদায় স্থান পেয়েছিলেন যথাক্রমে রাজা রাজরূপ, কবীর সিং, অর্ঘনাথ সিং, প্রেমদেব সিং, দিলীপ রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ। রাজা রাজরূপ সিংহকে বাদশাহ এত বিশ্বাস করতেন যে. শ্রীনগরের রাজার বিরুদ্ধে গোটা যুদ্ধটাই তাঁর অধীনে পরিচালিত হয়েছিল। কবীর সিং ছিলেন সম্রাটের বিশেষ লোক। আসামের যুদ্ধের জন্য প্রেমদেব সিংহকেই আওরঙ্গজেব বাছাই করেছিলেন। দিলীপ রায় ছিলেন আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি। এছাড়া পুলিশ বিভাগ, গুপ্তচর বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতিতে হিন্দু রাজকর্মচারির সংখ্যা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হত। রাজস্ব বিভাগে মুন্সীর পদগুলো হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল বলা যায়। তার কারণও ছিল গুরুত্বপূর্ণ–কর আদায়ের নামে যেন হিন্দু সম্প্রদায় কোনও ভাবে অত্যাচারিত না হয়–"Most of the Munsis were Hindus and the proportion rapidly increased. The Hindus had made a monopoly of the lower ranks of the Revenue department."

রসিকলাল ক্রোরী ছিলেন সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি এবং রাজস্ব বিভাগে সর্বোচ্চমানের পদাধিকারী। শুধু তাই নয়, বরং এমন কোন বিভাগ ছিলনা যে বিভাগে সম্ভব সত্ত্বেও হিন্দু কর্মচারি নিয়োগ করা হয়নি। এমনকি বাদশাহ আইন জারী করেছিলেন যে, প্রত্যেক বিভাগে হিন্দু কর্মচারি নিয়োগ করা আবশ্যক। অতএব তিনি সত্যই শুধু উদার নন বরং উদারতম মহান নৃপতি ছিলেন–এটাই আধুনিক বিশেষজ্ঞ এবং পুরাতন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত।

একটা প্রশ্ন থেকে যেতে পারে, তাহলে কি আওরঙ্গজেবের উপর সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন? তার উত্তরে পরিষ্কারভাবেই বলা যেতে পারে যে, সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তার কারণও অবশ্য বিদ্যমান। রাজদরবারে যে সমস্ত গর্হিত বেআইনি কাজ চলে আসছিল এবং আকবর জাহাঙ্গীর প্রভৃতি বাদশাহ কর্তৃক যে সমস্ত বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল, যার ফলে সারা ভারতে ধর্মের নামে, আভিজাত্যের নামে, সংস্কৃতির নামে যত আগাছা গজিয়েছিল আওরঙ্গজেব একধার হতে তা উৎপাটন করাতে যাঁদের অসুবিধায় পড়তে হয়েছে তাঁরাই অভিযোগ করেছেন। অবশ্য পরে নিজেদের ভুল বুঝে সর্বভারতীয় উন্নতি ও শান্তি দেখে অনেককেই লজ্জা ও অনুতাপের ইন্ধন হতে হয়েছিল।

বাদশাহদের দরবারে 'নওরোজ' বলে একটা কুপ্রথার প্রচলন ছিল, যা ছিল শুধু বিলাসিতা ও অহঙ্কার প্রদর্শনের নামান্তর। আর রাজদরবারে রাজকর্মচারিদের মধ্যে মদের মর্যাদা এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল যে. চীনের আফিম খাওয়ার মত ভারতকেও ধ্বংস হতে হত

যদি না আওরঙ্গজেব কঠিন হাতে তা দমন করতেন। পক্ষান্তরে মন্দির তৈরি করার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এক জায়গায় যেখানে একটা মন্দিরই যথেষ্ট সেখানে লাগালাগি দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশ' করে মন্দির হতে লাগল। আর ধর্মের এ বাড়াবাড়ি দৃষ্টিকুট হবারই কথা। মসজিদের ক্ষেত্রেও সম্রাটের মত ছিল, বিনা প্রয়োজনে অথবা যেখানে মসজিদ আছে যতক্ষণ পর্যন্ত সে মসজিদে স্থান সংকুলান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে মসজিদ তৈরি করা যাবেনা। যেমন অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় বাদশা নবাবদের কীর্তিসমূহ লক্ষ্য করলে দেখা যায় চারিদিকে শুধু মসজিদ। নিরপেক্ষ মতে এত মসজিদ দরকার ছিলনা। কেহ কেহ যুক্তি দেখান যে, স্থান সংকুলান হতনা বলেই হয়ত সে যুগে এত মসজিদের প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু ঘটনা মোটেই তা নয়, কারণ স্থান সংকুলান না হলে মসজিদকে বাড়িয়ে প্রয়োজন মত লম্বা, চওড়া ও বহুতল করলেই তো চলত। শুধু শুধু সংখ্যায় ছোট ছোট অনেক মসজিদ আর কারুকার্যের এত ছড়াছড়ির কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি। অনুরূপভাবে মন্দিরও। পশ্চিমবঙ্গে একই স্থানে দু চারটে নয়, বর্ধমান শহরের পাশে ছোট ছোট, গায়ে গায়ে লাগান ১০৮টি মন্দিরও দেখা গেছে। মন্দিরের ক্ষেত্রে স্থান সংকুলানের তো প্রশ্নই ওঠতে পারে না, কারণ মন্দিরের ভিতরে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ ছাড়া জনসাধারণের প্রবেশাধিকার পূর্বেও ছিল না আর এখনও নেই। ভবিষ্যতে কি হবে তা অবশ্য বলা যায় না।

বেনারসের শাসনকর্তা আওরঙ্গজেবকে গোপনে একটা পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল–"বেনারস একটা হিন্দুদের ধর্মীয় ঘাঁটি, উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী প্রত্যেকে মনে করে সমস্ত উন্নতির কুঞ্জী এ মন্দিরেই দেবতার হাতে আছে। মন্দিরের নিত্য নূতন নির্মাণ ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং বহু অর্থব্যয়ে তাহাতে কারুকার্য করা চলিতেছে, যেন শেষ নাই। এক মন্দির অপর মন্দিরের সাথে পাল্লা দিয়া জিতিতে চাহে। যদি এখানে এই মন্দিরের পুরোহিত বা ব্রাহ্মণদের উপর কিছু শক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহা ঠিক হইবে কিনা? তবে এখানে কেহ কেহ মনে করেন ব্রাহ্মণদের উপসনাভিত্তি শিথিল করিতে পারিলে লোকে আমাদের ইসলাম ধর্মের দিকে আকর্ষিত হইতে পারে........।"

তার উত্তরে আওরঙ্গজেব যে পত্র দিয়েছিলেন তা উল্লেখযোগ্য এবং লক্ষ্যণীয়–".....প্রজাদের উপকার সাধন এবং নিম্ন সকল সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন আমাদের সুদৃঢ় উদ্দেশ্য। সেহেতু আমাদের পবিত্র আইন অনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, পুরাতন মন্দিরগুলো বিনষ্ট করা হবে না কিন্তু নূতন কিছু সৃষ্টি করাও চলবে না। .....কোন লোক অন্যায়ভাবে ব্রাহ্মণ অথবা তাহাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অথবা তাহাদের উপর কোন হামলা করতে পরিবে না। তারা যেন পূর্বের ন্যায় স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত থাকতে পারে এবং আমাদের আল্লাহ্ প্রদত্ত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য সুস্থ মনে প্রার্থনা করতে পারে।" (ওয়াক্য়েরে আলমগীরী' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

যাহোক, এরকম উদার ও ন্যায়বান সম্রাট আলমগীরকে জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তনকারী গোঁড়া হিন্দু বিদ্বেষী মুসলমান বলে চিত্রিত করে যাঁরা ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করেছেন ইতিহাস তাঁদের কিভাবে গ্রহণ করবে তা দেখার বিষয়।

(৬) 'তাঁর অযোগ্যতাই মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ' বলে যে অভিযোগ বা অপবাদটি যোগ্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার অসারতা প্রমাণে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, আওরঙ্গজেব অযোগ্য তো ছিলেনই না বরং তাঁর যোগ্যতাই দ্রুত পতনোন্মুখ মোঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে অব্যর্থভাবে রক্ষা করেছে

অতএব মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আওরঙ্গজেবের অযোগ্যতা মোটেই নয় বরং কারণ অন্যবিধ। আওরঙ্গজেবের পরবর্তীগণের আলোচনায় তা পরিস্ফুট হবে। তাছাড়া তিনি অযোগ্য হলে তাঁর পক্ষে এ সুবিশাল ভারতবর্ষকে অর্ধশতাব্দী ধরে পরিচালনা করা অসম্ভব হত বরং এ কৃতিত্বই তাঁর চরম যোগ্যতাকে আরও অব্যর্থভাবে প্রমাণিত করে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অনেকে তাঁকে এ ব্যাপারে দায়ী করলেও মোঘল যুগের সমসাময়িক ঐতিহাসকগণ, মূল ইতিহাসের পুরান পাতা ও বর্তমানের সত্য সন্ধানী গবেষকগণ তাঁকে মোটেই দায়ী করেন না।

আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যত মিথ্যা, অপপ্রচার, কুৎসা ও প্রচণ্ড নিন্দার ফিরিস্তি তৈরি করা হয়েছে তা আর কারোর জন্য পরিমাণে এত নয়। যা ঘটে তাই ঘটনা, আর তারই নাম ইতিহাস। আর যা ঘটেনা শুধু রটে, তা ঘটনা নয় রটনা–তাকে ইতিহাস না বলে রুটিহাস বলা ভাল। এ প্রথায় মনিবের হুকুমের তাবেদারী করে অথবা মাতালদের মাতলামীর মালসামান জুগিয়ে রুটি ও রুজি হাসিল করা যায়, তা দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখা যায় না।

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর শুধু অমুসলমানদের উপব অত্যাচার করেছিলেন এ চিত্রই তো আমরা বর্তমান ইতিহাসে পেয়েছি। কিন্তু তিনি যে কত উদার, ন্যায় পরায়ণ ও নিজ ধর্ম-কর্মে অটল ছিলেন সে কথা তো আমরা এ সব ইতিহাসে সহজে পাইনি। তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক অনেক ঘটনা এমন আছে যা আজও সূক্ষ্মদর্শীদের স্তম্ভিত করে, যেগুলো আজও মূল ইতিহাসের পাতাকে স্বর্ণোজ্জ্বল করে রেখেছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি জনশ্রুতির উল্লেখ করা হচ্ছে।

একদিন সম্রাট আলমগীরের সৈন্যবাহিনী একজন মুসলমান সেনাপতির অধীনে পাঞ্জাবের এক পল্লবী মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পথে জনৈক ব্রাহ্মণের এক অপরূপ সুন্দরী কন্যার প্রস্ফুটিত গোলাপের মত মুখশ্রী দেখে লোভতুর সেনাপতি তার পিতার কাছে মেয়েটিকে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং সিদ্ধান্ত জারী করেন যে, আজ থেকে এক মাস পরেই তিনি তাঁর বাড়ীতে বর বেশে উপস্থিত হবেন।

কন্যার পিতা স্বয়ং আলমগীরের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে সমস্ত ঘটনাটা বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সম্রাট তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'যাও, নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যাও। নির্দিষ্ট দিনে আমি তোমার বাড়িতে উপস্থিত থাকব।' ব্রাহ্মণ নানা চিন্তার ঝুঁকি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। সত্যিই কি সম্রাট স্বয়ং আসবেন? না তাঁর পক্ষ হতে কোন প্রতিনিধি পাঠাবেন? আর যদি সত্যিই তিনি আসেন তবে সাথে নিশ্চয়ই লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়া কম আসবে না। তাঁদের থাকতে দেবেন কোথায় ইত্যাদি অনেক চিন্তা।

অবশেষে সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটিয়ে বিবাহের আগের দিন সম্রাট আলমগীর একাই এসে উপস্থিত হলেন ব্রাহ্মণের বাড়িতে। ব্রাহ্মণ হতবাক! সম্রাট এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক জীর্ণ কামরায় সারা রাত ইবাদত ও মোনাজাতে অশ্রুবিসর্জন করে কাটালেন। ব্রাহ্মণের পরিবারবর্গ অবাক–ইনি কাঁদছেন কেন? এঁর কিসের অভাব? প্রশ্নের উত্তর তাঁরা পেলেন না, আর সাহস করে জিজ্ঞেস করতেও পারলেন না। যাহোক, পরদিন মোঘল সেনাপতি বর বেশে ব্রাহ্মণের ঘরে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'বিবাহের পূর্বে আপনার কন্যাকে একবার দেখা উত্তম। আপনার কন্যা কোথায়?' ব্রাহ্মণ সম্রাটের শেখানো কথা অনুযায়ী সম্রাটের কামরার দিকে ইশারা করলেন। সেনাপতি ঘরে প্রবেশ করেই দেখলেন খোলা তরবারি হাতে সম্রাট আলমগীর স্বয়ং। উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনের বুক ভরা আবেগ আর মুখভরা হাসি নিমেষেই উবে গেল। যে সেনাপতির দাপটে শত্রুসৈন্য থরথর করে কাঁপে কাঁপে, যাঁর হৃদয়ে ভয়-ভীতি অথবা দুর্বলতা কখনও স্থান পায় না, আজ সে হৃদয় কালবৈশাখী ঝড়ের মত ভীষণ শব্দে যেন কেঁপে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করলেন কিন্তু দুঃখ, লজ্জা, শান্তি

তার অপমানের আশঙ্কায় জ্ঞানহারা হয়ে বলিষ্ঠদেহ সেনাপতি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কন্যার পিতা সম্রাট আলমগীরের সুবিচার, দায়িত্ববোধ আর অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা দেখে আনন্দে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললেন, 'আপনি আমার, বিশেষ করে আমার কন্যার ইজ্জত রক্ষা করেছেন। আপনার এ ঋণ অপরিশোধ্য।' সম্রাট ব্রাহ্মণকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভাই এ মহান দায়িত্ব আমার। আমি যে আমার দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পেরেছি এতেই আমি ধন্য।'

সম্রাট আলমগীর আজ নেই সত্য, কিন্তু তাঁর মহিমান্বিত অমর কীর্তি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে রয়েছে এ গ্রামের অণু-পরমাণুতে। এ ঘটনার পরই এ পল্লীর নামকরণ হয় 'আলমগীর' নগর।

এমনই এক মহৎ ও উদার চরিত্রের সম্রাটকে ইতিহাসে নিঃসঙ্কোচে হিন্দু বিদ্বেষী বলে চিত্রিত করতে ঐতিহাসিকদের কলম এতটুকু কেঁপে ওঠেনি? এটা আক্ষেপের বিষয়।

আজও ঐতিহাসিক বালাজী মন্দির বা বিষ্ণু মন্দির যেটা চিত্রকুটের রামঘাটের উত্তর দিকে অবস্থিত, সে মন্দিরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে লেখা আছে–"সম্রাট আওরঙ্গজেব নির্মিত বালাজী মন্দির"। কোন মুসলিমের মুর্তিপূজায় অংশ গ্রহণ, মূর্তি বা মন্দির নির্মাণে নিষেধ আছে কিন্তু যখন হিন্দুপ্রজা বা সংখ্যালঘু প্রজাদের মন্দির কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাদের ধর্মরক্ষার দায়িত্ব মুসলমান বাদশাহের উপরেও পড়ে। যদি পচা ইতিহাসের পাতায় ইতিহাসের সব তথ্য সত্য আছে বলে কেহ সুদৃঢ় মনে বিশ্বাস করেন তাহলে কিছু বলার নেই। নচেত অনুরোধ করব হিন্দু তীর্থস্থান বারানসী ধামে গিয়ে দেখুন, সেখানে বহু পুরাতন মন্দিরের রক্ষক ও স্বত্বাধিকারীদের কাছে সংরক্ষিত সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলের বহু ফরমান বা দলিল দেখে অবাক হতে হবে যে, মিথ্যা অভিযোগ অভিযুক্ত হিন্দু বিদ্বেষী আওরঙ্গজেব হিন্দু-মন্দির সমূহের রক্ষাকল্পে জায়গীর স্বরূপ প্রচুর সম্পত্তি দিয়েছিলেন।

"এ প্রকার কাশ্মীর প্রদেশে হিন্দুমন্দির রক্ষার্থে বাদশাহ কর্তৃক যে সমস্ত জমি বৃত্তিদান করা হইয়াছে সেই ফরমান দেখিয়া অবগত হওয়া যায় যে, তাহার মধ্যে অধিকাংশ ফরমানে আওরঙ্গজেবের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে।" (দ্রষ্টব্য Islam and Civilization)

বেনারস বা কাশীতে কয়েকজন নবদীক্ষিত মুসলমান অতিভক্তির নামে হিন্দুমন্দিরও পূজারীদের কিছু ক্ষতি করেছিল। সংবাদ পেয়ে সম্রাট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ এবং স্থায়িত্বের জন্য একটি ফরমান জারী করেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের জন্য তার বঙ্গানুবাদটি এখানে উল্লেখ করছি–"প্রজাদের মঙ্গলার্থে ব্যথিত হৃদয়ে আমরা ঘোষণা করছি যে, আমাদের ছোট বড় প্রত্যেক প্রজা পরস্পর শান্তি ও একথার সাথে বাস করবে এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী আরও ঘোষণা করছি যে, হিন্দুদের উপাসনালয়গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধান করা হবে। যেহেতু আমাদের কাছে আকস্মিক সংবাদ পৌছেছে যে, কতিপয় লোক আমাদের বারানসী ধামে অবস্থিত হিন্দু প্রজাগণের সাথে অসম্মানসূচক নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে ও ব্রাহ্মণকে তাঁদের প্রাচীন ন্যায় সংগত উপাসনার অধিকারে বাধা দিতে মনস্থ করেছে এবং আরও আমাদের কাছে জানান হয়েছে যে, এ সমস্ত অত্যাচারের ফলে তাঁদের মনে দারুণ দুঃখ, ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব আমরা এ ফরমান প্রকাশ করছি এবং এটা সাম্রাজ্যের সর্বত্র জানিয়ে দেয়া হোক যে এ ফরমান (অর্ডিন্যান্স) জারী হওয়ার তারিখ হতে কোন ব্রাহ্মণকে যেন তাঁর প্রার্থনার কাজে বাধা দান বা কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করা হয়। আমাদের হিন্দু প্রজাগণ যেন শান্তির সাথে বাস করতে পারেন এবং আমাদের সৌভাগ্য ও উন্নতির জন্য আশীর্বাদ করেন।" (ইসলামিক রিভিউ" দ্রষ্টব্য)

Goto List

আজ যে সাম্যবাদ সারা বিশ্বের মানুষের মস্তকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, যে সাম্যবাদের অভিনব বন্যায় পৃথিবীর পুরাতন সব ঐতিহাসিক রাজা বাদশাহ ও তাঁদের শাসননীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি 'মধ্যযুগের অসভ্যতা' বলে অনেকের ধারণা হয়েছে। কার্লমার্ক্সের যে নূতন চিন্তাধারা নূতন পথ আর পাথের দান করে পৃথিবীকে রক্ষা করতে উপস্থিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আজ প্রমাণিত সত্য কথা এটাই যে, মুসলমান রাজা বাদশাহদের উদার ব্যবহার, অর্থনৈতিক নীতি আর সাম্যবাদের কথাই বর্ণনা করে গেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ের এবং তাভানিয়ের। তাঁদের লেখা হতে জানা যায়, শাহজাহানের প্রখ্যাত পুত্র আওরঙ্গজেবের সাম্যবাদ, অর্থনীতি ও শাসননীতি এত সুন্দর ছিল যে তা যে কোন নিরপেক্ষ মানুষের মনকে আনন্দে এবং বিস্ময়ে অভিভূত করে। কার্লমার্কস ইতিহাসের এ অধ্যায় পড়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে গিয়েছিলেন। কার্লমার্কস এও বুঝেছিলেন, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের যত বৈশিষ্ট্য সবই কিন্তু ইসলাম ধর্ম তথা কুরআন ও হাদীসের, কারণ আওরঙ্গজেবের কুরআন বিরোধী কোন কাজ করতে কোন দিনই ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি এ সাথে আরও বুঝেছিলেন, যে মুসলমান বাদশা যত অন্যায় করেছেন তিনি তত কুরআনের নীতি থেকে দূরে ছিলেন–তাই আজ কার্লমার্ক্সের কমিউনিজম বৃক্ষেও ইসলামী ফল, ফুল, আর লতা পাতার সৌন্দর্য বেশ কিছু পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সৌন্দর্যমণ্ডিত এ বৃক্ষটি সুস্থ ধর্মীয় সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তার নাস্তিকতা নীতি–এ নীতিই যেন বৃক্ষটির শিকড় ও মূল কেটে দিয়েছে। যদি নাস্তিকতা নীতির পরিবর্তন করে কোন নূতন নেতা সাম্যবাদকে পরিবেশন করতে এগিয়ে আসেন তাহলে আজ যে মুসলমান ওলামা-মুফতিগণ দূরে দাঁড়িয়ে ভাবছেন তাঁরা বেশির ভাগই ঝাঁপিয়ে পড়বেন সারা বিশ্বে এ নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে–এ বিশেষ সন্দেহ নেই।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ন্যায় নীতিতে মার্ক্স যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা শ্রীবিনয় ঘোষকেও কিঞ্চিত স্বীকার করতে হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "বার্নিয়ের বিশ্লেষণ পাঠ করিয়া কার্লমার্ক্সের মত মনীষীও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।" [ভারতজনের ইতিহাস, ৪৮০ পৃষ্ঠা, বিনয় ঘোষ]

মুসলমান যুগের মূল ইতিহাস মূলতঃ ফারসী, আরবী ও উর্দুতে। সে যুগের ঔরঙ্গবাদের ঐতিহাসিক মুহাম্মদ কাসিমের লেখা আহওয়াল-উল-খাওয়াকীন গ্রন্থে উদ্ধৃত আওরঙ্গজেবের একটি মূল্যবান উক্তি তাঁর সম্বন্ধে আমাদের পুরানা কু-ধারণা সমাধি সৃষ্টিতে যথেষ্ট হবে আশা করা যায়।

আওরঙ্গজেবের ধর্মমত বিরোধী উপযুক্ত শাহী কর্মীকে সদরবখশী পদে যাঁকে বসিয়েছিলেন তিনি ছিলেন শিয়া। অথচ সম্রাট অত্যন্ত বেশি শিয়া মতের বিরোধী ছিলেন। আমিন খাঁ তাঁকে এ পদ হতে অপসারণের দাবী জানান। তাঁর যুক্তি ছিল, ধর্মের নীতিতে সম্রাটের সাথে তাঁর সম্পূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, সুতরাং তাঁকে না সরালে ধর্মের ক্ষতি হবে। আওরঙ্গজেব তাঁর উত্তরে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন, পার্থিব যোগ্যতা ও প্রয়োজনকে দেখেই তাঁর এ নির্বাচন, এখানে 'ধর্মের সাথে জাগতিক ব্যাপারের সম্পর্ক কোথায়?' প্রশাসনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভণ্ডামির তিনি বিরোধী। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, আপনার এ নিয়ম যদি সত্যই আমাকে গ্রহণ করতে হয় তাহলে প্রতিটি (অমুসলমান) রাজা ও তাঁদের সমর্থকদের অপসারণ করা কি আমার কর্তব্য হবে না? (দ্রষ্টব্য : স্যার যদুনাথ সরকারের আখান-ই-আলমগীরী ও অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের লেখা মোঘল দরবারে দল ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা ৫৫, টীকা ২৭, ১৯৭৮)

Goto List

মোঘল আমলে ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের কোর্টে আসার প্রথা ছিল। কিন্তু জমি জায়গা, উত্তরাধিকারীর সম্পদ বন্টন, সাংসারিক বিবাদ প্রভৃতির বিচার শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্য হিন্দু আইন অনুযায়ী 'পঞ্চায়েতের' মাধ্যমে হত এবং এ পঞ্চায়েত প্রথা মুসলিম হিন্দুদের শাসনের পর ইংরেজ আমলেও পুরোপুরিভাবে ছিল, বর্তমানে আমাদের দেশেও অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হচ্ছে। অতএব এখানেও লক্ষণীয় বিষয় হল, তখন কিভাবে হিন্দু আইন অনুযায়ী হিন্দু প্রজাদের বিচারের ব্যবস্থা হত তা আজ চিন্তার বিষয় সন্দেহ নেই।

হিন্দুপ্রীতির প্রমাণস্বরূপ আকবরের জন্য একটা সুনাম আছে যে, তিনি বড় বড় পদে হিন্দু ও রাজপুত কর্মীদের নিয়োগ করতেন। অবশ্য একথাও ঠিক যে আকবর ১৪ জন হিন্দুকে বিখ্যাত 'মনসবদার' পদে নিযুক্ত করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য 'আইন ই-আকবরী'। কিন্তু মজার কথা হল, এটাই যে মনসবদারের বিরাট পদ, তাতে কি আওরঙ্গজেব কোন হিন্দুকে নিয়োগ করেননি? হ্যাঁ, আওরঙ্গজেবও এ বিখ্যাত পদে হিন্দুদের নিয়োগ করেছিলেন। তবে আকবরের সাথে পার্থক্য এটুকু ছিল যে, আকবর চৌদ্দ জন হিন্দুকে এ উচ্চ পদ দিয়েছিলেন আর আওরঙ্গজেব দিয়েছিলেন মাত্র একশ' আটচল্লিশ জনকে। (দ্রষ্টব্য শ্রীশর্মার লেখা মোঘল গভর্ণমেন্ট, পৃষ্ঠা ১১১)

সম্রাট আকবর

পিতা হুমায়ুনের মৃত্যুর সময় আকবরের বয়স ছিল মাত্র তের বছর। আর এ বয়সেই ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি তাঁর প্রধান সহায়ক বৈরাম খাঁ তাঁকে সিংহাসনে বসালেন। শুরুতে আকবরের নামে শাসনকার্য পরিচালিত হলেও সমস্ত কাজকর্ম ও দায়দায়িত্ব বৈরাম খাঁকেই পালন করতে হত। পাঁচ বছর পরে আকবর বৈরামের অধীনতায় থাকা অসহ্যবোধ করলেন, তাই তাঁর হাত থেকে সমস্ত দায়িত্ব নিজেই ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলেন, 'আমি এখন উপযুক্ত, আপনি বরং হজ্ব করতে যান।' এ আদেশ জারী হওয়াতে বৈরাম খাঁ নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন এবং শেষে বিদ্রোহী রূপ নিলে সংঘর্ষ হয়। আকবর তাঁকে পরাজিত করলেন কিন্তু কারারুদ্ধ বা প্রাণদণ্ড না দিয়ে তাঁর হজ্বে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন; যেহেতু তাঁর থেকে তিনি বহুভাবে উপকৃত ছিলেন। হজ্ব থেকে ফিরে এসে বৈরাম খাঁর ভূমিকা কি হত বলা যায় না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হজ্বে যাওয়ার পথে গুজরাটে তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। কেহ বলেন এটা গুণ্ডা কর্তৃক, আবার কারও ধারণা আকবরের অঙ্গুলি হেলনেই তাঁর এ নিষ্ঠুর পরিণাম।

আকবর এখন বেশ বুঝতে পারলেন যে, এতবড় ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতিকে হাতে রাখলেই কাজের সুবিধা হবে। তাই রাজপুত ও হিন্দু জাতিকে তাঁর দিকে আকর্ষিত করতে সচেষ্ট হলেন।

তিনি হিন্দুদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে দিয়ে এবং তাঁদের বড় বড় পদে ভূষিত করলেন। রাজপুত বীর মানসিংহকে অন্যতম সেনাপতি করলেন। রাজস্ব বিভাগ ছেড়ে দিলেন। এভাবে যবন অস্পৃশ্য মুসলমান (?) আকবর এত সহজে হিন্দুদের প্রিয়পাত্র হলেন যে, কেহ আপন বোন, কেহ বা নিজের কন্যাকে সম্রাটের হেরেমে প্রবেশ করিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হলেন না। অম্বর ও জয়সালমীরের হিন্দু রাজকুমারীদ্বয়কে রাজা ভগবানদাসের কন্যা এবং মাড়োয়ারের রাজা উদয় সিংহের কন্যার সাথে পুত্র সেলিমের বিয়ে দিলেন।

প্রায় সকলেই বশে এলেন ব্যতিক্রম শুধু মেবারের রাণা। বাধ্য হয়ে আকবর মেবার আক্রমণ করলেন। তখন মেবারের রাণা ছিলেন সংগ্রাম সিংহের পুত্র উদয় সিংহ। তিনি সেনাপতি জয়মল্লের হাতে রাজ্য রক্ষার ভার দিয়ে আরাবল্লী পর্বতে আশ্রয় নিলেন। জয়মল্ল

নিষ্ঠুর অকারণ আক্রমণের শিকার হয়ে আট হাজার সৈন্য নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করেও পরাজয় বরণ করলেন। অধঃপতিত চিতোর আকবরের দখলে এল বটে কিন্তু সমগ্র মেবার হাতে এল না। উদয়সিংহ উদয়পুরে রাজধান স্থাপন করে রাজত্ব করতে লাগলেন। উদয়সিংহের মৃত্যুর পর প্রতাপসিংহ আকবরের সাথে মর্যদার যুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি প্রতিজ্ঞা যতদিন না চিতোর পুনরুদ্ধার হয় ততদিন তিনি অত্যন্ত সাধারণ আহার করবেন এবং শয়ন করবেন শুধু তৃণশয্যায়। পরে হলদিঘাট নামক গিরি সঙ্কটে তুমুল যুদ্ধ হয় ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে। প্রতাপ পরাজিত হলেন আর মেবারের হল অনিবার্য পতন। প্রতিজ্ঞা পালনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতাপ বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন কিন্তু প্রিয়ী রাজধানী চিতোরকে তাঁর জীবদ্দশায় আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

পূর্বে যে সমস্ত দেশ স্বাধীন হয়েছিল আকবর সে সব রাজ্য একের পর এক জয় করে চললেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে গুজরাট দখল করলেন। তখন সুলাইমান কারনানী ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। তিনি যুদ্ধের পথে পা না বাড়িয়ে সন্ধি করতে আগ্রহী হলেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীনচেতা পুত্র দাউদ বিদ্রোহী হয়ে বিহার আক্রমণ করলে আকবর সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে দাউদের স্বাধীনতার স্বাদ মিটিয়ে তাঁকে হত্যা করে নিশ্চিন্ত হয়ে বাংলা-উড়িষ্যা নিজের দখলে আনলেন। তারপর ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু দেশ জয় করে সমগ্র আর্যাবর্তের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসলেন।

এবার তিনি উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের দিকেও দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন। এ সময় বাহমনী রাজ্য ছোট ছোট অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আহমাদনগরের রাজার মৃত্যুর পর সেখানে অশান্তি ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহীরা আকবরের সাহায্য প্রার্থনা করলে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আকবর তাঁর পুত্র মুরাদকে একদল সৈন্যসহ আহমাদনগরে পাঠালেন। আহমাদনগরের নাবালক রাজার অভিভাবিকা বিদূষী নারী বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানা বিপুল বিক্রমে বাধা দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। মোঘল সৈন্যরা আহমাদনগর করায়ত্ত করতে না পারলে পর বছর আকবর স্বয়ং নারী এবং শিশুর বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্য ও শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চাঁদ বিবি এবারেও প্রাণপণে যুদ্ধ চালনা করলেন। রসদ ও গুলি বারুদের স্বল্পতার জন্য শুধু বন্দুক এবং মামুলি অস্ত্র নিয়েই রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু আকবরের বীর গুপ্তচর পিছন থেকে সুলতানাকে হত্যা করার ফলে আহমাদনগরে নেমে এল পরাজয়। আহমাদনগরের একাংশ বাদশার হাতে এল। তারপর বাদশাহ খান্দেশ ও আসিরগড় দুর্গে আক্রমণ চালিয়ে বাকি অংশগুলোও দখল করলেন। এমনিভাবে আকবর বিশাল এক সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা রাজাধিরাজ বলে বিবেচিত হলেন।

আকবরের পিতা হুমায়ুনের উপর যখন বিপদের বিরাট বন্যা এসে পড়েছিল, সে সময় হুমায়ুনের এত বড় বন্ধু আর সুহৃদ কেহ ছিলেন না যিনি তাঁর জন্য নিজের প্রাণ, সম্পত্তি ও সম্মান কিছুই দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি-তিনিই হচ্ছেন বৈরাম খাঁ। হুমায়ুন তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সামান্য কিছু ভূখণ্ড ছাড়া হারিয়ে যাওয়া জায়গাগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। এ সময় সিকিন্দার শূর এবং ইবরাহিম শূরের মধ্যে শক্তির খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। কিন্তু আদিল শাহের এক হিন্দু মন্ত্রী হিমু তদানীন্তন সময়ে শক্তি সামর্থ ও জ্ঞান বুদ্ধিতে প্রধান ছিলেন। তিনি এত শক্তিশালী হয়ে পড়লেন যে, দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে বিক্রমাদিত্য নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আবার আকবরের ভাই আবদুল হাকিমের অধীনে কাবুল, বঙ্গদেশ, মালব, গুজরাট, গণ্ডোয়ানা, উড়িষ্যা, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও দাক্ষিণাত্য তখন স্বাধীন হয়ে পড়েছিল। রাজপুতগণও মোঘল আক্রমণের

প্রথম আঘাত সামলে নিয়ে শক্তিশালী হয়ে পশ্চিম উপকূলে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে মেতে উঠল। এমনকি পারস্য সাগর ও আরব সাগরে তাদের প্রভুত্বের ফলে মক্কাশরীফগামী হজ্ যাত্রীদের ভীষণ বিপদ ও বাধার সম্মুখীন হতে হত।

একে তো এতগুলো বিপদ তার উপর আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন বালক বয়সে। তখন বৈরাম খাঁ-ই আকবরকে নওজোয়ান বা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন। আকবর যদিও বৈরাম খাঁকে লাঞ্ছিত ও পদচ্যুত করেছিলেন কিন্তু এ কথা সঠিক যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন আকবরের গুরু, যদিও আকবর তা প্রকাশ্যে স্বীকার করতেন না। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকে এর ধারে কাছেই ঘেঁষেননি অথচ আসল ইতিহাসে যথেষ্ট এর প্রমাণ রয়েছে যে, আকবর যদিও বাদশাহ ছিলেন তবুও বৈরাম খাঁ জানতেন–সে অবুঝ ও অপরিপক্ক। তাই বাদশার ব্যক্তিগত কাজেও তিনি বাধা দিতেন এবং কু-পদক্ষেপ নিলে তা থেকে বিরত রাখতেন অভিভাবকের মত। (দ্রষ্টব্য সেণ্ট্রাল স্ট্রাকচার ঃ ইবনে হাসান, পৃষ্ঠা ১২৩)

হুমায়ুন যখন কান্দাহার দখল করলেন তখন কৃতজ্ঞতার সাক্ষী স্বরূপ বৈরাম খাঁকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাছাড়া তাঁকে বড় একটা জায়গীরও প্রদান করেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি আকবরের অভিভাবক নির্ধারিত করেন এ বৈরাম খাঁকেই (খানই খানান)। আকবর পিতার কাছে শিখেছিলেন তিনি বাবার মত, তাই তাঁকে ডাকতেন 'খান-ই বাবা' সম্বোধন করে।

এ বৈরাম খাঁ অসম্মানিত আর পরাজিত হয়ে যে বহিষ্কৃত হতে হবে গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবদের সভা হতে, রাজা হতে এবং সব শেষে পৃথিবী হতে একথা ভাগ্যহারা বৈরাম খাঁ কোনদিন কল্পনাও করেন নি; কল্পনা করেননি অতীত ইতিহাসের পাঠক। আকবরের জীবনের শুরুই কি তবে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল আর গোলক ধাঁধার পথে?

সহজলভ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়, আকবর রাজপুতদের বিশেষতঃ বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়ে কাছিয়ে নিয়েছিলেন বা আয়ত্তে এনে বন্ধু জাতিতে পরিণত করেছিলেন। অপরদিকে হিন্দু প্রজাবর্গও তাঁকে 'দিল্লিশ্বর' উপাধিতে ভূষিত করেই ক্ষান্ত হননি, অনেকে আবার তাঁকে 'জগদীশ্বর' উপাধি দিতেও কুণ্ঠিত হননি। দালাল মার্কা ইংরেজ ঐতিহাসিকরা প্রশংসা করতে গিয়ে অনেকে চরম মাত্রায় পৌঁছে গেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা আকবরের জন্য লিখেছেন, বৃটিশ যুগের ডালহৌসির সাম্রাজ্য প্রসার নীতির সাথে আকবরের তুলনা করলে মনে হয় যেন মোঘল বাদশা ভারতের আকাশে প্রখর সূর্যের মত দীপ্তমান আর ডালহৌসির ক্ষুদ্র তারকাটি তার পাশে পাশে মিটমিট করে জ্বলছে–"A strong and stout annexationist before whose sun the modest star of Lord Dalhousie pales." আকবর দেখতেও সুন্দর ছিলেন না, তাঁর রং ছিল কাল তদুপরি আকবর ছিলেন খর্বাকৃতি। কিন্তু ইংরেজ প্রভুর (?) দেয়া সনদ হচ্ছে–"He looked every inch a king." অর্থাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চিই আকবর রাজার মত। আবার কোন কোন প্রভু (?) বলেছেন–"He was great with the great, lowly with the lowly." শক্তের সাথে শক্তি প্রয়োগ আর নরমের সাথে নম্রতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। আবার কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, তাঁর চক্ষুর চাহনী ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল সমুদ্রের মত–'Vibrant like the sea in sunshine' ইত্যাদি।

তিনি হিন্দু নারী বিবাহ করেছিলেন। সেখানে নিশ্চয় ইসলাম ধর্মে কোন বাধা নেই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে নারীকে প্রথমে মুসলমান হতে হবে, তারপর ইসলাম অনুযায়ী বিয়ে হলে তা বৈধ হতে পারে। বিবাহ আর ব্যভিচারের পার্থক্য একটুকুই। কিন্তু আকবর তাঁর হিন্দু

পত্নীদের রাজ অন্তপুরে হোমাগ্নি জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং যিনি যে ঠাকুরের পূজারিণী ছিলেন তাঁর তেমনি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের মধ্যে তথা রাজবাড়িতে অনৈসলামিক কু-প্রথার প্রচলন হয়, যথা মদপান, ব্যভিচার, গীতবাদ্য প্রভৃতি। তাঁর সন্তানগণ এত বেশি ব্যভিচার প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, আকবরের জীবদ্দশাতেই তাঁর দুই পুত্র মুরাদ ও দানিয়াল অত্যন্ত মদপানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম বা জাহাঙ্গীরও চরম মাতাল ছিলেন বলা যেতে পারে। মহামতি আকবরের পুত্রদের মধ্যে মদপান এত চরমে ওঠে যে মদে আর নেশা হত না বলে তাঁরা মদের সাথে ভাং নামক উগ্র মাদক দ্রব্য মিশ্রিত করে পান করতেন।

যাহোক, ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দু রাজা হিমুকে বৈরাম খাঁর রণকীর্তির কারণে পরাজিত করা সম্ভব হয়। হিমু বন্দী হন এবং আকবরের শাসনের প্রারম্ভে আকবরের সামনেই তাঁর মুণ্ডুটি দেহচ্যুত করা হয়। আকবরকে মহামতির অভিনয় করতে হলে এ অশোভনীয় কাজটুকু দামাচাপা দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে এত বড় এক নৃশংশ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার বাদ দেয়াও যায় না, তাই ভারতজনের ইতিহাসে' লেখা হয়েছে–"বন্দী হিমুকে আকবরের কাছে ধরিয়া আনিয়া বৈরাম হত্যা করিতে বলিলে তিনি তাহা করেন নাই। শেষে বৈরাম নিজেই তরবারি দিয়া হিমুর মুণ্ডুটি কাটিয়া ফেলেন।" লেখক এই ঘটনাটির প্রমাণ দেয়ার জন্যে কিছু ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের নাম দিয়েছেন যাঁরা এই ঘটনা সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন আবুল ফজল, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ইত্যাদি। তবুও বাজারের ঐতিহাসিকদের প্রমাণ প্রয়োগ শান্তি না পেয়ে পরক্ষণেই লিখেছেন, "ভিসেণ্ট স্মিথ কেন যে আকবরকে কিশোর বয়সেই এ নিষ্ঠুর হত্যার দায়ে দোষী করিয়াছেন তা রহস্যজনক মনে হয়। হিমুর পরাজয়ে মোঘল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং আফগান শক্তির অবসান ঘোষিত হয়।"

প্রথম পক্ষের উপরোক্ত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় দোষ যেন আকবরের নয়–বৈরাম খাঁর। দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য হচ্ছে–আকবরই হত্যাকারী কারণ কাউকে হত্যা করা সিংহাসন বা পালঙ্কে বসা সম্ভব নয়। হত্যা করার নির্দিষ্ট স্থান প্রত্যেক রাজার থাকে, এখানেও তাই ছিল। আকবর তাঁকে (হিমুকে) হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং হত্যাকাণ্ড তিনি চোখের সামনে দেখতে ইচ্ছুক ছিলেন শুধু হত্যা করার উদ্দেশ্য থাকলে বৈরাম খাঁ তার আগেই কাজ সমাধা করতে পারতেন। হিমুকে বদ্ধ ভূমিতে আনার পর আকবরকে মনে করিয়ে দিলেন তাঁর ইচ্ছার কথা। তারপর আকবরের অনুমতি ও আদেশেই তাঁকে হত্যা করা হয়। যিনি যখন নেতৃত্ব দেন সাধারণ নিয়মে হত্যাকাণ্ড তাঁর দ্বারা, তাঁর সঙ্গী বা কর্মী দ্বারা, তাঁর আদেশ, সমর্থন বা মৌনতা প্রভৃতিতেই ঘটে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে অর্থাৎ আকবরের আদেশ বা নির্দেশেই একজন রাজার এ রকম হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এবার যাঁরা আকবরের দোষ গৌণ এবং বৈরাম খাঁর দোষ মুখ্য বলেছেন তাঁরা হলেন আবুল ফজল, জাহাঙ্গীর আর আবদুর রহিম প্রমুখ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যাঁরা ঐতিহাসিক তাঁরা নবী বা অবতার নন যে, তাঁদের সাধরণ মানবিকতা প্রত্যেক মুহূর্তে সজাগ থাকবে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের লোভ, লালসা, ক্রোধ, অভিমানের কবলেও পড়তে হয়; এক্ষেত্রেও কারণ তাই। যেহেতু আবদুর রহিম হচ্ছেন পিতার অবাধ্য সন্তান (পিতা পুত্রের কলহের প্রমাণ আছে), আর জাহাঙ্গীর হচ্ছেন আকবরের ঔরসজাত সন্তান–সে ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে। এমনিভাবে আবুল ফজল ও আকবরের মধ্যেও এক গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল–গুরুর পুত্র। অতএব সেখানেও তাঁদের কিছু দুর্বলতাবোধ বোধহয় আশ্চর্যের ঘটনা নয়।

আকবরের মা ও বাবার স্বপ্ন ছিল, 'আমার ছেলের নাম ও রাজ্য বিস্তার যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে–যেমন মৃগনাভীর সুগন্ধ ছড়িয়ে যায়।' আকবরের তাই ইচ্ছা ছিল, ছলে-বলে, কলে-কৌশলে, হত্যা, মিথ্যা শঠতা যেমন করেই হোক তাঁকে রাজ্য বিস্তার করতেই হবে। তাই তিনি বৈরাম খাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি আমার ধর্ম বাবা, খান-ই-বাবা, সুতরাং যতক্ষণ না আমি মজবুত হই আপনি যা ভাল হয় করুন।' হত্যার জন্য দায়ী বন্দুক না বন্দুকধারী সেটাই আজ সিদ্ধান্তের বিষয়। তখন আফগান শক্তি নির্মূল করতে হলে হিমুর ধ্বংসের প্রয়োজন ছিল। তাই হিমুর মৃত্যুর সাথে সাথেই দিল্লি ও আগ্রা আকবরের নিয়ন্ত্রণে এসে গেল।

অপরদিকে আদিল শাহও অন্যত্র নিহত হন। সিকেন্দার শূর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইবরাহিম শূরও বহু দিন ধরে ঘুরে ঘুরে শেষে উড়িষ্যায় নিহত হলেন। ১৫৫৮ হতে ১৫৬০ খৃস্টাব্দের মধ্যে গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর আকবরের কবলে এসে যায়। এসবই বৈরামের বীরত্বের ফল আর আকবরের ভাগ্যের জোর বলতে হবে। অবশেষে ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর অপেক্ষা বহু গুণে সর্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ পীর মহম্মদ এবং আদম খাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। এটা ছিল বৈরাম খাঁর ব্যক্তিত্বে চরম আঘাত ও পরম বেইজ্জতি। তবুও একপক্ষের কাছে আকবর মহামতি।

রৈরাম খাঁর মৃত্যুর পর এক সময় আকবরের মা হামিদা ও ধাত্রীমাতা মহিম অনাগা আকবরকে অশ্রুপ্লুত নয়নে বলেছিলেন, 'আকবর, বৈরাম আর নেই। তোমাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে সঠিক পথ দেখাবে তেমন কেহ নেই। তাছাড়া তুমি নিজেও লেখা-পড়া জাননা। সুতরাং যখন ভাল মন্দ বুঝতে পারবে না আমাদের মতামত নেয়ার চেষ্টা করবে।' কিন্তু আকবর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজ্ঞ বলে মনে করতেন। পরে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে ছোট ছোট ব্যাপারে মাকে খুশি করবার জন্য মহামতি মায়ের মতামত নিতেন। তাও আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো ছিল অরাজকীয় বিষয়।

নূতন সেনাপতি আদম খাঁ ও পীর মহম্মদ ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে মালব জয় করেন। পরের বছর ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আকবর তাঁর সেনাপতি আদম খাঁকে হত্যা করেন। যে আদম খাঁকে আকবর হত্যা করেছিলেন সে আদম খাঁ ছিলেন তাঁর ধাত্রীমাতা মহিম অনাগার পুত্র। পুত্রের শোকে বৃদ্ধা মাতা বাঁচতে পারলেন না, বুকফাটা শোকে দেহত্যাগ করলেন।

তারপর পীর মহম্মদকেও তিনি দিয়েছিলেন মৃত্যুদণ্ড। পরে আকবর তাঁর একজন অন্যতম মামা খাজা মোয়াজ্জেমকে মিথ্যা হত্যার অভিযোগে প্রাণদণ্ড দেন। নানা কারণে সারা মুসলমান সমাজ, আত্মীয় অনাত্মীয় প্রত্যেকেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। আকবর বুঝতে পারলেন একটা দল ভেঙ্গে গেছে। অতএব অন্য কূল আর ভাঙ্গতে দেয়া হবে না। যেমন করেই হোক অমুসলমানদের হাতে রাখতে হবে। তাঁর এ প্রস্তাবে রাজপুতরা অনেকে সাড়া দিলেন। সাড়া দেয়ার কারণ ঐতিহাসিকদের মতে প্রধানতঃ দুটি -প্রথমতঃ পূর্ব থেকেই রাজপুতরা মুসলমানদের শক্তি ও প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা এর মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়, আধিপত্য লাভ ও ভবিষ্যতে হিন্দু সাম্রাজ্যে স্থাপনের আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন। যাহোক, ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে অম্বর রাজ্যের রাজা বিহারীমল্ল আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাঁর কুমারী এক কন্যাকে দান করেন। সেলিম বা জাহাঙ্গীরের জন্ম এ কন্যার গর্ভেই হয়েছিল। সেলিম চিস্তি নামে এক মুসলমান সাধক দোয়া করেছিলেন বলে তাঁরই নামানুসারে নাম রাখা হয়েছিল 'সেলিম'।

তারপর মানসিংহ আকবরকে তাঁর আপন বোন দান করেন। আকবর নিজে বিয়ে না করে সেলিমের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। মানসিংহের বোন ছিলেন বিহারী ভগবান দাসের কন্যা। এ কন্যারই গর্ভজাত সন্তান খসরু। যোদপুরের রাজা উদয়ের কন্যাকেও গ্রহণ করেন

আকবর। বিকানীরের রাজা রায় সিংহও তাঁর কন্যা দান করলেন মহামতির হেরেমে। তাঁকে বিয়ে করলেন জাহাঙ্গীর। জয়সলমীরের রাজা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, শুধু বশ্যতাই নয়, সে সাথে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকেও।

মোটকথা, মহামতির আসল ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাঁর অসংখ্য স্ত্রী, অ-স্ত্রী আর পত্নী-উপপত্নীর কথা, যাঁদের দ্বারা মহামতির মহল সব সময়ই জমজমাট থাকত। কিন্তু যেহেতু এসব কীর্তি ইতিহাসে প্রকাশ করলে 'মহামতি' নামের সার্থকতা থাকে না, তাই এগুলো দৃষ্টির আড়ালেই চাপা ছিল এতদিন।

'আকবরের বহু সংখ্যক উপপত্নী ছিল...'–এসব নূতন তথ্যের সন্ধান মুসলমান খিখিত ইতহাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিখ্যাত হিন্দু ঐতিহাসিক শ্রীরামপ্রসাদ গুপ্তের লেখা 'মোঘল বংশ' পুস্তকের ১৭৮ পাতার মন্তব্য বিশেষ স্মরণযোগ্য–"উপপত্নীর সংখ্যা ছিল পাঁচ শতের বেশি।" পাঁচ শত নারীর ধর্ষক রাজা বরে ইতিহাসে যাঁর উল্লেখ আছে যদি এটা সত্য হয় তাহলে তাঁকে আমরা 'মহামতি' বললেও আগামীকালের ইতিহাস বলবে কি করে সেটাই চিন্তার কথা। আমাদের ভারতের বিখ্যাত "Akndication of Aowrangzab" গ্রন্থের ১৩ পাতায় আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে–"Akber had over five thousand wives." আকবরের পাঁচ হাজারেও বেশী স্ত্রী ছিল। যাঁরা কন্যা দিয়েছিলেন তাঁরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই দিয়েছিলেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। ফলে তাঁরা বাদশার অনুগ্রহে ধন্য হয়ে অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি ও সম্মান পেয়েছেন, আর রাজপুতদের হাতে এসেছিল রাজকীয় শক্তির মোটা একটা অংশ।

এক পক্ষ বলেন, আকবর ও রাজপুতদের উদারতার সাক্ষ্য হয় কন্যা প্রদানের ক্ষেত্রে। অপর পক্ষ বলেন, নারী লোলুপতা আর চরিত্রহীনতা প্রকাশ পেয়েছে মহামতির দিক থেকে, আর এ সমস্ত রাজপুতদের দিক থেকে প্রকাশ পেয়েছে নীচতা ও হীনতা। তাঁরা আরো বলতে পারেন, পার্থিব উন্নতির জন্য যাঁরা নিজেদের কন্যা ও বোনকে চরিত্রহীনের হাতে স্বেচ্ছায় অর্পণ করতে পারেন তাঁরা নিঃসন্দেহে শুভ কর্ম করেননি।

তবে এ কথা সত্য ও স্বাভাবিক যে, প্রত্যেতক রাজপুতই পাইকারি হারে এ পাপ পঙ্কিলে নিমজ্জিত হয়েছিলেন তা নয়। বরং বহু রাজপুত বীর তাঁদের বরিত্বের মহিমাকে অক্ষুন্ন রাখতে উল্টো নজির সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আকবর যখন মধ্য প্রদেশের গন্ডোয়ানা দখল করেন তখন সেখানকার বিধবা রাণী দুর্গাবতী যুদ্ধে পরাস্ত গন পরে তিনি আত্মহত্যা করেন, তবুও আকবরের হাতে পড়েন নি । মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র উদয় সিংহ আকবরের প্রস্তাব সত্ত্বেও তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করেননি, যার ফলে আকবর কর্তৃক চিতোর আক্রান্ত হয় ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে। উদয়-সিংহ পলায়ন করেন কিন্তু রাজপুত সৈন্যগণ জয়মল্ল ও পুত্রের নেতৃত্বে যুদ্ধ করে। অবশেষে পুত্ত ও জয়মল্লকে আকবরের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হতে হয় বলে চিতোর আকবরের হাতে এসে যায়। যুদ্ধে পরাজিত রাজপুতদের প্রাণ দিতে হল 'মহামতি' আকবরের নিষ্ঠুর হাতের ইঙ্গিতে। আর নারীরা হালচাল বুঝতে পেরে 'জহরব্রত' পালন অর্থাৎ আগুনের চিতার মত তৈরি করে তাতেই ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করলেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রতাপ সিংহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনি পিতার চেয়েও সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে আকবরের হাতে তিনি পরাজিত হলেন। তারপর বনে জঙ্গলে লুকিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে কাটিয়ে বহু যুদ্ধ করে অনেক স্থান পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন কিন্তু তাঁর সাধের চিতোর অধিকার করা আর সম্ভব হয় উঠে নি। প্রতাপের এই পরাজয় বিজয়েরই নামান্তর। তিনি বশ্যতা স্বীকার ও কন্যা দানের চিন্তাকে মুহূর্তের জন্যও মস্তিষ্কে আসতে দেননি।

Goto List

প্রতাপের জন্য অনেকে গোঁড়া সংকীর্ণমনা হিন্দু বলে অভিযোগ করেন। কারণ, একবার আকবরের শ্যালক ও সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। প্রতাপ মোটেই অতিথির আপ্যায়ন বা সম্মান প্রদর্শন কিছুই করেননি বরং অপমানের সুরে বলেছিলেন, 'যারা মুসলমানকে পিসি, বোন বা কন্যা দিয়েছে তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। মানসিংহর মান বিনষ্ট হওয়ায় তিনি বলেছিলেন, 'এর কেমন করে প্রতিশোধ নিতে হয় আপনাকে দেখাতে পারি জানেন?' প্রত্যুত্তরে প্রতাপ বলেছিলেন, 'যাও, তোমার পিসেমশাই, ভগ্নিপতি, জামাইদা আকবরকে গিয়ে সব বল এবং তাঁকেও সাথে করে এনো।'মোটকথা, প্রতাপ এক সাথে খাদ্য গ্রহণ করেন নি এবং ঘৃণাভরে উঠে গিয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্যঃ রাজপুত ও মারাঠাঃ রমেশচন্দ্র দত্ত, পৃষ্ঠা ১৬)

প্রতাপের এমন বীরত্ব আমাদের মতে মোটেই গোঁড়ামি নয় বরং একনিষ্ঠ বীরের বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ। তাঁকে গোঁড়া হিন্দু না বলে নিষ্ঠাবান বীর প্রতাপ সিংহ বলা উচিত।

তারপর বনে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে প্রতাপ সিংহকে হৃদয় বিদারক ঘটনার সম্মুখীন হতে হল। তাঁর আদরের কন্যা ক্ষুধায় কাঁদতে কাঁদতে ছটফট করতে লাগল। তাছাড়া আরও পারিপার্শ্বিক কারণে তিনি আর ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে আকবরকে এক লিখিত পত্রে জানালেন, তাঁর কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করতে সম্মত। পত্র পেয়ে খুশি হয়ে আকবর সভাসদকে ডেকে বললেন, প্রতাপের উপর অত্যাচার যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে। ঠিক এ সময় সভাসদগণের মধ্য থেকে জাহাঙ্গীরের শ্বশুর বিকানীরের রাজা রায় সিংহের কনিষ্ঠ সহোদর পৃথ্বীরাজ মর্মাহত হয়ে এক পত্রে প্রতাপকে বললেন–"আমরা, রাজপুতরা আকবরের অধীনতা স্বীকার করেও এবং তাঁকে কন্যা দিয়ে অধঃপতিত হলেও আপনার জন্য গর্ব করি। সম্রাট আকবরকে একদিন মরতেই হবে তখন আমাদের দেশে খাঁটি রাজপুতবীজ বপনের জন্য আমরা আপনার কাছেই উপস্থিত হব। রাজপুত জাত আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে" পত্রটি যে একটি ঐতিহাসিক গবেষণামূলক দলিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে যা হোক, এ পত্র পাওয়ার সাথে সাথে প্রতাপ নূতন করে শক্তি ধারণ করলেন। রাজপুতগণ রাজপুত জাতির প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীক্ষা করেছিলেন বীজ বপনের–কিন্তু কালের চক্রত পরিচালিত হয় বিশ্বনিয়ন্তার ইঙ্গিতেই।

'মহামতি'র ইতিহাসে দুর্লভ দলিল

আকবর এক নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন, যার নাম 'দীন-ই-ইলাহী'। এটা এক পক্ষের কাছে দারুণ ভাবে প্রশংসিত আর অপর পক্ষের কাছে তা নিরেট ভন্ডামি ও আবর্জনার ন্যায় পরিত্যাজ্য। নিরপেক্ষ ভূমিকায় বলতে হলে, 'দীন-ই-ইলাহী' ছিল মহামতি আকরের স্বধর্মের নিপাত সাধনের এক পরিকল্পিত সুগভীর চক্রান্ত।

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্ ছাড়া কোন সৃষ্টির উপাসনা করা নিষেধই নয় বরং সৃষ্টির দ্বিতীয় কোন উপাস্য স্বীকার করলে তিনি মুসলমানই নন। তাই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সারা জীবন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন, উপাসনা একমাত্র স্রষ্টারই জন্য। কিন্তু মহামতি তাঁর 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্মে সূর্য উপাসনার উৎসাহ ও আদেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও শাস্ত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের উপাসনা করতেন।

সারা বিশ্বের মুসরমানদের মূলমন্ত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ আল্লাহ্রই প্রেরিত নবী বা রাসূল। কিন্তু আকবর তাঁর নূতন 'কালেমাহ' চালু করলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবর খলিফাতুল্লাহ।' এত বড় আঘাত, যা মুসলমানদের উপর কোন বিরুদ্ধবাদী অন্য ধর্মাবলম্বীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি, তাই-ই হয়েছিল 'মহামতির' সময়ে।

আকবরের নূতন ধর্মে মদ ও সুদকে বৈধ করে ঘোষণা এবং উৎসাহ দান করা হয়েছে। কুরআন শরীফে জুয়া খেলাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আকবর তাঁর নূতন ধর্মে জুয়া খেলা জায়েজ বা বৈধ করেন। শুধু তাই নয়, রাজ খরচে পৃথক অট্টালিকা তৈরি করে সেখানে জুয়া খেলার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। এছাড়া মজার কথা হল, জুয়া খেলায় যাদের পুঁজি বা মূলধন থাকত না রাজকোষ থেকে তাদের ঋণ দেয়ারও সুব্যবস্থা ছিল।

দাড়ি রাখা ইসলাম ধর্মে 'সুন্নাত' বা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নির্দেশ। না রাখলে পাপ হয়। তাছাড়া দাড়ি রাখাকে বা বিশেষ কোন সুন্নাতকে উপেক্ষা কিংবা অস্বীকার করলে এবং সে ইসলাম বিরোধী বলে বিবেচিত হয়। মহামতি দাড়ি মুন্ডন বৈধ বলে আইন করলেন এবং তাঁর মাতার মৃত্যুর পরেই মাতার শোকে দাড়ি মুন্ডন করে আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করলেন। পর দিন থেকে রাজদরবারে যত উচ্চ শ্রেণীর কর্মচারি ছিলেন তাঁরা অনেকে নিজের দাড়ি মুন্ডন করে বাদশাহের পদপ্রান্তে উৎসর্গ করলেন। মহামতি আকবর নিজের ধর্মের ও বুদ্ধির সাফল্যে বেশ আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন।

প্রত্যেক মুসলমানের কুরআন ও হাদীসের আইন অনুযায়ী স্ত্রী সংসর্গান্তে 'ফরয গোসল' (এক বিশেষ নিয়মে গোসল) অবশ্য করণীয়। কিন্তু, নূতন ধর্মে তা রহিত করা হয় এবং এক নূতন প্রথার প্রচলন করা হয়–'গোসল করা ভাল কিন্তু পরে নয়, পূর্বে।'

মহামতি নিজের, রাজপুতগণের এবং সভাসদবর্গের সুবিধার্থে এক অভিনব বিয়ের প্রচলন করলেন যার নাম 'মুৎআ বা অস্থায়ী বিয়ে। অর্থাৎ দু-চার দিন বা দু-এক মাসের জন্য একটা বিয়ে করে আবার তাঁকে তালাক বা বিসর্জন করা যাবে। বিয়ের নামে এরকম এক বীভৎস ব্যভিচার প্রথার প্রচলন করে নারীর নারীত্বকে কলঙ্কিত করতে মহামতির মতি কোন সময়ে কেঁপে ওঠেনি।

তিনি ইসলামের সুচিন্তিত 'পর্দা' প্রথাকে একেবারে রহিত করেন। অর্থাৎ সারা ভারতের মুসলমান-হিন্দু ভদ্র রমণীগণের মধ্যে অবগুণ্ঠন–যথা ঢিলে পোশাক পরা, মাথায় কাপড় দেয়া, ওড়না ব্যবহার করা ইত্যাদি যেসব সভ্য নীতিগুলোর প্রচলন ছিল, মহামতি কঠোর নির্দেশ দিয়ে তা নিষিদ্ধ করলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধ ছিল। কিন্তু মহামতি পরিস্কার নির্দেশ দিলেন–বাজারে বাইরে চলাফেরার সময় মাথায় কাপড়, পর্দা অথবা অবগুণ্ঠিতা হওয়া চলবে না।

বার বছরের কম বয়স্ক বালকদের 'খাতনা' দেয়া নিষিদ্ধ । বড় হয়ে সে নিজের ইচ্ছায় করাতেও পারে আবার নাও করাতে পারে–এরকম আদেশও জারি করা হল।

মৃতকে কবর দেয়া সারা পৃথিবীর মুসলমানের একটা সার্বজনীন প্রথা ও ইসলাম ধর্মের নির্দেশ। আর কবর দেয়ার নিয়ম হল মৃতদেহটিকে কবরে এমনভাবে শায়িত করা যেন মক্কার কাবাঘরের দিকে পা বা মাথা না থাকে। (ভারতে উত্তর দক্ষিণে) সম্রাট নির্দেশ দিলেন 'মৃত ব্যক্তির স্কন্ধে একটা গমের প্যাকেট বা ইট বেঁধে পানিতে ফেলে দাও। আর যদি একান্ত কবর দিতেই হয় তাহলে ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে কাবা শরীফ, অতএব সেদিকে পা করেই মৃত দেহটিকে শায়িত রাখতে হবে।'

ইসলামী বিধি অনুযায়ী পুরুষদের জন্য প্রকৃত রেশম সিল্ক বস্ত্র ও সোনার গহনা ব্যবহার অবৈধ। আকবর আইন করলেন পুরুষদের জন্য সোনা ও সিল্ক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নয়।

তাঁর নূতন ধর্মে গরু, মোষ, মহিষ উট খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু বন্য জন্তু যথা বাঘ, ভল্লুক, সিংহ ইত্যাদি খাওয়া বৈধ ছিল। গো মাংস খাওয়া শুধু নিষিদ্ধই ছিলনা, বিশ্বের মুসলমানদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎসব 'ঈদুর আজাহা'তেও গরু ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।

Goto List

মসজিদ আযান দেয়া ও একসাথে (জামাতে) নামায পড়ার নিয়ম বন্ধ করা হয়েছিল (মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ, পৃষ্ঠা ৩১৪)। পবিত্র মক্কা শরীফে হজ্ব পালন যুগে যুগে সব দেশের স্বচ্ছল মুসলমানের জন্য একবার জরুরী, বলে 'ফরয'। তাঁর সময় হঠাৎ আইন করে হজ্ব নিষিদ্ধ করা হয়।

কুকুর ও শূয়োর ইসলাম ধর্মে ঘৃণ্য পশু বলে চিহ্নিত। আকবর কিন্তু তাঁর সময়ে কুকুর ও শূয়োরকে আল্লাহ্‌র 'কদরত' (মহিমা) প্রকাশক ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেন।

তিনি কুরআন-এ বিশ্বাস করতে নিষেধ করতেন। অর্থাৎ তিনি চাইতেন সারা পৃথিবী কুরআনের প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ধ্বংসের কারণ হোক।

প্রত্যেক মুসলমানের তাঁর মুসলমানিত্ব বজায় রাখার জন্য মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস রাখা একান্ত জরুরী। কিন্তু 'মহামতি' পুনরুত্থান ও বিচারের ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতেন।

মুসলমানদের একে অপরের সাথে সাক্ষাত হলে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' [আল্লাহ্ আপনার উপর শান্তি বর্ষণ করুন] বলার নিয়ম আছে। প্রত্যুত্তরে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' (আপনার উপরেও শান্তি বর্ষিত হোক) বলা হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে এ পদ্ধতি ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই।

আকবর সালাম দেয়ার প্রথা বিরোপ করে তার পরিবর্তে 'আল্লাহু আকবার' বলার নিয়ম চালু করেছিলেন। তার উত্তরে 'জাল্লা জালালুহু' বলা হত। এবারেও হিন্দু প্রজাগণ তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, 'সম্রাট, আপনার কাজকর্ম দেখে সমস্ত হিন্দুই আপনার উপরে সন্তুষ্ট। তাই শ্রদ্ধায় হিন্দুরা আপনাকে দিল্লিশ্বর ও জগদীশ্বর বলে। কিন্তু আপনি সালাম তুলে দিয়ে 'আল্লাহু' শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? আপনি এটাও তুলে দিন।' তখন আকবর হিন্দু প্রজাবর্গকে নিশ্চিন্ত করতে বললেন–মুসলমানদের জন্যই আমিই স্বয়ং আল্লাহ্ হয়ে প্রকাশিত হয়েছি অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবর' মানে আকবরই আল্লাহ্। তাঁর অনুগত হিন্দু প্রজাগণ আবার অভিযোগ করলেন–আল্লাহু শব্দটা হিন্দু বিরোধী অতএব ওটাকে তুলেই দিন। আকবর তাই-ই করলেন। সরা দেশে ঘোষণা করে দিলেন–আজ থেকে 'সালাম' বা আল্লাহুর পরিবর্তে 'আদাব' শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

যীশুখৃষ্টের সাথে যেমন 'খৃষ্টাব্দে' জড়িত তেমনি 'হিজরী' সন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অনেক হিন্দু প্রজা 'দিল্লিশ্বরে'র কাছে আবেদন করলেন–আমরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমাদের জন্য একটা পৃথক সনের ব্যবস্থা করা হোক। তাই করা হল, পৃথক নামের নাম রাখা হল 'ইলাহি' বছর। তাতে অনেক হিন্দু প্রজার হিন্দু প্রজা তাঁদের কৃতকার্যতার জন্য 'মহামতির' মহত্ত্বের প্রতি খুবই আস্থাবান হলেন।

এখানে বেশ প্রমাণ হচ্ছে, আকবর আসলে ইসলাম ধর্ম বিধ্বংসী কতকগুলো চরমপন্থী মানুষের হতের পুতুল ছিলেন মাত্র।

মুসলমানদের মসজিদ ও উপাসনালয়গুলোকে গুদাম ঘর ও হিন্দু প্রজাদের ক্লাব ঘরে রূপান্তরিত করেও আকবর এক বিশেষ শ্রেণীর বাহাবা কুড়িয়েছিলেন। (দ্রঃ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠ ৩২২)

ইসলাম ধর্ম নিঃশেষিত হতে পারে কি না তা পরীক্ষার জন্য কিছু মসজিদ অমুসলমান প্রজারা ভেঙ্গে ফেলে সে স্থানে মন্দির নির্মাণ করে। আকবরের কাছে প্রতিবাদ করা হলে তিনি যুক্তি দেখালেন, 'মুসলমানদের এ মসজিদগুলো সত্যিকারের প্রয়োজন নিশ্চয় ছিলনা, যদি থাকত তাহলে ভাঙ্গা সম্ভব হতনা। মন্দিরের প্রয়োজন ছিল তাই মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদও ধর্মস্থান আর মন্দিরও ধর্মস্থান। একটি ধর্মস্থান ভেঙ্গে অধর্মের কিছু গড়া হলে

প্রতিকার করা যায় কিনা বিবেচনা করা হত। কিন্তু এখানে সে রকম কিছু না হয়ে বরং ধর্মস্থানের পরিবর্তে ধর্মস্থানই গড়ে উঠেছে।' তারপরেই মসজিদ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে নূতন মসজিদ নির্মাণ বন্ধ করে দেয়া হয়।

মুসলমান ধর্মের হৃৎপিণ্ড পবিত্র কুরআন ও হাদীস শিক্ষা, শিক্ষালয় বা শিক্ষাদাতাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আকবর সবচেয়ে মারাত্মক কর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ইসলাম সংক্রান্ত শিক্ষার চির অবসানই ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। এক কথায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা নির্দেশ দিয়েছেন বা নিষেধ করেছেন, তিনি যেন তার সাথেই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন মুসলিম বিদ্বেষী অমুসলমান শাসকও যা কল্পনা করেননি, 'মহামতি' তা বাস্তবে পরিণত করার জন্য কত পাকাপাকি সুব্যবস্থা করেছিলেন এ আলোচনার পর সে কথা সহজেই অনুমেয়।

আকবর নিজেকে ঈশ্বরের মত মনে করতেন এবং তিনি ভাবতেন, তিনি হচ্ছেন মনুষ্য আকারের দেবতা (দ্রঃ সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃষ্ঠা ৫৯) আর সে জন্যই আকবর একটি নূতন 'বিদাতে'র সৃষ্টি করেন, যাকে বলা হত 'ঝারোকা দর্শন'–সূর্য ওঠার সাথে সাথে তিনি দরবারে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সৌভাগ্যের সৃষ্টি করতেন। আরও পরিষ্কার ভাষায় দিল্লিশ্বরকে জগদীশ্বর (?) মনে করে দেখতে আসতেন গরীব প্রজার দল। ঐতিহাসিক বদাউনির মতে এটা ছিল হিন্দু দর্শনের অনুকরণ। (দ্রঃ মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ ঃ
২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৬)

আকবর জনসাধারণকে তাঁর সৃষ্ট জীবের মত মনে করে খুব বেশি শ্রদ্ধার আশা করতেন। রাজদরবারে নিয়মের বাইরে একটু বেয়াদবি বা ভুলত্রুটি বরদাস্ত করতেন না। তাঁর দরবারে 'কুর্ণিশ' অর্থাৎ মাথা ও কোমর ঝুঁকিয়ে দুই হাতের তালু কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে এগিয়ে যাওয়া এবং কাজ সেরে এভাবে ফিরে আসার প্রথা চালু ছিল। 'তসলীম' প্রথাও বর্তমান ছিল, অর্থাৎ ডান হাত মেঝেতে রেখে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের তালু মাথায় ঠেকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা। ইসলামে যদিও এক আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে সিজদা করা মোটেই চলে না তবুও তাঁর দরবারে 'জামিন বসা' অর্থাৎ সম্রাটের সামনে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সিজদা বা প্রণিপাত করে সম্মান জানানর ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। (দ্রঃ আইন, প্রথম খণ্ডের ১০ পৃষ্ঠা, দি কালচারাল আস্পেক্ট অব মুসলিম ইন ইন্ডিয়া ঃ এস, এম, জাফর, পৃষ্ঠা ২০-২৯)

আকবর ইসলামের নিয়ম-কানুন বর্জন করার আদেশই শুধু দিতেন না প্রকাশ্যে ইসলামের নিন্দাও করেন। বলতেন, 'আরবদেশের ফকীররা ইসলামের সৃষ্টি করেছে।' ইসলাম সম্বন্ধীয় আরবী বইপত্র পড়া নিষিদ্ধ ছিল, তবে চিকিৎসা বিষয়ক ও অনৈসলামিক প্রস্তকাদি পড়ার অনুমতি ছিল। আসমানী বাণী কুরআনকেও তিনি অস্বীকার করেন। (দ্রঃ নুয্হাতুল কাওয়াতির ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৯)

ঐতিহাসিক মাওলানা আকরম খাঁর তথ্যবহুল বিরল গ্রন্থ 'মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' থেকে আরও কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে–(ক) শাহী মহলে অগ্নি পূজার তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। (খ) পারস্যের কুখ্যাত 'মোলহেদ' দলের তিনিই প্রশয়দাতা যা থেকে ভারতে তান্ত্রিক ভণ্ড মারেফাত দলের সৃষ্টি হয়। (গ) তিনি নিজে স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে অন্য ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা পরে চন্দন-চর্চিত দেহে সন্ন্যাসীর পোশাকে দরবারে বসতেন। (ঘ) সন্ধ্যার সময় দীপ জ্বালানোর সাথে সাথে আকবর সকলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে অগ্নি শিখাকে প্রণাম করতেন। (ঙ) তাঁর সময়ে বেশ্যাখানা বা পতিতালয় বৈধ

করা হয় এবং প্রথম কর ধার্য করা হয়। (চ) তিনি আল্লাহ্‌র ছায়া, তাঁর হুকুম না মানলে নরকে যেতে হবে—এ নির্দেশনামায় ১৭ জন মুসলমান ও একজন হিন্দু পণ্ডিতের সই করান। (ছ) হিন্দু প্রজাদেরকে মসজিদে পূজা করার অনুমতি দেন। (জ) মূর্খ নর-নারীরা আকবরকে নিয়মিত পূজা করতে শুরু করেন।

যদিও এ তথ্যগুলো উপরোক্ত গ্রন্থের ১২৯-১৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে তবুও এগুলো লেখকের সৃষ্টি করা বক্তব্য নয়, তিনি সাহায্য নিয়েছেন টার্কস্‌ ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থের। এমনিভাবে মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী সাহেবের 'তাজদীদে এহ্‌ইয়ায়ে দ্বীনে'র আবদুর মান্নান তালিব কর্তৃক অনুদিত ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন পুস্তকের ৫৬-৬১ পৃষ্ঠাতেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

এখন একটা সহজ প্রশ্ন হতে পারে, উপরোক্ত তথ্যগুলো যদি সত্য হয় তবেই তো আকবর হবেন এ অভিযোগে অভিযুক্ত। কিন্তু যদি কোন ইতিহাসে তার প্রমাণ না থাকে তাহলে অভিযোগের অধিকার আধুনিক ঐতিহাসিকদেরই বা থাকবে কি করে? সেহেতু উল্লেখ করা যেতে পারে 'এসবাতুন নবুওত', রিসালায়ে তাহলীলিয়া', 'মুনতাখাবুল লুবাব', মুনতাখাবুত্তাওয়ারিখ', 'নুযহাতুল খাওয়াতির', 'আইন-ই আকবরী', Mujaddid's Conception of Towhid,' 'Awnul Mabud', 'Kalematul Hoque', 'History of Nationalism' প্রভৃতি অসংখ্য আকর গ্রন্থ আকবরের কীর্তিকলাপের সাক্ষী স্বরূপ আজও বেঁচে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরিতে, যেগুলো পড়ে অব্যর্থ সত্য ইতিহাসের উৎস সন্ধানে উৎসাহের খোরাক পাওয়া যায়। এছাড়া আরও বহু পত্র-পত্রিকা আমাদের দেশে ছোট বড় লাইব্রেরিতেও মজুদ রয়েছে, যেগুলো হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের তথ্য ও তত্ত্বের মিশ্রণে নিঃসন্দেহে মূল্যবান মূলধন।

আকবরের কোন দোষ ইংরেজ ও বর্তমান ঐতিহাসিকরা স্বীকার করতে চান না মোটেই। তাঁর গুণগানে বলা হয়, তিনি হিন্দুদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে দিয়েছিলেন। যদি ক্ষণিকের জন্য মেনেই নেয়া হয় জিজিয়া হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার ছিল তাহলে আকবর সিংহাসনে বসেই তা তুলে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। আকবরনামায় আছে, ১৫৬৪ খৃস্টাব্দে সরা ভারতবর্ষ থেকে জিজিয়া তুলে নেয়া হয়। যদিও আকবরনামা অনেক মূল্যবান তথ্য বহন করে তবুও মনে রাখা দরকার, এ ইতিহাস আকবর লিখিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর আবুল ফজলকে দিয়ে। তাই সন তারিখের সঠিক তথ্য জানতে হলে অন্য ইতিহাসের দিকে নজর দেয়া ভাল। যদি আমরা ঐতিহাসিক বদাউনির মুনতাখাবুত্তাওয়ারিখ এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে তার দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৬ পৃষ্ঠায় দেখতে পাব আকবর জিজিয়ার উচ্ছেদ করেছিলেন ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে নয়, ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে।

হিন্দুদের কাছ থেকে সম্রাটের দরবারে এত বেশি উপহার আর উপঢৌকন-আসত যে তাঁদের কাছ থেকে জিজিয়া নেয়ার প্রয়োজনই ছিলনা। তবুও দরদী (?) আকবর তা নিতে ছাড়েন নি। তাছাড়া, তর্কের খাতিরে ১৫৭৯-র পরিবর্তে যদি ১৫৬৪ খৃস্টাব্দকেই জিজিয়া বিলোপের সময় বলে ধরে নেয়া যায় তাহালেও বলা যায়, সিংহাসনে বসার (১৫৫৬) পর দীর্ঘ আটটি বছর তাঁর দরদ ছিল কোথায়? এতদিন তিনি জিজিয়ার উচ্ছেদ করলেন না কেন, তা কি সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ শ্রেণীর চিন্তার বিষয় নয়?

আরও গুরুত্বের ব্যাপার হল, আকবর প্রত্যেক অমুসলমানকেও যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বা যুদ্ধে যোগদানের জন্য অস্ত্রধারণে বাধ্যতামূলক আইন করেছিলেন। সুতরাং সেখানে জিজিয়া নেয়া তো কোনমতেই চলে না। তবুও জগদীশ্বর (?) তা থেকে বিরত হননি। তা সত্ত্বেও

তিনি এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের কাছে মহামতি বলে সুপরিচিত। (শর্ট হিষ্ট্রিঃ ঈশ্বরী প্রসাদ, পৃষ্ঠা ৩৩২)

আকবর অমুসলমানদের নাকি খুবই বিশ্বাস করতেন। বড় বড় সরকারি লেবেল মারা ঐতিহাসিকদের ইতিহাসে তাই দরদী আকবরের এত সুনাম। প্রকৃত ইতিহাস কিন্তু তা না বলে বরং উল্টোটাই তুলে ধরে।

আকবর-প্রচলিত মনসবদারী ব্যবস্থায় পাঁচ থেকে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদারদের মধ্যে অমুসলমানগণ থাকতে পারতেন কিন্তু দশ হাজার হতে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের মনসবদারিতে কোন হিন্দু বা অমুসলমান নিয়োগ তিনি মেনে নিতে পারেননি। মানসিংহ ও তোডরমল এত উচ্চপদের হয়েও মাত্র সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখতে পারতেন। দশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বা তদুর্ধের মনসবদার হতে পারতেন একমাত্র রাজ পরিবারের লোক। (দ্রঃ আনন্দরাম ঃ মিরাট-ই-ইস্‌তিলাহ–ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি, ১৮১৩; আইরভিন ঃ আর্মি, পৃষ্ঠা ৪)

আকবরের দয়া, মায়া আর কোমলতার অভাব হতে দেননি আমাদের ভারতীয় আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকে, কিন্তু প্রকৃত তথ্যানুযায়ী তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত আসামীরা কিভাবে পরোলোকে যাত্রা করবে তার প্রোগ্রাম আকবর সহজেই করতে পারতেন। আসামীকে হাতের পায়ের তলায় ফেলে এবং শূলে চড়িয়ে মারার মত নিষ্ঠুর বর্বর যুগের শাস্তিও তিনি দিতে পারতেন। এমনকি অপরাধীকে ততক্ষণ দুই হাত দিয়ে গলা টিপে ধরে রাখার আদেশ দিতেন যতক্ষণ না প্রাণবায়ু শেষ হয়। (প্রমাণ ঃ মনসারেটের লেখা, 'কমেনটারী' পুস্তকের ২১০ পৃষ্ঠা)

আকবর কোন গভর্ণর বা আতালিকের ত্রুটি বা অন্যায়ের সংবাদ পেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তদন্ত না করেই সাথে সাথে ব্যবস্থা নিতেন; ব্যবস্থা মানে একেবারে পদচ্যুত বা বরখাস্ত (দ্রঃ শরণ ঃ প্রভিনশিয়াল গভর্ণমেন্ট পৃষ্ঠা ১৭৩)। আওরঙ্গজেবের পরিবর্তে বরং আকবর কাউকে বিশ্বাস করতেন না বললে যদিও তা সঠিক হয় না তবুও কিছু প্রমাণ পেশ করা যায়। যেমন, একটা অঞ্চলে সম্মানীয় একজন গভর্ণরের প্রতি আকবর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে না পেরে অনেক ক্ষেত্রে আর একজন গভর্ণর অর্থাৎ যুগ্ম গভর্ণর নিয়োগ করতেন, অথচ মোটেই তার প্রয়োজন ছিলনা। কাজের চাপ বেশি থাকলে তাঁর অধীনে সহকারী রূপে আরও কর্মী রাখা যেতে পারত, যুগ্মভাবে রাখার প্রয়োজনীয়তা ছিলনা। তাছাড়া কোন একটা মাত্র ক্ষেত্রে যদি আকবর যুগ্ম গভর্ণর নিয়োগ করতেন তাহলে হয়ত তা প্রসঙ্গ হয়ে উঠত না। কিন্তু সন্দেহ প্রবণতার জন্য তিনি অনেক ক্ষেত্রেই এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছিলেন। নিয়োজিত যুগ্ম গভর্ণরদের তালিকা আকবরের বিশ্বাসী ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আকবর নামা'র তৃতীয় খণ্ডের ৫১১ পৃষ্ঠায় লিখে গেছেন।

গভর্ণরগণ যাতে বেশি প্রভাব বিস্তার না করতে পারেন বা যাতে বিদ্রোহী হয়ে না ওঠেন সে সন্দেহে প্রত্যেককে তিনি ঘন ঘন বদলি করতেন। তার কারণ কি ছিল? তা কি অবিশ্বসহেতু নয়? কিন্তু যেহেতু আকবর করেছেন সেহেতু মন্তব্যের অনধিকার অনস্বীকার্য। মানসিংহের মত প্রভাবশালী কর্মকর্তাকেও গুপ্তচরের সামান্য সংবাদের উপর ভিত্তি করে, তদন্ত না করেই কাবুল থেকে জোর তলবে দিল্লি ফিরে আসতে বাধ্য করেছিলেন। (আকবরনামা, ৩ খণ্ড, পৃঃ ৫১৭-৫১৮)। এমনিভাবে বাংলার সুবেদার শায়েস্ত খাঁনকেও রাজস্বের অপব্যয়ের অভিযোগ শুনে রাজদরবারে তৎক্ষণাৎ হাজিরা দিতে বাধ্য করেছিলেন। (দ্রঃ রিয়াজুস সালাতিন, পৃষ্ঠা ২২২-২২৩)

সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও আকবরের দূরদর্শিতার যথেষ্ট অভাব ছিল। ভারতবর্ষের তিন দিকে শুধু পানি আর জল। পানিপথের যে কোন দিক থেকে শত্রুর আক্রমণ সম্ভব ছিল। তাছাড়া প্রায়ই দেখা গেছে বিদেশীদের আগমন পানিপথেই হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের জন্য বিশাল ও শক্তিশালী এক নৌবহরের যে প্রয়োজন ছিল সে বিষয়ে আকবরের বুদ্ধিজ্ঞান একটুও উঁকি মারেনি। এ অদূরদর্শিতাকে অধ্যাপক আবদুল আলীম এম. এ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে 'শিথিল সংগঠন' বলে উদ্ধৃত করেছেন। অবশ্য তিনি তথ্য সরবরাহ করেছেন হুসাইনির লেখা মুঘল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন পুস্তকের ২৬৮ পৃষ্ঠা থেকে।

ইংরেজের অত্যাচার মনে পড়লে আজও বুক কেঁপে ওঠে। মনে পড়ে কত শোষণ, পীড়ন, প্রহার আর কোটি কোটি মানুষের ইতিকথা। সে ইংরেজকে আকবরই দিয়েছিলেন ভারতবর্ষে বুক ফুলিয়ে ব্যবসা করার অধিকার। যা তারা আগেও সীমিতভাবে পেয়েছিল। শুধু তাই নয় কুঠী বানাবার অধিকার, রাজদরবারে ও সর্বত্র খৃষ্টানধর্ম প্রচারের অধিকার। আর যেখানে ইচ্ছা বসবাস ও গীর্জা নির্মাণ করার অধিকার–এর প্রমাণ রয়েছে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক মনসারেটের লেখা 'কমেন্টারী' পুস্তকের ৪৭ পৃষ্ঠায়।

মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ মূলত ইউরোপীয় জাতির আগমন। সেহেতু বলা যায়, ভারতে ইংরেজ তথা ইউরোপীয় জাতির আগমনের বীজ বপন করে গেছেন আকবর, আর জাহাঙ্গীর সে বীজের চারাগুলোকে শক্তিশালী করতে যথার্থ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখন যদি এ কথাটুকু প্রমাণ হয় তাহলে আকবরকে ভারতবাসী ক্ষমা করে মহামতি বলে মেনে নিবেন কি না তা পাঠকবৃন্দের দায়িত্বে।

খৃষ্টান ও হিন্দু মহিলাদের বিয়ে করা এবং তাঁদের স্ব স্ব ধর্ম পালন, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও পূর্ণ অধিকার দান আকবরের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অবশ্য এটা উদারতা বটে কিনা তা প্রত্যেক ঐতিহাসিক ও ইতিহাস অনুরাগীর চিন্তার বিষয়।

এ বিয়েকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম করে। তাছাড়া রাজদরবারে মদপানের আমন্ত্রণ ইংরেজ রাজনীতিবিদগণ প্রায়ই পেতেন। মোগল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনার কাজ আকবর শুরু করেন এবং মদপ পুত্র জাহাঙ্গীর স্যার টমাস রো ও তাঁর মূল পুরোহিত, অক্সফোর্ড শিক্ষাপ্রাপ্ত, চতুর কূটনীতিবিদ রেভারেন্ড ফেবীকে অতি মাত্রায় প্রশ্রয় দান করে সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেন। তিন বছরর ক্রমাগত মোঘল দরবারে তদবির করে স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে তাঁর সকল দাবী দাওয়া মঞ্জুর করিয়ে নিতে সক্ষম হন। ইংরেজরা অবশ্য কাজ গোছানের তাগিদে মদ খেতেন আর আকবর ও তাঁর পুত্রগণ শুধু মদ খেতেন বলা ঠিক হবে না বরং বলা যায়, মদই তাঁদের ছিল প্রধান খাদ্য।

খৃষ্টানদের মুখে তাঁদের বীরত্ব গাথা শুনে এবং কিছু প্রত্যক্ষ করে আকবর-জাহাঙ্গীর ইংরেজদের উপর ভীত হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, ইংরেজরা সুরা সুন্দরী রমণী দিয়ে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন বা পরাস্ত করে দিয়েছিলেন পিতা পুত্রের চেতনাকে। সে যাহোক, তাঁরা ধীরে ধীরে খৃষ্টান ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করে চললেন এবং দেশের ভিতরে ইউরোপীয় ঘাঁটি তৈরি করতে অনুমতি ও সাহায্য দিলেন। আর তার ফলস্বরূপ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে উদীয়মান ইউরোপীয় শক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। সুতরাং মোঘল সাম্রাজ্যের পতন তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার জন্য দায়ী আওরঙ্গজেব নন, দায়ী মূলত মহামতি বা জগদীশ্বর নামক আকবর ও জাহাঙ্গীর।

এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক প্রিঙ্গল কেনেডি তাঁর 'The History of Mughals' গ্রন্থে যা বলেছেন তার অর্থ হল–আকবরের গঠিত সাম্রাজ্যের দুর্বলতা তাঁর সামরিক নীতির মধ্যেই নিহিত ছিল। তিনি উত্তর পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলের ওপার হতে সতেজ ও সবল সৈন্য আমদানী বন্ধ করে এবং 'ভারত ভারতীয়দের জন্য' নীতির অনুসরণ করে তাঁর সাম্রাজ্যের পতনের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হয়েছেন। তাঁর গঠিত সাম্রাজ্য যখন বিজাতীয় প্রতিকূল শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল তখন তাঁর আর আত্মরক্ষা করার শক্তি ছিলনা।

এমনিভাবে বহু উদ্ধৃতির মধ্যে আর একটির উল্লেখ করে বলা যায়, "...শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শেকোহ সম্রাট হলে খুব সম্ভবতঃ অতি সত্বর অবস্থান্তর বা পতন ঘটত। মোঘল সাম্রাজ্যের এ পতন স্থগিত রাখতে কৃতকার্য হয়েছিলেন ইসলামী তৃণীয়ের শেষ তীর আলমগীর বা আওরঙ্গজেব। দারা ছিলেন আকবরের মত বিজাতীয় ভাবাপন্ন। বলাবাহুল্য, আকবরই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ বপন করেন। ইসলাম অনুরাগী মোহিউদ্দিন আলমগীর আওরঙ্গজেব বিজাতীয় প্রভাব দুর্নীতিসমূহ হতে সাম্রাজ্যকে সংস্কার ও সংশোধন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য তিনি কারও সন্তোষ বা অসন্তোষ কিছু মাত্র গ্রাহ্য করেননি। তাঁর চেষ্টা অনেকটা ফলবতী হয়েছিল বলেই ভারতে ইসলাম এবং জাতি হিসেবে মুসলমান এখনও টিকে আছে বা বেঁচে আছে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এরূপ অসাধারণ শক্তিশালী আদর্শ চরিত্রের কোন ব্যক্তি আর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন নি।" (হবিবর রহমান প্রণীত 'আলমগীর' দ্রষ্টব্য)

অতএব এতসুদীর্ঘ আলোচনার পর একথা ভুললে চলবে না যে, আধুনিক সহজলভ্য ইতিহাসে যা আছে তাই-ই অমৃতের ধার, নয়। প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং যুক্তি বা সত্যের মাপকাঠিতে যা গ্রহণযোগ্য তা অবশ্যই গ্রহণীয়, বাকীটুকু পরিত্যাজ্য বা পরিহার্য।

আকবরের বিদায় পর্ব

বিশ্বের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মীয় আন্দোলন ও আলোড়ন শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষে কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ নানা ধর্মমত সৃষ্টি করে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলেন। তেমনি 'মাহদী' আন্দোলন জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। প্রতি হাজার বছরের শেষ ভাগে ধর্মভোলা মানুষকে উদ্ধারের জন্য একজন 'মসিহ' পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন–এ ছিল মাহদীপন্থীদের বিশ্বাস। আফগানিস্তানেও অনুরূপ 'রাসনী' আন্দোলন শুরু হয়। তাদের ধ্যানধারণাও অনুরূপ ছিল।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে পারস্যের শাহ আততায়ীর দ্বারা নিহত হলেন। তখন পারস্য বা ইরানে একটা 'মোলহেদ' নামক ইসলাম বিধ্বংসী দল তৈরি হয়েছিল। পারস্যের নতুন শাহ সিংহাসনে বসেই চিন্তা করে দেখলেন, এ কুৎসিত নোংরা দলটি অদূর ভবিষ্যতে সুন্দর স্বচ্ছ ইসলাম ধর্মের কলঙ্কের কারণ হতে পারে। তাই এ 'মোলহেদ' দলকে নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের বন্দী করার আদেশ দেন। কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে তাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল। এ ঘাঁটি পারস্যের শাহ আক্রমণ করলে তারা দলে দলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সম্রাট আকবরের সাথে তাদের দলনেতারা দেখা করে নিজেদের মত ও পথের কথা বলতে গিয়ে বলে, 'আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, প্রত্যেক যুগে যুগে নবী আসেন। হযরত মুহাম্মদের পর আর কেহ নবী আসবেন না বটে, কিন্তু ইমাম মাহদীর আগমনের কথা কিতাবে আছে। তাছাড়া প্রতি হাজার বচর অন্তর একজন মোজাদ্দেদ বা সার্বজনীন ধর্ম বিশারদ আবির্ভূত হন। এখন আরবী হিজরী সালের সে হাজার বছর পূরণের যুগ। আমরা জানতে পেরেছি এ

Goto List

যুগসন্ধিক্ষণে আপনিই সে ইমাম মাহদী এবং ধর্ম প্রচারক। অতএব আপনি এগিয়ে আসুন, পালন করুন আপনার পবিত্র দায়িত্ব।' সম্রাট আকবর এ রকমই একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী আকবর তাঁর রাজনীতির ভাল অঙ্গ হিসেবে এবং ধর্মজগতে অমর হওয়ার বাসনায় এ দলের নেতাদের নিজের উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেন।

(দ্রঃ হিষ্ট্রি অব ন্যাশন্যালিজম, পৃষ্ঠা ৩১)

কপট সুফী ভ্রাতৃদ্বয় ফৈজী ও আবুল ফজল এবং তাঁদের পিতার সাথে আকবরের সান্নিধ্য লাভের ফলে আকবরের ধর্মজীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তাঁরা আকবরকে দর্শন ও ধর্মীয় আলোচনার জন্য ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদতখানা নির্মাণ করতে উৎসাহ প্রদান করেন। পরে সম্রাট বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতদের তাঁর ইবাদতখানায় আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে আকুয়াডিভ ও মনসারেটের জেসুইট মিশনকে (খৃষ্টান মিশন) আকবর তার সভায় সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি জোরোষ্ট্রিয় ও জৈব ধর্মের পণ্ডিতদেরও সভায় স্থান দিয়েছিলেন। আর হিন্দু পণ্ডিতগণ তো পূর্ব থেকেই সভায় বহাল ছিলেনই।

ধর্ম-বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন আবুল ফজলের পিতা শেখ মুবারক। তিনি সর্ব বিষয়ে আকবরের মনোরঞ্জনের উপায় উদ্ভাবন করতেন বলে আকবর তাঁকে খুব সমীহ করতেন। শেখ মুবারক নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করে আকবরকে প্রমাণ করে দিলেন যে, উলামাগণ ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করেন। অপরাপর ধর্মের মধ্যেও কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে। যার ফলে বিদ্বেষ একঘেঁয়ে গোঁড়ামি এবং সম্প্রদায়গত আক্রমণের ভাব পরিলক্ষিত হয়।

নিরক্ষর সম্রাট আকবর ধর্ম প্রবণতা নতুন খাতে প্রবাহিত হল। সাম্রাজ্যলিপ্সু উচ্চাভিলাষী সম্রাট আকবরের জীবনে পূর্ব বর্ণিত ফার্সী ধর্মগুরুর আশ্চর্য প্রভাব দেখা যেতে লাগল। এ সময়ই শেখ মুবারক তাঁকে পরামর্শ দিলেন, যেহেতু তিনি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা, সেহেতু তিনি ধর্মনেতাও হতে পারেন। ধর্মগুরু হওয়ার এ পরামর্শে আকবর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন।

এদিকে দরবারের পণ্ডিত ও সভাসদগণ 'শঠে শঠ্যং' নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরা সম্রাটকে আল্লাহ্‌র আসনে বসিয়ে 'দিল্লিশ্বর, জগদীশ্বর' এর আওয়াজে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুখরিত করে তুলে তাঁর প্রতি কৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগলেন। সে উদ্দেশ্যে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে এক হিন্দু কবি রচনা করলেন–

হেথা এক দেশ আছে নামে পঞ্চগৌড়।
সেখানে রাজত্ব করেন বাদশাহ আকবর।
অর্জুনের অবতার তিনি মহামতি।
বীরত্বে তুলনাহীন জ্ঞানে বৃহস্পতি॥
ত্রেতা যুগে রাম হেন অতি সযতনে।
এই কলি যুগে ভূপ পালে প্রজাগণে॥

(দ্রঃ চণ্ডী, মাধবাচার্য ঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা ৩৭২)

পণ্ডিতগণের এ ধরনের চাটুকারিতা আর সে যুগের কিছু স্বার্থন্বেষী মৌলবিদের অন্তর্বিবাদ ও মতভেদ তাঁর ভাবান্তর বা ইসলাম ধর্মের প্রতি অবহেলার অন্যতম কারণ ছিল। দরবারে আকবরের পাশে কে বেশি নিকটবর্তী হয়ে বসবেন তাই নিয়ে বিবাদ হওয়াতেও আকবরের ভাবান্তর হয়। তবে আকবরের উৎসাহ ও পরামর্শদাতারা তাঁকে বিশেষভাবে নতুন

ধর্ম সৃষ্টিতে উৎসাহিত করলেও তেমন কেহ পরবর্তীকালে নতুন ধর্মে দীক্ষিত হননি। বলাবাহুল্য, ইসলাম ধর্মের সর্বনাশ সাধন যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা কেবলমাত্র এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কপট আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন।

ধর্মগুরু হওয়ার পথে আকবর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চললেন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রীর প্রধান মসজিদ আকবর তাঁর বিশেষ দালাল দলকে উলামা সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। পরে নিজে মসজিদের গেটে সাড়ম্বরে উপস্থিত হন। তার পূর্বে এ মসজিদকে জমকাল করে সাজান হয়েছিল। এবার যখনই আকবর সেখানে উপস্থিত হলেন অমনি সেই নকল উলামা আর বহুরূপী সভাসদগণ নামায ত্যাগ করে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে মসজিদের অভ্যন্তরে মিম্বরে বসালেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময় থেকে প্রতি শুক্রবার জুমার নামাযের পূর্বে যে আরবী বক্তৃতা হত তা বাতিল করে আকবরের গুণগান সম্বলিত কবিতা পাঠ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সে কবিতার রচয়িতা ছিলেন ফৈজী। ঠিক হয়েছিল যে, আকবর নিজে সেটা পাঠ করে শোনাবেন বিরাট জনতাকে আর সকলে সমস্বরে 'আল্লাহু আকবর' (আকবরই আল্লাহ) বলে সাবাস দেবেন এবং সে সাথে আকবর তাঁর নতুন 'দীন-ই-ইলাহি' ধর্মে দীক্ষিত হতে আদেশ দেবেন।

আকবর ফৈজীর লেখা নিজ গুণগান সম্বলিত কবিতা হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকীয় ঘটনা এটাই যে, মাত্র তিন লাইন কবিতা আবৃত্তি করেই আকবর চোখে যেন কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার দেখতে লাগলেন। তবু মনকে চাঙ্গা করে আবৃত্তি করতে লাগলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি যেন নিজ কানে শুনতে পাচ্ছিলেন নিজের বুকের স্পন্দন। হৃদকম্পনের কারণে তাঁর একটি হাত বুকে বোলাতে লাগলেন। একটার পর একটা উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। প্রথমে চোখ বিদ্রোহ করল, তারপর কণ্ঠস্বর বিদ্রোহী হয়ে উঠল। শেষে তাঁকে মিম্বারের উঁচু ধাপ থেকে নীচে নেমে আসতে হল। সকলেই হতবাক। সমস্ত প্রোগ্রাম পণ্ড। অবশেষে কোন রকমে বললেন, 'জোর করে নয়, ইচ্ছা করলে যে কেহ এ নতুন ধর্ম দীন-ই-ইলাহি গ্রহণ করতে পারে।

এক ইংরেজ ঐতিহাসিক আকবরের হৃদকম্প আর মিম্বার থেকে নীচে অবতরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন, "কিন্তু এই ঘটনায় যে ভাবাবেগের সঞ্চার হইল, তাহা যে দৃঢ়চিত্ত, প্রবল শত্রুর মোকাবেলায়ও কখনও বিচলিত হয় নাই তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল। যে হৃদয় সকল বিপদে শান্ত থাকিত এখন তাহা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে কণ্ঠস্বর যুদ্ধের তুমুল হট্টনিনাদ ছাপাইয়াও উর্ধ্বে শ্রুত হইত এক্ষণে বালিকার কণ্ঠের ন্যায়ই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রথম তিন ছত্রের উচ্চারণ সমাপ্ত করার পূর্বেই এই সম্রাট (নকল) নবীকে সেই উচ্চ মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিতে হইল।" (অনুবাদ টার্কস্ ইন ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ৬৯)

আকবর ১৫৮৭ সালে কাজী বা মুফতির বিচার ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে তার পরিবর্তে তিনি নতুন আইন, সোজা কথা খিচুড়ি আইনের প্রবর্তন করেন। এ ঘটনায় স্বভাবতই অমুসলমান অনেকে আকবরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে পারেন। তাবে আকবর যদি পুরো হিন্দু হয়ে যেতেন তাহলে এ মারাত্মক অভিযোগ থেকে তিনি বাঁচতে পারতেন; কিন্তু তিনি হিন্দুও হননি আবার তাকে পুরোপুরি মুসলমান বলাও কঠিন। উপরন্তু দেখা যায় তিনি ভিতরে মুসলমান হয়ে তওবা করে অনুতাপ ও অনুশোচনা করে নিজের জীবনে সহস্র সহস্র ধিক্কার দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাহলে তিনি হিন্দু মুসলমান উভয জাতির সাথেই সমানভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে গেছেন বলে মনে হয়। হিন্দুদের খুশি করতে যত রকম ব্যবস্থা আছে তা তিনি করেছিলেন—আজ তা প্রমাণ হতে চলেছে। কিন্তু আসলে তাঁর মধ্যে কোন আন্তরিকতা ছিলনা, মৌখিক ছিল সবই। তাঁর রাজনৈতিক চালাকিকে নিছক উদারতার অভিনয় ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজা ভগবান দাসের ভাগ্না, দত্তক পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মানসিংহকে আকবর তাঁর নতুন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে অনুরোধ বা আদেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যা জবাব দিয়েছিলেন তা চমকপ্রদ ও উল্লেখযোগ্য। মানসিংহ বলেছিলেন, 'যদি জীবন উৎসর্গ করার সংকল্পই হয় মহামান্য সম্রাটের মতবাদ গ্রহণের একমাত্র অর্থ, তাহা হইলে আমার ধারণা, আমি যে সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত অনুসারী তাহার প্রমাণ আমি যথেষ্টই দিয়াছি। কিন্তু আমি একজন হিন্দু, সম্রাট আমাকে মুসলমান হইতে বলিতেছেন না। আমি তৃতীয় কোন ধর্মের কথা অবগত নহি।' নবরত্নের অন্যতম সদস্য রাজা তোডরমলও আকবরের ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তিনি ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে হিন্দু অবস্থাতেই পরলোকগমন করেন।

আকবরের একান্ত অনুগত বীরবল ও অন্যান্য ১৭ জন ছাড়া আর কেহ 'দীন-ই-ইলাহি' ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হননি। তাছাড়া এ ১৮ জনও কেবল উঁচু রাজপদ ও অর্থের লোভে এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এখানেও আকবরের সবচেয়ে লজ্জাকর পরাজয়। কারণ, একজন সহায় সম্বলহীন ফকির দরবেশও মৃত্যুর পূর্বে শত সহস্র মুরিদ বা শিষ্য রেখে যেতে পারেন, অথচ আকবর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বা জগদীশ্বর (?) হয়েও মাত্র ১৮ জন শিষ্য পেয়েছিলেন। শিষ্যের এ সীমাবদ্ধতা তাঁর পরাজয় ও অসাফল্য প্রমাণ করে। যাহোক, আকবরের মৃত্যুর পর আকবর অদৃশ্য হন বটে, কিন্তু তাঁর রোপিত বিষবৃক্ষ ভারতের বুকে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর দারুণভাবে আঘাত হানে। যার জের এখনও বিদ্যমান।

'দীনি-ইলাহি' সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ স্মিথ বলেন, 'এ ধর্মবিশ্বাস ছিল হাস্যকর আভিজাত্য এবং অসংযত স্বৈরাচারের স্বাভাবিক ফল।' অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন, 'এটা আকবরের ভুলের সৃষ্টি, জ্ঞানের নয়।'

আকবরের কার্যকলাপ ও চরিত্র সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা যদিও হয়েছে তবুও এখানে আরও কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে।

আজও ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে খামের উপর ৭৪॥ লেখেন। এর অর্থ হচ্ছে অত্যাচারী মুসলমানেরা নাকি এত হিন্দু ব্রাহ্মণ হত্যা করেছিলেন যে তাঁদের পৈতার ওজন হয়েছিল ৭৪॥মণ। এখন প্রশ্ন, কে সে মুসলমান অত্যাচারী? নাম না জানলে হয়ত মনে হতে পারে আওরঙ্গজেব, হুমায়ুন, শেরশাহ, বাবর প্রভৃতি রাজা বাদশাহ কেহ, না হয় নাদির অথবা মুহাম্মাদ বিন কাসিম। কিন্তু যদি বলা হয় আকবর–তাহলে হয়ত অনেকে চমকে উঠতে পারেন। তাই শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চিতোরগড়ের কথা' থেকে কয়েক লাইন তুলে দিচ্ছি–"সাড়ে চুয়াত্তর কথা শুনেছ নিশ্চয়? কথাটার ব্যবহার কেন হয়েছিল জান? চিঠি লিখে খামের পিছনে সাড়ে চুয়াত্তর লেখা হয় কেননা যাতে করে খামটা কেহ না খোলে। যদি খোলে পাপের ভাগী হবে। গল্পটা ইতিহাসের। আকবর বাদশাহ হুকুম দিলেন যুদ্ধে যত লোক মরেছে তাদের পৈতাগুলো ওজন করতে। তাই করা হল। দেখা গেল ওজন হয়েছে সাড়ে চুয়াত্তর মণ। যদি পৈতার ওজন সাড়ে চুয়াত্তর মণ হয়, তাহলে অনুমান কর কত হাজার লোক মরেছিল যুদ্ধে। গল্পটা আজ হয়ত ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। তবে ঘটনাটি ঘটেছিল চিতোরে।'

তবুও তাঁকে মহামতি বলতে হবে যত হত্যাই তিনি করুন না কেন। যদি তিনি অসংখ্য ব্রাহ্মণ হত্যাকারী তবুও তো তিনি ইসলামের শত্রুতা করেছিলেন। অবশ্য তাঁকে মহামতি বানালে অন্ততঃ মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা আকবরের মত হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে যাতে 'উদার' উপাধি পান সে রাস্তা পরিষ্কার হবে। ইংরেজদের ইনজেকশন সত্যিই সাংঘাতিক।

Goto List

দাবা খেলা আজও প্রচলিত আছে। দাবা খেলায় মানুষ ঘুঁটি ব্যবহার করে। কারও ঘুঁটি কাঠের, কারও হাড়ের, কারও বা হাতির দাঁতের, কারও রূপার, আবার কেহ ব্যবহার করেন সোনা ঘুঁটি। আকবরও দাবা খেলতেন, তাঁর ঘুঁটি হয়ত সোনার কিংবা মূল্যবান পাথরের হবে বলে সাধারণের ধারণা। কিন্তু আগেই বলেছি তাঁর চরিত্র-বিকৃতি মাত্রতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল, আকবরের দাবা খেলার ঘুঁটি ছিল–জড় পদার্থ নয়, জীবন্ত ষোড়শী যুবতী সুন্দরী নারী। সে নারী নিয়ে হার জিত হত আর জিতে নেয়া নারীদের ব্যবহার করা হত আনন্দের সামগ্রী স্বরূপ। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ও লিখেছেন, 'সুন্দরী সুবেশা তরুণীদের দাঁড় করিয়ে ছক কাটা ঘরে পাশা খেলতেন সম্রাট আকবর।'

আকবরের কাছে বিবাহ আর ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য ছিলনা। কোন কোন পণ্ডিতও বলেছেন, বিকানীরের রাজকন্যাকে আকবর বিয়ে করেছিলেন আবার তাঁরই গর্ভে সাথে খৃষ্টানদের অবাধ মেলামেশা করার ক্ষেত্রে আকবরের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাঁরই গর্ভে একটি সুন্দর সুস্থ সন্তান জন্মেছিল, আকবর সে নবজাতকের নাম তাঁর মদপানের সাথী মিঃ দানিয়েলের নাম অনুসারে রেখেছিলেন, দানিয়েল। (দ্রঃ 'দুর্গেদুর্গে')

ইসলাম ধর্মে ভাগ্য গণনা বা হাত গণনা ইত্যাদি বিশ্বাস করা মারাত্মক অপরাধ। আকবর ইসলামের প্রতি সেখানেও আঘাত হেনেছেন। আকবর হিন্দু জ্যোতিষীকে বসিয়ে রাখতেন তাঁর দরবারের চত্বরে এবং তিনি যা বলতেন আকবর তা-ই বেশির ভাগ কক্ষেত্রে মেনে নিতেন। যুদ্ধযাত্রা, প্রমোদ ভ্রমণ, প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি কাজে জ্যোতিষীর রায় গৃহীত হত। তবে অনেক মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে 'দ্বীনি ইলাহি'র সর্বজনপ্রিয়তার কথাও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু যেহেতু আকবর তাঁকে বহুদিন ধরে ভক্তি করে এসেছেন তাই তখন ভক্তি করতে ইচ্ছা না হলেও অনেককে খুশি রাখতে মৌনতা পালন করা ছাড়া উপায় ছিলনা।

ইসলামের নামে অসভ্যতা, অনাচার, ইসলাম-ধ্বংসী কাজ, শির্‌ক-বিদআত, বাউল-আউল, মিথ্যা মারেফতি ও অসভ্য মিথ্যাবাদী ফকির দলের নোংরামির উৎস আকবরের উৎসাহ এবং তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজেব অনেক বর্বরতা দূর করেছিলেন। কিন্তু আগাছা চাষ করার প্রয়োজন হয় না, সার দেয়ারও প্রয়োজন হয় না, এমনিই গজিয়ে ওঠে-তাই আজ এ আধুনিক যুগেও মাথা উঁচু কর গজিয়েছে বহু আগাছা ও বিষবৃক্ষ।

আকবর কিন্তু মৃত্যুর পূর্বাহ্নে তাঁর অভিনয়ের মুখোস খুলে ফেলেছিলেন। সুদীর্ঘ ৪৯ বছর রাজত্ব করার পর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে অজস্র স্ত্রীকে বিধবা করে পরলোকগমন করেন। আকবরের শেষ দশ বছরের ইতিহাস ভালভাবে পাওয়া যায় না। কারণ তাঁর মৃত্যুর দশ বছর আগে বিখ্যাত ঐতিহাসিক বাদাউনীর মৃত্যু হয়। অপর একজন ঐতিহাসিক আবুল ফজলও আকবরের মৃত্যুর বার বছর পূর্বেই নিহত হন। যাহোক, হিজরী ৯৯৯ সালে আকবর দেখলেন মাত্র আর এক বছর বাকি ১০০০ হিজরী সন পূর্ণ হতে, অথচ তিনি নতুন নবী বলে খ্যাতি লাভ করতে পারলেন না, ইমাম মাহদী ও মসীহ রূপে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতেও পারলেন না। তিনি ১০০০ হিজরী সনে বেশ বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সমস্ত স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই নয় বরং জাগরিত অবস্থায় দুঃস্বপ্ন দর্শন মাত্র। তাই মিঃ কীসিও বলেছেন–পরের বছরটা ছিল হিজরীর ৯৯৯ সাল। এবং তার পরেই এল ১০০০ হিজরী সাল। এক সহস্র বছরের যে ধোকা ব্যাপকভাবে পোষণ করা হয়েছিল তার সমাধি রচিত হল এ ১০০০ হিজরী সনেই। (দ্রঃ টার্কস্ ইন ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ৭২)

আকবরের মৃতদেহ কিন্তু দাহ বা নদীর বক্ষে নিক্ষেপ অথবা পশ্চিম দিকে পা রেখেও কবরস্ত করা হয়নি, সমাধি হয়েছিল সাধারণ মুসলমানের মতই। তবে বড় পরিতাপ ও অবাক হওয়ার কথা হল, যে অমুসলমানদের জন্য তাঁর এত কাণ্ড এত পরিকল্পনা তাঁরই আকবরের কবর খুঁড়ে অস্থিগুলোকে পর্যন্ত যতদূর সম্ভব অপবিত্র করে তুলে ফেলে দিয়েছিলেন।

আকবর সম্বন্ধে আলোচনা আর বেশি নিষ্পয়োজন। সুদীর্ঘ আলোচনার পর কিং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তা সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তার বিষয়। তবে সব শেষে এটুকু বলে রাখা ও মনে রাখা ভাল যে, আকবরের হঠকারিতা, নিষ্ঠুরতা, স্ত্রী-লোলুপতা, শঠতা ও মদপানের অভিযোগের বিরাট বোঝাটি ঐতিহাসিকরা তাঁর মাথা থেকে বহু টানাটানি করে নামিয়ে সেটাকে মুসলমান সুলতান, সম্রাট ও শাসকদের মধ্যে সমানভাবে পরিবেশন করে দিয়েছেন। তারই এক একটি ভাগ পেয়েছেন সুলতান মাহমুদ, মুহাম্মাদ বিন তুঘলক, সম্রাট বাবর, হুমায়ুন, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কেরা।

শিবাজী

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্যের এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের পরে পরেই দক্ষিণ ভারতে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সে থেকে মারাঠাগণ বাহমনী, আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি স্থানের সুলতানদের অধীনে কাজ করতেন। যে সমস্ত মারাঠা পরিবার সুলতানদের অধীনে রাজকর্মের ভিত্তিতে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভোঁসলে পরিবার অন্যতম। কৃষি কর্মই ছিল ভোঁসলেদের পারিবারিক বৃত্তি। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে প্রথমে নিজাম শাহী সুলতানের অধীনে, পরে বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতানের অধীনে চাকরিতে যুক্ত থেকে বেশ প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিলেন। উত্তর ভারতের মোঘল আর দক্ষিণ ভারতের সুলতানদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগে তাঁরা সুলতানী ও মোঘল সাম্রাজ্যের দুর্গ দখল ও লুঠতরাজ করতেন। ধর্মগুরু রামদাসের শিক্ষা-দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিবাজী মারাঠিদের জাতীয় চরিত্র আরও সংগঠিত করেন।

শিবাজী জুনারের কাছে শিবনের পাতর্বত্য দুর্গে জন্মগ্রহণ কবেন। স্বামী শাহজী ভোঁসলের অনাদরের জন্য জিজাবাঈ ও শিশু শিবাজী দাদাজী কোন্দদের নামে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মারাঠিদের শৌর্য বীর্যের ঐতিহ্যই ছিল শিবাজীর চরিত্রের প্রধান ভিত্তি।

শিবাজীকে সাধারণ ইতিহাসে মনে হয় তিনি আদর্শ বীর, বিরাট যোদ্ধা, সুকৌশলী এবং আওরঙ্গজেবের চরম প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। আরও ধারণা হয় যে, আওরঙ্গজেব নাকি শিবাজীর কাছে বার বার পরাজয় বরণ করে নাজেহাল হয়েছিলেন। মোটকথা, শিশুকাল থেকেই এ ধারণা মনে ঠাঁই পেয়ে থাকে যে, শিবাজী কেবল মারাঠা জাতির গৌরব নন, বরং তিনি ভারতের বিখ্যাত রাজাও বটে; তাই তিনি জাতীয় বীর। আর তাই ভারতের প্রধানতম ফটক বোম্বাই-এ শিবাজীর মূর্তি বীর বেশে স্থাপিত হয়েছে।

সমালোকচকদের অপর পক্ষ কিন্তু শিবাজীকে সামান্য সৈনিক, দস্যু, পাহাড়ী ইঁদুর, বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞ বলে মনে করেন। নিরপেক্ষ পাঠকদের কাছে অবশ্য এ নিয়ে সমীক্ষার প্রয়োজন। তবে আকবরের ভুলভ্রান্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ঢাকা দিয়ে যাঁরা তাঁকে 'মহামতি', আকবর দ্য গ্রেট', 'দিল্লিশ্বর'ও 'জগদীশ্বর' উপাধি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি তাঁরা নিজ গুণে ঠিক বিপরীত পন্থায় আওরঙ্গজেবের নিন্দা বা তাঁকে হেয় করে প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং আওরঙ্গজেবের সাথে যাঁদের যত বিবাদ-বিসম্বাদ, তাঁরাই হবেন তত বীর, তত বাহাদুর। শিবাজীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে কিনা তা ভাববার বিষয়।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে এক নতুন জাতির অভ্যুত্থান হয়, সেটাই হল মারাঠা জাতি। মারাঠা জাতি যাযাবর দুস্যুবৃত্তিতে চিরদিনের জন্য ইতিহাসে কুখ্যাতই ছিল। রাতের অন্ধকারে তারা অতর্কিতে বিভিন্ন গ্রাম ও শহরবাসীদের উপর চড়াও হয়ে লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ করে ধন-দৌলত অর্থ-সম্পদ নিয়ে চম্পট দিত। আমাদের বাংলাদেশে পুর্তুগীজ মগ দুস্যুদের মত মারাঠা বর্গী জাতিও কুখ্যাত ছিল। তাদের অত্যাচারের কাহিনী গ্রামীণ লোকগাথায় ও ইতিহাসের পাতায় মজুত আছে। মারাঠা বর্গীদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে মানুষ এত আতঙ্কগ্রস্ত ছিল যে, কচি কচি বাচ্চাদের কান্না থামাবার জন্য বাংলার মায়েরা এখনও তাদের অত্যাচারের কথা তুলে বলেন–

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল
বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।।

শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে আহমাদনগরের উচ্চ পর্যায়ের সামরিক কর্মচারি ছিলেন। তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রী জিজাবাঈকে নানা কারণে উপেক্ষা করতে থাকেন। তখন জিজবাঈ শিশু শিবাজীকে নিয়ে উল্লেখিত ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ কোন্দদেব প্রকৃত শিক্ষিত ছিলেন না তবে শিবাজীকে একটা শিক্ষা তিনি ভালভাবে দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা, অর্থাৎ মুসলমান হিন্দুর শত্রু। নিরক্ষর শিবাজীর হৃদয়-ফলকে কোন্দদেবের কথা বিষবৃক্ষ রোপণের এক শক্ত বুনিয়াদ সৃষ্টি করে।

শিবাজী বড় হয়ে কোন্দদেবের কথা বাস্তায়িত করতে লাগলেন। সে সময় মাওয়ালী নামে অসভ্য এক পার্বত্য জাতির সাথে শিবাজীর মিলন হয়। শিবাজী তাদের এ আশ্বাস দিয়ে হাত মেলাতে বলেন যে তারা তাঁর অধীনে যদি লুঠতরাজে সামিল হয় তাহলে প্রত্যেকের অংশে মোটামুটি ভাল বখরা পড়বে এবং ভবিষ্যতে মোঘল রাজধানী পর্যন্ত লুট করা যেতে পারে। শিবাজী মাওয়ালী জাতিকে নিয়ে একটা সৈন্যবাহিনী গঠন করে বিজাপুর রাজ্যে বার বার হানা দেন। এ ব্যাপারে বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে শিবাজীর পিতা শাহজীকে বন্দী করলেন। পিতাকে উদ্ধার করার শক্তি শিবাজীর ঝিল না তাই শিবাজী তার মুক্তির জন্য সম্রাট শাহজাহানের কাছে অনেক অনুনয় বিনয়ের সাথে আবেদন রাখলেন। সম্রাট শাহজাহানের মধ্যস্থায় শাহজী মুক্ত হন।

কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর ১৬৫৬ খৃস্টাব্দে শিবাজী অনায়ভাবে জাওয়ালী অধিকার করেন। আওরঙ্গজেব তখন বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। সে অবসরে মোঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম ভূ-ভাগ তিনি আক্রমণ করেন। সম্রাট সংবাদ পেয়েই সেখানে মোঘল সৈন্য প্রেরণ করে মারাঠাদের বিতাড়িত করেন। শিবাজী হতমান হলেও আক্রমণের সংকল্প তখনও তাঁর ছিল। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, সে সময় আওরঙ্গজেব পিতার অসুস্থতার সংবাদে দিল্লি ফিরে যান। সেটা ছিল ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ। শিবাজী আওরঙ্গজেবকে খুব ভয় করতেন তাই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায না গিয়ে না গিয়ে এ সুযোগটা গ্রহণ করলেন। তাছাড়া দিবালোকে সম্রাটের সাথে সম্মুখে সমরে অংশ গ্রহণের সাহস আদৌ তাঁর ছিল বলে কোন প্রমাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না।

শ্রীবিনয় ঘোষও তাঁর 'ভারতজনের ইতিহাসে'র ৬২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়ছিলেন (১৬৫৮) তারপর শিবাজীর মৃত্যুর দুই বছর পরে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসেন।" শিবাজীর মৃত্যু হয়

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে। ১৬৫৮ থেকে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে এ ২২ বছর, আর শিবাজীর মৃত্যুর পর ২ বছর মোট ২৪ বছর পরে আবার সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে আসেন। অতএব, আওরঙ্গজেব শিবাজীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হলে এ সময়ের মধ্যে সারা দাক্ষিণাত্যে জয় করে নিতে পারতেন। তাছাড়া শিবাজী সারা জীবনে কোন যুদ্ধে আওরঙ্গজেবকে দেখতে পেয়েছিলেন কি না সন্দেহ। তাই, শিবাজী যে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে বারবার পরাজিত করেছিলেন—এ কথা সঠিক নয়।

সম্রাটের শাসনকালে ১১ বছর শাহজাদা শাহ আলম, ৬ বছর বাহাদুর খাঁ, ৪ বছর শায়েস্তা খাঁ, ২ বছর জয়সিংহ এবং ১ বছর দিলির খাঁ দাক্ষিণাত্যে সুবাদারি করেন। আওরঙ্গজেব দিল্লি থেকে ফরমান পাঠাতেন মাত্র। সম্রাট নন, তাঁর সেনাপতিগণই বার বার পরাস্ত করেছেন শিবাজীকে, বার বার তাঁদেরকে বন্দী করেছেন আর সম্রাট আওরঙ্গজেব বার বার তাঁদের ক্ষমা করেছেন।

প্রথম জীবনে শিবাজী বিজাপুরের অনেক দুর্গ মাওয়ালীদের সহযোগিতায় করায়ত্ব করেছিলেন। তখন সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করলেন, সেনাপতি ছিলেন আফজল খাঁ। এর পরের ঘটনা ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ছাপা, আমাদের দেশের সরকারি স্কুলের পাঠ্য পুস্তক 'ইতিহাস পরিচয়' থেকে তুলে ধরেছি—"শিবাজী দেখিলেন যে, প্রকাশ্য যুদ্ধে তিনি পারিবেন না, তাই তিনি এক মতলব আঁটিলেন; সন্ধির প্রস্তাব করিয়া তিনি আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাত করিতে চাহিলেন। দুইজনে সাক্ষাত হইল। সাক্ষাতের সময় কোন পক্ষেই বেশী লোকজন ছিলনা। সাক্ষাতকালে উভয়ে যখন উভয়কে আলিঙ্গন করিতেছিলেন, সেই সময়ে শিবাজী তাঁহার পোশাকের নীচে লুক্কায়িত 'বাঘনাখ' নামক অস্ত্র দ্বারা হঠাৎ আফজল খাঁকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিলেন। ইহার ফলে আফজল খাঁর সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল,; তখন শিবাজী তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনায়াসেই পরাজিত করিলেন।" (পৃষ্ঠা ১৪৮-৪৯)

প্রাচীনকাল হতে নিয়ম আছে সন্ধি বা কোন চুক্তি করার সময় শত্রু পক্ষকে হত্যা করা মানবতা বিরোধী। কিন্তু শিবাজীর এ রকম বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাসে বিরল। মারাঠা-ভক্ত ঐতিহাসিকগণ উল্টোভাবে আবার আফজল খাঁকেই দায়ী করেন। এখন আবার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে তুলে ধরা হয়, আফজল খাঁ আলিঙ্গনের সময় শিবাজীকে গলা টিপে মারার চেষ্টা করছে শিবাজী 'বাঘনখ' দিয়ে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করেন। কিন্তু একজন সুশিক্ষিত শক্তিশালী দশ হাজার সৈন্যের সেনাপতির পক্ষে শিবাজীকে মারার জন্য তো যুদ্ধই যথেষ্ট ছিল এবং সেটাই বীরত্বের নিদর্শন হত। তিনি কিন্তু শিবাজীর দুর্বল কাতর কণ্ঠের আবেদন ম ুর করে বীরত্বের পরিবর্তে পরিচয় দিয়ে খোলা মনে খালি হাতেই অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রকৃত ইতিহাসের তথ্য এটাই।

শিবাজী নিজেকে খ্যাতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রাহের পরিপ্রেক্ষিতে নব প্রস্তুতি নিয়ে মাওয়ালী জাতি ও মারাঠা জাতির বাছাই করা সৈন্য নিয়ে মোঘল ঘাঁটি আক্রমণ করলেন। সংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব পাঠালেন শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীকে পরাস্ত করতে। শায়েস্তা খাঁ মারাঠাদের বিতাড়িত করে পুনা, চাকান দুর্গ ও কল্যাণ অধিকার করেন। যুদ্ধ শেষে একদিন শায়েস্তা খাঁ পুনরায় রাত-শয্যায় বিশ্রাম করেছিলেন। এমন সময় সে রাতের অন্ধকারে শিবাজী অতর্কিতে শায়েস্তা খাঁর কক্ষে সশস্ত্রে আক্রমণ করলেন। শায়েস্তা খাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখলেন, দরজায় তরবারি হাতে শিবাজী। তিনি তখন সবলে জানালা ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়র চেষ্টা করলে শিবাজীর তরবারির আঘাতে শায়েস্তা খাঁর দুটি আঙ্গুল কাটা

যায়। অত্যন্ত পরিতাপ ও বিপজ্জনক ঘটনার এখানেই শেষ নয়, শিবাজী শায়েস্তা খাঁর নিরাপরাধ এক অল্প বয়স্ক পুত্রকে পেয়ে গেলেন এবং সাথে সাথে তিনি নিজে তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করলেন। এ ঘটনাটি ঘটে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

পরের বছর অর্থাৎ ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করেন। তীর্থ যাত্রীদের জাহাজ পর্যন্ত তাঁর অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। এ সংবাদে সম্রাট আওরঙ্গজেব বললেন, 'যে সম্মুখে আসে না, মানবতার ধার ধারেনা, এ রকম একটা দুস্যু বা পার্বত্য মুষিক না হয়ে শিবাজী যদি একজন রাজা বা বীর হত তাহলে আমি কয়েকদিনের জন্য গিয়ে সমুচিত শিক্ষা দিতাম।' সম্রাট আওরঙ্গজেব এবার জয়সিংহ এবং দিলির খাঁকে পাঠালেন 'পাহাড়ী ইঁদুর' শিবাজীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য।

মোঘল বাহিনী পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গের ভিতরে শিবাজী সপরিবারে বাস করতেন। যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত এবং পরাজিত হলে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে মনে করে শিবাজী ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পুরন্দরের চুক্তি করেন। চক্তি অনুযায়ী তাঁকে ২৩টা দুর্গ ও ১৬ লাখ টাকা বাৎসরিক রাজস্বের সম্পত্তি দিতে হল এবং নিজে মোগল আনুগত্যের বিনিময়ে ১২টা দুর্গ ও বাৎসরিক ৪ লাখ টাকা রাজস্বের সম্পত্তি রাখতে অনুমতি পান। যদিও শিবাজীর চরিত্র তাঁদের জানা ছিল, তা সত্ত্বেও বাদশার আইনে কেহ সন্ধি করতে এলে তাঁকে উপেক্ষা না করে স্বাগত জানাতে হত। তাই শিবাজীকে প্রাণে না মেরে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বন্দী করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে যথা সময়ে খবর পৌছল, 'পাহাড়ী ইঁদুর' খাঁচায় বন্দী। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে সম্মুখে আনিয়ে বললেন, 'জয়সিংহ ও দিলির খাঁ তোমার প্রাণ ভিক্ষার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি জানি তুমি বহু নরহত্যার অপরাধে দায়ী, তবু তোমাকে ক্ষমা করলাম। আর আগামীতে প্রজাদের উপর যেন কোন অত্যাচার না হয়।' শিবাজী শুধু আক্রমণ করতেই জানতেন, সম্রাটের সাথে শালীনতা বজায় রেখে কথা বলতেও জানতেন না। তাই শিবাজীর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে সম্রাট আদেশ দিলেন শিবাজীকে নজরবন্দী রেখে শিষ্টাচার শেখাতে। বন্দীর প্রতি সব রকম সুব্যবহার করতেও তিনি আদেশ দিলেন। শিবাজীর দেখাশুনার ভার ছিল তাঁরই এক মারাঠি আত্মীয়ের উপর। বন্দী অবস্থায় শিবাজী দরবারে আবেদন করলেন, তিনি ধর্ম পালনের জন্য বিপুল পরিমাণে মিষ্টি দরিদ্র ব্রাহ্মণদের জন্য পাঠাতে চান। সম্রাট আওরঙ্গজেব বললেন, 'ধর্ম পালনের কথা বলেছে, অতএব আবেদন মঞ্জুর না করলে তা ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে।' এভাবে ঝুড়িতে করে মিষ্টি পাঠানোর অজুহাতে শিবাজী নিজেই ঝুড়িতে বসে পলায়ন করলেন।

দাক্ষিণাত্যে গিয়ে শিবাজী প্রথমে চুপচাপ থেকে মারাঠাদের আরও সংগঠিত করে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পূর্বেকার মত সুরাট লুঠ করে জোরপূর্বক 'চৌথ' আদায় করেন এবং নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে রায়গড়ে তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। শিবাজী রাজা হয়ে 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তখন উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পাঠান উপজাতির বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। আওরঙ্গজেব শিবাজীর এ চরম পর্যায়ের সংবাদ শুনে বুঝলেন, শিবাজীকে 'পাহাড়ী ইঁদুর' মনে করে উপেক্ষা করা ঠিক হয়নি। তাই পাঠানদের বিদ্রোহ দমন করে যখন দাক্ষিণাত্যের দিকে নজর দিলেন তখন সংবাদ পেলেন যে শিবাজীর মৃত্যু হয়েছে। এ সংবাদ শুনে তিনি যে ফারসী কবিতা পাঠ করেছিলেন তার অর্থ–আমার দয়া, ক্ষমা, উদারতা, সহনশীলতা এবং দাক্ষিণাত্যে আমার অনুপস্থিতির সুযোগেই শিবাজী ক্ষণিকের 'ইঁদুর রাজা' হয়ে মরল।

সম্রাট আওরঙ্গজেব এরপর দেখলেন যে, শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীও পিতার সমকক্ষ বিদ্রোহী। অবশ্য শম্ভুজীর পরিচয় আওরঙ্গজেব পূর্বেই পেয়েছিলেন, যেহেতু শম্ভুজীকেও শিবাজীর সাথে বন্দী করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তিনিও শিবাজীর সাথে মিষ্টির ঝুড়িতে পালিয়েছিলেন। শম্ভুজীও সমান বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা নেন। এখানে আর একটা জরুরী কথা মনে রাখা দরকার দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতি শুধু মাওয়ালীদের সহযোগেই দৌরাত্ম্য করত তা নয়, তারা পেয়েছিল আওরঙ্গজেবের আকবর নামের এক অবাধ্য সন্তানকেও। যেমন করে 'মহামতি' আকবরকে প্রশংসার মালা পরিয়ে তাঁর স্বকীয়তা বিনষ্ট করা হয়েছিল, যে উপায়ে জাহাঙ্গীরকে জীবনে বিভ্রান্ত হতে হয়েছিল এবং যে কবচের দ্বারা শাহজাহানের পুত্র দারাশিকোহকে পঙ্গু করা হয়েছিল সে একই রকম পন্থায় আওরঙ্গজেবের শত্রু মারাঠা, মাওয়ালী ও সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ আকবরকেও বুঝিয়েছিলেন যে, নাম যখন আকবর তখন কাজেও আকবর হলে সারা ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় তাঁর সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে। তাই অদূরদর্শী অপরিণত বয়সের আকবর সরল মনে সে যুক্তি বিশ্বাস করে ত্যাজ্যপুত্রের মত দাক্ষিণাত্যে পিতার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ যোগ দিয়েছিলেন।

যাহোক, বৃদ্ধ সম্রাট আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, যুবকের মত মনোবল আর সাহস নিয়ে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে আক্রমণ কররেন বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা। কারণ বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সুলতানগণ শিবাজী ও শম্ভুজীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এ সুলতানগণের পতনের পর পরাজিত সৈন্য শম্ভুজীর সাথে যোগ দেয়।

সুলতানদের পালা শেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেব মারাঠাদের দিকে দৃষ্টি দেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শম্ভুজী সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হলে আওরঙ্গজেব দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন। উপাসনান্তে আওরঙ্গজেব সৈন্যদের উৎসাহ-বর্ধক ভাষণ দান করেন। মোঘল সৈন্য বিপুল উৎসাহ আর শক্তি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেমনি শুরু তেমনি শেষ। শম্ভুজী শিবাজী অপেক্ষা বড় বীর ছিলেন। কারণ তিনি অন্ততঃ একবারও সামনা-সামনি যুদ্ধের জন্য সাহস সঞ্চয় করতে পেরেলিন; এটা তাঁর কৃতিত্ব। মারাঠা শক্তি বিধ্বস্ত হবার পর শিবাজীর রায়গড় সহ বহু মারাঠা দুর্গ আওরঙ্গজেবের হস্তগত হয় এবং শাহু সহ শম্ভুজী পরিবার বন্দী হন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব শুধু উত্তর ভারত নয়, দাক্ষিণাত্যেরও সর্বাধিনায়ক হয়ে পড়েন। আওরঙ্গজেব শব্দের অর্থই সিংহাসনের 'শোভা'; সত্যই তাঁর নামের সার্থকতা আজও স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে আসল ইতিহাসের পাতায়।

শম্ভুজীর মৃত্যুর পর মারাঠারা আবার সংগ্রাম শুরু করে। তাঁর ছোট ভাই রাজারাম মহারাষ্ট্রের নেতা হন। সেনাপতি শান্তাজী ও ধনজীর নেতৃত্বে মারাঠা সৈন্য খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অপরদিকে সম্রাট মনে করেছিলেন মারাঠাদের মাথা তোলবার তেমন কেহ নেই–এ ধারণা মোঘলদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। পুনরায় ১৬৯০ খৃষ্টাব্দেই রাজারাম মোগলদের অতর্কিতে আক্রমণ করে কয়েকটি মোঘল ঘাঁটি দখল করে নেন। পরে অবশ্য মোঘল সৈন্য শান্তাজীকে নিহত করে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হলে নেতৃত্ব নিয়ে মারাঠাদের মধ্যে লড়াই বাঁধে। রাজারামের পুত্র তৃতীয় শিবাজীর 'রিজেন্ট' হন বীরাঙ্গনা তারাবাঈ। তারাবাঈ মোঘলদের ধ্বংসের জন্য যে বিরাট বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সে সমস্ত পরিকল্পনা কিন্তু ৯০ বছরের বৃদ্ধ আওরঙ্গজেবকে এতটুকু টলাতে পারেনি।

হাল ইতিহাসে মারাঠা জাতিকে বীরের জাতি বলা হয়। আর সে জন্যই শিবাজীকে বলা হয় জাতীয় বীর। বাংলায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজী উৎসব পালিত হয়। অনেক দূরদর্শী ঐতিহাসিকদের মতে এটা একটা ঐতিহাসিক ভ্রান্ত

পদক্ষেপ। কারণ, যদি জাতীয় হিন্দু বীর হিসেবেই উল্লেখ করতে হয় তাহলে প্রতাপ সিংহই উপযুক্ত শ্রেষ্ঠতর বীর। মারাঠা জাতি বা 'বর্গীর হাঙ্গামা' সত্য ইতিহাসের পাতায় খুব বেশি অপরাধী এজন্য যে, ইংরেজ জাতিকে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে তাঁরই অধিক পরিমাণে সাহায্য করেছিলেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও লর্ড ওয়েলেসলীর 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' গ্রহণ করার (১৮০২) ফলেই ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইতিহাসে মারাঠা বা বর্গী হাঙ্গামাকারীরা যেভাবেই চিত্রিত হোক না কেন আসলে যে তারা দস্যু বা লুণ্ঠনকারী ছিল এ বিষয়ে অনেকের কোন সন্দেহ নেই। প্রমাণ স্বরূপ নিচে কতকগুলো উদ্বৃতির উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) "মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যরা এদেশে বর্গী নামে পরিচিত। আলিবর্দ্দী খাঁর সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব হতেই তাহারা সময়ে সময়ে মোঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিত। আলিবর্দ্দী খাঁর আমরে এদেশে যে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলিতে তাকে, তাহাই 'বর্গী হাঙ্গামা' নামে পরিচিত। ...এইরূপে রঘুজী (মারাঠা) পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে লাগিল।"

(খ) "ইংরেজী বণিকেরা 'বর্গী হাঙ্গামা'র সুযোগ পেয়ে নবাবের কোন অনুমতি গ্রহণ না করে কলিকাতায় দুর্গ নুতন করিয়া গড়তে আরম্ভ করল।"

(গ) "মারাঠা তখনকার শ্রেষ্ঠ ধনী জগৎশেঠের বাড়ী লুণ্ঠন করে প্রায় আড়াই কোটি টাকা লইয়া প্রস্থান করে।" (উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো শ্রী অজয়কুমার বসু লিখিত 'ঐতিহাসিক প্রশ্নোত্তর' পুস্তকের ৬১-৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

H. G. Rawlinson প্রণীত Sivaji the Maratha পুস্তকে আছে, "দক্ষিণে ভারতে মুসলমান সুলতানরা মারাঠাদের বিশ্বাস করে তাঁদের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলো ও রাজ্য পরিচালনার ভার দান করেছিলেন। কিন্তু এ অতি উদারতা ও বিশ্বাসের ফল তাঁদের ও মুসলিম জাতির পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল। শিবাজীর নেতৃত্বের মারাঠাদের বিদ্রোহ ও এর দ্বারা আফজল খাঁর হত্যার নিরীহ জনসাধারণের উপর অসহ্য অত্যাচার, উপদ্রব, ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন ইত্যাদি ব্যাপার তার নিদর্শন।"

শ্রীশরৎকুমার রায় লিখেছেন, "মারাঠা দেশনায়করা হিন্দু রাজ্য সংস্থাপনের অভিলাষ করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস মুসলমানরা হিন্দুদের প্রতি উৎপীড়ন করিতেন বলিয়া শিবাজী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র মুসলমান শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধ ভাব মারাঠাদের অভ্যুত্থান চেষ্টার একমাত্র কারণ নহে। আসল কথা এই যে, পঞ্চাদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সমস্ত ভারতবর্ষে বিশেষঃ দাক্ষিণাত্যে ধর্ম সমাজ সাহিত্য প্রভৃতির একটা সংস্কারের যুগ আসিয়াছিল। মুসলমানদের সাথে কেবল বিরুদ্ধ সংঘর্ষের আঘাতেই যে এই সংস্কাররের চেষ্টা জাগিয়াছিল তাহা সত্য নহে। বরং মুসলমান ধর্ম ও সাহিত্যের সংস্পর্শেই তথাকার হিন্দুচিত্তে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজস্ব বিভাগের ও ধনকোষের কর্তৃত্ব হিন্দুরা লাভ করিয়াছিল। মারাঠারা সৈন্যদলভুক্ত হইয়া যেমন অর্থোপার্জন করিত তেমনি যুদ্ধবিদ্যায় দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছিল। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকর্তারা অনেকেই হিন্দু মহিলা বিবাহ করিতেন। এইরূপ হিন্দু-মুসলমান বৈবাহিক সম্বন্ধ মুসলমান রাজ্যগুলিতে হিন্দু জাতিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। যে সকল হিন্দু মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহাদিগের দ্বারাও হিন্দুদিগের ক্ষমতা বাড়িয়া উঠিতেছিল। এদেশের মুসলমানেরা কদাচ গোঁড়া হইয়া উঠিতে পারেন নাই। সময়ে সময়ে মুসলমানেরা যৎসামান্য অত্যাচার করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য

নহে। সাধারণতঃ এদেশের মুসলমানেরা হিন্দু প্রজাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন এবং প্রকারান্তরে রাজকার্যের ক্ষমতা হিন্দুদের হস্তে অর্পণ করিতেন। ক্রমে বাহুবলে ও বুদ্ধি সুকৌশলে শাসন ও সৈন্য বিভাগে হিন্দুরাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। মুসলমান শাসনে হিন্দুদিগের ক্ষমতা লেশমাত্র বাধা না পাইয়া দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। ক্রমশঃ হিন্দুরা এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে মুসলমানেরা নামে মাত্র শাসনকর্তা ছিলেন। হিন্দুরাই রাজ্যের সর্বত্র ক্ষমতা চালনা করিবার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, আহমদনগর ও বিজর এ মুসলমান রাজ্যগুলির সকল ক্ষমতা মারাঠী নীতিবেত্তা ও যোদ্ধাদিগের অধিগত হইল।" (দ্রঃ শ্রী রায়ের 'শিবাজী ও মারাঠা')

এ মারাঠাদের অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী আজও অনেককে শিহরিত করে। এখানেও এ লেখকের ভাষায় তাঁর বর্ণনা না দিয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিক হলওয়েলের উক্তির হুবহু অনুবাদ তুলে ধরছি–"তারা ভীষণতম ধ্বংসলীলা ও ক্রুরতম হিংসাত্মক কার্যে আনন্দ লাভ করত। তারা তুঁত গাছের বাগানে ঘোড়া চড়িয়ে রেশম উৎপাদন একেবারে বন্ধ করে দেয়। দেশের সর্বত্র বিভীষিকার ছায়া পড়েছে। গৃহস্থ কৃষক ও তাঁতীরা সকলেই গৃহ ত্যাগ করে পলায়ন করেছে। আড়ৎগুলি পরিত্যক্ত, চাষের জমি অকর্ষিত। ...খাদ্যশস্য একেবারে অন্তর্হিত, ব্যাবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে উৎপীড়নের চাপে।" (Interesting History Events-Holwell, 1766, part 1 p. 121, 151)

জাষ্টিস্ আঃ মওদুদ বলেছেন, "এ দস্যুতার দাপট ও ক্রুরতার হিংস্র প্রকাশ উপমহাদেশেরই এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলেও কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল, তার চিত্র মেলে মারাঠী বর্গীয় লুণ্ঠন বৃত্তিতে।" (দ্রঃ 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর,' পৃষ্ঠা ৩৭)

প্রত্যক্ষদর্শী গঙ্গারাম মহাশয়ের বিবরণ আরও গুরুত্বপূর্ণ–"বর্গীরা সহসা উদিত হয়ে গ্রাম ঘিরে ফেলে, তখন সকল শ্রেণীর মানুষ যে যা পারে অবস্থাবর মালপত্র নিয়ে পলায়ন করে। বর্গীরা সব কিছু ফেলে দিলে কেবল সোনা-রূপা কেড়ে নেয়। তারা কারও হস্ত কর্তন করে কারও কর্ণ-নাসিকা, কাউকে একেবারে হত্যা করে। সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলেই টেনে নিয়ে যায়...তারপর বর্গীরা তার উপর অকথ্য পাপাচার করে পরিত্যাগ করে যায়। লুণ্ঠন শেষে গ্রামকে গ্রাম জালিয়ে দেয়। প্রদেশের সর্বত্র এরূপ বীভৎস লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালায়...তারা কেবল চিৎকার করে 'টাকা দাও, টাকা দাও'। টাকা না পেলে তারা হতভাগ্য মানুষের নাকে জল ঢুকিয়ে কিংবা পুষ্করিণীতে ডুবিয়ে হত্যা করে...ভাগীরথী পার হয়ে অপর তীরে গেলে তাদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি মিলে।" (দ্রষ্টব্য ঐ পুস্তকের ৩৬ পৃষ্ঠা)

যে অত্যাচারী কুখ্যাত "মারাঠা বর্গীর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও দানবীয় লুণ্ঠনকর্মে বাংলাদেশের আপামর বাসিন্দা হয়েছিল", সে মারাঠা জাতির স্রষ্টা শিবাজীকে ইতিহাসে সীমাহীন সম্মান দেয়াটা অনেকেরই অবাক লাগার কথা।

বর্ধমানের মহারাজার সভাপণ্ডিত শ্রীবাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় লিখেছেন, "শাহু রাজার সৈন্যরা দয়ামায়াহীন। তারা গর্ভবতী নারী, শিশু, ব্রাহ্মণ, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করে...ভয়াল তাদের মূর্তি, সর্বপ্রকার লুণ্ঠন কর্মে সুপটু এবং সবরকম পাপাচারণে দক্ষ।" (History of Bengal, Vol, II p. 457, 458)

শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী বাবুর 'পুরানা কলকাতার কথাচিত্র' বইখানা একটা মূল্যবান দলিল বলা যায়। তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি ও আলোচনা তুলে ধরেছি–শিবাজীর পরে "মারাঠা নায়ক তখন রঘুজী ভোঁসলে। মন্ত্রী পণ্ডিত ভাস্কররাম কোলহৎকর। কূটবুদ্ধিতে অতুলনীয়। তাঁরা

দুজনে ঠিক করলেন বাংলাদেশকে (তখন অবিভক্ত) এবার জয় করে জুড়ে দিতে হবে নাগপুরের সাথে। কি করে সম্ভব হবে সেটা। কেন লুট-পাট, জোর-জুলুম, হত্যা আর অত্যাচারে। নাগপুরের এক পাহাড়ী অঞ্চলের অন্ধকার অরণ্য শিউরে উঠল এ দুই মারাঠা বীরের গোপন ষড়যন্ত্রে। ...ঘোড়ার খুরে পাথর ফাটিয়ে নাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল কাঁপিয়ে, বীরভূম-বিষ্ণুপুরের শালবন ডিঙিয়ে, উড়িষ্যার গিরিনদী পার হয়ে বিশ হাজার বর্গী সেনা নেমে এল বাংলার বুকে। সাথে ২৩ জন সর্দার। তাদের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত।"

"বাদশাহ আওরঙ্গজেব এদের ঠাট্টা করে বলতেন–'পার্বত্য মূষিক'। সে মূষিকের আক্রমণেই বাংলার গ্রাম, নগর, জনপদ, ফেটে পড়ল এক আকস্মিক চিৎকার, গ্রাম পুড়ছে। ঘর জ্বলছে। মাঠের ধান, দোকান-বাজারের খাদ্য শস্য, সংসারের আসবাব ঐশ্বর্য ধনরত্ন হচ্ছে লুটপাট। মানুষ পালাচ্ছে জন্মভুমির মায়া কাটিয়ে। দ্বিপ্রহরের চড়চড়ে রোদ। তারই মাঝে উন্মাদিনীর মত প্রাণ ভয়ে ছুটছে গর্ভবতী রমণী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পালাচ্ছে। গলায় দুলছে শালগ্রাম শিলা। বগলে শাস্ত্রগ্রন্থ।" (দ্রঃ 'পুরানা কলকাতার কথাচিত্র', পৃষ্ঠা ২২৩-২২৪)

গঙ্গারাম বাবুর পদ্যাকারে লেখা দলিলে কিভাবে হিন্দুদের পূজামণ্ডপ ধ্বংস করা হয়েছিল তার সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ, গন্ধবণিক, কাঁসারী, কামার, কুমার, জেলে, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, শেখ, সৈয়দ, মোঘল, পাঠান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বর্গীদের আক্রমণের নাম শুনে গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগলেন কিন্তু বর্গীরা মাজপথে তাঁদের ঘিরে কেমন ভাবে অত্যাচার করেছিল তার বর্ণনার হুবহু ছন্দ তুলে দিচ্ছি। অবশ্য এখনকার সাথে পূর্বের বানান ও শব্দের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করার মত;

"এই মত সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে॥
মাটে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুঠে নএ আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধ-এ পরাণ॥
ভাল২ স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জন ধরে।
রমণের ডরে ত্রাহি শব্দ করে॥
এইমতে বরগি যত পাপ কর্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোক জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগি গ্রামে সাধা-এ
বড়২ ঘরে আইয়া আগুনি লাগাএ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোণ্ডপ।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দিকে বরগি বেড়াএ লুটিয়া॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিয়া পিঠমোড়া।
চিত কইয়া মারে লাথি পা-এ জুত চড়া॥
রূপি দেহ রূপি দেহ বলে বারে বার।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জলে ভার॥"

Goto List

এ সব কিন্তু বর্গীরা তাদের সেনাপতির আদেশ অনুযায়ীই করত। সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের হুকুমতনামা ছিল আরও ভয়ঙ্কর–

"স্ত্রী পুরুষ আদি করি যতেক দেখিয়া।
তলোয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা॥"

ধর্মকে বাদ দিয়ে অন্যায়, আর ধর্মকে অবলম্বন করে অন্যায় নিশ্চয় এক নয়। অত্যাচারী ভাস্কর পণ্ডিত এবার ধর্মের (?) নামে দুর্গাপূজা করবেন বলে সকলকে ডাক দিলেন। তাদের আদেশে প্রতিমা নির্মিত হল। সাথে সাথে এল পূজার নামে পাঁঠা, মোষ আর লাখ লাখ টাকার উপঢৌকন। গঙ্গারাম মহাশয়ও লিখেছেন ঃ

"তবে গ্রামে গ্রামে যত জমিদার ছিল।
তা সভারে ডাক দিয়া নিকটে আনিল॥
কহিতে লাগিল তবে তা সভার ঠাঞি।
জগৎজননী মায়ের পূজা করিতে চাই॥...
তারপর উপাদেয় সামগ্রী আইল জত।
ভার বাহান্ধিতে বোঝা এ কত শত॥
ভাস্কর করিবে পূজা বলি দিবার তরে।
ছাগ মহিষ আইসে কত হাজারে হাজারে।"

(দ্রষ্টব্য শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রীর 'পুরানা কলকাতার কথাচিত্র', পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬)

মুসলমান লেখকের তো শিবাজী সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য তুলে ধরার উপায়ই নেই। তবে ইংরেজ ও হিন্দু লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখলে অন্ততঃ বইটি বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে রেহাই পাবে। তাই একটি উল্টা কথার (?) উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দী খাঁর আমলেই কুখ্যাত মারাঠা দুস্যুরা বারবার এ জায়গা আক্রমণ করেছিল এবং উভয়তঃ অর্থাৎ রঘুজী ভোঁসলে এবং পেশোয়া বালাজীরাও এর ডাকাত সৈন্যদলের অত্যাচারে সোনার বাংলা ছারখার হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধিমান স্থিতধী ও অসামান্য রণনিপুণ সেনাপতি আলিবর্দী রঘুজী ভোঁসলের বিরুদ্ধে পেশোয়ারা বালাজীরাও এর সৈন্য বাহিনীকে প্রয়োগ করেছিলেন।

পেশোয়ার সৈন্যবাহিনী (সংগঠিত ডাকাত দল) ভোঁসলে ও ভাস্কর পণ্ডিতকে প্রথমে বিতাড়ন করতে সক্ষম হল। কিন্তু এ দুটি ডাকাত দল নিজেদের মধ্যে যথেচ্ছ লুঠতরাজের বন্দোবস্ত করে পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করে। বাংলাদেশের লুটতরাজের বন্দোবস্ত ছিল ভাস্কর পণ্ডিত ও তার কুখ্যাত ২১ জন ডাকাত দলপতির হাতে।"

(দ্রঃ 'মুর্শিদাবাদ জেলার সত্যিকারের ইতিহাস'; রতন লাহিড়ী, পৃষ্ঠা, ৬১-৬২)

ইংরেজদের উপস্থিতিতেও মারাঠাদের অত্যাচার অব্যাহত ছিল। তারাও বাধা দেয়ার ইতিহাস সৃষ্টিতে শূন্যের অঙ্কে। বর্গী মারাঠিদের অত্যাচার স্তব্ধ করে দিয়ে আহত বাংলাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন বীর নবাব আলীবর্দী। অবশ্য তা করতে গিয়ে চতুরতা ও কৌশল খাটিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে প্রাণদণ্ড দিতে হয়েছিল। (প্রমাণ ঃ পূর্ণেন্দু পত্রীর ঐ পুস্তকের ২২৭-২২৮ পৃষ্ঠা)

শ্রীরতন লাহিড়ীও তাঁর পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "মারাঠা বর্গীদের হাত থেকে সোনার বাংলাকে রক্ষা করার জন্যে আলিবর্দীর নাম চিরকাল বাঙালি জাতির ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।"

Goto List

আলোচ্য লেখা থেকে প্রমাণ করা কঠিন নয় যে, মারাঠা বর্গীরা আসলে মুসলমান বিদ্বেষী কোন সম্প্রদায় নয়, বরং জাতি, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে একটা লুণ্ঠনকারী অত্যাচারী জাতি। আর তাদের মধ্যে থেকে শিবাজীকে যেভাবে এক নম্বর শ্রেষ্ঠতম বীর হিন্দু নেতার সম্মান দিয়ে ইতিহাসকে সাজান হয়েছে তা অনেকের ভাল লাগলেও চিন্তাশীল, গবেষক, সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রকেই যে তা ভাল লাগবে তার কোন গ্যারান্টি দেয়ার উপায় নেই।

আওরঙ্গজেব তাঁর কর্মচারি শিবাজী বারবার পরাস্ত করেছেন, বহুবার বন্দী করেছেন, আবার ক্ষমাও করেছেন অনেকবার। শিবাজীর পুত্র শম্ভুও যুদ্ধ করতে গিয়ে সদলবলে বন্দী হন, আর নিহত হন শুধু শম্ভুজীর শিশুপুত্রকে রাজকীয় সুখে প্রতিপালন করেন এবং শাহুর যৌবন এলে সুন্দর দুজন মারাটি যুবতীর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়েতে প্রচুর উপহারের সাথে তিনি শিবাজীর ফেলে যাওয়া তরবারিও উপহার দেন। এ আশ্চর্য তথ্য পরিবেশিত হয়েছে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মহাশয়ের 'মোঘল দরবারে দল ও রাজনীতি' পুস্তকের ৩১ ও ৩২ পাতায়। সতীশবাবু এ তথ্য কি সৃষ্টি করেছেন? না, এ চেপে রাখা তথ্যের তিনি উদ্ধৃতি নিয়েছেন Raqaim-E-Karaim-এর ৩৩২, ৪৩৩, ৪৮২, এবং Sardesai. New History 1, 331 পৃষ্ঠা হতে।

শিবাজীর কথা বলতে গিয়ে আওরঙ্গজেবের উদারতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে এজন্য যে, চরিত্র বিচারে শিবাজী ও আওরঙ্গজেবকে তুলনা·করে স্কুল-কলেজ ও ইউনিভারসিটির প্রশ্নপত্র সৃষ্টি করাকে কেহ যদি পাগলামি, বোকামী বা সাম্প্রদায়িকতা বলেন তা উড়িয়ে দেয়া যাবে কি? অনেক আধুনিক বিচক্ষণ ইতিহাসবেত্তাদের মতে, শিবাজী আওরঙ্গজেব অপেক্ষা বড়, সমপর্যায়ের অথবা নিকৃষ্ট এ তুলনা করাটাই অপ্রয়োজনীয়। হিমালয়ের সাথে তুলনা করতে হলে অন্য একটা পর্বতমালাকে আনতে হয়, তাই বলে উই ঢিবিকে নয়। আমার মত লেখক যদি মেনেই নেয় যে, শিবাজী বিশ্ব বিখ্যাত বীর, ভারতের হিন্দু জাতির স্রষ্টা. উচ্চ শিক্ষিত, দয়ালু, গুণবান, সম্ভ্রান্ত বংশীয় অভ্রান্ত নেতা ইত্যাদি তাই বলে এ কথা পৃথিবীর সকল সুধীজনকে বুঝান যাবে কি? শিবাজীর পূর্ব পুরুষ ও উত্তরপুরুষদের ইতিহাস আর আওরঙ্গজেবের পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণের ইতিহাস আমাদের সামনে থাকলেও মন মানতে চায় না অনেকের। যদি বলা হয়, আওরঙ্গজেব মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে পূর্ণভাবে জয়ী হয়েছিলেন, শিবাজীর সমস্ত স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণকে আওরঙ্গজেব বন্দী করেন বটে কিন্তু তাঁদের সম্মানজনক ভাতা দিয়ে সাধারণ কারাগারে না রেখে নিজের থাকার জায়গার পাশে বিশেষ স্থানে আত্মীয়-পরিজনদের আসা, যাওয়া বজায় রেখে বন্দী করেছিলেন—তাহলে অনেকের মনে হতে পারে, বোধ হয় এগুলো কোন কাঁচা লেখক অথবা মুসলমান ঘেঁসা ঐতিহাসিকের রচনা মাত্র। তাই এ সম্বন্ধে একটি ইংরেজী উদ্ধৃতির হুবহু বাংলা অনুবাদ পেশ করছি ঃ

"১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকেই (আওরঙ্গজেবের) প্রধানমন্ত্রী আসাদ খানের পুত্র ইতিকাদ খানকে রায়গড় দখলের জন্য প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠান হয়েছিল। অনেক দিন যুদ্ধ করে তিনি ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর দুর্গ দখল করে শিবাজীর বিধবা স্ত্রীগণ এবং ৯ বছর বয়সের শাহু সমেত পুত্র কন্যাগণকে বন্দী করলেন। বন্দী দলটাকে সম্রাটের শিবিরে ২৩শে নভেম্বর নিয়ে আসা হল। ভিন্ন ভিন্ন তাঁবুতে মহিলাদের রেখে সব রকম সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শাহুকে সাতহাজারী ও রাজা উপাধি দান করা হয়েছিল এবং তাঁকে সম্রাটের নিকটস্থ শিবিরে বন্দী অবস্থায় রাখা হল। আর তাঁর ভাই মদন ও আধু

(মাধু?) সিংকে তাঁদের জননী ও পিতামহীদের সাথে উপযুক্ত ভাতাদিসহ বাস করা ও উপাসনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এভাবে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকেই আওরঙ্গজেব সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট রূপে পরিগণিত হতে পেরেছিলেন। আদিল শাহ, কুতুব শাহ ও রাজা শম্ভুজী সকলেই পরাজিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের সাম্রাজ্যগুলো তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।”

ভবিষ্যতে ইতিহাস লিখতে সাহায্য করতে পারে বলে ইংরেজি উদ্ধৃতিটিও তুলে দিচ্ছি-"As early as December, 1688, itiqad Khan [a son of the prime minister Asad khan] had been deputed to lay seize to Raighar. After a lony struggle he captured the fort on 9th October, 1689, and seized in it Shivaji's surviving widows and Shambhuji and Raja Ram's wives, daughters and sons including Shahu, a boy of nine. The captives were brought to the imperil camp at Karegaon on 23rd November. The ladies were lodged in separate tents with every respect and privacy. Shahu was given the rank of a 7 Hazari and the title of Raja, but kept a prisoner near the imperial tent, while his brothers Modan singh and Adhu (Madhu?) Singh were permitted to live with their mothers and grand mothers, with proper allowances and establishment of offices.

Thus, by the end of the year 1689, Aurangzab was the unrivalled lord paramount of Northem India and the Deccan alike. Adil Shah, Qutab Shah and Raja Shambhuji had all fallen and their Jominions hae been annexed to his emprire. [History of Aurangzeb : Prof. J. N. Sirkar, Vol. IV p. 466-67].

মহীয়সী জেবন্নেসার বিকৃত চরিত্রের আসল তথ্য

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাজসিংহ ' বইটা পাঠ্যপুস্তক রূপে গঠিত হচ্ছে। তাতে আওরঙ্গজেবের কন্যা গুণবতী, চরিত্রবর্তী ও প্রতিভাবতী জেবন্নেসাকে ভ্রষ্টা ও পতিতা অপেক্ষাও চরিত্রহীনা প্রমাণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই; সেটি নাকি ইতিহাস নয়, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'।

পৃথিবীর বুকে বহু নর-নারী দেখা যায় যাঁরা বিশেষ কোন কারণে জীবনে বিয়ে করেননি। এঁদেরকে নিয়ে অনেকে উপন্যাস লিখেছেন। আর উপন্যাস লিখতে গিয়ে চিরকুমার আর চিরকুমারীদের চরিত্রহীন বা চরিত্রহীনা করে না লিখলে উপন্যাস সরস হবে কি করে? তাই সমস্ত কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থকারিণী 'হফেযা' ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী জেবন্নেসাকেও উপন্যাস মার্কা ইতিহাসে আঘাত থেকে রেহাই দেয়া হয়নি।

হাফেয, মাওলানা হযরত আরমগীরের চরিত্র বিকৃত কররে যেমন পরোক্ষভাবে কুরআন ও হাদীসকে অকেজো, নেশার সামগ্রী প্রতিপন্ন করে মুসলমান সমাজকে ধর্ম বিমুখ করা যাচ্ছে, ঠিক সে রকম মহীয়সী মহিলা হাফেযা জেবন্নেসাকেও যদি ভ্রষ্টা, চরিত্রহীনা প্রমাণ করা যায় তাহলে বিশেষতঃ মুসলিম নারী জাতিকেও কুরআন ও হাদীসের বিপরীত দিকে চালান সম্ভব হবে—এ চাতুর্যপূর্ণ মতলব নিয়েই ইতিহাসে বিষ প্রয়োগ করার পরিকল্পিত ব্যবস্থা।

আকীল খাঁকে জেবন্নেসার প্রণয়ী বলে লিখেছেন কিছু অমুসলমান লেখক। আর বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জেবুন্নেসা নাকি মোবারক খাঁর অবৈধ প্রেমিকা ('রাজসিংহ' দ্রষ্টব্য)। আবার সম্রাট আওরঙ্গজেবের বোন জাহানাকেও এ সামান্য সৈনিক মোবারক খাঁর প্রেমিকা বলে দেখিয়েছেন সাহিত্য সম্রাটের দল। পিসি ও ভাইঝির একই ব্যক্তির সাথে ব্যভিচারের নেশার কথা বর্ণনা করে অনেকে কাগজের পাতায় 'ইনভেনটরে'র খ্যাতি লাভ করেছেন। সত্য ইতিহাসের সংবাদ কিন্তু একেবারে এর বিপরীত।

কুমারী জেবন্নেসার কুমারীত্বের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে এক ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতির অনুবাদ এখানে তুলে দিচ্ছি-"যেহেতু জেবন্নেসা দিবানিশি কাব্যানুশীলন ও পুস্তক অধ্যয়নের গবেষণায় রত থাকতেন এবং বিবাহ হলে যেহেতু স্বামী সেবা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যাবে ফলে অধ্যয়ন, গবেষণা ও কাব্য রচনার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে বলে চিরজীবন কুমারী থেকে বিবাহের বর্তমান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়াতে নিজের স্বাধীনতা সত্তাকে সায় দিতে পারেন নি।" [উর্দু গ্রন্থ 'জেওয়ারে জেবন্নেসা' দ্রষ্টব্য)

কোন কোন লেখক জেবন্নেসাকে শিবাজীর পণয়-ভিখারিণী বলতে বা বইয়ে লিখে নাটক ও যাত্রারূপে তা সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিতেও লজ্জানুভব করেননি। এতে সমাজে সাম্প্রদায়িকতা সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে গেছে।

আবার কোন কোন লেখক নাসীর খাঁর সাথেও জেবন্নসার অবৈধ প্রেম ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে সব লেখকের লেখার সময় মনে রাখা উচিত ছিল যে, তাঁদেরই মতে সম্রাট আওরঙ্গজেব নাকি খুবই গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, আর গোঁড়া মুসলমানের মেয়েরা অবৈধ পুরুষ দেখতে পায়না, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং গোঁড়া আওরঙ্গজেবের হারেমে সংরক্ষিতা রাজকন্যাদের অপর পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকতে পারে কি করে? তাই মনে হয়, ভেজাল দেয়ার উন্মাদনায় অসাবধানতামূলক কিছু গোলমাল থেকে গেছে।

হাফেযা জেবন্নেসা সম্বন্ধে সে যুগের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লেখক ও কবিগণ তাঁদের কাব্য-কবিতায় যা লিখেছেন সেগুলো যাঁদের জানা আছে তাঁরা অবশ্যই জেবন্নোসার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন সন্দেহ নেই। মির্জা সাঈদ আশরফ লিখেছেন, "আল্লাহ্‌র বান্দাগণ যেমন তাঁর উপাসনা করেন অথচ তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে পান না, তেমনি জেবন্নেসার ভৃত্যগণ তাঁর কাজ করত অথচ তাঁকে দেখতে পেতনা।"

ঐতিহাসিক নিয়ামত আলি খাঁন লিখেছেন, "আল্লাহ্ নিজে অদৃশ্য থাকলেও তাঁর গুণরাজির দ্বারা তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও প্রকাশিত। জেবন্নেসা পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য থাকলেও দয়া দানে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও প্রকাশিত।"

এগুলো সবই মুসলমানদের উদ্ধৃতি তাই অনেকের কাছে গ্রহণীয় নাও হতে পারে। তাই বিখ্যাত হিন্দু লেখক লক্ষ্মীরানায়ণের লেখার উদ্ধৃতি দিচ্ছি-"জেবন্নেসা তৈমুর বংশীয়া উজ্জ্বলতর আলোকবর্তিকা, এ যুগের নারীকূল মুকুটমণি! তাঁর অধ্যবসায়, আরাধনা, কাব্য সাধনা ও ধর্মপ্রবণতা তাঁকে সুনামের অধিকারিণী করেছে। তাঁর সুখ্যাতি অনেকের কাছে পবিত্র কাবা ঘরের মত। হযরত মহম্মদের পত্নী খাদেজার মত তিনি ছিলেন পাপ ও কলঙ্কশূন্য কুমারী।"

জেবন্নেসা সম্পর্কে জানতে হলে বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত লক্ষ্মী নারায়ণ সংকলিত 'গুলেরানা হস্তলিপি' যথেষ্ট হবে বলা যায়।

Goto List

ভারতে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী-মিলন স্থায়ী হলে গোড়ায় গলদ রেখে বাহ্যিক সমাধান করতে চাইলে তা হবে মূল্যহীন। বাস্তবে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়তে হলে বিষাক্ত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' লেখার পথ বন্ধ করতে হবে, কারণ ওটাও সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম বীজ। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যিনি আবিষ্কারক অথবা প্রবর্তক তিনি হচ্ছেন শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরে আমাদের সর্ববরেণ্য সাহিত্য সম্রাট উপাধিপ্রাপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনিই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'রাজসিংহ' লিখে উপন্যাস মার্কা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

'অঙ্গুরী বিনিময়' বইয়ে শিবাজীকে নায়ক আর 'রোসিনারাকে' নায়িকা করে ভূদেববাবু যা লিখেছেন তার স্রোতে আওরঙ্গজেবের কন্যা 'রোসিনারা'কে একেবারে পশু চরিত্রে নামিয়ে আনা হয়েছে। অথচ আওরঙ্গজেবের 'রোসিনারা' নামে কোন কন্যাই ছিল না। অনেকের ধারণা, ভূদেববাবুর ইতিহাসে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবেই এত বড় ভুল হয়েছে। কিন্তু তা নয়, ভূদেববাবুর রচনায় 'বাঁচার' একটা রাস্তা করা হয়েছে মাত্র। সেটা হচ্ছে এ, যদিও রোসিনারা নামে আওরঙ্গজেবের কোন কন্যা নেই তবুও এটা যে উপন্যাস। উপন্যাসে কল্পনার মিথ্যা পালিশ চড়ালে যেন অপরাধের কিছু নয়। অতএব ঐতিহাসিক-উপন্যাসিকের মতে, প্রখ্যাত চরিত্রবর্তী জেবন্নেসাকেও চরিত্রহীনা বললেই বা দোষ হবে কেন?

এমনিভাবে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একটি বই লিখেছেন তার নাম 'ভারতের বিদূষী'। অবশ্য গঙ্গোপাধ্যায় মশায়ের গ্রন্থে জেবন্নেসা যে স্থান পেয়েছেন এটাই সৌভাগ্য (?) বলতে হবে। তবে তিনিও শিবাজীর প্রেম-প্রণয়ী বলে জেবন্নাসাকে চিত্রিত করেছেন। তেমনই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সুনীতি দেবীর "The Beautiful Princess" নামে একটি পুস্তকেও শিবাজীর প্রণয়িনী বলে জেবন্নেসার চরিত্রে কালিমা নিক্ষেপ হয়েছে।

আজকাল নানা পত্র-পত্রিকায় এত বেশি উৎকট ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি হচ্ছে যে, নিরপেক্ষ পাঠকের সামনে যখন সেগুলো বার বার ফুটে ওঠে তখন অনেকেরই মনে হয়, "একটা মিথ্যাকে বারংবার প্রচার করতে করতে তা সত্যে পরিণত হয়।" এছাড়া আমাদের বাংলা ভাষাতেও একটা প্রবাদ আচে, "যা রটে, তার কিছুও ঘটে।" কিন্তু আজ প্রমাণিত সত্য হয়ত এটাই যে, "যা না ঘটে, তাও রটে।"

প্রকৃতপক্ষে যাঁরা ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন, যেমন কাফি খাঁ, মনুচি, তাভার্নিয়ের, স্যার যদুনাথ সরকার প্রভৃতি পণ্ডিতদের লিখিত ইতিহাসে এসব অভিযোগ বা অপরাধের 'অ'ও নেই, বরং প্রশংসার প্রাচুর্য আছে। যদুনাথ সরকারের একটা পুস্তকের নাম 'শিবাজী' আর একটার নাম 'ঔরঙ্গজেব'। কিন্তু এগুলোর মধ্যে এসব অলীক গল্পের কোন স্থান নেই। তবে আগামীকাল নতুন সংস্করণের বা নতুন মুদ্রণে কি হবে তা বলার স্পর্ধা আমাদের নেই।

যদুনাথ সরকার ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'Modem Review' পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তার শিরোনাম 'Love Affairs of Jebannessa'। তাতে তিনি জোরাল ভাষায় গুরু গম্ভীর ভঙ্গিমাতে প্রকাশ করেছেন-"এ সমস্ত কাহিনী একেবারে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।"

আর একজন খ্যাতনামা চরিত্রকার শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'মোঘল বিদূষী' পুস্তকে এ সমস্ত প্রেম-কাহিনীকে মিথ্যা এবং কাল্পনিক বলেই শুধু লেখেননি বরং তা প্রমাণ করতেও সক্ষম হয়েছেন।

আওরঙ্গজেব নিজেই পছন্দ করে তাঁর কন্যার নাম রেখেছিলেন জেবন্নেসা, অর্থাৎ 'ললনাশ্রী'। তিনি যখন কুরআন মুখস্থ করতেন তখন পুরাতন পড়া ভুলে যাওয়ার সম্ভবনা ছিল কারণ তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। হাফেযা হওয়ার পর আরবী, ফারসী ও উর্দুতে তিনি উল্লেখযোগ্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এছাড়া আরও অন্যান্য ভাষায় জেবন্নেসা যথেষ্ট সুদক্ষ ছিলেন।

একবার পারস্যের বাদশা স্বপ্নের মধ্যেই কবিতার একটা ছত্র মুখস্থ করেন–'দুর্‌রে আবলাক কাসে কমদিদা মওজুদ'। বাক্যটির অর্থ হল 'সাদা-কাল মিশ্রিত রঙের মোতির প্রত্যক্ষদর্শী বিরল।' তিনি অনেক কাব্যবিদ ও কবিদের এ বাক্যের সাথে মিলিয়ে অর্থ, ছন্দ ও তাৎপর্যপূর্ণ আর একটি বাক্য তৈরি করতে আহ্বান করেন। অনেকেই করলেন বটে কিন্তু তা বাদশাহের পছন্দ হল না। অবশেষে তিনি সকলের পরামর্শে এ বাক্যটি হিন্দুস্তানে কবি ও কাব্যকারদের জন্য দিল্লির রাজদরবারে পাঠিয়ে দেন। দরবারের সকলেই যখন ইতস্ততঃ করেছেন তখন অন্তঃপুরে ভারত বিখ্যাত বিদূষী জেবন্নেসার কাছে তা পাঠান হল। তিনি একটু চোখ বুলিয়েই এ বাক্যের নিচে আর একটি বাক্য লিখে দিলেন–'মাগার আশকে বুতানে সুরমা আলুদ'–যার অর্থ হল, 'কিন্তু সুরমা পরা চোখের অশ্রুবিন্দুতে এ মোতির প্রাচুর্য।'

সাধারণ একটা বাক্যের সাথে জেবন্নেসা রচিত এ অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি বিজড়িত উচ্চ শ্রেণীর ছন্দ সৃষ্টিতে ভারতের জ্ঞানী-গুণীরা তো মুগ্ধ হয়েছিলেনই সে সাথে এ কবিতাটি যখন পারস্যে পৌঁছেছিল তখন পারস্যবাসী এত শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করে যে, তার জ্ঞানমুগ্ধ ও গুণমুগ্ধে অনেকে পুস্তক পুস্তিকায় তা নানাভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

পারস্যের পণ্ডিতবৃন্দ সুলতানকে অনুরোধ করেন এ বিখ্যাত নারীকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে। তাই তিনি জেবন্নেসাকে বিখ্যাত কবিকে দিয়ে লিখিত কবিতার মাধ্যমে তাঁর মনের কথা জানালেন–'তুরা এ্যায় মহ্‌জেবী বে পরদা দিদান আরজু দারাম'-অর্থাৎ 'হে চন্দ্রাপেক্ষা সুন্দরী, আমাদের ব্যবধান দূরীভূত হোক, পর্দার বাইরে আপনার দর্শনের আশা নিয়ে যেতে চাই।'

উত্তরে গোঁড়া (?) সম্রাটের গোঁড়া কন্যা লিখে পাঠালেন–'বুয়ে গুলদার বারগে গুল পুশিদাহ্ আম দর সৌখন বিনাদ মোরা.....' - অর্থাৎ 'পুষ্পের সুঘ্রাণের মত পুষ্পেই আমি লুকিয়ে আছি। আমায় যে কেহ দেখতে চায়, সে আমায় দেখুক আমারই লেখায়।' এ রকম পর্দার পক্ষপাতিনী নারী হয়েও জেবন্নেসাকে আজ মর্মান্তিক ও ঘৃণ্য অভিযোগের শিকার হতে হয়েছে। বলাবাহুল্য জেবন্নেসা, রওশনআরা আর জাহানারা প্রভৃতি রমণীগণ পর্দা বজায় রেখে পাণ্ডিত্য অর্জনের যে ইতিহাস রেখে গেছেন তা চাপা দেয়া এবং তাঁদের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক নিক্ষেপ করার প্রয়োজন এ জন্যেই যে যদি কোন শিক্ষিত নারী সমাজে প্রয়োজনীয় পর্দার পক্ষাবলম্বন করেন তাহলে উদ্দেশ্য যাঁদের সফল হবে না তাঁরাই প্রমাণ করতে চান, কুরআন আর হাদীসের শিক্ষাপ্রাপ্ত পর্দায় থাকা রাজকুমারীরা পর্দায় থাকলেও বাস্তবে তাঁদের পর্দা ছিলনা, তাই যাকে তাকে প্রেম নিবেদন করেছেন। সুতরাং তাঁদের মতে, যত্ দোষ যেন কুরআন আর হাদীসের শিক্ষা। অনেকের ধারণা এ ধরণের উপন্যাসের সৃষ্টি করে অনেকে চাইছেন, মুসলিম নারীকে এমন পর্যায়ে আনতে হবে যাতে তাঁরা কুরআন-হাদীসের শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকেন এবং শরীয়ত প্রথা হতে মুক্তি নিয়ে অপর অসভ্য স্রোতের টানে উলঙ্গ অথবা অর্ধোলঙ্গ স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিণী এবং নকল উন্নতির শেষ সীমায় পৌঁছে ব্যভিচারিণী হয়ে ওঠেন। অবশ্য এ শ্রেণীর লেখকদের শ্রমের সার্থকতা আজ অনেকাংশে প্রমাণিত।

আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মোগল বাদশাগণ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মত এত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না ঠিকই, তাই বলে খুব অযোগ্যও ছিলেন না। বাহাদুর শাহ উপাধি নিয়ে আরওঙ্গজেবের জেষ্ঠ্যপুত্র শাহ আলম ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসলেন। সম্রাট শাহ আলম বা বাহাদুর শাহ বীর, পণ্ডিত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সকল শত্রুই স্বাভাবিক ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু শাহ আলমের বীরত্ব, গাম্ভীর্য ও কলা-কৌশলের শুধু ভূমিকা দেখেই অনেকে শান্ত ও ক্ষান্ত হয়। কিন্তু শিখ জাতি শক্তিশালী হয়ে বান্দার নেতৃত্বে ও আদেশে শিরহিন্দে লুটপাট শুরু করলে বাহাদুর শাহ কোন সেনাপতি নিয়োগ না করে নিজেই বীরবেশে সুশিক্ষিত সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে নামলেন। যুদ্ধে শিখ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল এবং বান্দা কোনও রকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। ভাতের প্রান্তে প্রান্তে শাহ আলমের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। শাহ আলম মোঘল বাহিনীকে শক্তিশালী করে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মাত্র ৫ বছর রাত্ব করেন শাহ আলম। স্বল্পায়ু না হলে না শাহ আলম৩ আওরঙ্গজেবের মত অমর হয়ে থাকতেন। তিনি সিংহাসনে বসে রাজপুতদের সাথে মৈত্রী বন্ধনের ব্যবস্থা করেছিলেন ও পিতা আওরঙ্গজেবের আমলে বন্দী শম্ভুজীর পুত্র শাহুকে তিনি মুক্তি দেন। এমনিভাবে পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা সুদূর প্রসারী চিন্তাদারা সর্বোপরি ধর্মপ্রবণতা তাঁকে মহীয়ান করে তুলেছিল। কিন্তু চাপা পড়ে গেছে সেসব সত্য ইতিহাস—এখানে সুযোগ্য হয়েছেন কলমের খোঁচায় অযোগ্য।

শাহ আলমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহান্দার শাহ সম্রাট হন। তিনি বিচক্ষণ ছিলেন। দুষ্টের দমনে তিনি ছিলেন খুব নির্ভীক। এক বছর রাজত্ব করার পর ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে তিনি গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। এখানে অপমৃত্যুর জন্য নিশ্চয় তিনি দায়ী নন বা অযোগ্য প্রমাণিত হবেন না। অথচ অনেক ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবের পরবর্তীগণ অযোগ্য ছিলেন বলে ব্যক্ত করেছেন বিনা দ্বিধায়, চিন্তার গভীরে প্রবেশ না করেই।

গান্ধীজী, ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানের লিয়াকত আলি খাঁন, আরেরিকার মিঃ কেনেডি প্রমুখ শত্রুদের হাতে নিহত হন। যারা হত্যাকারী তারাই কলঙ্কিত আর যাঁরা নিহত তাঁরা ইতিহাসের পাতায় নানা কারণে অমর হয়ে রয়েছেন। তাই এখানেও জাহান্দারের মৃত্যুতে অযোগ্যতার কি থাকতে পারে?

সম্রাট জাহান্দারের পরে বাহাদুর শাহের পৌত্র ফাররুখশিয়র সিংহাসনে বসেন ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে। পূর্বপুরুষদের আকস্মিক মৃত্যুর অভিজ্ঞতায় স্থির করলেন, মৃত্যুর পূর্বে এমন যোগ্য প্রতিনিধি তৈরি করতে হবে যাঁরা যে কোন মুহূর্তে সাম্রাজ্যের হাল ধরতে পারবেন। তাই বংশের যোগ্য দুই ভাই, ইতিহাসে যাঁরা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বলে পরিচিত, সে সৈয়দ হুসাইন আর সৈয়দ আবদুল্লাকে সাথে নিলেন এবং কাজ-কার্যে এমন সুযোগ্য করে তুললেন যাতে সম্রাটের অসুস্থতা বা অনুপস্থিতির কারণে সম্রাটের ও সাম্রাজ্যের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। অনেক ঐতিহাসিক অবশ্য মনে করেন যে, সম্রাট ফাররুখশিয়র সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতের পুতুল ছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও দুরদর্শী। লেখকগণ অনেকে সম্রাটের বাস্তব মূল্যায়ন করতে পারেন নি।

তাঁর সময় মারোয়াড়ের রাজা অজিত সিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সম্রাট তা কঠোরভাবে দমন করেন। অজিত সিংহ পরাজিত হয়ে অত্যন্ত আগ্রহেই সম্রাট ফাররুখশিয়রের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং নিজের কন্যার সম্রাটের সাথে বিয়ে দেন। পূর্ববর্ণিত শিখ নেতা

Goto List

বান্দাও আবার শক্তি সঞ্চয় করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফাররুখশিয়র বিপুল বিক্রমে বান্দাকে পরাজিত এবং নিহত করেন। কিন্তু আবার আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটল ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে–আততায়ীর হাতে সম্রাট নিহত হন। অতএব এখানেও তাঁর অযোগ্যতার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এমনিভাবে মুহাম্মাদ শাহ উপাধি নিয়ে বাহাদুর শাহের চতুর্থ পুত্র জাহান শাহ সম্রাট হলেন (১৭১৯-৮)। পতনোন্মুখ মোঘল সাম্রাজ্যের ইনিই ছিলেন শেষ প্রতাপশালী সম্রাট। তাঁর সময়ে দরবারে ওমরাহগণ ইরানী ও তুর্কী এ দু' দলে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দেখা দেয়। তাঁর উজির বা মন্ত্রী নিজামউল মুলক দাক্ষিণাত্যের সুবাদার থেকে স্বাধীন শাসক হয়ে উঠলেন; হায়দরাবাদ রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।

সুবাদারগণও চারিদিকে স্বাধীন হয়ে দাঁড়ালেন। অযোধ্যার সাদাত খাঁ, বাংলাদেশের আলিবর্দ্দী খাঁ, রোহিলাখণ্ডে আফগানরা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অত্যাচারী মারাঠারাও এ সময় আবার খুব প্রবল হয়ে মালব, বুন্দেলখণ্ড, গুজরাট, বেরার ও উড়িষ্যা দখল করে। বঙ্গদেশও এদের আক্রমণ থেকে বাদ যায়নি। এদের লুটপাটকে বঙ্গের লোক তখন 'বর্গীর হাঙ্গামা' বলত।

তাছাড়া এ সময় তুর্কী নাদির শাহ সাফাবী বংশের উচ্ছেদ করে পারস্যের মসনদে বসে ভারত আক্রমণ করেন। তাঁর প্রচণ্ড আঘাতে মোঘল সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

নাদির শাহ যে একজন আক্রমণকারী তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য সে যুগে এ ধরণের আক্রমণ অন্যায় ছিলনা, বরং বীরত্বই ছিল। মুসলমান নাদিরের আক্রমণে বহু নর-নারী নিহত হয়েছিল ও বহু ঘর-বাড়ি অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়েছিল–একথাও অসত্য নয়। কিন্তু ইতিহাসে, নাটকে ও যাত্রায় যা বোঝান ও দেখান হয় তাতে প্রমাণ হয় যে, মুসলমান নাদিরের অত্যাচার ও আক্রমণ ছিল আকস্মিক ও অহেতুক, ওটা যেন নতুন কিছু নয়, মুসলমানদের স্বাভাবিক কাজই হল এ ধরণের আক্রমণ। কিন্তু বস্তুতপক্ষে ঘটনা তা নয়। আসলে তিনি স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি করেই দিল্লি দখল করেন। কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষ রটিয়ে দিলেন যে, নাদির শাহ হঠাৎ মারা গেছেন। আর সে সাথে নাদিরের সৈন্য ও কর্মীদের যথেচ্ছভাবে হত্যা করা শুরু হল। এ রকম ঘটনা নাদিরের কল্পনার বাইরে ছিল। তাঁর সৈন্যদের আক্রান্ত হবার ঘটনা যখন তিনি শুনলেন তখন তিনিও দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পাইকারি হত্যা বা কঠোর প্রতিশোধ নিতে বললেন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে। ফলে জাতি, ধর্ম-নির্বিশেষে অনেকেই নিহত হল–এখানে 'হিন্দু-মুসলমানে'র কোন ব্যাপার ছিলনা।

নাদির শাহের পর আহমদ শাহ আবদালির ভারত অভিযানে মোঘল সাম্রাজ্য একেবারে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। মুহম্মদ শাহের পরে আহমদ শাহ (১৭৮-'৫৪), দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫-'৫৯), দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬), দ্বিতীয় আকবর শাহ (১৮০৬-'৩৭) ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-'৫৮) পর্যায়ক্রমে বাদশাহ হন। শেষ মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহও অযোগ্য বিবেচিত হয়েছেন অনেক ঐতিহাসিকের কলমের খোঁচায়। তিনি নাকি কবিতা আর বিলাসিতা ভাল বুঝতেন, সাম্রাজ্য নয়। তাঁর চেপে রাখা ইতিহাস, কিন্তু মোটেই তা বলে না–তার থেকেই সামান্য কিছু পরিবেশিত হচ্ছে।

সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের চাপা পড়া তথ্য

সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে অভিষেক হয় এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হয় তাঁর হত্যাযজ্ঞ। কুচক্রী ইংরেজ ও তাঁর দালালদের লেখা অথবা তথ্য বা নাজার কারণে লেখা ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ শুধু কবি, বিলাসী আর স্ত্রী জিনাত মহলের হতের পুতুল ছিলেন। আরাম-আয়েশ, বিলাস-ব্যসন ও খামখেয়ালীর কারণেই তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে দিতে ব্যর্থ হন এবং নির্মমভাবে পরাজিত হন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস তা বলেনা।

প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলন, যেটাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছে, সেটা ছিল সর্বভারতীয় আন্দোলন। সে বিশাল অবিভক্ত ভারতের নেতা নির্বাচন করার সময় হিন্দু-মুসলমান সকলেই বাহাদুর শাহকেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে বরণ করে নেন। তিনি ধর্ম জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেককে সমান চোখেই দেখতেন। হিন্দুদের তিনি বিশেষভাবে ভালবাসতেন। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, বেনারসের বাবু সরোজ নারায়ণ, পণ্ডিত নন্দকিশোর, রাজা ভোলানাথ, কুমার সলগরাম, রাজা দেবী সিংহ, গয়েন্দ মল্ল, লালা শিবলাল, জগজ্জীবন দাস, লালা মুকুন্দলাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে তাঁর গভীর সুসম্পর্ক ছিল। হোলি, দেওয়ালি, রাখি বন্ধন প্রভৃতি হিন্দুপর্বে তিনি হিন্দুদের উৎসাহ প্রদান করতেন। (দ্রষ্টব্য Court Diary, 11th December, 1856, Page-39)

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সারা দেশ যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে হুংকার ছেড়ে উঠেছে তখন বাহাদুর শাহের বয়স ৮২ বছর। সর্বভারতীয় নেতৃত্ব নিতে তাঁকে অনুরোধ করা হলে তিনি যা বলেছিলেন তা খুব হৃদয়স্পর্শী–"আমি সর্বান্তকরণে তোমাদের সাথে আছি। কিন্তু আমার না আছে অর্থ, না আছে সৈন্য। যদি আমি আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি তবে আমি তোমাদের রাজকীয় মর্যাদা দেব।" এ কথা জনসাধারণ সমস্বরে চিৎকার করে বলেছিলেন–"হুযূর আমরা ধনও চাইনা, সৈন্যও চাইনা। আমরা চাই যে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আপনার নেতৃত্বের সমর্থন আমাদের দিন। আমরা আপনার পায়ের তলায় জীবন উৎসর্গ করব। আমরা আপনার হারিয়ে যাওয়া রাজ্য উদ্ধার করার পক্ষপাতী এবং আমরা চিরস্থায়ী গৌরব অর্জন করতে চাই।" বাদশাহ তখন বললেন, "তাহলে আমার যা কিছু আছে তা তোমাদের দায়িত্বে দিলাম। আমার ভাণ্ডার থেকে তোমরা খানাপিনা কর এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করে শত্রুদের ভারত থেকে দূর করে আমার নামে মুদ্রা চালু কর।" সাথে সাথে তাঁর নামে এক রকম স্বর্ণমুদ্রা চালু করা হয়েছিল।

তিনি সৈন্যগণকে লুটপাট ও শিশু-নারী হত্যার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। এ প্রসঙ্গে ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর সৈন্যদের লক্ষ্য করে যা বলেন তার বঙ্গার্থ হল–লুট করার কোন দরকার নেই। আমি আমার সম্পদ-সম্পত্তি সোনা এবং রুপোর অলঙ্কার সমস্ত বিক্রয় করে তোমাদের বেতন দেব। কিন্তু তোমরা যদি শহর লুট করতে চাও তবে আমাকে আগে হত্যা কর এবং পরে তোমাদের যা খুশী করতে পার। (দ্রঃ Metcalfe : Two Narratives of the Mutiny in Delhi, p.,216)। ১৮৫৭ সনের ১৩ই মে ৬০ জন ইংরেজ শিশু ও নারীকে হত্যার ব্যাপারে তাঁর অনুমতি চাওয়া হলে তিনি অনুমতি তো দিলেনই না উপরন্তু তাদের রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সে সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য মুসলমানদের গরু কোরবানীকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ যড়যন্ত্রের জাল বোনে। হুশিয়ার বাহাদুর শাহ সাথে সাথে আদেশ জারী করেন "এ বছর গরু কোরবানী বন্ধ

থাকবে; ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি দিয়েই কাজ চলবে এবং যে এ আদেশ অমান্য করবে তাকে কামানের গোলায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।" সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বের নিরপেক্ষ এ বৃদ্ধ সম্রাটও সেবার নিজের তরফ থেকে একটি মেষ কোরবানী করেন।

৮২ বছর বয়স্ক সম্রাটের সিংহাসনের লালসা ছিলনা। তাই তিনি সর্বভারতীয় রাজন্যবর্গের সমন্বয়ে একটি কনফেডারসী কমিটি গঠন করতে চেয়েছিলেন–সারা ভারত পরিচালনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা এ কমিটির হাতে থাকবে।

সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের পরাজয়ের কারণ তাঁর অযোগ্যতা যে মোটেই নয়, তা তাঁর কার্যবলীই প্রমাণ করে। মোহনলাল, মুন্সী, গোবিন্দ দাস, আগাজানদের মত বিশ্বাসঘাতকদের চরম হঠকারিতা ভারতীয় রাজন্যবর্গের অসহযোগিতা, উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রের অভাব তার কারণ তো বটেই, তাছাড়াও তাঁর অধীনস্থ সংগ্রামীদের দ্বারা তাঁর আদেশ ভুলে শিশু, নারী ও অসহায়দের হত্যা ও লুঠপাট করা, বাহাদুর শাহকে নিরুৎসাহ করে ফেলেছিল। একে বৃদ্ধ তার উপর তিনি শারীরিক দুর্বল ছিলেন। এ তাজা ও উদার হৃদয়ের মানুষটাকে অযোগ্য বলে চিহ্নিত করার মধ্যে কি যে ঐতিহাসিক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তা আমাদের জানা নেই।

১৯শে সেপ্টেম্বর দীর্ঘাঙ্গী, শুভ্র শ্মশ্রুধারী বাদশাহ বুঝতে পারলেন, মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গনে তাঁর আর বিলম্ব নেই। তাই তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেশ রক্ষিত যে বাক্সটি তাঁর কাছে ছিল সেটা হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাযারের তত্ত্বাবধানকারীর হাতে এ মনে করে সঁপে দিলেন যে, ইংরেজদের দ্বারা সেটা কলঙ্কিত হতে পারে। তারপর তিনি হুমায়ূন মাক্বারায় বা সমাধি স্থানে সপরিবারে আত্মগোপন করে রইলেন। কিন্তু শীঘ্রই কুখ্যাত বৃটিশ সেনাপতি হড্সন তাঁকে অপমান সহকারে গ্রেপ্তার করলেন। দুর্গে বন্দী হলেন বৃদ্ধ সম্রাট। সে সাথে বাহাদুর শাহের দুই পুত্রসহ রাজবাড়ির মোট ২৯ জন শিশু ও বালক-বালিকাকে মিঃ হড্সন দিল্লি রাজপথে গরুর গাড়ি থেকে নামিয়ে গুলি করে হত্যা করে। নরপিশাচ হড্সন বাদশাকেও গুলি করতে যান কিন্তু মিঃ উইলসন তাতে আপত্তি জানান। এ ২৯ জন বাচ্চার কাটা মাথা নিষ্ঠুর হড্সন সম্রাটকে উপহার দেন। তারপর সম্রাটকে সৈন্যদের মাঝখানে দাঁড় করান হয়। অসহায় সম্রাট নির্বাক শিশুর মত দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন কিভাবে হতে পারে তাঁর শেষ পরিণতি। এমন সময় এক ইংরেজ সৈন্য ছুটতে ছুটতে এসে লাফিয়ে সজোরে বাদশাহের নাকে ঘুঁষি মারে। প্রবল রক্তের ধারা নিয়ে বৃদ্ধ সম্রাট লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। সম্রাটের একজন কৃষ্ণদেহী সেবক প্রভুর এ দৃশ্য দেখতে না পেরে বন্দুক কামানের পরোয়া না করে তাকেও এক ঘুঁষি মেরে ধরাশায়ী করে। অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই কৃষ্ণদেহীকে হত্যা করে টুকরা টুকরা করে ফেলা হয়।

বাদশাহকে অবশিষ্ট পরিবারর্গ সহ রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। হতভাগ্য বাদশাহ একটা ছোট্ট কামরাতে বন্দী ছিলেন। প্রয়োজন মত তেল সাবানটুকুও তাঁকে সরবরাহ করা হত না। সব থেকে দুঃখের কথা, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা সেখানে ছিলনা। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর শুক্রবার ৫টার সময় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়; বলা হয় তাঁর কণ্ঠনালীতে প্যারালাইসিস্ হয়েছিল। মৃত্যুর পর দাফন, কাফন, কবর যা হোক কিছু একটা হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ সৈনিক দল তাঁর কবরস্থান মাড়িয়ে ও খোঁচায়ে মাটির সাথে সমতল করে দেয়। ফল এ দাঁড়িয়েছিল যে, উক্ত কবরের কোন চিহ্ন বর্তমান ছিলনা। পরবর্তীকালে বাহাদুর শাহের কিছু সংখ্যক অনুরাগী ভারতীয় মুসলমান রেঙ্গুনে যাইয়া তাঁহার কবরে 'ফতেহাখানির' আয়োজন করেন। কিন্তু তাঁহার কবর নির্ধারণে তাঁহারা ব্যর্থ হন। অতঃপর স্থানীয় কিছু সংখ্যক বৃদ্ধের সাহায্যে তাঁহারা শেষ মুঘল সম্রাটের কবরস্থান নির্ধারণ করিতে সমর্থ হন।" (দ্রঃ সিপাহী বিপ্লবে মুসলমানদের অবদান, পৃষ্ঠা ৫১)

সম্রাট বাহাদুর শাহ সম্পর্কে তথ্য বহুল অনেক নির্ভরযোগ্য ইতিহাস চাপা পড়ে আছে। তিনি এমন অসাম্প্রদায়িক ছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানকে ডান এবং বাম হাতের মত মনে করেই বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন। কিছু চরিত্রহীন লোক নিকৃষ্ট স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ইংরেজ পুরুষ এবং মহিলাদের খুঁজে বের করার অজুহাতে ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করেছিল। বৃদ্ধ সম্রাট এ সংবাদে নিজ হাতিতে চড়ে নাগরিকদের সাথে দেখা করে সে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। অবশ্য বাদশাহ ব্যর্থ হয়েছিলেন। (দ্রঃ Eighteen Fifty Seven : S. N. Sen)

অবস্থাকে আয়ত্তে আনার জন্য তিনি প্রধান সেনাপতির অধীনে একটি দশ সদস্য বিশিষ্ট সামরিক সংস্থা তৈরি করলেন। তাঁরা ভোটাভোটি করে সিদ্ধান্ত নেবেন প্রদানমন্ত্রীর সম্মতি নিয়ে। প্রধান মন্ত্রী অসুবিধা বোধ করলে বাদশার কাছে পাঠাবেন। (দ্রঃ ঐ পুস্তক, পৃঃ ৭৫)

বাদশাহ কিছু বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করে কঠোর হাতে মির্জা মোঘলের পরিবর্তে বখত খাঁকে আজাদী দলের প্রধান সেনাপতি করলেন। বাহাদুর শাহ তাঁর বাড়ির অনেক কিছু বিক্রি করে সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন অগ্রিম দিয়েছিলেন, যদিও পূর্বে বলেছিলেন তিনি কিছুই দিতে সমর্থ নন। অতএব যাঁরা বলেন বাহাদুর শাহকে পুতুলের মত দাঁড় করিয়ে কাজ করা হয়েছিল বা তিনি অপদার্থ ছিলেন, তাঁদের কথা সঠিক নয়। সে সময়কার কুখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রী জামানা দাস অর্থ পিশাচের ভূমিকায় অত্যন্ত চড়া দামে আটা বিক্রি করছিল। তিনি এ রকম ধরণের দেশদ্রোহী ব্যবসায়ীদের দোকান লুট করার অনুমতি দিয়ে ছিলেন ঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৪]

সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্য বাহাদুর শাহ ভিক্ষুকের মত ধনী ব্যবসাদার শ্রী রামজীমলকে বলেন, "আমি আপনার কাছে অর্থ চাচ্ছি ঋণ হিসেবে, কর হিসেবে নয়।" কিন্তু রামজীমল তা অস্বীকার করলেন তখন সম্রাট বেদনা নিয়ে জানালেন, "কি আশ্চর্যের কথা! দেশ বাঁচাতে আপনি ঋণ দিতে অস্বীকার করছেন, অথচ আগ্রার খুব ধনী ঠিকাদার শ্রী জ্যোতিপ্রসাদ ইংরেজকে ত্রিশ হাজার টাকা সাহায্য (অনুদান) করলেন।" দেশের লোক যখন আর্থিক সাহায্যের জন্য টাকা ধার হিসেবে দিল না তখন বাদশাহের আদেশে একটি টাকশাল খোলা হল। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। [দ্রঃ Mutiny Papers in the National Archives of India, Bundle 43, No. 45]

যুদ্ধের গতি নীচের দিকে নামল, এ কারণে যে, বারুদ ও রসদ ফুরিয়ে গেল। বাজারেও বারুদ কিনতে পাওয়া গেলনা। মনে হল সমস্ত বারুদ হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। ঘর তল্লাশি করে প্রচুর বারুদের সন্ধান পাওয়া গেল কিন্তু তখন যুদ্ধের গতি বেশ বেঁকে গেছে। যিনি এ বারুদ লুকিয়ে রেখে সঙ্কট সৃষ্টির প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁর নাম দেবীদাস। এ বারুদ থেকে ইংরেজদের প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করা হয়েছিল বলেও জানা যায়। (তথ্য Mutiny Papers in the National Archives of India, Bundle 51, No. 280-81)

বাহাদুর শাহ বিপ্লব চেয়েছিলেন কিন্তু অসামরিক ব্যক্তি, নারী ও শিশুর হত্যা চাননি। অবশ্য তাঁর এ আদেশ প্রতিপালিত হয়নি। ফলে সেনাপতিও তাঁর অকৃতকার্যতার জন্য পদত্যাগ করেছিলেন। দ্বিতীয় কথা, দেশের জনসাধারণের বিশেষ সম্প্রদায় তাঁর সাথে দেশের জন্য সহযোগিতা থেকে অসহযোগিতা করেছে বেশি। তৃতীয়তঃ ইংরেজদের মত আধুনিক উন্নত অস্ত্রের অভাব লক্ষ্য করে তিনি বুঝতে পারলেন বিপ্লবের সমাধি হতে চলেছে। এ অবস্থায় ইলাহি বখ্‌শ অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করলেন আত্মসমর্পণের জন্য। তাঁর স্ত্রীও সে প্রস্তাবে যোগ দিলেন। বাধ্য হয়ে বৃদ্ধ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাই মেনে নিলেন। (দ্রঃ Eighteen Fifty Seven : S. N. Sen, 115)

Goto List

ইংরেজ সরকার তাদের জয় হওয়ার সাথে সাথে যে নিষ্ঠুর হত্যালীলা চালিয়েছিল ইতিহাসে তার নজির পাওয়া মুশকিল। ভারত বিখ্যাত কবি গালিব সে সময় দিল্লিতে ছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ রক্তের সমুদ্র দেখছি, আল্লাহ্ আর কত দিন দেখাবেন কে জানে। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১১৫)

ইংরেজ সৈন্য রাস্তায় যাকে পেয়েছে, যে কোন জাতির মানুষকে, গুলি করে হত্যা করেছে। এ মানুষদের মধ্যে ছিলেন কত ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষ, কত প্রতিভাধর ব্যক্তি, তাঁদের মত লোক আর জন্মাবে কিনা সন্দেহ। ১৪০০ নামজাদা লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রাজঘাট দরওয়াজায় নিয়ে যাওয়া হয় ও প্রত্যেককে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর পৈশাচিক উল্লাসে যমুনা নদীতে মৃত ও অর্ধ মৃতদেরকে নিক্ষেপ করা হয়। সে সময় সমস্ত কূপগুলো মৃতদেহে ভর্তি ছিল। যাতে ছিল শিশু ও নারীদের শবদেহের প্রাচুর্য। (সুরেন্দ্রনাথ সেনের ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১১৫-১১৬)

পণ্ডিত কেদারনাথ বলেন, ১৮৫৭ সালে বিপ্লবের সময় বিদ্রোহীগণ তাঁর কাছে অর্থ দাবী করেন। অবশ্য তিনি কিছুই দেননি। কিন্তু যখন বৃটিশ সৈন্য নগরী অধিকার করল তখন প্রায় ৭০ হাজার টাকার সম্পত্তি তারা লুট করল। [দ্রঃ Foreign Political Consulation. No. 3825, 31st. Dec. 1858].

ইংরেজরা বিদ্রোহ দমন করার পর সামরিক কর্তৃপক্ষ একটা আদেশ জারী করল যে, বাহাদুর শাহের সমর্থকদের উপর অর্থদণ্ড ধার্য হবে। সেক্ষেত্রে ধরে নেয়া হল যে, হিন্দু সম্প্রদায় বৃটিশের সমর্থক এবং মুসলমানগণ বৃটিশের বিপক্ষ। এ রকম উক্তি অনেকের কাছে হিন্দু বিদ্বেষমূলক উক্তি বলে মনে হবে। কিন্তু ইতিহাসের সত্যকণ্ঠ কি করে টিপে ধরা যায়? এ তথ্য লিখেছেন ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর Eighteen Fifty Seven গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় যা ১৯৫৭ তে ছাপা। আমি তার থেকেই তথ্যটুকু নিয়েছি। মূল ইংরেজি উদ্ধৃতিটুকু তুলে দিচ্ছি।

"The military authorities insisted that a fine should be imposed on all supporters of the late regime; and it was generally held that as the Hindus were as a community well disposed towards the British and the Muslim as a community were hostile, the Hindus should be exempted from any penalty." [Eighteen Fifty Seven : Dr. Surendranath Sen, p. 118, 1957]

নবাব সিরাজউদ্দৌলার চেপে রাখা ইতিহাসের তথ্য

ভারতের প্রাণকেন্দ্র বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ও তাদের দালালদের চক্রান্ত তাঁকে, অপর ভাষায় বাংলার স্বাধীনতাকে ধ্বংস করা হয়। তাঁর বীরত্ব ও মহত্বকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ইতিহাসে বিকৃত করা হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমস্ত রক্তবিন্দু দেয়ে যিনি ভারতের মাটিতে রক্তরাঙা করলেন তাঁর ঐতিহাসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সামান্যতম চেষ্টার পরিবর্তে বরং অসামান্য অপচেষ্টাই করা হয়েছে।

সম্রাটদের রাজ্যে বঙ্গদেশ একটা প্রদেশ বলে গণ্য ছিল। বাংলার প্রথম নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ পরে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলা বিহারের নবাব হন। পরবর্তীকালে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে বসেন। তিনি যথেষ্ট উপযুক্ত

ও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর অধীনস্থ গভর্ণর আলিবদ্দী খাঁ মারাঠা ও বর্গীদের লুণ্ঠান কঠোর ভাবে প্রতিরোধ করার জন্য অনুমুতি প্রার্থনা করেন। তাতে সরফরাজ খাঁ খুব একটা গুরুত্ব দেননি। এতে বীর আলিবর্দ্দীর বীরত্ব প্রকাশে ও বঙ্গরক্ষার বাধা সৃষ্টি হয় দেখে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সরফরাজকে পরাজিত করে নিজে নবাব হন। নবাব হওয়ার পরে তিনি মারাঠি অত্যাচারকে বন্ধ করে জনসাধারণরে শুভাশীষ পেয়ে ধন্য হন।

আলিবর্দ্দী খাঁয়ের কোন পুত্র সন্তান ছিলনা। তাই তাঁর প্রাণপ্রিয় নাতি সিরাজউদ্দৌলাকেই সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। সিরাজের পিতার নাম জয়নুদ্দিন আহমদ। তিনি ছিলেন বিহারের গভর্ণর। তাঁর মায়ের নাম ছিল আমিনা। এ সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকাল ইতিহাসে এক গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়। আধুনিক ইতিহাসের মিথ্যা দুর্নামের আসরে তাঁর ভূমিকা অতীব বেদনাদায়ক।

যাহোক সিরাজের সিংহাসন লাভের পরেই নবাবকে অযোগ্য মনে করে ইংরেজরা দুঃসাহসের সাথে কলকাতার ঘটি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ তৈরি করতে শুরু করে। ইংরেজরা জানত সারা ভারতের মস্তিষ্ক বাংলা তাই কলকাতাতেই ঘাটি তৈরি পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করতে লাগল। সিরাজ সাথে সাথে সংবাদ পাঠালেন যে, দুর্গ তৈরি বন্ধ করা এবং তৈরি অংশ ভেঙ্গে ফেলা নবাবের আদেশ। ইংরেজরা নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করে দুর্গের কাজ অব্যাহত রাখে। কারণ নবাবের সাথে যুদ্ধের জন্য তাঁরা আগে থেকেই তৈরি ছিল। সিরাজ পূর্ণ সাহসিকতার সাথে বিদেশী ইংরেজকে আক্রশণ করেন এবং তাঁদের ভীষণভাবে পরাস্ত করেন।

কলকাতা অধিকারের সংবাদ মাদ্রাজে পৌছালে বৃটিশ সেনাপতি ক্লাইভ সাথে সাথে সৈন্য সামন্ত নিয়ে কলকাতা পুনর্দখল করেন। ইংরেজরা বুঝতে পারল আর যুদ্ধে নামা যাবে না। কারণ ইংরেজদের চক্রান্ত তাঁরই বিশ্বাসভাজন হিন্দু ও মুসলমান বন্ধু-বান্ধব দেশশত্রু ইংরেজকে জয়ী করার জন্য সর্বস্ব পণ করে লেগেছে। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁকে ১৭৫৬ খৃস্টাব্দে অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার ইতিহাস রেখে সন্ধি করতে হয়। এ সন্ধির নাম হয় 'আলিনগরের সন্ধি'। সন্ধির শর্তানুযায়ী কলকাতা ইরেজরা ফিরে পায় এব শুধু মাত্র ফোর্টউইলিয়ম দুর্গের মেরামত বা নির্মাণের অধিকার পায়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে ইরেজরাই বিশ্বাসঘাতকের মত হঠাৎ বঙ্গের চন্দননগর দখল করল এবং সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করল।

এ ব্যাপারে ইংরেজরা যে বড় অস্ত্র হাতে পেয়েছিল তা হচ্ছে, বঙ্গের বিখ্যাত ধনী জগৎশেঠ, কলকাতার বড় ব্যবসায়ী উমিমচাঁদ বা আমীর চাঁদ এবং রাজারাজবল্লভ প্রভৃতি দেশের শত্রু ও শোষকবন্দ সিরাজ ও দেশের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাথে যোগ দেন। জগৎশেঠের বাড়িতে গোপন সভা হয়। সে গোপন আলোচনায় স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে ইংরেজদের দুত মিঃ ওয়াটস্ সাহেবকে পাল্‌কীতে করে আনান হয়। এ সভায় মিঃ ওয়াটস্ সকলকে লোভ লালসায় মুগ্ধ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে এবং তার ফলে বঙ্গ তথা সারা ভারতের মুসলমানদের উত্তেজিত হয়ে ওঠার রাস্তা বন্ধ করতে তাঁরই আত্মীয় মীরজাফরকে সিংহাসনে বসান হবে। মিঃ ওয়াটস্ আরও জানালেন, সিরাজের সাথে লড়তে যে প্রস্তুতি ও বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা বর্তমানে তাঁদের নেই। তখন জগৎশেঠ ঠেজীর কর্তব্য পালন করতে সদন্তে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'টাকা যা দিয়েছি আরও যত দরকার আমি আপনাদের দিয়ে যাব, কোন চিন্তা নেই।" আপনারা প্রস্তুতি নিন।

মীরফাজরকে একটু বোঝাতে বেগ পেতে হল। তিনি প্রথমে বলেছিলেন, 'আমি নবাব আলিবর্দীর আত্মীয়, অতএব সিরাজুদ্দৌলাও আমার আত্মীয়; কি করে তা সম্ভব?" তখন উমিচাঁদ বুঝিয়েছিলেন "আমরা তো আর সিরাজকে মেরে ফেলছি না অথবা আমরা নিজেরাও নবাব হচ্ছি না, শুধু তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে বাসাতে চাইছি। কারণ আপনাকে শুধুমাত্র আমি নই, ইরেজরা এবং মুসলমানদের অনেকেই আর এক কথায় অমুসলমানদের প্রায় প্রত্যেকেই গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে।"

এবারে মীরজাফর আমীরচাঁদের (উর্মিচাঁদ) বিষ পান করলেন। উর্মি চাঁদের জয় হলে তিনিও পুরুস্কৃত হবেন। আর মীরজাফর হবেন বাংলার নবাব। এদিকে জগৎশেঠের শোষণের পথ হবে নিষ্কন্টক আর ইংরেজদের লাভ হিসেবে ভারত এসে যাবে তাদের মুঠোয়। পক্ষান্তরে সিরাজউদ্দৌলার লাভ হলে তা হত বাংলা তথা সমগ্র ভারতের লাভ।

যাহোক, ষড়যন্ত্রের জাল বোনা যখন শেষ, ভারতের স্বাধীনতার সূর্যকে পরাধীনতার গ্লানিতে সমাধিস্থ করার সমস্ত পরিকল্পনা যখন প্রস্তুত সে সময় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ জুন ক্লাইভ মাত্র তিনি হাজার দুইশত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন। একুশে জুন নবাবের অধীস্থ কাটোয়া ক্লাইভের দখলে আসে। ২২ শে জুন গঙ্গা পার হয়ে ক্লাইভ মধ্য রাত্রিতে নদীয়া জেলার সীমান্তে পলাশীর আম বাগানে পৌছান। নবাবের বহু গুণ বেশী সুদক্ষ সেনা আগে থেকেই তৈরি ছিল। ক্লাইভের তবুও ভয় নেই, কারণ তিনি জানেন এ যুদ্ধ নয়, পুতুল খেলা মাত্র। আগে হতেই পরিকল্পনা পাকাপাকি। আমীর চাঁদ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতির সাজান সেনাপতি আজ ভিতরে ভিতরে ক্লাইভের পক্ষে, সুতরাং বিজয় হয়েই আছে।

ক্লাইভের সৈন্য যেখানে মাত্র তিন হাজার দুই শত সেখানে সিরাজের সৈন্য পঞ্চাশ হাজার। কারো কারো মতে আরো বেশি। কিন্তু মীরজাফর, রায়দুর্লভ ও অন্যান্য সেনাপতি পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন যুদ্ধক্ষেত্রে আর ইংরেজদের আক্রমণ ও গুলির আঘাতে নবাবের সৈন্য আত্মহত্যার মত মরতে শুরু করল। এ অবস্থায় সেনাপতির বিনা অনুমতিতেই সিরাজের জন্য তথা দেশ ও দশের জন্য মীরমর্দান বীর বিক্রমে যুদ্ধে ব্যপৃত হলেন আর পরক্ষণেই বিপক্ষের নির্মম গুলিতে বীরের মত শহীদ হলেন। নবাব সিরাজ এ সংবাদে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। এ সময়ে যুদ্ধের গতি নবাবের অনুকূলে যাচ্ছিল। কারণ মীরমর্দানের সাথে মোহনলাল ও সিনফ্রে তখন ইরেজদের কায়দা করে ফেলেছিলেন। এমন শুভ মুহূর্তে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধ বন্ধ করতে আদেশ দেন। রায়দুর্লভের অনুরোধে সিরাজও তা অনুমোদন করলেন। ঈদকে ক্লাভই এ প্রত্যাশিত মুহূর্তটার প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। নবাবের সৈন্যদের ওপর গোলাবর্ষণ চলতে লাগল। অবশেষে নিরুপায় হয়ে নবাবের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নবাবও রাজমহলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে গিয়ে পরিকল্পনানুযায়ী ধরা পড়লেন এবং তাঁকে বন্দী হতে হল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়।

দেশের বিশ্বাসঘাতক সন্তানেরা এটা বোঝেনি যে, এ পরাজয় সিরাজের নয়, শুধু বাংলার নয়–সারা ভারতের। আর এ জয় ইংরেজ ও ইংল্যাণ্ডের।

কিন্তু সিরাজ পরাজিত ও নিহত হলেন কেন? তাঁর অযোগ্যতাই কি পরাজয়ের কারণ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, পলাশীর যুদ্ধ কোন যুদ্ধই ছিলনা। এটা ছিল যুদ্ধযুদ্ধ খেলা মাত্র। আসলে যাঁদের তিনি বিশ্বাস করতেন, সে উমিচাঁদ, সেনাপতি রায়দুর্লভ প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, দেওয়ান রামচাঁদ, মুন্সী নবকৃষ্ণ আর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ধনী জগৎশেঠ এঁরাই ছিলেন সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রকাশ্য শত্রুর দ্বারা যত ক্ষতি হয়, বন্ধু শত্রু হলে আরও

মারাত্মক। পলাশীর যুদ্ধে এ সত্যই দারুণভাবে প্রমাণিত। তাই নিরপেক্ষ বিখ্যাত লেখক শ্রীনিখিলনাথ রায় লিখেছেন, "আষ্টাদশ শতাব্দীর সে ভয়াবহ বিপ্লবে প্লাবিত হইয়া হতভাগ্য সিরাজ সামান্য তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল এবং মীরজাফর ও মীরকাশিম উর্দ্ধক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত কেহ বা অনন্ত নিদ্রায় কেহ কেহ বা ফকিরী অবলম্বনে নিষ্কৃতি লাভ করেন। জগৎশেঠগণের ক্রোধ ঝটিকা সেই তুফানের সৃজনের মূল। দুঃখের বিষয় সেই ভীষণ তুফানে অবশেষে তাহাদিগকেও অনন্তগর্ভে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। যে বৃটিশ রাজ রাজেশ্বরী শান্তিধারায় আসমুদ্র হিমাচল স্নিগ্ধ হইতেছে জগৎশেঠগণের সাহায্যই তাহার প্রতিষ্ঠাতা।"

একজন ইংরেজ লিখিয়াছেন যে, "হিন্দু মহাজনের অর্থ আর ইংরেজ সেনাপতির তরবারি বাংলার মুসলমান রাজত্বের বিপর্যয়। যে বৃটিশ রাজলক্ষ্মীর কিরীট প্রভায় সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত হইতেছে, মহাপ্রাণ জগৎশেঠগণের অর্থবৃষ্টিতে ও প্রাণপাতে তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পদিত হয়।" (ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

শ্রীবিনয় ঘোষও তাঁর 'ভারতজনের ইতিহাসে'র ৫১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "আজকের যে কোন বালকও বুঝিতে পারে যে পলাশীর যুদ্ধ শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মত অভিনয় ছাড়া আর কিছু নহে?।"

ইংরেজ ঐতিহাসিক C. Malleson ও তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "Plassey, then, though a decisire can never be considered a grat battle. "[Decisive Battles of India, p 73]

তাহলে ভারতের মানুষের এতবড় সর্বনাশ সাধন করার উদ্দেশ্য কি? এর উত্তরে অনেকে অনেক কথা বলেন। তবে একদল বিচক্ষণ পণ্ডিতের পণ্ডিতের মতে সাম্প্রদায়িকতাই তার প্রধান কারণ। মুর্শিদাবাদের কথা বলতেই মনে পড়ে যায় মুসলমান মুদর্শিদকুলে তার নাম। কিন্তু তিনি মুসলমান ছিলেন বলেই তাঁর অপরাধ ছিলনা, বরং তাঁর বড় অপরাধ ছিল তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন (এসিয়াটিক সোসাইটির সংরক্ষিত অক্ষয়কুমার মৈত্র সম্পদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' দ্রষ্টব্য)। পৃথিবীর ইতিহাস-সমালোচনা করে জানা যায় ইংরেজরা মুসলমান শক্তির সাথে লড়াইয়ে বার বার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরাজিত হয়েছে। তার ফলস্বরূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সারা বিশ্বে মুসলমান রাষ্ট্রের প্রচুর্য। ক্রুসেডের যুদ্ধগুলোতে মুসলমানদের বীরত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ভারতে ব্যবসাদার ইংরেজ রাজা হয়ে বসতে পারত না, যদি তাদের সাথে ভারতের বিশ্বাসঘাতকদের সহযোগিতা না থাকত।

ভারতের যোধপুরের একটা দরিদ্র পরিবারের হীরানন্দ নামে এক ব্যক্তি বঙ্গদেশেরই এক গ্রামে কিছু গুপ্তধন পেয়ে উন্নতির শিখরে উঠতে থাকেন। স্বভাবতই তাঁর প্রতি অনেকেই নজর দেন বা আকৃষ্ট হন। সে বংশেরই মানিকচাঁদের সাথে মুর্শিদকুলী খাঁব ভালবাসা হয়। মানিকচাঁদও ভাগ্যক্রমে কাজ গুছিয়ে বেশ উঁচু ধাপে উঠতে থাকেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ফররুখশাহের কাছে সুপারিশ করে মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁকে শেঠ উপাধি দান করেন। হিন্দু মুসলমানের ভালবাসার এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত এই 'শেঠ' উপাধি দান। (রিয়াজুল সালাতিন; Stewart; History of Bengal দ্রষ্টব্য)

শেঠ বংশের ফতেহ চাঁদই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধিপ্রাপ্ত হন। রিরায়জুস সালাতিনের ২৭৪ পাতায় পাওয়া যায়, মুহাম্মদ শাহ এ জগৎশেঠ উপাধিপ্রাপ্ত হন। রিয়াজুস সালাতিনের ২৭৪ পাতায় পাওয়া যায়, মুহাম্মদ শাহ এ জগৎশেঠ উপাধি দিয়েছিলেন; তার সাথে মোতির মালা এবং কয়েকটি হাতি। সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে শেঠজীরা তোষণ ও সেবায় এত মুগ্ধ

Goto List

করেন যে মুর্শিদকলি খাঁর উপর একবার বিরক্ত হয়ে তিনি ফতেহ চাঁদকেই নবাব করতে চেয়েছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর টাকা শেঠদের বাড়িতে যা জমা রাখা ছিল তার পরিমাণ সে বাজারের সাত কোটি টাকা; যা শেঠজীরা ফেরত দেননি। (নিখিলনাথ রায়ঃ মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ৫৬ পৃষ্ঠা)

এ অর্থই হয়েছিল যত অনর্থের মূল। সায়া ভারতে বহু স্থানে শেঠদের গদি ছিল। ইংরেজরা প্রথমে শেঠদের হাত করে এবং শেঠরা যত টাকা প্রয়োজন দিতে প্রতিশ্রুত হন। তারপর জগৎশেঠের বাড়িতে গোপন বৈঠক বসে সে সভাতে সাহেবদের সাথে সারা ভারতকে তথা সিরাজকে ধ্বংস করতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন জগৎশেঠ, রাজা মহেন্দ্র রায় (দুর্লভ রায়), রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস মীরজাফর প্রভৃতি।

যবনকে নবাব না করে কোন হিন্দুকে নবাব করার জন্য একজন প্রস্তাব দেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুসলমান মীরজাফরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লজ্জিত ও থতমত হয়ে বলেন, 'মীরজাফরকেই নবাব করে আমরা সিরাজকে সরাতে চাই।' উদ্দেশ্য, তাতে মুসলমানগণ ক্ষেপে উঠবে না; মুসলমান নবাবের পরিবর্তে মুসলমান নবাব মাত্র। দীর্ঘ কথোপকথনের পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথাই যুক্তিসঙ্গত মনে করে তাঁর এ মত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। (এরও পূর্ণ তথ্য ঃ মুর্শিদাবাদ কাহিনী ও পুরানা কলকাতার কথাচিত্রের ৩৫৭-৩৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

তাই বলা যায়, ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য শুধু তাদের গোলাগুলি আর মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতেই প্রতিষ্ঠি হয়নি বরং শেঠজীরেদ বিশ্বাসঘাতকতাই এর পশ্চাতে বিশেষ সহায়ক ছিল। শেঠজীদের ইংরেজদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা ও গোলামি মীরজাফরের তুলনায় কোন অংশে কম ছিলনা বরং শেঠজীদের বিপুল অর্থ-সাহায্যেই ইংরেজদের এমন দুসাহসিক অভিযানের গোড়াপত্তন সম্ভব হয়েছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও এ বিরাট সত্যকে একেবারে হজম করতে পারেননি, তাই বলেছিলেন–"The rupees of the Hindu banker, equally with the sword of the English Colonel contributed to the over through of the Mahamedan power in Bengal." বোঝা, যাচ্ছে, বালায় মুসলমান শক্তিকে ধ্বংস করতে, ভারতকে পরাধীন করতে বৃটিশ সেনাপতির তরবারির সাথে হিন্দু ধনপতিদের অর্থভাণ্ডারও সমান ভাবে সহয়োগিতা করেছিল।

শেঠজীরা শুধু ইংরেজদের হাতেই অর্থ ঢালেননি, সিরাজের সৈন্যদের পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সরবরাহ করে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছেন। আরও দুঃখের কথা, সিরাজকে হত্যা করার প্রস্তাব ইংরেজ সর্দারকে এ জগৎশেঠই দিয়েছিলেন।

'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র লেখক নিখিলনাথ বাবু তাই খুব দরদ দিয়ে লিখেছেন-"হতভাগ্য সিরাজ রাজ্যহারা সর্বস্বহারা হইয়া অবশেষে প্রাণ ভিক্ষার জন্য প্রত্যকের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা প্রাণ দানের পরিবর্তে যদি প্রণানাশের কেহ সম্মতি দিয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ঘৃণিত ও নিষ্ঠর প্রকৃতির লোক এবং তাহারা যে সর্বদা নিন্দনীয় এ কথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যাইতে পারে।"

জগৎশেঠের মৃত্যু হয়েছিল উঁচু পর্বত হতে নীচে নিক্ষিপ্ত হয়ে–পৃথিবীর প্রখ্যাত ধনী বংশ দরিদ্রতর হতে সৃষ্ট হয়ে দরিদ্রতম গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ইতিহাসকে সাহিত্য, নাটক গ্রামোফোন রেকর্ড ও থিয়েটার চলচিত্র প্রভৃতিতে যে ভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছে তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। নবাব নাকি চরিত্রহীন ও মদপায়ী ছিলেন তিনি নিষ্ঠর ছিলেন–এ অপবাদ নাকি

প্রমাণিত হয় তাঁর অন্ধকূপ হত্যার দ্বারা। কিছু কম দু''শো ইংরেজকে ছোট একটি অন্ধকার কক্ষে খাদ্য, পানীয় ও বাতাসের অভাব ঘটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল বলে নিরীহ সিরাজের নামে কলঙ্ক দেয়া হয়েছে। অবশ্য সিরাজউদ্দৌলা তাঁর কিশের বয়সে মদ পানের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী প্রাণপ্রিয় সিরাজকে ডেকে মদ আর কোনও দিন স্পর্শ না করার জন্য কোরআন ছুঁয়ে শপথ করতে বললে সিরাজ বলেছিলেন, 'নানাজী আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সিরাজ জীবনে কোন দিন আর মদ স্পর্শ করবে না। যদি করে তাহলে সে আপনার নাতি নামের কলঙ্ক।" বলাবাহুল্য, সিরাজ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন সারা জীবন।

এছাড়াও নারী লোলুপতার মিথ্যা অপবাদ ও তাঁর উপর যেভাবে যে পরিমাণে আরোপ করা হয় তাও ইংরেজ ও তাদের দালালদের কৌশল মাত্র।

শ্রীসুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "সিরাজ অতিরিক্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি প্রায়ই নদীতে বন্যার সময় নৌকা আরোহীদিগকে উল্টাইয়া দিয়া বা ডুবাইয়া দিয়া এক সাথে এক দুই শত যুবক, যুবতী, স্ত্রী, বৃদ্ধ, শিশু সাঁতার না জানিয়া জলে নিমজ্জিত হওয়ায় নিষ্ঠুর দৃশ্যটি উপভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।"

এ প্রমাণহীন মিথ্যা কাহিনী পড়ে হয়ত অনেকে বলতে পারেন সুধীর বাবু তেমন উল্লেখ্য লোকের মধ্যে গণ্য নন, সুতরাং তাঁর উক্তিতে গুরুত্ব না দেয়াই ভাল। কিন্তু বিখ্যাত কবি, উচ্চ ইরেজি শিক্ষিত বাঙালী বাবু নবীনচন্দ্র সেন যদি এ রকম বা তার চেয়েও মারাত্মক কিছু লিখে থাকেন তবে সুধীর বাবুরই বা লেখা দোষের হবে কেন? নবীনচন্দ্র সেন শুধু নৌকায় নবাবের নরহত্যার কথা সমর্থনেই ক্ষান্ত হননি, বরং 'গর্ভিনীর বক্ষ বিদারণ' অর্থাৎ সিরাজ নাকি জীবন্ত গর্ভবতী নারীর পেট কেটে সন্তান দেখতেন-এরকম কিংবদন্তীর উল্লেখ করে তাতে নতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন। এমনি আরও কত আজগুবি আর অবান্তর উদ্ভট ঘটনার অবতারণা করে সিরাজের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করার নীচতম প্রচেষ্টা চালান হয়েছে। সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাসটিও এরই প্রতিচ্ছবি। যার সত্যতার অমর সাক্ষী নাকি কলকাতার ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কুখ্যাত মনুমেন্ট।

অন্ধকূপ হত্যাঃ ইতিহাসের অলীক অধ্যায়

যে ইংরেজ জাতি বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছে সে ইংরেজকে হিমশিম্ খাইয়েছিলেন তরুণ যুবক নবাব সিরাজ। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন নবাবের সৈন্য কলকাতার দুর্গে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় যা প্রতিরোধ করা ইংরেজদের সাধ্যের বাইরে ছিল। ইংরেজ সৈন্যদের বন্দী করে সিরাজের সম্মুখে আনা হল। সেনাপতি হলওয়েরও বাদ যাননি। সৈন্যরা ভয়ে কম্পিত কণ্ঠে প্রাণ ভিক্ষা চাইল। নবাব মিঃ হলওয়েলকে হাত বাঁধা অবস্থায় লাথি খাওয়া পশুর মত অবস্থায় দেখেলেন। সিরাজ ইচ্ছা করলে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যেককে হত্যার আদেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি কারোর প্রতি দুর্ব্যবহার করার আদেশ দেননি। (এ তথ্যের প্রমাণ মেজর বি.ডি. বসুর Rise of the Christian Power in India গ্রন্থে ৫৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে)

কিছু আলেমকে কলকাতা বিজয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশক উপাসনা ও বন্দীদের উপর নজর রাখবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। বন্দীরা সকলেই ছিল মদপায়ী। তাদের মদ পানের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিলনা বলে তারা খুব বেশি পরিমাণে পান করে উম্মত্ত হয়ে অসামরিক প্রহরী ও আলেমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, অত্যাচার করে। সিরাজ এ সংবাদ শুনে তাদের আটক করতে বললেন সে বন্দীখানায়, যেখানে তারা ভারতীয়দের বন্দী করে রাখত-এরই কল্পিত নাম অন্ধকূপ। (প্রমাণ: মেজর বি. ডি. বসুর ঐ গ্রন্ত, ৫৭ পৃষ্ঠা)

সিরাজজের ইতিহাসে অন্ধকুপ হত্যা কাহিনী এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়; শাসকদের চরিত্রে কলঙ্কের মসিলেপনের এক অদ্ভুত ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা। তাই এ অন্ধকূপ হত্যা বা Black Hole সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

সুধীরবাবু তাঁর রচনায় বাংলা তথা ভারতের কল্যাণের জন্য মস্তিকের উর্বর পরিচয় দিতে চেষ্টা করে গেছেন। অন্ধকূপ হত্যার স্রষ্টা অবশ্য সুধীর বাবু নন, ইংরেজ অনুচর মিঃ হলওয়েল।

এ মিঃ হলওয়েলকে একটু যাচাই করা যাক। এ হল্লওয়েলই মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করায় বড়যন্ত্র করে মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন এবং ৩০৯৩০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন (এর প্রমাণের জন্য ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের Report of the Committee of the House of Commons দ্রষ্টব্য)। এ হলওয়েলই বিলেতের কর্তৃপক্ষকে পত্র লিখেছিলেন যে, নবাব মীরজাফর আলি খাঁর জঘণ্য চরিত্রের কথা কি আর জানাব। তিনি নিওয়াজেস মহিষী ঘসেটি বেগম, সিরাজের মা আমিনা বেগম ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ঢাকার রাজ কারাগারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছেন।

এ পত্রের বক্তব্য যে কত ভিত্তিহীন ও অসত্য তা পরে প্রমাণিত। কারণ, হলওয়েল যখন ঢাকার রাজমহিলাদের মৃত্যু কাহিনী রচনা করেন তার পরেও তাঁরা জীবিত ছিলেন। [Long's Selection from the Record of India vol.. 1]

মিঃ হলওয়েলের লেখায় প্রমাণ হয় যে, সিরাজের কলকাতা আক্রমণের পূর্বে কলকাতা দুর্গে ষাটজন মাত্র ইউরোপীয়ান ছিল। এ ষাট জনের মধ্যে গভর্ণর ডেক্র, সেনাপতি মিনচিন, চার্লস ডগলাস, হেনরী ওয়েডারব্যারণ, লেঃ মেপলটফট, রেভারেণ্ড ক্যাস্টন, মিস্টার ম্যাকেট, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড, মানিংহাম ও ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট প্রভৃতি দশ জন বীরপুরুষ পালিয়ে গিয়েছিলেন।

তাহলে হলওয়েলের বর্ণনানুযায়ীই প্রমাণ হয়, সিরাজের হাতে মাত্র পঞ্চাশ জনের প্রাণহানি হয়। কিন্তু এ হলওয়েলই আবার কি করে শতাধিক লোকের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। (এ তথ্যগুলোর প্রমাণের জন্য Halwell's Letter to the Hon'ble Court of Directors, P.36, dated 30th Nov. 1758 দ্রষ্টব্য।)

মিঃ ড্রেকের দুর্গ পরিত্যাগের পর ১৭০ জন দুর্গে জীবিত ছিল বলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী মিঃ গ্রে বলেছেন, ১৯শে জুন রাত্রে একজন ইংরেজ সৈন্য ৫৭ জন ডাচ সৈন্য সহ শত্রুপক্ষে যোগদান করে (প্রমাণ স্বরূপ Gray's Letter, Hill, Vol. I p. 108 দ্রষ্টব্য)। আবার মিঃ ওয়াটস্ বলেছেন, মিঃ ড্রেকের দুর্গ ত্যাগের পর এবং দুর্গের পতনের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীরের উপরেই নিহত হয় ৫০ জন সৈন্য। Hill: Vol. 1, p. 88-তে এ তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এদিকে হলওয়েল বলেছেন, গোলন্দাজ বাহিনীর ৩১ জন সৈন্য ২০ শে জুন দুপুরের পূর্বেই নিহত হয় (য. ১১৪)। মিঃ মিল্‌স বলেন, দুর্গের পতনের সময় ১৮ জন সৈন্য পলায়ন করেন [p.44] অতএব দেখা যাচ্ছে, একজনের বর্ণনার সাথে অন্য জনের বর্ণনার মিল নেই। অলীক ঘটনার অসত্যতা এ ভাবেই প্রমাণিত হয়। আর ঐতিহাসিকদের গবেষণায়ও হিসেবে শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে এ দুর্গে ৮ থেকে ১০ জন মাত্র ইংরেজ বর্তমান ছিল।

এ হলওয়েলের স্বরূপ দেখে তাই নিরপেক্ষ দৃষ্টি সম্পন্ন লেখক শ্রী অক্ষয় কুমারে মৈত্র বলেন, "মুসলমানদের কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহারা না হয় স্বজাতির কলঙ্ক বিলুপ্ত করিবার জন্য স্বরিচত ইতিহাস হইতে এই শোচনীয় কাহিনী সযত্নে দূরে রাখিতে পারেন। কিন্তু

যাঁহারা নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্মপীড়িত হইয়া অন্ধকূপ কারাগারে জীবন বিসর্জন করিলেন, তাহাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয় সমসাময়িক ইংরেজদিগের কাগজ পত্রে অন্ধকূপ হত্যার নাম পর্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?" ('সিরাজুদ্দৌলা' দ্রষ্টব্য)

শ্রীমতী হেমলতা দেবী লিখিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "ইতিহাস" পুস্তকের দ্বিতীয় মুদ্রণের গ্রন্থ সমালোচনা অধ্যায়ে (১৫৭ পৃষ্ঠা) লিখেছেন, "সিরাজুদ্দৌলার রাজ্য শাসনকালে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি তিনি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষরকুমার মৈত্রের 'সিরাজুদ্দৌলা পাঠ করিতেন তবে এই ঘটনাকে ইতিহাসে স্থান দিতে নিশ্চয় কুণ্ঠিত হইতেন।

ডক্টর ভোলানাথ চন্দ্র Travels of a Hindoo নামক বিখ্যাত ইংরাজি গ্রন্থের লেখক। তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে Calcutta University Magazine-এ প্রমাণ করেছেন, অন্ধকুপ হত্যার কাহিনী একেবারেই মিথ্যা। তিনি লিখেছেন এ ছোট ঘরে বেদানার দানার মত করেও যদি লোক রাখা যায় তবুও কোনমতেই ১৪৬ জনের স্থান হতে পারেনা। তাঁর ভাষায়-"I have a very doubtful faith in its account......Geometry contradicting arithmetic give the lie to the story.""

ডক্টর C. R. Wilson তাঁর Old Fort William in Bengal গ্রন্থে |Vol. II) ৫৯ পৃষ্ঠায় জ্যামিতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন, দেড় ফুটের কিছু বেশি জায়গা প্রত্যেকের ভাগে পড়েছিল; সুতরাং এসব মনড়া কাহিনী। তাছাড়া এ্যানি বেসান্তও বলেছেন-"Geometry disproving arithmetic gave lie to the story."

জনৈক বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সর্বজনবিদিত সমসাময়িক 'মুতাআক্ষিরীন' গ্রন্থের অনুবাদ করতে গিয়ে টীকান্তরে লিখেছেন, অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, কলকাতার অধিবাসীরাই অন্ধকূপ হত্যার সংবাদ জানত না। যাদের বুকের উপর এ রকম ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হয়েছিল তারা এর কিছুই জানল না, এটা কি আদৌ সম্ভব?

পলাতক ইংরেজ বীর পুরুষগণের পলায়নের বিবরণে বা সিরাজের প্রতি পিগটের পত্রে অথবা সিরাজকে লিখিত ওয়াটস্ এর ক্লাইভের বীরত্বপূর্ণ পত্রে অন্ধকূপের কোন উল্লেখ নেই। এছাড়া সিরাজকে লিখিত ইংরেজদের অন্যান্য চরম পত্রেও অন্ধকূপের উল্লেখ নেই। এমনকি 'আলিনগরের সন্ধি' কাগজেও তার উল্লেখ নেই।

ক্লাইভ কোর্ট অফ ডিরেক্টরকে যে পত্র লিখেছেন তাতে সিরাজকে কেন সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে তার বিবরণ আছে, কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার কোন কথাই সেখানে নেই। অথচ সুধীর কমার আর নবীন কুমারের নবীন কলমে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তাই এ ধরণের লেখনী বহু দৃঢ়চেতা সৎ মানুষ, যেমন অক্ষয় কুমার মৈত্র, বিহারীলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নিখিলনাথ রায়, কবি রবীন্দ্রনাথ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরনেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি অনেকের মনে বেদনা দিয়েছিল।

অক্ষয়কুমার মহাশয়ের আন্দোলন এবং কলমের অগ্নিবর্ষণকে নেতাজী দারুণভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ফলে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৪ মে মার্চ কলকাতার ক্রিষ্ট্রীক্যাঅল সোসাইটির মাধ্যমে এসিয়াটিক সোসাইটির ঘরে এক বিরাট সভায় উপস্থিত অক্ষয় কুমার মৈত্র, মিঃ জে. এইচ. লিটস এবং মিঃ এফ. জে. মানাহন প্রমুখের এ অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস-উপন্যাস উপকথার মত নিক্ষিপ্ত হয়, অর্থাৎ কাহিনীটি মিথ্যা বলে স্বীকৃতি পায়। তার কিছুদিন পরে জে. এইচ. লিটল Calcutta Historical Society-র পত্রিকায় তা

প্রকাশ করে দেন এবং অন্ধকূপের জন্য বলা হয় " gigantic hoax" অর্থাৎ প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজি। উপরোক্ত অথ্যাদি 'Bengali Past and Present Vol. XI. Serial No. 1 p. ৭৫ হতে গৃহীত।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে সুভাষ বসু এ অন্ধকূপ হত্যার চিহ্ন মনুমেন্টটি ভেঙে ফেলার দাবী করেন। এ নিয়ে বিরাট আন্দোলন হয়। শত্রু ইংরেজ ও মুসলমান বিদ্বেষী অনেকেই সেদিন অবাক অথবা অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, তবে ধৈর্যের প্রয়োজন। ইংরেজ রাজত্বের রাজধানী কলকাতার এ মনুমেন্ট অবশেষে ইংরেজকে ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হতে হয়।

শ্রীগিরিশ ঘোষের 'সিরাজউদ্দৌলা' নামক সঠিক ও সুন্দর বইটি এ সময় সাহসের সাথে লিখিত হয়। তার উপর অক্ষয়বাবুর 'সিরাজউদ্দৌল্লা ও মীরকাশিম' অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে। পরে সত্যচরণ শাস্ত্রী একখানি বই লিখলেন তার নাম 'জালিয়াত ক্লাইভ'। সখারাম গণেশ দেউস্কর 'দেশের কথা' নাম দিয়ে এ সম্বন্ধেই আর একখানা বই লিখলেন। এটাও বেশ মূল্যবান্ বই। এর দু-একটা বাক্য এখানে তুলে ধরা হল—"ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা হিন্দু-ছাত্রদের হৃদয়ে মুসলমান বিদ্বেষ প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় কোন কোন অদূরদর্শী হিন্দু লেখক কাব্য নাটকাদিতে অনর্থক মুসলমান ভ্রাতাদিগের নিন্দাবাদ করিয়া ইংরাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন।"

এদিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ একটি নাটকও লিখলেন যা সহজলভ্য বিষাক্ত ও চলতি নাটকের একেবারে উল্টা। সাধারণ মানুষের মগজ একটু নড়ে উঠল—তাহলে ইতিহাসে' যা শুনি তা তো সঠিক নয়। কবি নবীনচন্দ্র সেন এ বইটি পড়ে একটি চিঠি লিখলেন গিরিশচন্দ্রের নামে। তাও এখানে তুলে ধরা হল—

"ভাই গিরিশ,

বিশ বৎসর বয়সে আমি 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিয়াছিলাম, আর তুমি ষাট বৎসর বয়সে 'সিরাজুদ্দৌলা' লিখিয়াছ। আমি বিদেশী ইতিহাসে যেভাবে পাইয়াছি সেইভাবে চিত্রিত করিয়াছি। কিন্তু তুমি সিরাজের নিখুঁত চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছ। অতএব তুমি আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান।"

অত্যন্ত দুঃখের কথা, সিরাজের ইতিহাসে পাওয়া যায় মূলতঃ মুসলমান মীরজাফরের কথা। তাতে প্রমাণ হয় মুসলমান জাতি মানেই বিশ্বাসঘাতক জাতি। ফলস্বরূপ আজ মুর্শিদাবাদ জেলা, এমনকি মুসলমান জাতি বাংলার মাটিতে যেন কলঙ্কিত। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস এ কথাই বলে যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যে আকাশ ছোঁয়া অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল তা মুসলমানদের হাতেই। 'সিপাহী বিদ্রোহ' তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আর এ সিপাহী বিদ্রোহের গোড়পত্তনের দাবীতে যে স্থান গৌরবের অধিকারী তা হল মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুর।

সিরাজ জানতেন মীরজাফরের হাবভাব। তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন হবে, সিরাজ যদি জানতেন মীরজাফরের দ্বারা স্বাধীন ভাগ্যকাশে দুর্যোগ উদয় হবে, তবে কেন তাঁকে পূর্বাহ্নেই সরিয়ে দেননি? স্বাধীন ভারতের প্রতি সিরাজের এটা কি নিষ্ঠুরতা নয়? উত্তরে বলব, না। কারণ মীরজাফর একদা সিরাজের সম্মুখে পবিত্র কুরআন ছুঁয়ে শপথ করে বলেছিলেন, তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিংহাসন রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন। তাই পবিত্র কুরআনের সম্মানার্থে বিশ্বাসঘাতকার পূর্বেই তাঁকে শাস্তি দিতে পারেন নি।

Goto List

বীর সিরাজ মিঃ ওয়াটস সাহেবকে সপরিবারে বন্দী করে কাশিমবাজার হতে মুর্শিদাবাদ নিয়ে এসেছিলেন। সিরাজ-জননী আমিনার কোমলতায় সিরাজের করুণাবতী স্ত্রী লুৎফুন্নেসা তাঁদের মুক্তি দিয়েছিলেন। যখন সিরাজ এ ঘটনা শুনলেন তখন গর্ভধারিণী মা বা সহধর্মিণী স্ত্রী কাউকে তিরস্কার অথবা কারো কাছ থেকে কৈফিয়ত চাওয়ার কোন ভূমিকাই নিতে পারেন নি। এটাও সিরাজের সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা ও উদারতা না নিষ্ঠুরতা তারও বিবেচনার ভার চলমান সমাজের উপরেই রইল।

রাজা রাজবল্লভ আলিবর্দীর আমলে প্রজাদের সর্বনাশ সাধন করে যে বিরাট অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণদের মারফত সে প্রচুর অর্থ যখন ইংরেজরদের ঘটিতে পাচার হয়েছিল তখন সিরাজ রাজবল্লভ ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণদেবের উপর স্বাভাবিকভাবেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং ঠিক তারপরেই তিনি কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের অপরাধে কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। বলাবাহুল্য, এ কৃষ্ণদেবের পাচার করা প্রচুর অর্থই কলকাতায় দুর্গ নির্মাণে ইংরেজদের হাত শক্ত করেছিল। তাই কৃষ্ণদেবের কাণ্ডকে কেন্দ্র করেই সিরাজের কলকাতা অভিযান। যুদ্ধ শেষে হলওয়েল. উমিচাঁদ ও কৃষ্ণদেবকে বন্দী করে তাঁর সামনে আনা হল। সিরাজ যখন তাঁদের হাতের মুঠোয় পেলেন তখন তাঁরা জেনে নিয়েছিলেন, প্রাণদণ্ডই হয়ত তাঁদের যোগ্য শাস্তি। কিন্তু তিন জনেই যখন ক্ষমা প্রার্থনা করলেন সিরাজ প্রত্যেককে ক্ষমা করে মুক্তি দিলেন।

আরও একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, কলকাতা বিজয়ের পর মানিকচাঁদকে কলকাতার দায়িত্ব দিয়ে, তাঁকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে নবাব আদেশ দিলেন, বাজার-হাট যেন বন্ধ না থাকে। কারণ বাজার ও দোকানপাট বন্ধ থাকলে, ইংরেজরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যেভাবে কোণঠাসা হয়েছিল, খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে তারা মারা যেতে পারে [C.R. Wilson: Old Fort William of Bengal, Vol. 1 p. 301]। এ রকম আরও অনেক মহানুভবতার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে নবাবকে নিষ্ঠুর বলে চিহ্নিত করা যাবে, কি না তা বিচারের জন্য বাকী রইল।

সিরাজের হত্যাকাহিনী

পলাশী যুদ্ধের পর রাজমহলে ধৃত হবার ফলে সিরাজ যখন বন্দী ছিলেন তখন তাঁর কক্ষে মহম্মদী বেগ উলঙ্গ তরবারি হাতে প্রবেশ করতেই সিরাজ অনুমান করেছিলেন তাঁর মৃত্যু সংবাদ আগত। তখন সিরাজ কাতর কণ্ঠে বলেন–"মহম্মদী বেগ, তুমি আমায় কতল করতে এসেছ?' মহম্মদী বেগ নিশ্চুপ। নবাবের মুখের দিকে তাকাতেও যেন সে অপারাগ। আবার রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠে নবাব বলেন-'আমাকে কি তোমরা সামান্য একটা অসহায় গরীবের মত বেঁচে থাকতেও দেবে না?' এবার মহম্মদী বেগ গলাটা সামান্য পরিষ্কার করে বলল–'না, তারা তা দেবে না।' নবাব যেহেতু বছর দেড়েক আগে ভুলক্রমে হুসেনকুলি খাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন, তাই বলেন, 'আমিও বাঁচতে চাইনা, হুসেন কুলির মৃত্যুর প্রতিশোধ হোক।' বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা তথা সারা ভারতের দেদীপ্যমান আলোকবর্তিকা নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁর কোটি কোটি দেশবাসীর চোখের আড়াতে অশ্রু মুছে কাঁদোকাদোঁ কণ্ঠে আবার বলেন-'আমাকে একটি বার সুযোগ দাও আল্লাহ্‌র সন্নিধ্যানে যাবার পূর্বে শেষ দুই রাকাত নামায পড়ে নিই।' মহম্মদী বেগের চক্ষুদ্বয় তখন বর্ষণোম্মুখ। উত্তর দিতে পারেনা। নবাব বুঝলেন, মৌনতা সম্মতির সমার্থক। তাই জীবনের অন্তিম প্রার্থনাময় নামাযে আত্মনিয়োগ করলেন। নামায তখনও শেষ হয়নি, দূরে বাঁশির সংকেত শুনে মহম্মদী বেগ প্রর্থনারত অবস্থাতেই তরবারি চালনা করল নবাবের পিঠের উপর। লুটিয়ে পড়লেন নবাব।

অতপর আরও কয়েকটি আঘাত করল মহম্মদী বেগ। সিরাজ শুধু একবার বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ তুমি আমায় ক্ষমা কর'। তারপর রক্তাক্ত সিরাজ শুধু 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' শব্দ করতে করতে চিরবিদায় নিলেন। [অক্ষয় কুমার মৈত্রের সিরাজুদ্দৌলা ও পুরানা কলকাতার কথাচিত্র, পৃষ্ঠা ৩৯৩]

এ ঘটনায় অনেকে মুসলমান ভৃত্য কত বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর হতে পারে তারই শিক্ষা পাবেন। কিন্তু সূক্ষ্ম ও সুস্থ জ্ঞানীর নিকট ধরা পড়বে আসল রহস্য।

ইংরেজরা যখন সিরাজকে বন্দী করেছিল তখন সিরাজের সমস্ত চাকর-চাকরানী আর সিরাজের ছিল না, বরং তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ক্লাইভ আর ওয়াট্সের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় ইতিহাসে মুসলিম চরিত্রকে কলঙ্কিত করার পরিকল্পিত বুদ্ধিতেই মীরনকে দিয়ে সিরাজের সাহায্যপুষ্ট মহম্মদী বেগকে আদেশ করা হয়েছিল। সিরাজকে হত্যা করতে। মহম্মদী বেগ তাতে রাজী না হলে তার ও তার স্ত্রী-পুত্রের প্রাণদণ্ড হবে বলে ভয় দেখান হয়েছিল। তখন অনন্যোপায় নিরক্ষর বোকা মহম্মদী বেগ অশ্রু সম্বরণ করে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নবাবকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। যদি মহম্মদী বেগ শিক্ষিত ও প্রকৃত জ্ঞানী হত তাহলে ইংরেজদের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে নিজের প্রাণদণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে মীরমদন আর মোহনলালের মত 'ধন্য হতে পারত। সিরাজ যখন অসহায়ের মত একটু বেঁচে থাকার আবেদন করেছিলেন তখন মহম্মদী বেগ এ কথা বলেনি, যে, 'না আমরা তা দেবনা।' বরং তার ভাষাতে একদিকে ভালবাসা ও অপরদিকে অসহায়তার কথাই ফুটে উঠেছিল বলেছিল, 'না, তারা তা দেবেনা।' এসব লোক কারা? তারা কি ইংরেজ তাদের দালালরা নয়?

সিরাজকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ একটা বস্তায় ভরে হাতির পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিরাজের স্ত্রী, মা এবংঅনেক আত্মীয়া তখন বন্দিনী। ইংরেজ কর্মচারীরা প্রভুর আদেশ অনুযায়ী সিরাজের খণ্ডিত দেহের বস্তা সেখানে পৌছে দিয়েছিল। নবাব পরিবারের উৎসুক মহিলাদের পক্ষ হতে একজন বস্তার মুখ খুলতেই দেখতে পেলেন তাতে আমও নেই বা অন্য কোন খাদ্য বস্তুও নেই, আছে সিরাজের দেহের ছোট্ট ছোট্ট টুকরাগুলো আর তার সাথে খোলা চোখে তাকিয়ে থাকা সিরাজের কাঁচা কাটা মাথা। সিরাজ যেন তাঁর গর্ভধারিণীমাকে শেষ দেখা করতে এসেছেন। সিরাজের হতভাগী মা প্রিয় পুত্রের মুখের দিকে এক পলক তাকাতেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে এলে মীরজাফরের অনুচর গোলাম হেসেনের আদেশে তাঁকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়।

পরে জয়নুল আবেদীন নামক এক দরিদ্র নাগরিকের অনুরোধে সিরাজের খণ্ডিত দেহকে ভাগীরথী নদীর পারে খোসবাগ নামক বাগানে তাঁর নানাজান আলিবর্দীর কবরের পূর্ব পাশে সামাধিস্থ করা হয়। (দ্রঃ পুরনো কলকাতার কথাচিত্র পৃষ্ঠা ৩৯৫)

Goto List

নবাব মীর কাশিম

মীরজাফর ইংরেজদের সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্তে বাংলার সিংহাসনে বসেন ইংরেজদের হাতে উপঢৌকনের নামান্তরে মোটা অঙ্কের অর্থপ্রদানের ফলে তাঁর ধনাগার প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। অবশেষে অর্থ দিতে অপরাগ হলে তাঁকেও সিংহাসনচ্যুত করে তাঁরই জামাতা মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসান হয়। ইংরেজ যখন মীরজাফেরের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিল তখন তাঁর সাথে হাত মিলিয়েছিল। সিংহাসনে বসার পর সে হাত যখন শূন্য হল তখন তাঁকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে পর্বান্তর ঘটাল।

মীরকাশিম বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, ইংরেজরা গোটা ভারতবর্ষ দখল করতে চায়। তিনি এও বুঝেছিলেন যে, ইংরেজরা তাদের শক্তির দ্বারা এখুনি তাঁকে পরাজিত করে রাজা হয়ে বসতে সক্ষম। কিন্তু তারা এখনই তা করবে না। কেননা বাংলার জনতা, বিশেষ করে মুসলমানেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে আর সে বহ্নি সারা ভারতের বুকে ছড়িয়ে যেতে পারে; তখন তা সামলান হবে মুশকিল। অবশ্য এ নবাবী প্রহসন মাত্র। তাই মীরকাশিম 'করি অথবা মরি' নীতি অবলম্বন করে ইংরেজদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

ইংরেজরা চাষীদের উৎপাদিত শস্য, দরিদ্র দেশবাসীর দোকানের মাল যথেচ্ছ ভাবে নিয়ে দাম দিতনা। খুব অনুগ্রহ হলে সামান্য কিছু দিত মাত্র। এছাড়া ইংরেজরা বহুদিন ধরে যে বাণিজ্য কর দিয়ে আসছিল তাও হঠাৎ বন্ধ করে দেয়। এ সমস্ত কারবার দেখে ন্যায়দণ্ডের বিচারে মীরকাশিম তাঁর হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের জানিয়ে দিলেন যে তাদেরও আজ থেকে কোন কর দিতে হবেনা। কারণ আমার দেশবাসী কর দেবে আর শোষক ইংরেজ কর ফাঁকি দিয়ে ভারতে শিকড় গাড়বে, তা হয়না।

এ ঘোষণায় ক্রোধান্ধ হয়ে ইরেজরা মীরকাশিমকে সিংহাসনচ্যুত করতে মনস্থ করলে তিনি বীর বিক্রমে সসৈন্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরস্পর যুদ্ধ চলতে থাকল। ইংরেজরা কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালা, মঙ্গের প্রভৃতি স্থানে মীরকাশিমকে পরাস্ত করে। উদয়নালার যুদ্ধই এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এ যুদ্ধে মীরকাশিমের প্রচণ্ড প্রস্তুতি আর বিরাট সৈন্যবল ভারতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করত সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানেও মীরকাশিমের বিশ্বস্ত (?) সেনাপতি মিঃ মঁসিয়ে জেনটিলের বিশ্বাসঘাতকতা এবং গুরগীন খাঁ-এর বেইমানি ইংরেজদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করতে সক্ষম হয়। বেঈমান জেনটিল সাহেবকে সে বাজারে প্রথমেই ৫০ হাজার টাকা দিয়ে বশ করা হয়েছিল। তাঁকে ভার দেয়া হয়েছিল নবাব মীরকাশিমের বিশ্বস্ত লোকদের খৃষ্টানদের পক্ষে করে নেয়ার। জেনটিল তা পেরেও ছিলেন। (দ্রঃ Long's Selections, p. 32-333)

অসাম্প্রদায়িকতার বলিষ্ট মনোভাবে নবাব মীরকাশিম যোগ্যতা দেখতেন–জাতি, বংশ ও গোত্র নয়। আর তাই ইউরোপীয় ও আরমেনীয় খৃষ্টান সৈন্য উচ্চ পদেনিয়োগ করেই তিনি ঐতিহাসিক ভুল করেছিলেন। (দ্রঃ Broome এর লেখা Bengal Army, Vol. 1. p. 388; Rise of the Christian Power in India p. 158)

বেইমান গুরগীন খাঁনের নাম শুনে অনেকে ভুলক্রমে তাঁকে মুসলমান মনে করতে পারেন। কিন্তু খাঁন উপাধি মুসলমানদের দেয়া, গুরগীন নামও তাঁর ডাক নাম। তাঁর আসল নাম ছিল মিঃ গ্রোগরী।

এরপর মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহে নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তাঁরা সাথে সাথে যথাসাধ্য সৈন্য নিয়ে মীরকাশিমের পাশে এসে দাঁড়ালেন বক্সার নামক যুদ্ধক্ষেত্রে। তথাপি মীরকাশিমের ভাগ্যে পরাজয় নেমে আসে। অবশ্য ঐতিহাসিকদের মতে পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা ভারতের ইতিহাসে এ যুদ্ধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। স্যার জি. স্টিফেনও বলেছেন, "Buxar deserves far more than Plassey to be connsidered as the origin of the British Power in India.

মীরকাশিমের শেষ জীবনের ইতিহাস অতীব দুঃখের। সে কাহিনীর মর্মান্তিক বর্ণনা 'আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম' পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করে প্রসঙ্গের শেষ করতে চাইছি।

"রোহিলাখণ্ডে না হোক, অন্য কোন স্থানে মীরকাশিম পরিজনবর্গ সহ আজীবন নির্বিঘ্নে বাস করিতে পারিতেন কিন্তু স্বদেশের মুক্তিস্পৃহা তাঁহাকে অনিশ্চয়তার পথে আবার ঠেলিয়া দেয়। পরিজনবর্গকে শেষ আসুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তিনি রোহিলাখণ্ড ত্যাগ করিলেন। সুদীর্ঘ ১২ বৎসরকাল তিনি সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে ব্যাপক সফর কারিয়া হিন্দু ও মুসলমান রাজ-রাজড়াদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রাজা-মহারাজা এবং নওয়াব-সুবাদারদের দ্বার হইতে বিমুখ হইয়া তিনি হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে বিদেশীয়দের ক্ষমতা বৃদ্ধির দরুণ আশু বিপদের কথা বুঝাইতে লাগিলেন। রাজপুতানায় উষর মরুভূমির বক্ষে, সিন্ধুর বিজন প্রান্তরে, মধ্য ভারতের গভীর ঝাড় জঙ্গলে, উত্তর ভারতের গিরি গহ্বরে তিনি কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিলেন, হাটে-বাজারে, মন্দিরে-মসজিদে দেশের নামে, স্বাধীনতার নামে, ইসলামের নামে দেব-দেবীর নামে হিন্দু-মাসুলমানের কাছে কত আকুল আবেদন জানাইলেন, কিন্তু কাহারও অন্তরে সামান্য দাগ পর্যন্ত কাটিতে পারিলেন না।"

"অবশেষে রণশ্রান্ত বরি, দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক মীরকাশিম দেশোদ্ধারের আশায় জলাঞ্জলী দিয়া মোঘলদের গোরস্থানে আশ্রয় লাভের জন্যই যেন দিল্লি গমন করিলেন। ১৭৭৭ সনের ৬ই জুন দিল্লির আজমীরি দরওয়াজার বাহিরে একটি মৃতদেহ অনাদরে পড়িয়া আছে দেখিয়া কিছু সংখ্যক লোক তথায় একত্রিত হয়। তাঁহার মাথার নীচে একটি গাঁঠরী ছিল। পথচারীরা অনুমান করিয়া লইল, নিদ্রিত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধের ফলে লোকটির মৃত্যু ঘটিয়াছে। গাঁঠরীটি খোলা হইলে উহার মধ্য হইতে একখানি বহু পুরাতন অথচ অত্যন্ত মূল্যবান্ কাশ্মিরী শাল বাহির হইয়া পড়ে। উহারই এক কোণে সোনালী অক্ষরে লেখা ছিলঃ নাসিরুলমুলক ইমতিয়াজউদ্দৌলা নসরতজঙ্গ মীরকাশিম আলি খাঁন বাহাদুর। দিল্লিতেই তিনি সমাধিত হন। দিল্লি-আজমীর রেলওয়ে নির্মাণের সময় বিদেশী ইংরেজ কোম্পানীর হাতে তাঁহাব কবরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।" (পৃষ্ঠা ৩১-৩২)

সবশেষে একটা মনে রাখার কথা যে, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বিশ্বাসঘাতক, সাম্রাজ্যবাদীদের কয়েকজন বান্ধবের মৃত্যুর ব্যবস্থা তিনি করে গিয়েছিলেন। প্রতিভারঞ্জন মৈত্রবাবুর লেখা থেকে একটা ছোট্ট উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"মুঙ্গের দুর্গের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে মহতাপ চাঁদকে। রেহাই পায়নি মহারাজ স্বরূপচাঁদ। রেহাই পায়নি সপুত্র রাজা রাজবল্লভ, রায়রায়ান, উদিমরায় সহ একাধিক রাজা, জমিদার। ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে একমাত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।" (দ্রঃ মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৫৯)

Goto List

নবাবদের ইতিহাসে আর একটি সত্য অধ্যায়

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ থেকে নবাব আলিবর্দী, নবাব সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিম পর্যন্ত নবাবগণ তাঁদের চরিত্রের সুদৃঢ়তা বা কোমলতা, যোগ্যতা অথবা, সযোগ্যতার ইতিহাস কিভাবে রেখে গেছেন তা আলোচিত হল ও হচ্ছে। তারপর মীরজাফর থেকে শুরু করে নবাব ওয়ারিশ আলি পর্যন্ত যাঁরাই নবাব হয়েছেন তাঁরা ইরেজজের হাতের কলের পুতুল ছাড়া কিছু ছিলেন না। শুধু ভারতবাসীকে ধোঁকা দেয়ার জন্য নবাব মোবারকদ্দৌলাকে বসান হল নবাবী সিংহাসনে এবং ক্ষমতাহীন নবাবের কাছ থেকে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ চিরদিনের জন্য বিনামূল্যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ছিনিয়ে নেয়া হল। অথচ জনসাধারণ জানল তিনি স্বেচ্ছায় দিয়েছেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের টাকশাল কলকাতায় চলে গেল। মুর্শিদাবাদ থেকে ১৭৯৩ সনে আদালত উঠিয়ে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল এ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। তারপরে সিংহাসনে বসান হয় তাঁর পুত্র বাবরজঙ্গকে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই পুত্র আলিজাকে নবাব করা হয়। ১৮২৪ সনের ২৪ শে ডিসেম্বর আলিজার মৃত্যুর পর হুমায়ুনজাকে বসান হল। ইতিহা.-. তাঁকে বিলাসী প্রমান করানর জন্য তৈরি করান হল হাজারদুয়ারী প্রাসাদ। যার ভিতরে গেলেই পাওয়া যাবে নবাবদের বিলাসিতা ও নগ্ন নোংরামির নির্দশন। বিলাসিতা প্রমাণে ঘোড়া ও অন্যান্য জীব-জন্তু রাখার জন্যে একটা অত্যন্ত লম্বা ও অপ্রয়োজনীয় উঁচু আস্তাবল তৈরি করান হয়। যেটাকে দেখেই ভুল বশতঃ তদানন্তিন গভর্ণর জিজ্ঞেস করেছিলেন, ""Is It Nawab palacc?" ১৮৩৮ সনে হুমায়ুনজাকে চুক্তিশর্ত লঙ্ঘণ করে ইংরেজ জানাল যে, বৃত্তিভোগী নবাব-বেগমদের মৃত্যুর পর তাদের উত্তরাধিকারীরা কোনও রকম বৃত্তি পাবে না। ক্ষমতাহীন হুমায়ুনজা শোকে মুহ্যমান হলেন। পরে মারাও গেলেন। তারপর তাঁর নাবালক পুত্র ফেরাদুনজাকে বসান হল নবাবীর (?) আসনে। একে একে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ফেরাদুনজা স্বয়ং ইংল্যাণ্ডের গিয়ে কাতরকণ্ঠে আবেদন রাখলেন। কিন্তু ফল হল উল্টা। কাজ তো হলই না. দশ লক্ষ টাকা দিয়ে বলা হল, "আজ থেকে নবাব এবং নাজিম পদ আপনার রইল না।" ১৮৮৪ সনের ৫ই নভেম্বর ক্ষমতাহীন নবাব অশ্রুপ্লুত নয়নে পরলোকে গমন করলেন। এ একই দিনে তাঁর স্ত্রীও শোকাহত হয়ে মারা যান।

তারপর কাঠের পুতুলের মত বসান হল হাসান আলীকে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ওয়াসিফ আলী মির্জা। ওয়াসিফ আলীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ওয়ারিশ আলী মির্জাকে বসান হয়। পরে তাঁরও মৃত্যু হয়। উপরোক্ত তথ্যগুলোর প্রমাণ; 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস'; শ্রীপ্রতিবার মৈত্র, পৃষ্ঠা ৭১-৭৬।

প্রচলিত মত অনুসরণ করে আমাদের শেখান হয়েছে. নবাব সিরাজউদ্দৌলা তথা ভারতের পতন হয়েছে তাঁর অযোগ্যতা এবং বিলাসিতার কারণে। এটা দায়ী, নাকি সিরাজদ্দৌলার অসাম্প্রদায়িক উদার রাজনীতি দায়ী? জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ. উর্মিচাঁদ কান্তবাবু. মানিকচাঁদ. রামচাঁদ, দেবীসিংহ, নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণকান্ত, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, মীরজাফর প্রমুখ বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরা বিশ্বাস ভঙ্গ করে দেশকে তুলে দিয়েছেন ইরেজের হাতে, পরিবর্তে তাঁরা পেয়েছেন পার্থিব সুযোগ সুবিধার প্রাচুর্য।

মীরজাফরঃ প্রচলিত ইতিহাসে শেখান হয়েছে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাই ভারতের স্বাধীনতা অস্তমিত হওয়ার মূল কারণ। কিন্তু আধুনিক যুগের বাস্তববাদী ঐতিহাসিক রতন লাহিড়ী 'মুর্মিদাবাদ জেলার সত্যিকারের ইতিহাসে' লিখেছেন, "ঐতিহাসিকরা যাঁর উপর প্রভূত অন্যায় করেছেন তিনি মীরজাফর আলি খাঁ ইনি অধিক বয়সে আফিমের নেশাগ্রস্ত হয়ে

পড়েন এবং দুই নর্তকী বেগমের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকেন। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসেবে এঁর ব্যয় অসম্ভব বেড়ে যায় এবং ক্রমে ইনি জগৎ শেঠদের ক্রীড়ানক হয়ে পড়েন এমতাবস্থায় তরুণ অনভিজ্ঞ নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁকে তাঁর বিপক্ষে ষড়যন্ত্রকারী বলে আটক করেন। এতে ইনি সম্পূর্ণ সিরাজের বিরোধী পক্ষে চলে যান এবং পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে পরাজিত করতে ইংরাজকে সবিশেষ সাহায্য করেন।"

"মীরজাফর দোষী কিন্তু মীরজাফরকে যত অপরাধী করে চিহ্নিত করা হয় তিনি তত অপরাধী ছিলেন না এ বেইমানীর ইনাম স্বরূপ ইনি শেষ বয়সে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হয়ে মার যান।" (পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট ১০-১১)

জগৎশেঠ ঃ রতন লাহিড়ী বলেন, "সুযোগ সুভিধা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও অর্থের জন কিছু মানুষ সব ধরনের অপরাধ করতে পারে, যাদের কাছে ন্যায়-নীতি, মান-সম্মান কিছুই নেই, যাদের একটা মাত্র সত্য 'টাকা', যাদের একটাই ধর্ম 'টাকা চাই আরও টাকা'-এ সম্প্রদায়ের প্রধান জগৎশেঠ।....এবার বহু পরিশ্রম করে এবং বহু অর্থব্যয় করে দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বিক্রয় করে। এদের বাড়ীতেই বেশীর ভাগ ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এরাই অঢেল অর্থ ব্যয় করে নবাব সিরাজুদ্দৌলার প্রতিদ্বন্দীদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এরাই কোম্পানীর সাথে ষড়যন্ত্রকারীদের যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এরাই নিজেদের লাভের জন্য স্রেফ নাফা কে নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা ইংরাজদের হাতে বিক্রি করে দেন।....মীরজাফর সিংহাসনে বসেই বন্দী সিরাজের প্রাণনাশ করতে চাননি। এ শয়তানরা আর ক্লাইভের অনুরোধে বাধ্য হয়েই মীরজাফর সিরাজকে মীরনের তত্ত্বাবধানে পাঠান। তখন জগৎ শেঠ আর ক্লাইভের পিঠ চাপড়ানিতে মীরন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে মারার মত নৃশংস ও জঘণ্য কাজটি সম্পন্ন করেন।" (রতন লাহিড়ীর ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট বিভাগের ৮,৯ ও ১০)

দেবীসিংহ ঃ রতন লাহিড়ীর ভাষায়, "ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম পাষণ্ড, সর্ব রকম পাপের, অত্যাচারের শ্রেষ্ঠ নায়ক কে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে সকলে এক বাক্যে বলবে দেবীসিংহ। এঁর নামে বহু গ্রামের অধিবাসী গ্রাম ত্যাগ করে পালাত। বহু স্তুতি উৎকোচ প্রদান করে তৎকালীন নায়েব দেওয়ানরেজা খাঁর কাছ থেকে পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়-ভার গ্রহণ করেন। এঁর অত্যাচার শুনে ও দেখে স্বয়ং হিষ্টিংস একে বিতাড়িত করেন এবং কোম্পানীর রেকর্ডে এক দুষ্কর্মের বিবরণ লেখেন। কিন্তু কান্তবাবুর প্রচেষ্টায় এবং বিশাল ঘুষের ফলে সে কুখ্যাত দেবীসিংহ আবার মুর্শিবাবাদ জেলার রাজস্ব আদায়ের প্রধান হন। ইনি ইংরেজ সিভিলিয়ানগণদের দেশীয় নারী ও ফরাসী মদ দিয়ে মুগ্ধ করে রেখে সমস্ত রাজস্বই প্রায় গ্রাস করতেন। পরে আরও উৎকোচ দিয়ে দিনাজপুরের নাবালক রাজার অভিভাবক রূপে রংপুর, দিনাজপুর, ইদরাকপুরের ইজারা নিলেন এবং সমস্ত এলাকাটিকে তাঁর চরম অত্যাচারে মূলভুমি করে তুললেন। প্রথমে ছোট ছোট জমিদারের, পরে প্রজাদের সমস্ত সম্পত্তি এমনকি অলঙ্কার কাপড়াদি জমি সব কিছু দখল করতে লাগলেন এবং এ সময়ে একদল সুদখোর মহাজনের সাহায্যে আরও শোষণ শুরু করলেন। এদের দিয়ে...'শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা সুদ আদায় করাত।' (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃষ্ঠা ৩৪৯-নিখিলনাথ রায়)

নিখিলনাথ রায়ের ভাষায়, "তাহার পর স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার চলিত, তাহা স্মরণ করিতে গেলেও হৃদয় কাঁপে। যে দেশের কুমারীগণকে বিশ্বজননী ভগবতী বলা হয়, সেই সমস্ত কুমারীদিগকে তাহাদের পবিত্র নিকেতন হইতে বলপূর্বক প্রকাশ্য বিচারালয়ে আনয়ন করিয়া তাহাদের পবিত্রতা বিনষ্ট করা হইল।...স্বামীর নিকট হইতে পত্নীকে কাড়িয়া আনা হত। এ সময়ে কত স্ত্রীলোকের যে সতীত্ব বিনষ্ট হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? সে

সমস্ত স্ত্রী লোকদিগকে সাধারণের সমক্ষে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত করা হইত। তাহার পর সূচাগ্র বংশখণ্ড বক্রভাবে আনত করিয়া যুবতীগণের স্তনবৃন্তে বাঁধিয়া দিত। স্তিতিস্থাপক বংশখণ্ডগুলি স্ত্রীলোকদিগের স্তন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ঋজু ভাব অবলম্বন করিত। পরে তাহাদের ক্ষতস্থানও গুল ও মশালের আগুনে দগ্ধ করিয়া যন্ত্রণার সীমা বৃদ্ধি করা হইতে। স্ত্রীলোকগণ যখন এরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে তখন আত্মীয়স্বজনে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিত।" (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃষ্ঠা ৩৫০-৩৫১)

রতন লাহিড়ী আরও বলেন, "এই শয়তান মুর্শিদাবাদের নসিপুর জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ১৮০৫ সনে সপ্তদোজখ বা কুম্ভিপাক নরকপথে যাত্রা করেন।" (রতন লাহিড়ী, পরিশিষ্ট ২,৩ ও ৪ পৃষ্ঠা)

নন্দকুমার ঃ "যে সমস্ত বিশ্বাসঘাতক অর্থের বিনিময়ে নিজের দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিয়েছিল–তরুণ নবাবের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁর সর্বনাশ করেছিল, তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ শয়তান নন্দকুমার। তিনি হুগলীর ফৌজদার থাকার সময় ঘুষ খেয়ে ইরেজদের শুধু ছেড়ে দেননি উপরন্তু বিনা বাধায় কলিকাতা পুনর্দখ-া করতে দেন। সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক ছিলেন এ শয়তানের অনুচর। পরে অর্থকরী স্বার্থ নিয়ে গণ্ডগোল হলে হেষ্টিংসের সাথে তার বিরোধ শুরু হয়। হেস্টিংসের প্ররোচনায় কান্তবাবু ও তাঁর অনুচরবৃন্দ এঁর বিরুদ্ধে দলিল জালের মামলা আনেন এবং এঁর ফাঁসি হয়। অনেকেরই নন্দুকুমারকে ভাল লোক বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেও এত বড় শয়তান খুব কম ছিল। প্রথম পর্যায়ে ইনি ক্লাইভ মীরজাফর এর মধ্যে দৌত্যগিরি থেকে শুরু করে অর্থোপার্জ্জনের জন্য হেন পাপ কাজ নেই যা তিনি করেননি। পলাশীর যুদ্ধে পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তার জন্যে এ কুখ্যাত মানুষটি ক্লাইভের দেওয়ানী বেনিয়ান পদ লাভ করেন। এবং.....বালা বিহার উড়িষ্যা সুবার সমস্ত অংশে চরম শোষণ ও অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। পরে মীরজাফরের দেওয়ান হন এবং যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য সব ধরনের পাপ করতেন। স্বাভাবিক ভাবে ক্লাইভ মরে যাবার পর নন্দকুমারের সাথে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস ও তাঁর মুৎসুদ্দীন বেনিয়ান–কান্তবাবুর সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষ বাধে এবং পরিনামে নন্দকুমারকে ফাসি কাঠে ঝুলাতে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, নন্দকুমারের ফাঁসির পর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পেকে তাঁর ন্যায়বিচারের জন্য রাজা নবকৃষ্ণ, কান্তবাবুর বা কান্তমুদি প্রমুখরা অভিনন্দন পত্র প্রদান করেছিলেন।" (পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট 'ক' অধ্যায়ের ৪-৫–রতন লাহিড়ী এ তথ্য নিয়েছেন–Stephen এর 'Nundcomar' Vol. 1, পৃষ্ঠা ২২৯ থেকে)

অবশ্য মহারাজা নন্দকুমার দেশ ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব যে, অভিযোগের তাঁর ফাঁসি দেওয়া হল সেই অভিযোগটি মিথ্যা এবং জাল জালিয়াতির ব্যাপার। সুতরাং ঐ মামলায় তাঁর ফাঁসি হওয়ার জন্য বিচারক জজ্‌কে অভিনন্দন–এ এক অদ্ভুত ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা। নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ শুনেই তাঁর প্রাণদণ্ডের পুর্বেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহভাজন দালালরা এই কুকর্মের সাক্ষ্য রেখে গেছেন। যেমন প্রতিভারঞ্জন বাবুও লিখেছেন 'তখন প্রাণদণ্ডের আগেই কোম্পানীর অনুগৃহীত নবকৃষ্ণ, হুজুরমল, রামলোচন প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পের কাছে চিঠি লিখে ইংরাজের বিচারশক্তির তারিফ করে অভিনন্দন পাঠায়।" (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৮২)

যে অত্যাচারী বেইমান হেষ্টিংসের জালিয়াতিতে নন্দকুমারের ফাঁসি হল এবং সারা ভারতবর্ষের মানুষ কত অত্যাচারিত হল সেই হেষ্টিংস যখন তাঁর দেশ ইংল্যাণ্ডের নানা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আসামী হলেন তখন যাতে তাঁর শাস্তি না হয়ে মুক্তি হয়, তার জন্য এখান থেকে হিন্দু রাজা মহারাজা সুপরিশ করলেন। সুপারিশনামায় হেষ্টিংসের মিথ্যা প্রশংসা মহানুভবতা ও উদারতার কথাই ছিল মূল বিষয়। তাই প্রতিভা বাবুও লিখেছেন, "এই প্রশংসা-পত্রে স্বাক্ষর করেন অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা থেকে শুরু করে জমিদার রাজা মহারাজা এমনকি কাশী নবদ্বীপের একাধিক পণ্ডিত। বিস্ময়কর হলেও সত্য। স্বাক্ষরকারীর মধ্যে দেখা যায় নন্দকুমারের দৌহিত্র রাজা মহানন্দ রামকৃষ্ণ এবং মহারাণী ভবানীর হস্তাক্ষর।" (পৃষ্ঠা ৮২)

কান্তবাবু ঃ রতন লাহিড়ী লিখেছেন "ভারতবর্ষের সত্যিকারের ইতিহাসে শয়তানদের পার্শ্বচর বলে বর্ণিত হবে যারা তাদের অন্যতম মুর্শিদাবাদের কাশিবাজারের কান্তবাবু বা কান্তমদি বা কৃষ্ণকান্ত নন্দী। ইনি প্রথম জীবনে ছিলেন কাশিবাজারের রেশম কুঠির মুহুরী।... কাশিমবাজারের কুঠির কাছে এঁদের মুদির দোকান ছিল। ইনি যখন রেশম কুঠির মুহুরী, ওয়ারেন হেষ্টিংস তখন ছিলেন একজন নিম্নতন কর্মচারী। স্বাভাবিক ভাবে এই দুই শয়তানের অনুচরের মধ্যে ভাবসাব হয়। সিরাজুদ্দৌলার কাশিবাজারের কুঠি দখলের সময় কান্তবাবু আশ্রয় দিয়ে হেষ্টিংসের প্রাণ ও মান রক্ষা করেছিলেন, এর প্রত্যুপকারে হেষ্টিংস কান্তবাবুকে নিজের মুৎসুদ্দীন নিয়োগ করেন এবং সর্বত্র শোষনের অবাধ অধিকার দান করেন এবং কোন উপায়ে যে কোন সম্পত্তি কান্তবাবু অধিগ্রহণ করতেন। এমনকি সারা ভারতে সর্বত্র যেখানে ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন ও শোষণ চলত সেখানেই কান্তবাবুর শঠতা ও শয়তানি ছিল। রঙ্গপুরের বাহারবন্দ পরগণার জমিদার বন্দোবস্ত পেলেও জনগণ তাঁকে কর দিতে স্বীকৃত হয় না। এজন্য তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট গুড়লাক এবং মানুষরূপী রাক্ষস বা দৈত্য বা ইবলিসের সহচর কান্তবাবু এখানে প্রজাদের উপর চরম অত্যাচার করেন। এ সবের মধ্যে প্রকাশ্যে সন্তানের সামনে বহু জন দিয়া তার মাকে ধর্ষণ, অত্যাচার উৎপীড়ন, স্তন কেটে দেয়া আরও অন্যান্য অত্যন্ত পাশবিক অত্যাচার, ঘর জ্বলান, পিটিয়ে মারা, আগুন ছেঁকা দেয়া অত্যন্ত সাধারণ ধরনের অত্যচার ছিল। এ ব্যাপারে কান্তবাবুকে সাহায্য করেছিলেন স্বয়ং ওয়ারেন হেষ্টিংস। ১৮৭৮ সনের Calcutta Review এর Warren Hastings in Lower Bengal (দক্ষিণবঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংস) দেখলে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়াও বহু জমিদারী লবণ মহলের ইজারা পেয়েছিলেন কান্তবাবু। শুধু তাই নয়, অযোধ্যার বেগমদের উপর অত্যাচার করে হেষ্টিংসের জন্য অর্থ আদায় করেছিলেন এই কান্তবাবু বা কান্তমুদি। হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদের মণি বেগমের যত উৎকোচ বারাংবার গ্রহণ করেছিলেন তার এক বিশেষ অংশ নিয়েছিল এ শয়তান। বেনারসের রাজা চৈতসিংহ ও তাঁর রাণীদের উপর সর্ব রকম অত্যাচার ও অর্থ আদায়ের মূল পাণ্ডা ছিলেন এই কান্তমুদি। যখন বারাণসীর জনগণ বিক্ষোভ করেছিল তখন হেষ্টিংস চুনার দুর্গে পলায়ন করেছিলেন সঙ্গে এই ঘৃণ্য কান্তবাবু। পরবর্তীকালে ইংরেজ সৈন্য ব্যাপক লুন্ঠন করলে এই লুণ্ঠনের মোটা ভাগ পেয়েছিলেন কান্তবাবু। কাশী রাজভবনের পাথরের থাম, জানালা প্রভৃতি খুলে নিয়ে এসেছিলেন কান্তবাবু। বহু দুষ্কর্মের এই পাণ্ডাটি ১২৫০ বঙ্গাব্দে নরক বা দোজখ যাত্রা করে। এই শয়তানই কাশিমবাজার জমিদার বাড়ির স্রষ্টা।" (পৃষ্ঠা ১-২)

প্রতিভারঞ্জনাবাবু তাঁর 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে 'লিখেছেন, "শোষণ করেছে ইংরেজ ঠিকই, কিন্তু সেই শোষণে সাহায্য করেছে এ দেশের কিছু লোক। কোম্পানীর অনুগ্রহে এরা সামান্য অবস্থা থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই অর্জন করেছে বিশাল সম্পত্তি, সেই সঙ্গে রাজা মহারাজা উপাধি। কাশিমবাজার কুঠিতে আট টাকা বেতনের কর্মচারী ছিল কান্তুমুদি। তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য ছিল মাত্র দেড় হাজার টাকা। গভর্ণর হেষ্টিংস সাহেবের অনুগ্রহে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই বিশাল সম্পত্তির ও অর্থের মালিক হয়ে কান্তমুদি হল কান্তবাবু।

রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ ঃ প্রতিভারঞ্জন বাবু ছিলেন "পলাশীর যুদ্ধে সময় রামচাঁদ ছিল ত্রিশ টাকা বেতনের কর্মচারী। দশ বছর পর মৃত্যুকালে রেখে যায় নগদ সাত লাখ বিশ হাজার পাউণ্ড, সোনা ও রুপা ভর্তি চারশটি পাত্র, এক লাখ আশি হাজার পাউণ্ড দামের ভূ-সম্পত্তি এবং দু' লাখ পাউণ্ড দামের মণি মুক্তা।" (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃঃ ৭৯)

পুর্ণেন্দু পত্রীও তাঁর পুস্তকে রামচাঁদের অল্প মাইনে পাওয়ার কথা লিখেছেন। আরও তথ্য দিয়ে বলেছেন, বামচাঁদ নগদ ৭২ লাখ টাকা, মণিমুক্তা ২০ লাখ টাকার, ১৮ লাখ টাকার জমিদারি, ৪০০ কলসী–তার মধ্যে ৮৩টি সোনার ও বাকীগুলো রূপার, সর্বমোট সে বাজারের ১ কোটি ২৫ লাখ টাকার সম্পত্তি রেখে যান। তিনি নবকৃষ্ণ সম্পর্কেও লিখেছেন যে, প্রথমে তিনি মাত্র ৬০ টাকা বেতনে কাজ করতেন। কিন্তু অল্প দিন পরে তাঁর মায়ের মৃত্যুতে ৯ লাখ টাকা ব্যয় করেছিলেন। শোভাবজারের বিখ্যাত জমিদারবংশের প্রধান ভূ-সম্পত্তি ও বংশ প্রতিষ্ঠা তাঁরই উপার্জিত অর্থে (পুরনো কলকাতার কথাচিত্র, পৃষ্ঠা ৪০০)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও লিখেছেন, 'রামচাঁদ তৎকালে ষাট টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন; কিন্তু দশ বৎসর পরে, তিনি এক কোটি পঁচিশ লাখ টাকার বিষয় রেখে মরেন। মুন্সী নবকৃষ্ণের মাসিক বেতন ষাটি টাকার অধিক ছিলনা। কিন্তু তিনি অল্পদিন পরে, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে, নয় লাখ টাকা ব্যয় করেন। এ ব্যক্তিই পরিশেষে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাজা নবকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন;" (দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর রচনাবরীর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 'বাংলার ইতিহাস' পৃষ্ঠা ১১৯)

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঃ শ্রীরতন লাহিড়ী তাঁর উপরোক্ত বই-এ লিখেছেন, "এ কুখ্যাত লোকটি ছিলেন দেবীসিংহের জুড়িদার এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের একটি প্রিয় সহচর। ধূর্তটি, জালিয়াতী, প্রবঞ্চনার ব্যাপারে ইনি ছিলেন এঁদের মধ্যে সর্বোত্তম। ইনি ছিলেন হেষ্টিংসের সমস্ত কুকাজের পরিকল্পনাকারী, রাজস্ব বিষয়ে ফার্সী ও অঙ্কে সুপণ্ডিত এবং কার্যতঃ সে প্রথম যুগের কোম্পানীর শাসনের সময়ের সর্বোসর্বা। কোম্পানীবাহাদুর ক্ষমতা দখলের পর রাজস্ব আদয়ের ভার দেন বিহারের কুখ্যাত খেতাব রায় ও বাংলার কুখ্যাত রেজা খাঁকে। রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের বেশির ভাগ ব্যাপারে তার কর্মরত যুবক গঙ্গাগোবিন্দকে তার ভাব দেন। মনে রাখা প্রয়োজন রেজা খাঁর বিশ্বস্ত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন কান্দীর জমিদারবাড়ীর স্রষ্টা। বংশানুক্রমিকভাবে আবার ইরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও জনগণকে শোষণের ব্যাপারেও এঁরা সুদক্ষ ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করা ষড়যন্ত্রের মুখ্য পরিকল্পনা করেছিলেন গঙ্গাগোবিন্দের অগ্রজ বিশ্বস্ত রাধাকান্ত। এ বংশের অন্যতম আদি পুরুষ হরেকৃষ্ণ ছিলেন একটি কুখ্যাত সুদখোর মহাজন। এর থেকে পরে জমিদার হয়ে ওঠেন এবং গঙ্গাগোবিন্দের সময়ে এঁরা কার্যতঃ বাংলার সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। হেস্টিংসের সঙ্গে এঁর এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল যে, রাজস্ব বিষয়ে কেউ গঙ্গাগোবিন্দ আর হেস্টিংসকে আলাদা ভাবতেন না। হেস্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু বলেছেন। হেস্টিংসের কুখ্যাত সহযোগীগুলির মধ্যে গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন সবচেয়ে পণ্ডিত বুদ্ধিমান সংগঠক। তার ফলে এঁর অপরাধগুলিও ছিল অনেক উঁচু দরের। কিন্তু হেস্টিংসের কাছে তাঁর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কোন ভুল ছিলনা।

হেস্টিংসের বিদায়ের সময় জাহাজঘাটাতে গিয়ে চোখের জলে ভাসিয়ে ছিলেন এই বাংলা বিহার উড়িষ্যার সমস্ত রাজস্বের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।....সর রকম অপরাধে এঁরা ওস্তাদ ছিলেন এবং যে কোন উপায়ে অর্থ, বিলাস ব্যসনের জন্য নারী সংগ্রহ, নিজেদের বিকৃত মানসিকতা চরিতার্থের জন্য অদ্ভুত ধরণের অত্যাচারের ব্যাপারে এদের জুড়ি ছিল না।....অত্যাচারে মুর্শিদাবাদ ও পাটনা এলাকা শ্মশান হয়ে উঠেছিল। বাধ্য হয়েই কোম্পানী এদের পদচ্যুত করে বন্দী করে কলকাতা নিয়ে যায়। এর ফলে ব্যাপক শূন্যতা দেখা গিয়েছিল। কোম্পানী সে জায়গা পুরণের দায়িত্ব দিয়েছিল একদল অনভিজ্ঞ তরুণ সিভিলিয়ানদের এঁরা কার্যতঃ গঙ্গাগোবিন্দের হাতের পুতুল হয়ে উঠেছিলেন। রাজস্ব কমিটির দেওয়ান প্রথমে ছিলেন, সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক, রাজা রাজবল্লভ। গঙ্গাগোবিন্দ প্রথমে এঁরই সহকারী হিসাবে তখনকার দিনে ৭০০ টাকা মাহিনার চাকরিতে নিযুক্ত হন। এর পর থেকে গঙ্গাগোবিন্দের জয়যাত্রা শুরু। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাগোবিন্দ কলিকাতার রাজস্ব সমিতির দেওয়ানী পদ পান। নিখিলনাথ রায়ের ভাষায়, '১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাগোবিন্দ কলিকাতার রাজস্ব সমিতির দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া আপনার চরিত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন। যাহাদের উপরে তাহার তত্ত্বাবধানের ভাব ছিল উৎকোচ ভারে তাহারা প্রপীড়িত হইয়া উঠিল।' (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃষ্ঠা ৩১৬)

"....এর পরে ১৭৭৬ সনেই হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ পাটনা প্রভৃতির রাজস্ব সমিতি ভেঙ্গে নতুন ভাবে কলকাতায় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। গঙ্গাগোবিন্দকে পুনরায় দেওয়ান করে সর্বেসর্বা করে দেন এবং একটি পুতল-রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। এই ভাবে সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ব হবার পর এই গঙ্গাগোবিন্দ তাঁর পুত্র প্রাণকৃষ্ণকে তাঁর সহযোগী করে নেন। এইভাবে মহামান্য হেষ্টিংস বাহাদুরের কৃপায় গঙ্গাগোবিন্দ ও তাঁর পুত্র বাংলাসুবাকে শোষণের আখড়া করে তোলেন। এই শোষণের প্রয়োজনে এঁরা জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, শক্তি প্রয়োগ সব কিছু অপরাধ করেছিলেন। এমন সময়ে গঙ্গাগোবিন্দই ছিলেন সর্বোসর্বা। বিধবার সম্পত্তি অপহরণ, নাবালকের সম্পত্তি অধিগ্রহণের ব্যাপারে ইনি ছিলেন বিশেষ ভাবে অভিজ্ঞ।"" (শ্রীরতন লাহিড়ী ঐ পুস্তকে পরিশিষ্টের ৭-৮ পৃষ্ঠা)

যে কোন দেশের আদর্শ সরকার অতিবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত থাকেন; তার জন্য থাকে মজুত অর্থভাণ্ডার। সিরাজের পতনের পর যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে দেশের ১/৩ অংশ লোক মারা গিয়েছিল। সিরাজের ধনভাণ্ডার যা ছিল তা গোটা কতক দেশীয় নেতাদের বাড়িতে কিভাবে জমা হয়েছিল, তা আলোচিত হয়েছে। তার চেয়ে বহু গুণ বেশী অর্থ ইংরেজ সিভিলিয়ান বা অফিসাররা ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে নিজেদের দেশকে ফাঁপিয়ে তুলেছিলেন। প্রতিভারঞ্জনবাবু লিখেছেন, "অপ্রকাশ্যে ক্লাইভ কত টাকা পেয়েছে তার হিসাব পাওয়া যায় না। তিনি আরও লিখেছেন, 'পলাশী যুদ্ধে পর হীরাঝিল প্রাসাদের প্রাকাশ্য ধনাগার লুঠের বখরা বাবদ ক্লাইভ সাহেব পায় প্রকাশ্যে দু লাখ আশী হাজার টাকা। এ ছাড়া চরম কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁকে মীরজাফর দিয়েছে আরও এক লাখ ষাট হাজার টাকা।" আরও বলেছেন, "স্ক্রাফটন সাহেব বলেছেন--ত্রিশখানা নৌকা বোঝাই ধনরত্ন নিয়ে গেছে ক্লাইব।"

"এ্যাডমিরাল ওয়াটসন মৃত্যুকালে রেখে যায় সত্তর লাখ টাকা। নৌসেনানী পোকক্ অর্জন করে বিপুল অর্থ। ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথম যখন এদেশের আসে তখন তার বেতন ছিল মাত্র পনের টাকা। কয়েক বছরের মধ্যেই সে হয় বিশাল ধনসম্পত্তির মালিক (হেষ্টিংস এ দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় ১৭৮৫ সনের তার এ দেশীয় যে সব সম্পত্তি নিলামে বিক্রিত করা হয় তার মধ্যে ছিল ৬৩ বিঘার বিরাট বাগানবাড়ী, ৪৬ বিঘার আস্তাবলসহ বিশাল অট্টালিকা,

Goto List

কাঠের রেলিং ঘেরা ৫২ বিঘা জমি, ১৩৬ বিঘার বাগান, রুপার বাসন প্লেট, টেবিল, চেয়ার, হাতীর হাওদা, ঘোড়ার সাজ, ঝালবদার পাল্কি, তাঁবু, বাদ্যযন্ত্র, ছবি ইত্যাদি।" (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৮০, কলিকাতা গেজেট, ১০-৫-১৭৮৫)

পূর্ণেন্দু পত্রীর মতে, (১) গভর্ণর ড্রেক ২৮০০০০, (২) কর্ণেল ক্লাইভ ২৮০০০০ মেম্বার হিসাবে, ২০০০০০ সেনাপতি হিসাবে এবং বিশিষ্ট দান হিসাবে ১৬০০০০০, (৩) ওয়াটটিস মেম্বার হিসাবে ২৪০০০০, বিশিষ্ট দান হিসাবে ৮০০০০০, (৪) মেজর কিলপ্যাট্রিক ২৪০০০০, অতিরিক্ত ৩০০০০০, (৫) মানিংহাম ২৪০০০০০, (৬) বিচার ২৪০০০০ (৭) কাউন্সিলের ৬ জন সভ্য ৬০০০০০, (৮) ওয়ালস ৫০০০০০, (৯) স্ক্রাফটন ২০০০০০, (১০) লুসিংটন ৫০০০ এ বিপুল পরিমাণের টাকা প্রাকশ্যে ভাগাভাগি হয়েছিল। অপ্রকাশ্যে কত হয়েছিল তা বলা কঠিন সিরাজুদ্দৌলার পতন না ঘটান হত, এ বিপুল পরিমাণ সম্পদ। যদি অর্থপিশাচরা আত্মসাত করতে না পারত, তাহলে অনেকের মতে মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সোনার দেশ মৃতখানায় পরিণত হত না।

সিরাজুদ্দৌলার পতনের জন্য দায়ী বিশ্বাসঘাতক হিন্দু-মুসলমান নায়করা ইতিহাসে যেমন কলঙ্কিত, পরকালেও হয়ত হবে জাহান্নামী। যদি কেউ পরকালকে বাদ দিয়েও চিন্তা করেন তবুও বলা যায়, পৃথিবীতেও তাদের লাঞ্ছনা কম হয়নি। যেমন মীরজাফর মারা যান কুষ্ঠ ব্যাধিতে। মীরন বজ্রাঘাতে মারা যান। লক্ষপতি উমিচাঁদ কপর্দকহীন অবস্থায় উন্মাদ ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে মারা যান। মহারাজ নন্দকুমার মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিতে মারা যায়। শেঠ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ গঙ্গার পানিতে ডুবে মারা যায়। মুহম্মদী বেগ পাগল হয়ে কুপে পড়ে মারা যায়। রায়দুর্লভ জেলখানায় অনশন অর্ধাশনে মারা যায়। দুর্লভরায় নিঃস্ব অসহায়ের মত 'নাস্তানাবুদ হয়ে সর্বস্বান্ত' হয়। ক্লাইভ আত্মহত্যা করে। বিশ্বনিয়ন্তার নির্দেশে এভাবে প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী এক আশ্চর্য পার্থিব বিচার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। (দ্রষ্টব্য 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম' পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠা ও ভুলে যাওয়া ইতিহাস পৃষ্ঠা ১৫)

হায়দার আলি

১৭১৭ (মতান্তরে ১৭২২) খৃষ্টাব্দে আলি নামক এক সম্ভ্রান্ত বীর কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে মহীশূরের হিন্দু রাজার অধীনে তিনি সৈনিক হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। হায়দারের বহু গুণের মধ্যে দুটি গুণ উল্লেখযোগ্যঃ একটি বীরত্ব ও অপরটি সততা।

এ সময়ে মন্ত্রীও সেনাপতিদের মধ্যে মতানৈক্যের ফলস্বরূপ অর্থ-দপ্তরের দুরবস্থাকে রাজা আয়ত্বে আনতে না পেরে অবশেষে হায়দারের হাতেই সব কিছু সমর্পণ করেন। হায়দার এ ডুবন্ত রাজ্যের হাল সাহসের সাথে গ্রহণ করেন। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে শাসন, পোষণ, দান, দয়া, মায়া ও বুদ্ধিপূর্ণ কৌশলে সমস্ত কিছু স্বাভাবিক ভাবে ফিরিয়ে আনেন। তিনি পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট রাজ্যগুলো দখল করে মহীশূরের সীমানা বৃদ্ধি করে দেশে প্রকৃত শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তাঁর অন্তরের আসল ইচ্ছা ছিল ইউরোপীয় আদর্শ ও ভাবধারায় নিজে ও সৈন্যদের সুগঠিত করে ইংরেজদের দেশচ্যুত করা।

এ ব্যাপারে মারাঠাদের তিনি বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, আমরা যে যেখান থেকেই আসি না কেন ভারতকে নিজের মাতৃভূমি রূপে বরণ করে নিয়েছি—হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মারাঠা সবাই আমরা ভারতবাসী, ভাই ভাই। হায়দারের উদার ও যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে মারাঠারা ও নিজাম তাঁর হাতে হাত মেলান। এবার হায়দার ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এটাই ইতিহাসে প্রথম মহীশুর যুদ্ধ নামে বিখ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয়

মাঝপথে নৌকাডুবির মত নিজাম হায়দারের পক্ষ পরিত্যাগ করেন। আর মারাঠারা শুধু পক্ষ ত্যাগ নয়, বিপক্ষ ইংরেজদের প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু হায়দার বীরবিক্রমে একাই সৎসাহসকে সহায় করে যুদ্ধে অগ্রগতিকে মাদ্রাজের দ্বারে পৌছে দেন। ইংরেজগণ হায়দারের অসম্ভব সাহসিকতা আর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধাবস্থায় ধৃত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। হায়দার লেখাপড়া না জানলেও জন্মগতভাবে চতুর ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তাই অনুমান করলেন, মাররাঠারা অপর দিক থেকে আক্রমণ করলে ঘরের শত্রু বিভীষণে পরিণত হবে। অতএব আপাতত সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করলে অন্য কোন শক্তি হায়দারকে আক্রমণ করলে ইংরেজরা তাঁকে সাহায্য কর।

এদিকে হায়দারের অনুমানই বাস্তবে পরিণত হয়। মারাঠারাই ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মহীশূর আক্রমণ করে। কিন্তু সন্ধির শর্তানুযায়ী ইংরেজরা হায়দারের কোন সাহায্যে এগিয়ে এলনা। আবার হায়দার পূর্বের ন্যায় জ্ঞানগর্ভ যুক্তিতে মারাঠাদের বোঝালে পুনরায় তারা হায়দারের সাথে সহযোগিতা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বার সদিচ্ছা জ্ঞাপন করে। নিজামও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একমত বলে জানান। হায়দার আবার সাহসে ভর করে সসৈন্যে মাদ্রাজ পৌছান। কিন্তু এবারে পরোক্ষভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজদের পক্ষে যোগাদান করে মারাঠারা ও নিজাম সাহেব হায়দারের সাথে প্রতারণা করেন। এবার আর সন্ধির কথা নয় বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন হায়দার। তাঁর সুযোগ্য বীর সন্তান টিপু ইংরেজদের এমন ভাবে পরাজিত করলেন যে, তারা আর পালানরও সুযোগ না পেয়ে অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। হায়দার তাঁর বীর সন্তানের বীরত্ব দেখার সুযোগ বেশি দিন পাননি। প্রায় ২২ বছর রাজত্ব করার পর এক কঠিন দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

তিনি যে অত্যন্ত সুযোগ্য শাসক ও পরিচালক ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁকে যদি প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজদের সাথে লড়াই করতে না হত এবং তাঁর যদি ভারত থেকে ইরেজ বিতাড়নের স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা না থাকত, তাহলে এ বিশাল ভারতবর্ষের অধিকাংশই তাঁর হস্তগত হত। ডক্টর এম এ কাদেরও বলেন, 'ইরেজদের বিরোধিতা করিতে না হইলে ভারতের অধিকাংশ স্থানই তাঁহার ও তৎপুত্রের হস্তগত হইত।" (হায়দার আলী, পৃষ্ঠা ৩২)

'তাঁহার সাম্রাজ্য আশি হাজার বর্গমাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল।' সবচেয়ে আশ্বর্যের বিষয়, এ বিরাট প্রতিভাবান, কঠোর ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক পড়তে ও লিখতে জানতেন না অর্থাৎ নিরক্ষর ছিলেন। (Rise of the Christian Power : Major B.D. Basu; হায়দার আলী, পৃষ্ঠা ১৬৫) "একদিন দক্ষিণ ভারত হায়দারকে জাতীয় নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া তাঁহার সাহায্যার্থে আকুল প্রাণে ছুটিয়া গিয়াছিল; মসজিদের ন্যায় মন্দির হইতেও তাঁর কৃতকার্যতার জন্য প্রার্থনার বাণী উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙালী আজ তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়েছে। এখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এ সময় কি তাঁহার আদর হইবে না? স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ বীর আজ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে কাছ হতে কি তাঁর ন্যায্য সম্মান পেতে পারেন না?" (হায়দার আলী, পৃষ্ঠা ১৭৫-৭৬)

"মহীশূরে আজও হায়দারের নাম সর্বদা সসম্মানে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক Bowring ও বলেছেন, "His names is always mentioned inMysore with respect. [R. B. Bowring: Haidar Ali and Tipu Sultan. 113]

অভারতীয় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক তাঁকে এশিয়ার সর্বোন্নত চরিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় "Hydar ali Khan was doubtiessly one of the greatest characters Asia has produced. [History of Hydar Sha and Tipoo Sultan: De La Tour p. 568]

টিপু সুলতান

টিপুর জন্ম হয় ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে। বীর পিতা 'মহীশূর ব্যাঘের ' মৃত্যু হলেও পিতার সুযোগ্য পুত্র রূপে পিতা অপেক্ষা বীরত্বে কোন অংশ কম ছিলেন না। পিতার ন্যায় তাঁরাও ছিল ইংরেজদের দেশচ্যুত করার পবিত্র কামনা। তিনি মেথিউ সাহেবকে বদনুরে সসৈন্যে বন্দী করেন এবং মাঙ্গালোর অধিকার করেন ৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ টিপুর সাথে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে সন্ধি করে। কিন্তু ইংরেজগণ এবারও সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে নিজাম ও মারাঠাদের সহযোগিতায় ভিন্ন দিক হতে মহীশূর আক্রমণ করে। টিপু এক বছর পর্যন্ত তাঁদের ঠেকিয়ে রাখেন। কিন্তু অবশেষে পরাজয় বরণ করে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। অর্ধেক রাজ্য, প্রচুর অর্থএবং দুই পুত্রকে জামিন রেখে অত্যন্ত মনোবেদনার সাথে তাঁকে মেনে নিতে সন্ধির শর্ত হয়েছিল। এ সন্ধি, যা পরাজয়ের নামান্তর। তবুও আবার তিনি ভীষণ দুরদর্শিতা ও তৎপরতায় সৈন্য গঠন করলেন এবং পিতা হায়দারের মত মারাঠাদেরও নিজামের সাথে সন্ধির আবেদন জানালেন আবার মারাঠারা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করল সুলতানের এ আন্তরিক প্রস্তাব। নিজামও ইংরেজদের এ বাধ্যতামুলক সন্ধি মেনে নিয়েছিলেন।

মিঃ ওয়েলেসলীর তথা ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক ও প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিশ্চিহ্ন করতে মিত্রশক্তি ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চতুর্থ মহীশুর যুদ্ধ সংগটিত হয় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। টিপু দেশী বিদেশী এ সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব ও যোগ্যতার সাথে লড়েও জয়ী হতে পারলেন না। টিপুর শ্রীরঙ্গপত্তম শত্রপক্ষ অধিকার করে। টিপুর সৈন্যগণ যেভাবে ক্রমপর্যায়ে তিনটি শক্তির সাথে লড়াই করেছিল এবং সবশেষে শহীদের মর্যাদায় মৃত্যুবরণ করেছিল তা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক অলিখিত ঐতিহাসিক অধ্যায়।

যাহোক, সমস্ত সৈন্যের যখন পতন হয় তখন টিপু সুলতানকে ইংরেজরা চিৎকার করে আত্মসমর্পণ করতে বলে। আহত বীরের এক হাত অস্ত্রঘাতে অচল, অপর হাতেই যুদ্ধ করতে করতে ভাগ্যহারা টিপু ভারতেরই মাটিতে দেশের সুযোগ্য সন্তানের মত নিজের প্রাণদান করলেন– তবুও জীবন্ত বন্দী হতে ঘৃণাবোধ করেছিলেন।

বীর হায়দারের বীরপুত্র টিপুর বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কেমন করে ধ্বংস হয়ে গেলেন। সে সম্বন্ধে Major B.D. Basu (I.M.S.,) লিখিত Rise of the Christian Power in India নামক নির্ভরযোগ্য আকর গ্রন্থের The Second War with Tipu অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এ পুস্তকেই লিখিত আছে টিপু সুলতানের বীরত্বের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল তাঁর দলের বেশ কিছু ফরাসী অফিসারদের বিশ্বাসঘাতকতায়। [পৃষ্ঠা ৩৩৪]

ইংরেজ টিপু সুলতানের মৃত্যুতে বুঝতে পারলে, তাদের পিটিয়ে তাড়াবার মত ক্ষমতা যে ভারতীয় বীরের ছিল, সে বীর আজ নিশ্চিহ্ন, সুতরাং ইংরেজদের ভবিষ্যত হল উজ্জ্বল। এ যুদ্ধের প্রধান নায়ক মিঃ মর্ণিংটনকে টিপু সুলতানকে নিহত করার জন্য প্রধান বিচারপতি Sri John Anstruther ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা থেকে এটা প্রমাণ হয়। তিনি লিখেছিলেন, "It is with the most sincere satisfaction and hear felt that I congratulate you upon the most brilliant and glorious event which ever occured in our Indian history. (দ্রষ্টব্য B.D. Basu!-র ঐ পুস্তকের ৩৩২ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি

দিল্লির হযরত শাহ ওলিউল্লাহ (রহঃ) ছিলেন সে যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠতম আলেম। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনিই প্রথম চিন্তানায়ক, আলেম যিনি ইংরেজ ভারত থেকে তাড়িয়ে দেয়া জরুরি মনে করে সংগঠনের বীজ ফেলে গেছেন। তাঁর পুত্র, ছাত্র ও শিষ্যগণ তাঁর এ সুপরিকল্পিত সংগঠনের সভ্য ছিলেন।

সৈয়দ আহমদ বেরেলী (রহঃ) ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উপরোক্ত এ সংগঠনেরই সভ্য ছিলেন। ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এমন গাঢ় হয়ে বসে গেল যে, তিনি বিখ্যাত আলেম হওয়ার সময় আর পেলেন না। তবে চরিত্র মাধুর্য ও আধ্যাত্মিকতার উন্নতির চরম সীমায় পৌছেছিলেন। দৈহিক ক্ষমতাও তাঁর সাধারণ মানুষের থেকে বেশি ছিল। তিনি ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করতেন। যুবক হবার পরেও মনের অঙ্কুরিত ইচ্ছা যেন ফুলে ফলে বড় হয়ে উঠল। তাই তিনি যোগ দিলেন 'এক ক্ষুদ্র সামন্ত প্রভুর সেনাবাহিনীতে, শিখলেন সামরিক কলাকৌশল। এর সাথে অন্যদের সাহায্য করার বিনিময়ে শিখলেন প্রশাসনিক কাজকর্ম।' কিন্তু এ মুসলমান সামন্ত প্রভু ইংরেজদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করল। সাথে সাথে ঘৃণাভরে চাকরি খতম করে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলেন বাড়িতে। পারপর শিষ্য সংখ্যা বাড়াতে লাগলেন ও সারা ভারত ঘুরে ফেললেন। পরে তিনি হজ্ব যাত্রা করলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে মুসলমানদের সাথে সশাস্ত্র সংগ্রামও করতে চাইলেন। তাই সর্বভারতীয় প্রচারে জানিয়ে দিলেন যে, কোরআন ও হাদীস বিরোধী কাজ মুসলমানদের করা চলবে না। অবশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। পরে বিরাট একটি দল নিয়ে যখন ভারত পরিক্রমা সহ মক্কা থেকে হজ্ব করে ফিরলেন, তখন দেখা গেল এ ভ্রমণে তাঁর দু'বছর দশ মাস পার হয়ে গেছে। সে বিপুল সংখ্যক লোকের খাওয়া দাওয়া ও খরচের সব অর্থটুকু তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে উপহার হিসেবেই তিনি পেয়েছিলেন। জানা যায়, শুধু হজ্ব যাত্রীদের টিকিট কিনতেই লেগেছিল তখনকার ১৩৮৬০ টাকা, আর হজ্ব যাত্রার প্রক্কালে রেশনের মাল কিনেছিলেন ৩৩৯১ টাকার।

আলিগড়ের সৈয়দ আহমদ ও বেরেলীর সৈয়দ আহমদ দুজনেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষ। তবে আলিগড়ী আহমদ সাহেব পেয়েছেন ইংরেজের পক্ষ থেকে 'স্যার' উপাধি, প্রচুর সম্মান, চাকরির পদোন্নতি প্রভৃতি। আর বেরেলীর আহমদ সাহেব ইংরেজের পক্ষ থেকে পেয়েছেন অত্যাচার ও আহত হওয়ার উপহার। আর সব শেষে শত্রুদের চরম আঘাতে তাঁকে শহীদ হতে হয়েছে–ভারতবাসীকে শেষ উপহার হিসেবে দিয়ে গেছেন তিনি তাঁর রক্তমাখা কাঁচা কাটা মাথা।

এ বিরাট আধ্যাত্মিক বিপ্লবী শহীদ বীরকে মিঃ উইলিয়াম হান্টার The Indian Musalmans পুস্তকে ডাকাত, ভণ্ড ও লুণ্ঠনকারী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চাপা পড়া ইতিহাসকে আজ কিন্তু কিছু বাস্তববাদী ঐতিহাসিক প্রকাশ করার জন্যে নতুন সাধনায় নিয়োজিত হয়েছেন। ঐতিহাসিক রতন লাহিড়ী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখা অন্তত এটা প্রমাণ করে যে, সত্য তথ্য প্রকাশে তিনি সুস্পষ্টবাদী। তাই তাঁর লেখা 'ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাস' থেকে সৈয়দ আহমদ বেরেলী সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

“যাঁর জীবনস্মৃতি প্রেরণা জুগিয়েছিল যুগে যুগে এ দেশের মহাবিপ্লবীদের। যাঁর জীবনাদর্শ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতার বাইরে থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করা, স্বাধীন সরকার গঠন করা, আবার সে সাথে সাথে দেশের মধ্যে থেকেও সাম্রাজ্যবাদকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা ইত্যাদি পথ দেখিয়েছিল পরবর্তীকালের মহেন্দ্রপতাপ, বরকতুল্লা, এমন এন, রায়, রাসবিহারী এমনকি নেতাজীকেও। কে এ মহাবিপ্লবী, যাঁর আদর্শে উদ্বোধিত হয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছিল ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহে–শত হাজার মানুষ বরণ করেছিল দ্বীপান্তর, সশ্রম কারাদণ্ড, কঠোর যন্ত্রণাময় মৃত্যু। কে ইনি? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর তার দালালদের লেখা ইতিহাসে এঁর নামোল্লেখ থাকলেও এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা থাকা স্বাভাবিকও নয়। আর আজও স্কুল-কলেজে যে ইতিহাস পড়ান হয়, সে সব এ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাচীন গলিত বিকৃত ইতিহাসের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। তাই কি করে জানবে এ মহাপুরুষের নাম? এ মহান মহাবিপ্লবী মহাবিদ্রোহীর নাম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভী।” (পৃষ্ঠা ৭–৯)

রতন লাহিড়ী আরও বলেন, “বিপ্লবীরা না পিছিয়ে মরণপণ সংগ্রাম করতে লাগল। তারপর যুদ্ধ হল শেষ। বিপ্লবী বাহিনী হল ধ্বংস। তাঁকে সকলে দেখেছিল বীরের মত লড়াই করতে একটার পর একটা শত্রু সৈন্য কচুকাটা করতে।” যদিও নিজেরা একে মৃত বলে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করল কিন্তু কেহ এঁর শেষ পরিণতি দেখেনি।” (শ্রী লাহিড়ীর ঐ পুস্তক পৃষ্ঠা ৭-৮)

এবার উইলিয়াম হান্টারের লেখা ‘দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস’ গ্রন্থের বিচারপতি আবদুর মওদুদের বঙ্গানুবাদ থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তার পূর্বে বলে রাখি, মিঃ হান্টার হচ্ছে মিঃ হর্ডসনের অন্তরঙ্গ বান্ধব। যেহেতু তিনি পুস্তকের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখ দিয়ে পুস্তকটি বন্ধু মিঃ হডসনের নামেই উৎসর্গ করেছেন। যে হডসন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের দু'জন পুত্রসহ রাজবাড়ির কচিকাঁচা ২৯ জন শিশুকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। সে যাহোক, লেখক যে একজন বিখ্যাত তথ্য সংগ্রহকারী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও তাঁর লেখায় কোরআন হাদীসের বিরুদ্ধে, মাওলানাদের বিরুদ্ধে, বিপ্লবী মহামনীষীদের বিরুদ্ধে অনেক অশ্লীল কথা লেখা আছে। এ বইটি লিখতে সরকারি তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল, যেহেতু তিনি ছিলেন সরকারি সিভিলিয়ান। তবে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত Calcutta Review-এর C.C.I ও C II সংখ্যায় 'Wahabis in India' শিরোনামে যে তিনটি বিরাট বিরাট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যার লেখকের বিচিত্র ছদ্মনাম ছিল 'Anonymous'-সে তিনটি প্রবন্ধই মিঃ হান্টারের পুস্তকের রক্ত, মাংস ও অস্থি বলা যায়।

হান্টার লেখেন, “অপেক্ষাকৃত গোঁড়া মুসলমানেরা যখন এভাবে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছে, তখন সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ই প্রকাশ্যে আলোচনা করছে, জিহাদে যোগ দেয়া তাদের পক্ষে ফরয কি না।” “পাঞ্জাব সীমান্তের বিদ্রোহী বসতি স্থাপন করেন সৈয়দ আহমদ।” (পৃষ্ঠা ৩)

হান্টার সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে আরও বলেন, “একজন মশহুর দুস্যু সর্দারের অধীনে অশ্বারোহী সিপাহী হিসেবে তাঁর জীবন আরম্ভ। বহু বছর তিনি মালব প্রদেশের আফিম উৎপাদনকারী গ্রামগুলোর উপর লুটতরাজ করেন। উদীয়মান শিখ শক্তির নায়ক রণজিৎ সিংহ পার্শ্ববর্তী মুসলমান অঞ্চল সমূহে যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন, তার ফলে কোন মুসলমান দুস্যুর পক্ষে পেশা চালিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। সৈয়দ আহমদ

বুদ্ধিমানের মত নিজেকে সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিলেন। তিনি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে নিয়ে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লির একজন মশহুর আলেম শাহ আবদুল আজিজ-এঁর কাছে শরিয়তী শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন। তিন বছর সেখানে সাগরেদী করার পর সৈয়দ আহমদ ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন এবং ভারতীয় ইসলামে যে সব অনাচার বা বিদয়াত ঢুকে পড়েছে, সেগুলোর প্রতি কঠোর আক্রমণ পরিচালনা করে একদল গোঁড়া ও হাঙ্গামাবাজ অনুচর সংগ্রহ করলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ধীরে ধীরে দক্ষিণ অঞ্চলে সফর করে ফিরলেন। তখন তাঁর মুরীদান তাঁর ধর্মীয় মাহাত্ম্য স্মরণ করে সাধারণ নফরের মত তাঁর খিদমত করত এবং দেশমান্য আলেম খিদমতগারের মত খালি পায়ে তাঁর পাল্কির দু ধারে দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। ১৮২২ সনে তিনি মক্কায় হজ্ব করতে যান এবং এভাবে তাঁর পূর্বতন দস্যুবৃত্তিকে হাজীর পবিত্র আলখেল্লায় বেমালুমভাবে ঢাকা দিয়ে তিনি পরবর্তী অক্টোবর মাসে বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন। (শিখরা লাহোরে ও অন্যান্য স্থানে বহুদিন ধরে হুকুমত চালাচ্ছে।) তারা মসজিদে আযান দিতে দেয় না এবং গো-জবেহ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। যখন তাদের অপমান-অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করল, তখন হযরত সৈয়দ আহমদ (তাঁর সৌভাগ্য ও প্রশংসা অক্ষয় হোক) একমাত্র দ্বীনের হিফাযত করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কয়েকজন মাত্র খাদিম সাথে নিয়ে কাবুল ও পেশোয়ারের দিক দিকে রওনা হলেন।....কয়েক হাজার ঈমানদার মুসলমান তাঁর আহ্বানে আল্লাহ্‌র রাহে চলতে তৈরি হয়েছে এবং ১৮২৬ সনের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বিধর্মী শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ আরম্ভ করা হয়েছে) * ১৮৩০ সালের জুন মাসে একবার পরাজিত হয়েও মুজাহিদ সৈন্যরা অকুতোভয়ে সমতলভূমি দখল করে ফেলে আর সে বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার তাঁদের হস্তগত হয়।...তাঁর প্রকৃত মুজাহিদ বাহিনী ছিল হিন্দুস্তানী ধর্মান্ধদের নিয়ে গঠিত। ইমাম আহমদ সাহেবের প্রধান খলিফাদের মধ্যে দু ভাই ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন জনৈক নামজাদা নরঘাতকের দুই পৌত্র। তাদের হামলার হাত শিখ গ্রামগুলোর উপর পড়তে লাগল বটে, কিন্তু বিধর্মী ইংরেজদের উপর আঘাত হানতে পারলেই তারা তীব্র উল্লাস উপভোগ করত। যতদিন আমরা জিহাদের দিকে নজর দিইনি, ততদিন তারা দলে দলে হামলা করে আমাদের প্রজা ও মিত্রদের ধরে নিয়ে গেছে কিংবা খুন করে ফেলেছে: আর যখন শক্তি প্রয়োগে তাদের নির্মূল করতে আমাদের সৈন্যদেরকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করছে এবং অনেককাল ধরে বৃটিশ ভারতের সীমান্ত বাহিনীকে অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে রেখেছে।

আমাদের সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রদ্রোহী ও ধর্মান্ধ প্রজাদের সাহায্যপুষ্ট একটা বিদ্রোহী ও নির্বাসিতের বসতি তীব্র হিংসার বশবর্তী হয়ে কিভাবে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহসী হতে পারে, এটা বোঝা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু এটা বোঝা খুবই শক্ত যে, একটা সুসভ্য দেশের সেনাবিহনীর সুকৌশল ও সমরনীতির বিরুদ্ধে কিভাবে তারা বহুকাল টিকে থাকতে পারে।....শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সনের তাঁর (আহমদ সাহেবের) পতন ও মৃত্যু হল।" (দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস পৃষ্ঠা ১-২১)

পূর্ণ বিদ্বেষ নিয়ে যদিও হান্টার এসব তথ্য পরিবেশন করেছেন, যদিও বিপ্লবী সৈয়দ আহমদের চরিত্রে মিথ্যার কালি মাখিয়েছেন, তবুও প্রমাণ হয় তাঁর বীরত্ব, বাহাদুরি, সংগঠন ও আত্মত্যাগের কথা।

সৈয়দ আহমদ ও তাঁর অনুসারীরা প্রায় সকলেই কোন্ যুদ্ধে এবং কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহীদ হন–সে সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এ রকম ঃ বালাকোটের শেষ যুদ্ধে পূর্বেও সৈদ আহমদ সাহেব নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিপক্ষ সৈন্য পাহাড় থেকে নীচে না নামা পর্যন্ত বা

---

* বন্ধনী বেষ্টিত বাক্যগুলো লেখক বা অনুবাদকের নয়, জিহাদে আহ্বানসূচক এক প্রচার পুস্তিকার।

তারা আক্রমণ না করা পর্যন্ত আমাদের আক্রমণ বন্ধ থাকবে। পাতিয়ালার সৈয়দ চেরাগ আলী বিপ্লবী যোদ্ধাদের জন্য পায়েস রান্না করছিলেন আর বিপক্ষ সৈন্যদের ঘাঁটির দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। হঠাৎ তাঁর ভাবান্তর হয়-যে লাঠি দিয়ে তিনি ফুটন্ত পায়েস নাড়াচাড়া করেছিলেন তা দিয়ে তিনি এ তামার হাঁড়ির গায়ে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ভাইসব, স্বর্গ হতে লাল পোশাক পরে অপ্সরীরা দল বেঁধে নামছে।' এ বলে অস্ত্র হাতে তিনি কারও পরামর্শ না নিয়ে ছুটতে লাগলেন শত্রু সৈন্য ঘাঁটির দিকে। "এ ঘটনা এমনই ক্ষিপ্রতার সাথে হইয়া গেল যে, কিসে কি হইল কেহ বুঝিবার পূর্বেই সৈয়দ চেরাগ আলী গুলি লাগিয়া শহীদ হইলেন। তিনিই বালাকোটের প্রথম শহীদ।" (দ্রষ্টব্য 'হঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ', পৃষ্ঠা ৫৯৮)। বাধ্য হয়েই পরিকল্পনা বিরোধী কাজ মোজাহেদ বাহিনীকে করতে হল, অর্থাৎ এলোমেলোভাবে অপ্রস্তুতির সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল। এ 'অতর্কিত' আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং শেষ পরিণতিতে প্রায় সকলকেই নিহত হতে হয়েছিল।

বিখ্যাত লেখক ও বিচারপতির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করতে চাইছি-"১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে এ যুদ্ধ হয়। এটাকে ঠিক যুদ্ধ বলা চলে না। এক পক্ষে বিশ হাজার সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্য....(আর এক পক্ষে) ভগ্নোৎসাহ প্রায় ৯০০ মোজাহিদ। এ ছিল মৃত্যু অভিসারীদের বাহ্নিবন্যার মুক্তিস্নান। দুর্দম বেগে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'জীবন মৃত্যু মিশেছে যেথায় মত্ত ফেনিল স্রোত'। শাহাদত বরণ করলেন সঙ্গীসহ সৈয়দ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈল।" (দ্রষ্টব্য ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা ১৯৫)।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে হযরত আহমদ সাহেব শহীদ হলেও তাঁর সংগঠন ও আন্দোলন কিন্তু শহীদ বা শেষ হয়নি। পরবর্তীকারে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৯৪৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত যাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, তাঁরা এবং তাঁদের আন্দোলন সৈয়দ আহমদ বেরেলীর (রহঃ) অঙ্কুরিত বীজের সফল বৃক্ষ বলা যায়। (দ্রষ্টব্য ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাস ঃ শ্রীরতন লাহিড়ী, পৃষ্ঠা ৯)

প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের চাপা দেয়া ইতিহাস

বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদের (রহঃ) নিহত হওয়ার পর যেসব আন্দোলন, বিদ্রোহ বা সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলোকে বিকৃত করে তাঁদের নাম পাল্টে কোনটাকে বলা হয়েছে সিপাহী বিদ্রোহ, কোনটাকে বলা হয়েছে ওহাবী আন্দোলন, ফারায়েজী আন্দোলন, মহম্মদী আন্দোলন, আবার কোনটাকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।

ওহাবী নেতাদের 'ওহাবী' বলা মানে তাঁদের শ্রদ্ধা করা তো নয়ই বরং নিশ্চিতভাবে গালি দেয়াই হয়, যেহেতু সে মহান বিপ্লবীরাই তাঁদেরকে 'ওহাবী' নামে আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। 'বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' পুস্তকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমলেন্দু দে-ও একথা উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ৯৫)। সেজন্য আমরা আমাদের আলোচনায় 'সিপাহী বিদ্রোহ' এবং 'ওহাবী' বা 'ফারায়েজী আন্দোলনের' পরিবর্তে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম', 'মহাবিপ্লব' 'মহাবিদ্রোহ' এবং ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে 'ওহাবী', 'ফারায়েজী' ও 'মুহাম্মদী' শব্দের পরিবর্তে 'বিপ্লবী' 'সংগ্রামী' প্রভৃতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা ভাল মনে করি। এমনকি উদ্ধৃতির কোন কোন ক্ষেত্রেও আমরা এ শব্দগুলো বাদ দিয়ে মূল শব্দের প্রথম অক্ষর বন্ধনীর মধ্যে রাখব-যেমন ওহাবী বা অহাবীর ক্ষেত্রে (ও. বা অ.) ফারায়েজীর ক্ষেত্রে (ফ.) ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হল, ভবিষ্যতে যাতে এ কল্পিত, মিথ্যা শব্দগুলোর বহুল প্রচার না হয়।

এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়ে রাখছি যে, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায, অনেকের একাধিক নাম থাকে। যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের, অপর নাম ছিল্ 'গদাধর'। এখন ইতিহাসে যদি তাঁকে গদাধর বলে প্রকাশ করা হয়, তাহলে তা অনিচ্ছাকৃত হলে অসাবধানতা এবং ইচ্ছাকৃত হলে অসভ্যতা বলে মনে করা যেতে পারে। তেমনি, স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। তাঁর আগের নাম ছিল বীরেশ্বর। সে বীরেশ্বরের সংক্ষিপ্ত 'বীরে' থেকে ক্রমে 'বিলে' বলেই তাঁকে ডাকা হত (মনীষীদের ছোটবেলা ঃ বিমল ঘোষ, পৃষ্ঠা ৮৯)। এখন তাঁর স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস যদি 'স্বামী বিলে' বরে আরম্ভ ও শেষ করা হয়, তাহলে তা হবে অতীব দুঃখের। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বিখ্যাত বিখ্যাত নেতাদের আসল নামের পরিবর্তে, জানিনা কোন্ উদ্দেশ্যে ছেলেবেলার সেকেলে আজেবাজে নাম ব্যবহার করা হয়েছে–যেমন তিতুমীর, নোয়ামিঞা, দুদু প্রভৃতি। এ ঐতিহাসক ভুলটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা তাই তাঁদের আসল ও সুন্দরতম নাম ব্যবহার করার পক্ষপাতি।

প্রথমে 'ওহাবী' জিনিসটা কি সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করছি। আরবদেশে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে আবদুল ওহাবের ছেলে মুহাম্মদের জন্ম হয়। আরব দেশের নিয়মানুযায়ী এ নাম 'মুহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল ওহাব' বলে বর্ণিত হয়। জন্মস্থানের নাম ছিল নজ্‌দ। এ ওহাবী আন্দোলনের নায়কের নাম আসলে মুহাম্মদদ। ইংরেজদের কারসাজিতে ছেলেদের পরিবর্তে বাপের নামেই ইতিহাস তৈরী হয়েছে, তাঁদের রাখা এ নাম হল ওহাব।

আরবদেশ যখন শিরক্, বিদআত ও অধর্মীয় আচরণে ছেয়ে গিয়েছিল, তখন তা রুখতে এ ওহাবের পুত্র মুহাম্মদ প্রতিবাদী দল গড়ে তোলেন। ক্রমে ক্রমে তা রাজনৈতিক সংঘর্ষের রূপ নয়। ১৭৪৭ সনে রিয়াদের শেখের সাথে সংঘর্ষ হয়। ১৭৭৩ সনে রিয়াদের শাসন দাহহাম আবদুল ওহাবের পুত্র মুহাম্মাদের কাছে ভীষণভাবে পরাজিত হন। আরববাসীরা এ ঘটনার পর দলে দলে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়। অবশেষে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান। 'ওহাবী আন্দোলনে'র ১১৬ পৃষ্ঠায় আছে–"আবদুল ওহাবের ধর্মীয় শিক্ষা ও মতবাদের আলোচনায় প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আরবদেশে 'ওহাবী' নামাঙ্কিত কোন মযহাব বা তরিকার অস্তিত্ব নেই। এ সংজ্ঞাটির প্রচলন আরবদেশের বাইরে এবং এ মতানুসারীদের বিদেশী দুশমন, বিশেষতঃ তুর্কীদের ও ইওরোপীয়দের দ্বারা 'ওহাবী' কথাটির অর্থ এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত। কোনও কোনও ইউরোপীয় লেখক, যেমন নীবর (Neibuhr) আবদুল ওহাবকে পয়গম্বর বলেছেন। এসব উদ্ভট চিন্তারও কোনো যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে আবদুল ওহাব কোনও মাজহাবও সৃষ্টি করেননি, চার ইমামের অন্যতম ইমাম হাম্বলের মতানুসারী ছিলেন তিনি, এবং তাঁর প্রযত্ন ছিল, বিশ্বনবীর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামের যে রূপ ছিল, সে আদিম সহজ সরল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা" (জাস্টিস আঃ মওদুদ)। তারিখ হিসেব করে দেখা যায়, আরবের মুহম্মদ ইব্‌নে আবদুল ওহাবের যখন মৃত্যু হচ্ছে তখন সৈয়দ আহমদ বেরেলীর বয়স মাত্র এক বছর। তাঁর সাথে যে এঁর কোন যোগাযোগ ছিলনা. তা সুস্পষ্টই প্রমাণ হয়।

'কিতাবুত তাওহীদে' হাম্বল মাজহাব অনুযায়ী আবদুল ওহাবের পুত্র মুহাম্মদ যা যা নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। তবে তার সংক্ষেপ হচ্ছে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করা এবং পীর ও ওলীদের কবরে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ: মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহ্ ছাড়া কারও নামে মান্নত করা শির্‌ক। কোরআন হাদীসের সরল অর্থকে বেঁকিয়ে ব্যাখ্যা করা নিষিদ্ধ। তাছাড়া জামাতের সাথে নামায পড়া তাঁর সময় ছিল জরুরী। ধুমপানকারীদের শাস্তি ছিল বেত্রাঘাত। মুসলমান দাড়ি কামালেও শাস্তির উপযুক্ত। যাকাত ঠিকমত না দিলে সেও

শাস্তিরযোগ্য। শুধু কলেমা পড়ে আল্লাহ্ নাম নিয়ে কোন হালাল পশু জবেহ করলেও তা হালাল খাদ্য হবে না, যদি তার চরিত্র মোটামুটি কলঙ্কমুক্ত না হয়। তাছাড়া তিনি কবরের উপর সৌধ নির্মাণ, কবরকে ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধান প্রভৃতির উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। এগুলো শুধু তাঁর মুখের কথাই ছিলনা, বাস্তবে রূপ দিতে মক্কা ও মদীনার অনেক নামজাদা মনীষীর কবর তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিল্লীর শাহ ওলিউল্লাহ থেকে শুরু করে তাঁর পুত্র, শিষ্য ও ছাত্রগণ এমনকি শহীদ সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর অনুগামীদের সকলেই মুসলমানদেরকে শরীয়তের উপর প্রত্যাবর্তন করার তাগিদ দিয়েছিলেন। ফলে কবর বাঁধান বা কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করা থেকে ক্রমে মুসলমানরা বিরত হতে থাকে। ইংরেজরা মুসলমান বিপ্লবীদের মতিগতি লক্ষ্য করে, এ আন্দোলন যে তাঁদের বিরুদ্ধে অব্যর্থ আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করছে তা বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা কতকগুলো দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেমকে টাকা দিয়ে ঘুরিয়ে তাদের মুখ দিয়ে বলিয়েছিল নিন–তোমরা যুগ যুগ ধরে যা করে আসছি, তা করতে থাক। এ বিপ্লবীরা আসলে ওহাব; ওরা নবী, সাহাবী ও ওলীদের কবর ভাঙার দল। ইংরেজ তাদের প্রচারে যোগ দিয়ে বলল, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ মক্কায় যান, ওখানে গিয়েই তিনি ওহাবী মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অথচ এটা একেবারে মিথ্যা কথা। প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জীবনে একবার মক্কায় গিয়ে হজ্ব করা অবশ্য কর্তব্য হিসেবেই তিনি গিয়েছিলেন। তাঁর হজ্বে যাওয়ার পূর্বের এবং পরের কার্যাবলীর সাথে আরবের 'ওহাবী' আন্দোলনের কোন যোগাযোগই ছিলনা।

সৈয়দ নিসার আলী ঃ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মক্কায় মাওলানা নিসার আলী সাহেবের সাথে সৈয়দ আহমদ সাহেবের দেখা হয়। নিসার আলী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর আন্দোলনও আগামী পরিকল্পনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন (দ্রঃ অমলেন্দু দেবঃ বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা ৯৯)। মাওলানা নিসার আলী ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এঁকে ইতিহাসে ইংরেজরা সম্ভবত হেয় করার জন্য তাঁর উৎকৃষ্ট নামের (সৈয়দ নিসার আলী) পরিবর্তে নিকৃষ্ট নাম (তিতুমীর) ব্যবহার করেছে। কিন্তু অতীব দুঃখের কথা যে, পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান ভারতীয় ঐতিহাসিকরাও সে প্রথাই চালু রেখেছেন।

তাঁর পিতা ছিলেন মীর হাসান আলী, আর মা আবেদা রোকাইয়া খাতুন। মীর নিসার আলীর সমগ্র কোরআন কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি কিশোর বেলা থেকেই ধর্মবিমুখ মুসলমানদের ধর্মের দিকে ঘুরিয়ে আনার জন্য কোরআন হাদীস হতে উপদেশ দিতেন। অবশেষে যৌবনে তাঁর এ চেষ্টা ত্রিমুখী সংগ্রামের রূপ নেয়–একটি হচ্ছে, মুসলমানদের অধর্মীয় আচরণ থেকে বাঁচান, দ্বিতীয়টি হল শাসক ইংরেজের ইঙ্গিত পরিচালিত অত্যাচারী ও শোষক জমিদারের হাত থেকে শুধু মুসলমান নয় মিলিত হিন্দু-মুসলমান শোষিত প্রজাদের বাঁচান ও তৃতীয়টি হচ্ছে, সারা ভারতবর্ষকে ইংরেজের শাসন হতে মুক্ত করা।

এদিদিকে গুরু সৈয়দ আহমদ লড়াই করেছেন সীমান্ত প্রদেশে। আর এদিকে সৈয়দ নিসার আলী কাজ শুরু করেছেন অবিভক্ত বাংলায়। ইংরেজের বিরুদ্ধে তখন প্রকাশ্য জিহাদ ঘোষণা না করলেও যুদ্ধে প্রাণ দেয়ার জন্য প্রচুর নওজোয়ানকে তিনি দলে দলে পাঠিয়ে দিতেন সাথে প্রচুর টাকা পয়সা পাঠাবারও ব্যবস্থা করতেন। সৈয়দ নিসার আলীর একটা বড় সম্বল ছিল, তা হচ্ছে অগ্নিবর্ষক সৃজনশীল বক্তৃতা করার ক্ষমতা। নিসার আলী নিজেও একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর ও ব্যায়ামবীরও ছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিজেই সশস্ত্র ট্রেনিং দিতেন। (দ্রঃ শহীদ তিতুমীর ঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা ৩০-৪১)

নিসার আলী ইসলাম ধর্মকে যেমন ভালবাসতেন, তেমনি হিন্দুদের দুঃখ দুর্দশার কথাও চিন্তা করতেন এবং তাঁদের বিপদে নিজে যথাসাধ্য তাঁদের পাশে দাঁড়াতেন। তা সত্ত্বেও ইংরেজদের অনুগত জমিদারগণ তাঁর উপর রাগ করতেন এবং তাঁর ধ্বংস কামনা করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান উদ্ধৃতির একাংশ তুলে ধরা হল–"নিসার (তি.) আপন ধর্মমত প্রচার করিতেছিল। সে ধর্মমত প্রচারে পীড়ন তাড়ন ছিলনা। লোকে তাঁহার বাগবিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার প্রচারে স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহার মতকে সত্য ভাবিয়া, তাঁহাকে পরিত্রাতা মনে করিয়া, তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিল এবং তাঁহার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। নিসার (তি.) প্রথমে শোণিতের বিনিময়ে প্রচার সিদ্ধি করিতে চাহে নাই। জমিদার কৃষ্ণদেব জরিমানার ব্যবস্থায় তাঁহার শান্ত প্রচারে হস্তক্ষেপ করিলেন।" (অধ্যাপক অমলেন্দু দে. ঐ, পৃষ্ঠা ১০১; বিহারীলাল সরকারের 'তিতুমীর বা নার বেড়িয়ার লড়াই', কলিকাতা ১৩০৪ পৃষ্ঠা)

ইংরেজের বলে বলীয়ান বিখ্যাত জমিদার রামনারায়ণ বাবু (তারাগুনিয়া), কষ্ণদেব রায় (পুঁড়া), গৌরপ্রসাদ চৌধুরী (নগরপুর) প্রভৃতি প্রখ্যাত জমিদারগণ মিলিতভাবে নিসার সাহেবের আন্দোলনকে খতম করার জন্য প্রকাশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেন। প্রত্যেক জমিদার তাঁর এলাকায় পাঁচটি বিষয়ে আদেশ জারী করলেন ঃ "(১) যাহারা নিসার আলীর (তি.) শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অহাবী হইবে, দাড়ি রাখিবে, গোঁফ ছাটিবে, তাহাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির উপর আড়াই টাকা এবং ফি গোঁফের উপর পাঁচসিকা খাজনা দিতে হবে। (২) মসজিদ প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচ শত টাকা ও প্রত্যেকে পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সারকারে নজর দিতে হইবে। (৩) পিতা-পিতামহ বা আত্মীয়-স্বজন সন্তানদের যে নাম রাখিবে, সে নাম পরিবর্তন করিয়া অহাবী মতে আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হইবে। (৪) গো-হত্যা করিলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া দেয়া হবে, যেন সে ব্যক্তি আর গো-হত্যা করতে না পারে। (৫) যে ব্যক্তি সংগ্রামী (অ.) নিসারকে (তি.) নিজ বাড়ীতে স্থান দিবে তাহাকে তাহার ভিটা হইতে উচ্ছেদ করা হইবে।" (A. R. Mallik : British Policy and the Muslims in Bengal, p. 78-79; সিদ্দিকী প্রণীত 'শহীদ তিতুমীর', পৃষ্ঠা ৪৫-৪৯ এবং অমলেন্দু দে, ১০২-১০৩)

সৈয়দ নিসার আলীর যা প্রস্তুতি ছিল তাতে তিনি একটা হামলা করতে পারতেন। কিন্তু উদ্দেশ্য তাঁর হিন্দু-মুসলমানে লড়াই নয় বরং লড়াই হবে যৌথভাবে মুসলমান ও হিন্দুর সাথে ইংরেজের। এ নোটিশ জারি হবার পর তিনি পুঁড়ার জমিদারকে শান্তির জন্য একটি পত্র দিয়েছিলেন। সে প্রত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম–

"বঃ জনাব বাবু কৃষ্ণদেব রায় জমিদার মহাশয় সমীপে–পুঁড়ার জমিদার বাড়ী। মহাশয়। আমি আপনার প্রজা না হইলেও আপনার স্বদেশবাসী। আমি লোক পরম্পরায় জানিতে পারিলাম যে, আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমাকে 'অহাবী' বলিয়া আপনি মুসলমানদের নিকট হেয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি কেন এইরূপ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারা মুশকিল। আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নাই। যদি কেহ আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার উচিত ছিল সত্যের সন্ধান করিয়া হুকুম জারী করা। আমি দ্বীন ইসলাম জারী করিতেছি। মুসলমানদিগকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিতেছে। ইহাতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকিতে পারে? যাহার ধর্ম সেই বুঝে। আপনি ইসলাম ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। অহাবী ধর্ম নামে দুনিয়ার কোন ধর্ম নাই। আল্লাহ্‌র মনঃপূত ধর্মই ইসলাম। ইসলাম শব্দের অর্থ হইতেছে শান্তি। ইসলামী ধরনের নাম রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট

করা, ঈদুল আজহার কোরবানী করা ও আকীকাতে কোরবানী করা মুসলমানদিগের উপর আল্লাহ্‌র ও আল্লাহ্‌র রাসূলের আদেশ। মসজিদ প্রস্তুত করিয়া আল্লাহ্‌র উপাসনা করাও আল্লাহর হুকুম। আপনি ইসলাম ধর্মের আদেশ, বিধি-নিষেধের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমি আশা করি আপনি আপনার হুকুম প্রত্যাহার করিবেন। ফকত্‌ - হাকির ও নাচিজ - সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।" (দ্রঃ অমলেন্দু দে, ঐ, ১০৩-১০৪; শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা ৫০-৫১)

সৈয়দ নিসার আলী তাঁর দাড়িওয়ালা, সৎসাহসী এবং নম্র শিষ্য মহঃ আমিনুল্লার হাতে পত্র দিয়ে পুঁড়ার জমিদার বাড়ী পাঠান। কৃষ্ণদেব পত্র পড়েই তাঁকে জমিদারী জেলে আটক করতে আদেশ দেন এবং সকলের সমানে বন্দী সিংহ মারার মত আমিনুল্লাকে বাঁধা অবস্থায় সীমাহীন প্রহার করান হয় ও অবশেষে হত্যা করা হয়। এ সংবাদ সৈয়দ নিসারের কাছে পৌছিলে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি এবং ব্যথিত হৃদয়ে বলেছিলেন, 'আমার আজাদী আন্দোলনের প্রথম শহীদ আমিনুল্লাহ।'

ওদিকে ইংরেজদের চক্রান্তে বড় বড় জমিদারদের একটি গোপন মিটিং হয় 'লাটুবাবু'র কলকাতার বাসভবনে। তাতে অংশ গ্রহণ করেন গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়, যদুরআটীর দুর্গাচরণ চৌধুরী, পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরডাঙ্গার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, নূরনগরের জমিদারের ম্যানেজার, টাকীর জমিদারের সদর নায়েব, রানাঘাটের জমিদারের ম্যানেজার, বাড়ির মালিক লাটুবাবু এবং বসিরহাট থানার ইংরেজের অনুগত পুলিশ অফিসার রামরাম চক্রবর্তীর্, (শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা ৫১-৫৩)। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ইংরেজ পাদ্রী, ইংরেজ নীলকর ও সমস্ত জমিদারগণ জমিদার কৃষ্ণদেবকে সব রকমের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও সাহায্য করবেন। অধ্যাপক অমলেন্দু দে'র মতে তাঁরা প্রচারের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক 'ত্রাসের সৃষ্টি করেন।'

জমিদাররা উপর তলার ঘাঁটি মজবুত করে পুনরায় পূর্ব ঘোষিত নোটিশ অনুযায়ী মুসলমানদের নিকট কর আদায়ের অত্যাচার অভিযান শুরু করলেন। মুসলমানদের অনেকে জরিমানা দিল, আবার অনেকে গ্রাম ত্যাগ করল। বিপ্লবী নেতা কিন্তু তখনো মিলন-মৈত্রীর পথই খুঁজছিলেন। তিনি মোটেই চাচ্ছিলেননা, লড়াই হিন্দু-মুসলমানে হোক, বরং চাচ্ছিলেন লড়াই ইংরেজ-মুসলমানে হোক–হিন্দু জনসাধারণ অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকুক। কৃষ্ণদেবের জরিমানা আদায়ের অভিযান যখন সরফরাজপুরে আরম্ভ হল, তখন সৈয়দ নিসারের সমর্থকরা বাধা দিলেন কিন্তু তা টিকল না। এরপর জমিদারের লাঠিওয়ালার মসজিদে এবং গ্রামে পাইকারীভাবে আগুন লাগিয়ে দিতে আরম্ভ করে। অনেকে আগুনে ও অস্ত্রে আহত হয়। অমলেন্দু দে'র মতে, 'এক সৈন্যবাহিনীসহ সরফরাজপুর গ্রাম আক্রমণ করেন'। নিসার সাহেব এ অবস্থায়ও ধৈর্য ধরতে সক্ষম হন এবং কোর্টে মোকদ্দমা করেন। বারাসাত কোর্ট এত বড় নরহত্যা, মসজিদ পোড়ান আর গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করার কেস ডিস-মিস করলে কলকাতায় আপীল করা হয়। ওখানেও কোন সুবিচার পাওয়া গেলনা দেখে সৈয়দ নিসার সাহেব ক্ষুব্ধ হলেন এবং বুঝলেন, সুবিচার চাইলে অবিচারই প্রাপ্য। (দ্রঃ A.R. Mallick. p. 81)

অবশেষে 'মরি বা করি' ভেবে নারকেলবেড়িয়ায় বাঁশের একটি কেল্লা সাধ্যানুসারে তৈরি করা হল। মৈজুদ্দিনের বাড়িতে সৈয়দ নিসারের আরাম ও গোপন পরামর্শ করবার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ মাসুম আলী ও শেখ মিস্‌কিন সমস্ত সৈন্যদের একত্রিত করলে সৈয়দ সাহেব সকলকে বললেন; এমন পাঁচজন লোকের প্রয়োজন, যাঁরা আজ

আজাদী আন্দোলনে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। নারায়ে তকবরি ধ্বনির উত্তরে আল্লাহু আকবর বলতে বলতে সহস্র সহস্র হাত জানাল প্রাণ দেবার সংগ্রামী প্রতিশ্রুতি। এবার আদেশ হল কৃষ্ণদেব বাবুর পুঁড়া গ্রাম আক্রমণ করার। সাথে সাথে সংগ্রামী আমিনুল্লা হত্যা, মসজিদ ও গ্রাম জ্বালান আর অন্যায় জরিমানা আদায়ের প্রতিশোধ নিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করল বিপ্লবীরা। জমিদারদের সেনাবাহিনী, নীলকর সাহেবদের কর্মচারি এবং পাদ্রীদের দলবল সকলে মিলে প্রতিরোধ করেও কিন্তু বিপ্লবীদের পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যেকেই অবাক হয় মাসুমের সামরিক কায়দায় সৈন্য পরিচালনা করা দেখে। ইংরেজরাও কম স্তম্ভিত হয়নি। (দ্রঃ শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা ৬৬-৭৩; অমলেন্দু দে, ১০৬)

এরপরে সৈয়দ নিসার সাহেব আরও ঘোষণা করলেন, 'আজ থেকে ইংরেজদের সাথে সর্বপ্রকার বিরোধিতা প্রকাশ্যে করতে হবে।' ওদিকে জমিদারবৃন্দ, থানা, ইংরেজ অফিসার, ইংরেজ নীলকরদের সুপারিশ এবং উপর মহলের পরামর্শের পরে ইংরেজ সরকার একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠালেন মাসুমের সৈন্যদের শায়েস্তা করতে। কিন্তু সৈয়দ নিসার, মাসুম ও মিসকিনের সৈন্য পরিচালনা পদ্ধতি ইংরেজদের চেয়েও উন্নত ধরণের ছিল বলে ইংরেজ সৈন্য পরাজিত হয় এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করে।

ইংরেজ সৈন্যের পরাজয়ের সংবাদ কলকাতায় পৌঁছাবার পরেই এক সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য আর উচ্চ শ্রেণীর কামান পাঠান হল, নারকেলবেড়িয়ার কেল্লার পতনের উদ্দেশ্যে। এবারেও সৈয়দ নিসার, মাসুম আলী ও মিসকিন খাঁ বিপ্লবী সৈন্যদের বললেন–আমাদের কামান নেই, হয়ত মৃত্যু হতে পারে: যাদের ইচ্ছা যুদ্ধ থেকে বিরত হতে পার। কিন্তু এমন একটিও দুর্বল হৃদয় সেদিন পাওয়া গেল না, যে প্রাণ না দিতে কুণ্ঠিত। যুদ্ধ আরম্ভ হতেই হুঙ্কার ছেড়ে ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ করল বিপ্লবী সৈন্য। ইংরেজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম, কিন্তু কালবিলম্ব না করে বিরাট কামান গর্জে উঠল। কামান পরিচালককে হত্যা করার জন্য সেনাপতি মাসুম বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে গিয়ে কামানের উপরে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর কয়েক সেকেণ্ড পূর্বেই কামান দাগা হয়ে গিয়েছিল। অজস্র বিপ্লবী সৈন্য ইংরেজের কামানের গোলায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে মৃত্যুর কোলে ছিটকে পড়ল। ওদিকে মাসুম তো একেবারে ইংরেজদের কোলে গিয়ে উপস্থিত। আর কয়েক সেকেন্ড আগে লাফ দিতে পারলে হয়ত কামান মাসুমের হাতেই এসে যেত। মাসুম বন্দী হলেন। কেল্লা ধ্বংস হল। ইংরেজের আদালতে মাসুমের বিচারে হল ফাঁসি। অপরাধ, তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর। দেশের মাটিতে রাঙ্গা রক্ত ঢেলে দিলেন শ্রদ্ধেয় শহীদ মাসুম। সৈয়দ নিসার আলীও কামানের গোলায় শহীদ হলেন। আর জীবন্ত যাঁদের পাওয়া গেল, বিচারের নামে তাঁদের জাহাজ ভর্তি করে ভারত থেকে দূরে পাঠিয়ে দেয়া হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বাকী আহতদের হাসপাতালে দেওয়ার নামে নদীতে নিক্ষেপ করে তারা নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

অবিভক্ত বঙ্গের বিপ্লবী বীরেরা সেদিন শহীদ হলেন ইংরেজ সৈন্য, দেশীয় দালাল ও পাদ্রীদের প্রত্যক্ষ আক্রমণে। এ ইতিহাস খ্যাত বীর শহীদ নিসার আলীর ইতিহাস যেভাবে মূল্যায়ন করা কর্তব্য সেভাবে কিন্তু আজো করা হয়নি প্রকৃত তথ্যের অভাবেই বোধহয় ইংরেজ সৃষ্ট ইতিহাসের ধারা প্রচলন চলছে।

মাওলানা শরিয়তুল্লাহ ঃ পূর্ববঙ্গে মাদারীপুর গ্রামে শরিয়তুল্লার জন্ম হয়। তাঁর বাবা মা যে খুব ইসলাম দরদী ছিলেন, তাঁর নামই তার সাক্ষী। আঞ্চলিক পড়া শেষ করে কলকাতায় এসে মাওলানা বাশারত আলীর কাছে যুবক শরীয়তুল্লাহ উচ্চ শিক্ষা নিতে থাকেন। এ মাওলানা সাহেব ছিলেন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলী সাহেবের ভক্ত এবং একজন গুপ্ত

যোদ্ধা। সুতরাং জিহাদের মন্ত্র দিতে ও নিতে কারও কোন বাধা ছিলনা। তারপর গুরু শিষ্য উভয়ে মক্কা গেলেন। সেখানে আরও উচ্চ শিক্ষা ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত পণ্ডিত তাহের সোম্বালের কাছে সূফিতত্ত্বের শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে বঙ্গদেশে মাওলানা শরিয়তুল্লাহ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এসে উপস্থিত হন। ওদিকে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলী বঙ্গদেশের জন্য এ রকম রত্নেরই তখন খোঁজ করছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় দুজনের যোগাযোগ হয় এবং তাঁকে তাঁর কাজ সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। মাওলানা শরিয়তুল্লাহ সাহেব ইংরেজ সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই ও ইংরেজের সাথে লড়াই অভিন্ন মনে করে শোষিত, অত্যাচারিত কৃষক, তাঁতী, তেলি প্রভৃতি অনুন্নত ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে আন্দোলন পরিচালনা করেন। এটা খুব মনে রাখা দরকার যে, তখন মুসলমান জমিদারও কিছু ছিলেন, যাঁরা অনেকেই আন্দোলনের প্রতিকূলে ছিলেন।

এ সময় হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান কৃষকের কাছে কালীপূজা, দূর্গাপূজা ইত্যাদিতে কর আদায় করতেন, যা ইসলাম বিরোধী। শুধু তাই নয়, মুসলমান প্রজাদের জন্য ঈদুল-আযহা পর্বে গরু ব্যবহারও বন্ধ করা হয়েছিল। মাওলানা শরীয়তুল্লাহ পূজায় চাঁদা দিতে মুসলমানদের নিষেধ করেন এবং পর্বে গরু ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করেন। মোটকথা তিনি ধর্ম সংস্কারকরূপে সংগ্রাম চালিয়ে সংগ্রামের বুনিয়াদ মজবুত করে ফেললেন। সে সাথে তাঁর ছেলে আলাউদ্দিন আহমদকে মক্কা পাঠালেন। সেখানে শিক্ষা লাভের পর আলাউদ্দিন বাড়ী এলেন এবং পিতার কাছে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে তিনি উপযুক্ত প্রতিনিধিতে পরিণত হলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মাওলানা শরিয়তুল্লাহ দেহত্যাগ করেন।

মাওলানা আলাউদ্দিন ঃ পিতার মৃত্যুর কয়েক বছর আগেই মাওলানা আলাউদ্দিন (অশুদ্ধ ও গেঁয়ো নাম 'দুদু মিঞা') স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি সংগ্রামের ধারা একটু বদল করলেন। হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কানে প্রথমে তিনিই সাম্যবাদ প্রচার করেন। আরও বলেন, জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি হিন্দুর উপর অত্যাচার হয় তাহলেও ইসলাম অনুযায়ী আমাদের তাদের পাশে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাওয়া ধর্মের বিধান। যদি না যাওয়া হয়, তাহলে অধর্মের কাজ হবে। তিনি শাসনতন্ত্র কায়েম করলেন। তাঁর বাহিনী তলোয়ার, সড়কি, তীর, ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়। সর্বপ্রথম তিনি 'বিপ্লবী খিলাফত ব্যবস্থা'র প্রতিষ্ঠা করেন পুরোপুরিভাবে। এ পদে সর্বোচ্চ স্থানে যিনি থাকতেন তাঁকে বলা হত 'ওস্তাদজী'। তাঁদের পরামর্শদাতারা দু'জন ছিলেন 'খলিফা'। এমনিভাবে সুপারিনটেনডেন্ট খলিফা, ওয়ার্ড খলিফা, গাঁও খলিফা প্রভৃতি নানা নামে নানা পদের ব্যবস্থা ছিল। তিন-চারশো বিপ্লবী পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম ইউনিট ছিল। সুপারিনটেনডেন্ট খলিফার একজন পিয়ন ও একজন পেয়াদা থাকত, তাদের দ্বারা নীচে হতে উপর মহলে যোগাযোগ ও নির্দেশ পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। (দ্রঃ M.A khan : History of the Faraidi Movement in Bengal, p. 104-112)

তাঁরা আদালতে বা পঞ্চায়েত গঠন করেন এবং সমস্ত অঞ্চলের বিচার বিপ্লবীরাই করতে থাকেন। মুসলমানদের যাকাত, ওশর ইত্যাদি দাতব্য অর্থ সংগ্রহ করা, সংগঠনের চাঁদা ফসল হতে তোলা, ঠিক মত তা আদায় করা, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা, মাদরাসা মক্তব তৈরি করা, মসজিদ তৈরি করা, প্রভৃতি কাজ জাদু খেলার গতিতে চলতে লাগল। এদিকে বিপ্লবীদের সুবিচার তখন ইংরেজ বিরোধিতার নামান্তর। তাঁরা বললেন, পৃথিবীতে জমি জায়গা যা আছে সব ঈশ্বরের। সেখানে জমিদার বা সরকারের কর নেয়া জুলুম বা অত্যাচার। মানুষ সব সমান, আমাদের কারো উপর তাদের কর্তৃত্ব করবার অধিকার নেই।

Goto List

“এ সুবাদে অমুসলমানরাও অনেকে তাঁদের কাছে কেস্ করতেন। বিচারও সূক্ষ্মভাবে হত। বিচারের রায় না মানলে তা মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা আলাউদ্দিনের সৈন্য বিভাগের ছিল। শেষে অবস্থা অনুকূলে দেখে তিনি তাঁর এলাকায় ঘোষণা করলেন, সমস্ত বিচার আমাদের স্বদেশী আদালতে হবে; যদি কেহ ইংরেজদের আদালতে বিচারপ্রার্থী হয় তাহলে তাকে শাস্তি নিতে হবে। এতে ইংরেজ ব্যবসায়ী বা নীলকরের সাহেবরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, আর জমিদার শ্রেণীও খুব অসন্তুষ্ট হল। কিছু মুসলমানের সহযোগিতায় তাঁরা বলতে লাগলেন, ‘গরীব ছোটলোকদের’ এত মাথায় তোলা অবিচার মাত্র। অবশেষে ইংরেজদের স্তম্ভ জমিদার শ্রেণী, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর বিপ্লবীদের উপর আক্রমণ শুরু করে এবং তা বহুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। (Proceeding of the Judicial Department. O. C. No. 25, 29 May 1843, p. 462)

ইংরেজের ইঙ্গিতে ফরিদপুরের সিকাদার ও ঘোষ পরিবারের দু'জন বড় জমিদারও মুসলমান প্রজাদের জন্য ঘোষণা করলেন, মুসলমানরা গরু কোরবানী করতে পারবে না, কালী ও দূর্গাপূজায় কর দিতে বাধ্য থাকবে। দাড়ির উপরও কর বসান হয়, আর নিষেধ করা হয়, কোন মুসলমান বিপ্লবী দলের সাথে সংযোগ না রাখতে। প্রথমে কিছু মুসলমান প্রজা তার অবহেলা করলে জমিদাররা তাদের কঠোর শাস্তি দেন। [দ্রঃ A.R. Mallick, p. 72-73, M.A. khan, p. 27-28]

আলাউদ্দিন সাহেব ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কানাইপুরের সিকদার ও ফরিদপুরের জয়নারায়ণ জমিদারদ্বয়ের বিরুদ্ধে সৈন্যসহ আক্রমণ করে উভয়কে পরাজিত করে। খুব মনে রাখার মত দরকার যে, এ লড়াই হিন্দু-মুসলমানের নয়, বরং কৃষক-জমিদারের লড়াই, অথবা ইংরেজ শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে মুসলমান বিপ্লবীদের সংগ্রাম। এরপরে কানাইপুরের জমিদার জয়নারায়ণবাবু ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রবলভাবে বিপ্লবীদের বাধা দেন। ফলে যুদ্ধ তুমুল রূপ নেয়। শেষে বিপ্লবীরা জমিদারের ভাই মদন বাবুকে ধরে নিয়ে চলে যায়। অনেকে বলেন, তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। এবং পদ্মা নদীতে নিক্ষেপ করা হয় (দ্রঃ M. A. Khan, p.27-29)। এ হামলায় ৮০০ জন মুসলমান বিপ্লবী যুক্ত ছিলেন। জমিদাররা ইংরেজদের আদালতে মামলা করলে বিচারে ২২ জনের ৭ বছর করে জেল হয়। আলাউদ্দিনের অবশ্য কোন শাস্তি হয়নি, তিনি মুক্তি পান। অনেকের মতে এও ঠিক যে, তাঁর শাস্তি হলে হিতে বিপরীত হত। কেননা পুলিসী রিপোর্ট অনুযায়ী এ সময় আলাউদ্দিনের হাতে আশি হাজার লোক প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। (দ্রঃ P.J.D.O.C.No.99.7.4.1847, P.146])

১৮৪১ ও '৪২ এর ঘটনার পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে জমিদারগণ লড়াই করতে সাহসী হননি। তবে ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ করে সমস্ত সংবাদ সরবরাহ করা এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জমিদারের সাথে শোনিত মানুষের বা কৃষকের লড়াইটিকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক লড়াই বলে প্রমাণ করার খুব চেষ্টা করা হয়েছিল। অমলেন্দু দে তাঁর উল্লিখিত পুস্তকের ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, জমিদারগণ অনেকাংশে সাফল্য মন্ডিত হয়েছিলেন। লড়াইটিকে হিন্দু-মুসলমানের লড়াই বলে সাধারণ মানুষকে বোঝান সম্ভব হয়েছিল।

এ সময় ডানলপ সাহেব ছিলেন কাসিমপুরের নীলকুঠির প্রভাবশালী সাহেব। এ ইংরেজের বিশ্বস্ত পার্শচর ছিলেন কালীপ্রসাদ কাঞ্জিলাল নামে এক গোমস্তা। ডানলপ সাহেব এবং এ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আট শত সশস্ত্র লোক নিয়ে বাহাদুরপুরে 'দুদু মিঞা'র বাড়ি আক্রমণ করেন। বাড়ির চারজন প্রহরীকে হত্যা এবং বহু ব্যক্তিকে আহত করে সে বাজারের দেড় লক্ষ টাকার অর্থ ও সম্পদ নিয়ে ফিরে যান। (দ্রঃ .M. A. Khan. p.35; অমলেন্দু দে, পৃষ্ঠা ৭৫)

১৮৪৬ সনের ৫ই ডিসেম্বর আলাউদ্দিন প্রতিশোধ নিতে ডানলপ সাহেবের কুঠি আক্রমণ করেন। পরে সে গোমস্তাকে বাখরগঞ্জ এলাকায় অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় এবং তাঁদের ২৬ হাজার টাকার ক্ষতি করে দেয়া হয়। অধ্যাপক অমলেন্দু দে'র ভাষায়—"তাঁদের তুলনায় ডানলপের ক্ষতির পরিমাণ অল্পই ছিল।" (দ্রঃ অমলেন্দু দে, পৃষ্ঠা ৭৫)

সে সময়কার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ডানলপের বন্ধু। সে সুবাদে অনায়াসেই ডানলপ কোর্টে কেস করলেন। আলাউদ্দিন এবং ৬৩ জন মুসলমান বিপ্লবীকে বন্দী করে বিচার চলতে থাকে। বিচারে সকলের শাস্তির রায় হয়। সে রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতার সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করা হয়। চতুর ইংরেজ অবস্থা বুঝে সকলকেই মুক্তি দেয়। ১৮৪৭ সনে মুক্তি পেয়ে আলাউদ্দিন সারা ভারতে প্রত্যেক কেন্দ্রে সংবাদ পাঠান যে, চারিদিক হতে একসাথে ইংরেজ ধ্বংস অভিযান চালাতে পারলে ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করা সম্ভব হবে। ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। শেষে খুবই গোপনে এ সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, সারা ভারতের আন্দোলন ও বিপ্লবকে ইংরেজ তার সৈন্য বাহিনী দিয়েই দমন করছে, সুতরাং সৈন্যদের কোন প্রকারে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নেয়ার পূর্বেই সরকার টের পায় যে, নেতা আলাউদ্দিনকে জেলে দেয়া ছাড়া পেরে ওঠা সম্ভব হবে না। তাই তাঁকে বন্দী করে জেলে খুব অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের ইন্ধন করা হয়। শরীর দুর্বল এবং অসুস্থ থাকলেও মন আর মস্তিষ্ক কিন্তু দুর্বল হয়নি একটুও। তাঁকে ছাড়া হয়েছিল ১৮৬০ সনে। শুধু ভয় করেই এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই যে ইংরেজ সরকার তাঁকে বন্দী করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। [M.A. khan, p. 42-43]

অনেকে মনে করেন, এ রকম এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাধীনচেতা নেতা যদি স্বাধীনভাবে ছাড়া থাকতেন তাহলে বিপ্লবের রূপরেখার প্রভূত পরিবর্তন হত। আর সে জন্যই ইংরেজ তাঁকে বন্দী করে প্রায় পাঁচ বছর আটকে রাখে। দু'বছর তিনি জেলের বাইরে বেঁচে থাকলেও জেলের অত্যাচারের জের টানতে হয়েছিল শেষ জীবন পর্যন্ত। ১৮৬২ সনের ২৪শে অক্টোবর স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী মাওলানা আলাউদ্দিন বাংলারই মাটিতে চিরনিদ্রিত হন। আজকের নিষ্ঠুর ইতিহাস যেন ভুলে গেছে সে বিপ্লবীর কথা।

আলাউদ্দিনের পুত্রদ্বয় : আলাউদ্দিন সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র গিয়াসসুদ্দিন হায়দার সামরিক নেতা হিসেবে বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তাছাড়া তাঁর আর একই ভাই আবদুল গফুরও পুরোপুরিভাবে বিপ্লব ও আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে ছিলেন। এ ইতিহাস বিখ্যাত আবদুল গফুর নামটাকে ইংরেজ ও তাদের অনুসারীরা তাঁর অখ্যাত নাম 'নোয়ামিএ্রা' বলে উল্লেখ করেছেন। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনী' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে বিপ্লবী গফুর সাহেবের জন্য অত্যন্ত বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করে যা লিখেছেন তাতে ভারতবাসীর ঘৃণায় মাথা নীচু হয়ে যাবার কথা।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে, তা হল, এঁরা বংশানুক্রমিকভাবে ইংরেজের সাথে লড়তে গিয়ে পার্থিব ধ্বংসকে বরণ করে নিয়েছিলেন। এর দ্বারা তাঁদের দেশপ্রীতি ও তেজোদ্দীপ্ত বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, সে আবদুল গফুর, গিয়াসুদ্দিন প্রভৃতি নিঃস্বার্থ বিপ্লবীদের আজকের ইতিহাস কতটুকু ধরে রেখেছে?

পলাশী যুদ্ধোত্তর বিদ্রোহের ধারা (১৭৫৭-১৮৫৭) : ১৭৫৭-তে পলাশীর যুদ্ধ বা মুসলমান শাসনের পতন হয়, আর ১৮৫৭ অর্থাৎ ১০০ বছর পর হয় মহাসংগ্রাম। সৈন্যদের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে সে বিদ্রোহ বলে তা 'সিপাহি বিদ্রোহ' বলা হয়েছে। এ ১০০ বছরের মাঝে ছোট বড় বহু আন্দোলন, আক্রমণ, যুদ্ধ, বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহের ধারা কিন্তু অব্যাহত থেকেছে। তার কিছু নমুনা দেখান যাচ্ছে।

১৭৫৮-তে শাহ আলম বিহার আক্রমণ করেন। ১৭৬০ সনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পূর্নিয়ায় বিদ্রোহ করেন খাদিম হুসেন। ১৭৬১-তে উধুয়ানালায় ও ১৭৬৪-তে বক্সারে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন মীর কাশিম। দরিদ্র অশিক্ষিত শ্রমিকদের 'চোয়াড়' বলা হত; তাঁদের দ্বারা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এক বিরাট বিদ্রোহ হয়। ডঃ এন. ভট্টাচার্য 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস' পুস্তকে লিখেছেন, "১৭৭০ খৃষ্টাব্দে চুয়াড়েরা বৃটিশ এলাকাসমূহে রীতিমত সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল" (পৃষ্ঠা ৬)। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের একটি শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামকে ডাকাত দলের হানা বা লুণ্ঠন বলা হয়েছে। যে ডাকাত বাহিনী হামলা করেছিল সরকারি রেকর্ডে সংখ্যা ৫০,০০০ বলে উল্লিখিত আছে।" এ বছরেই নিঃস্ব ভিক্ষুক ও ক্ষুধার্তের দল একটা বিদ্রোহ করে। তারাই ইংরেজ ক্যাপ্টেন টমাসকে নিহত করতে সক্ষম হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ফকীর ও সন্ন্যাসীদের দ্বারা ইংরেজরা আক্রান্ত হয় এবং তাতে ইংরেজ নেতা মেজর রেনেল গুরুতর আহত হয়ে অকেজো হয়ে যান। ১৭৭৮ ও '৭৯-তে হায়দার আলীর নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালান হয়। ইংরেজদের প্রতিনিধ দেবীসিংহের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় ১৭৮৩ তে তিন হাজার লোকের আক্রমণের ঘটনা ঘটে। (দ্রষ্টব্য ডক্টর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৮)

১৭৮৭ তে সিলেটে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৭৮৮ তে বিদ্রোহীরা প্রায় তিনশ ইংরেজ ও কর্মীদের হত্যা এবং থানা দখল করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের সন্ধির পর হতে ছোট্ট বড় অনেকগুলো বিদ্রোহ হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ভিজিয়ানা গ্রামে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান হয়। ১৭৯৫ সনে আসামে বিদ্রোহ হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিপ্লবের জন্য একটি জোট তৈরি হয়। তার নেতাদের নাম-টিপু সুলতান, জামান শাহ, সিন্ধিয়া, আসাদউদ্দৌলা এবং রোহিলা সর্দার গোলাম মহাম্মদ (তথ্য : ডক্টর এন ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৯)। এ বছরেই বীর টিপু ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন। বেনারসের ইংরেজ রেসিডেন্ট মিঃ চেরীকে হত্যা করা হয় এ সনেই। এ একই বছরে ওয়াজিব আলির নেতৃত্বে বেনারস, গাজীপুর ও আজমগড়ে বিদ্রোহ হয়। ডক্টর এন ভট্টাচার্য লিখেছেন, "শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওয়াজির ব্যর্থ হন, কিন্তু তাঁকে ঘিরে যে ঘটনাচক্র তা নিঃসন্দেহে ইংরেজ বিরোধী সর্বভারতীয় চক্রান্তের তীব্রতা ও ব্যাপ্তির পরিচায়ক।" (পৃষ্ঠা ১০)

১৮০০ খৃষ্টাব্দে বিজনোরে বিদ্রোহ হয়। ১৮০১ সনে গঞ্জাম জেলায় বিদ্রোহ ঘটে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মালবারের বিপ্লবীরা ওয়েনাদ জেলার পানামারাম দুর্গ দখল করতে সক্ষম হন। ১৮০৩ হতে ১৮০৫ পর্যন্ত কর্ণাটকে বিদ্রোহ হয়। ১৮০৪-এ বঙ্গদেশে শরীয়তুল্লার নেতৃত্বে যে প্রচণ্ড বিপ্লব পরিচালিত হয় তার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮০৫-এ বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ হয়। এভাবে কম বেশি কোথাও না কোথাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে মানুষ মাথা তোলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে সেগুলো ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়েছে।

১৮০৬-এ ভেলোরে ও ১৮০৮ সনে ত্রিবাঙ্কুরে ছোট বড় বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সুরাটের আবদুর রহমান বৃটিশ প্রধানকে মুসলমান হতে বলেন এবং তাঁর কাছ হতে করের দাবি জানান। এত স্পর্ধা নিয়ে যে বিদ্রোহ সৃষ্টি হয় তা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ১৮১৩-তে সাহারানপুর জেলায় বিদ্রোহ হয় ১৮১৪ তে মুরসন ও হারাসে বিদ্রোহ দেখা যায়। ১৮১৫ সনে গুজরাটের কাথিয়াবাড় অঞ্চলে বিদ্রোহের কথা জানা যায়। ১৮১৬-তে বেরেলীতে প্রচণ্ড বিদ্রোহ হয়; কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে এর সৃষ্টি হয়েছিল। নামজাদা অনেক ইংরেজ অফিসার তাতে নিহত হন, আর বিপ্লবীদেরও সাড়ে তিনশ জন শহীদ হন। এ বিপ্লবের নেতা ছিলেন মুফতি মহাম্মদ আয়াজ। (ডক্টর ভট্টাচার্য, ঐ, পৃষ্ঠা ১২)

১৮১৭ তে উড়িষ্যা ও ১৮১৯-এ খান্দেশে বিদ্রোহ হয়। ১৮২০ ও '২১-এ বেরেলীর সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে বিরাট আন্দোলন শুরু হয়। প্রথমে ধর্মভিত্তিক ও পরে তা ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে বহু সঙ্গীসহ তাঁর শহীদ হওয়ার কথা পূর্বেই জানান হয়েছে।

১৮২০-৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে এ সর্বভারতীয় সংগ্রাম কোথাও প্রত্যক্ষ আর কোথাও পরোক্ষভাবে চলতে থাকে। ১৮৩২-এ মানভূমে, '৩৫-এ গঞ্জামে,' ৩৬-এ সবন্তবদিতে ও ১৮৩৮-এ আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে সারা বঙ্গে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠেছিল। ১৮৩৮ সনে শোলারপুরেও সৈন্য বিদ্রোহ ঘটেছিল। ১৮৩৯-এ পুনা, ১৮৪০-এ বাদামি, ১৮৪২-এ বুন্দেলখণ্ড, সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ ও মালিগাঁও-এ বিদ্রোহ হয়। ১৮৪৩ ও '৪৪-এ যথাক্রমে জব্বলপুর ও কোলাপুরের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৬ সনে প্রথম ও ১৮৪৮-এ হয় দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ। অবশ্য দুটোতেই ইংরেজদের জয় হয়। ১৮৪৯ এ নাগাল্যাণ্ডে '৫০-এ পাঞ্জাবে ও '৫২ তে খান্দেশ ও চোপদা অঞ্চল বিদ্রোহ রূপ নেয়। ১৮৫৫-৫৬ তে রাজমহল ও ভাগলপুরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। আর ১৮৫৭ তে হয় মহাবিদ্রোহ, মহাভ্যুত্থান বা স্বাধীনতা আন্দোলন—যাকে বলা হয়েছে 'সিপাহী বিদ্রোহ'।

প্রধানতঃ মুসলমান পরিচালিত আন্দোলন ও সংগ্রামগুলো ছিল ইংরেজ সরকার ও তাদের দালাল অত্যাচারী কর্মচারি এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ইংরেজের স্তাবক ও পদলেহীরা সেগুলোকে শুধুমাত্র ধর্মীয় আন্দোলন বলে চালাতে চেয়েছে। আরও বলতে চেয়েছে যে, মুসলমানদের আক্রমণগুলো ছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ সেগুলো ছিল সাম্প্রদায়িক লড়াই। তাই ডক্টর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "১৮৩১-এ কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহেও তারা সমান নিরপেক্ষতার সাথে হিন্দু মুসলমান ভূমি অধিকারীদের উপর হামলা চালিয়েছিল" (পৃষ্ঠা ১৭) অধ্যাপক অমলেন্দু দে লিখেছেন, "জমিদারদের স্বার্থ রক্ষাকারী নয় অথবা জমিদারদের বাসস্থানের সংলগ্ন এলাকায় নয় এমন হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসীরা কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার জন্য আক্রান্ত হয়েছেন এমন কোন তথ্য সরকারী বা বেসরকারী সূত্র থেকে পাওয়া কষ্টকর।" (অমলেন্দু দে, পৃষ্ঠা ১২৯)

"মনে রাখা প্রয়োজন, মুসলিম বিপ্লবীরাই (ও.) সর্ব প্রথম বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংঘবদ্ধভাবে ভারতবর্ষ হতে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য সুদীর্ঘকাল ব্যাপী এক সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আর এ বিপ্লবকে (ও. আন্দোলন), মুসলিম কর্তৃত্ব পুন প্রতিষ্ঠিত করবার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে উল্লেখ করা যায়।" (অমলেন্দু দে : বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

"বিপ্লবী (ও.) খলিফাদের প্রচারের ফলে সুদূর ত্রিপুরা সিলেটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, পাটনা, বেনারস, কানপুর, দিল্লী, থানেশ্বর, আম্বালা, অমৃতসর, ঝিলম, রাওয়ালপিণ্ডি, কটক, পেশওয়ার ইত্যাদি স্থানে এ দলের কার্যালয় স্থাপিত হয়। তাছাড়া বোম্বাই মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদেও বিপ্লবী (ও.) মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে যোগদান করে।" (ঐ পৃষ্ঠা ১১২-১৩)

এ মহাবিপ্লব এমনই মারাত্মক ছিল যে, তার জন্য হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু প্রাট্রিয়ট' পত্রিকাতেও লেখায়—'মহাবিপ্লব' ব্রিটিশ শক্তির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ স্বরূপ দেখা দিয়েছিল। বিদ্রোহকে দমনের জন্য ভারতস্থ ব্রিটিশ শক্তি পর্যাপ্ত ছিলনা। খোদ ইংল্যাণ্ড থেকে প্রভূত রসদের যোগান এসেছিল, সৈন্য এসেছিল পারস্য থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে। (দ্রঃ S.R. Sharma : The Making of Modern India 1951, p. 45-46)

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ পূর্ণতা পেতে পারেনি জমিদার আর রাজাহমারাজাদের বেঈমানি করার কারণে–"যাদের উপর নির্ভর করে ইংরেজরা সে যাত্রায় পার হয়ে গিয়েছিল তারা ছিল ইংরেজ শাসনের দ্বারা সৃষ্টি কিছু অনুগত রাজা, মহারাজা ও জমিদার। উদাহরণ স্বরূপ, বর্ধমানের মহারাজা মহাবিদ্রোহের সময় ইংরেজদের প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।" (ডক্টর ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ২৯)

'সিপাহী বিদ্রোহ' নয়, জনগণের মহাবিপ্লব ঃ ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের নয়। ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছিলেন সত্যিকথা, তবে সৈন্যদের বিদ্রোহ তার আগে ও পরে বহুবার হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এ ১৮৫৭-র আন্দোলনে শুধুমাত্র সিপাহীরা নন, লাখ লাখ সাধারণ মানুষও প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র ধরে লড়াই করেছেন, কোটি কোটি মানুষ তাঁদের সমর্থন করেছেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ, খাদ্য ও অস্ত্র যুগিয়েছেন সাধ্যানুসারে এবং অনেক ক্ষেত্রে সাধ্যাতীতভাবে।

সাতান্নর বিপ্লবকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলার প্রতিবাদে কার্ল মার্কস্ বলেন, "ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীরা অভ্যুত্থানকে কেবল সশস্ত্র সিপাহীবিদ্রোহ রূপে দেখতে চায়, তার সাথে যে ভারতীয় জনগণের ব্যাপক অংশ জড়িত তা লুকাতে চায় তারা।" (প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ কার্ল মার্কস্-ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্, পৃষ্ঠা ১০) বিদ্রোহের ইতিহাস যাঁরা প্রথমে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের সকলেই ছিলেন ইংরেজ, বেশির ভাগ লেখক আবার ইংরেজ রাজপুরুষ। "ইংরেজ ঐতিহাসিকরা একে বলেছেন সিপাহী বিদ্রোহ আর ভারতীয়েরা একে বলতে চান ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।" (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ঃ মণি বাগচি, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা ১)

মুর্শিদাবাদ জেলা তখন ছিল উন্নততর জেলা এবং সেখানে ছিল মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। সেখান থেকেই ভারতের মুসলমান শাসন হস্তান্তরিত হয়েছিল ইংরেজদের হাতে। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৮৫৭ সনের মহাবিপ্লব মুর্শিদাবাদের বহরমপুরেই শুরু হয় সৈন্যদের বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে। সেখান থেকে এ সংবাদ ছড়িয়ে যায় সারা দেশে। তার পরের মাসে গণ্ডগোল হয় ব্যারাকপুরে। দেশের সর্বত্র মাওলানা পীর ও ফকির বেশধারী অসংখ্য মানুষ সিপাহীদের আরও বিদ্রোহী করতে সাহায্য করেন–মার্কস্ও একথা স্বীকার করেছেন। হট্টগোল আরো জোরদার হয়ে উঠল সৈন্যদের টোটা ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেক ক্যান্টনমেন্টে একথা পৌছে দেয়া হল যে, দাঁতে কেটে যে টোটা বন্দুকে দেয়া হচ্ছে তাতে চর্বি আছে। আর চর্বি যেখানে বিক্রি হয় সেখানে গরু, মহিষ ও শূকর প্রভৃতি পশুর চর্বি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সুতরাং আরও ঘোরতর করে রটিয়ে দেয়া হল যে, টোটাতে শুকর ও গরুর চর্বি একত্রে মেশান আছে। এ সম্বন্ধে এ উদ্ধৃতিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়–"১৮৫৭-র গোড়ার দিকে সে মাত্র প্রচলিত শূকর ও গরুর চর্বি মাখান টোটার প্রবর্তন, ফকিরেরা বলতে লাগল–ইচ্ছা করে করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক সিপাহী জাত খোয়ায়।...অযোধ্যা, ও পশ্চিমের প্রদশগুলিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে লোকদের ওসকাতে লাগল এ ফকিরেরা।" (দ্রঃ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, পৃষ্ঠা ১৯৮)

ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে মুসলমানরাই সর্বাগ্রে বিদ্রোহী হয়। কারণ মুসলমান সৈন্যরা মনে করেছিল যে তাদের ধর্মে হাত দেয়া হচ্ছে। মুসলমানদের উত্তেজিত হবার কারণ সম্বন্ধে ইংরেজরা তাদের কর্মচারি হেদায়েত আলীর কাছ থেকে যে রিপোর্ট নিয়েছিল; তা এ রকম ঃ (ক) দাড়ি কাটা বাধ্যতামূলক ছিলনা, কিন্তু পরে দাড়ি কাটতে বাধ্য করা হয়েছিল; (খ) শূকরের চর্বিযুক্ত টোটা দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে হয়; (গ) সরকারি হাসপাতালে মেয়েদের পর্দা তুলে দেয়া হয়; (ঘ) সৈন্যদের শপথ নেয়া হয়, যেকোন দেশের সাথে বা যেকোন দূর দেশের যুদ্ধে যোগদান করতে হবে ইত্যাদি।

মুসলমান মৌলবী, মাওলানা, ফকিরেরা এবার সারা দেশে রটিয়ে দিলেন যে, ময়দাতে হাড়ের গুঁড়া মেশান আছে। হিন্দুদের মধ্যে ছড়ান হল, ইংরেজদের তত্ত্বধানে যে সব ময়দা তৈরি হচ্ছে তাতে গরুর হাড়ের গুঁড়া মেশান হচ্ছে। সারা দেশের কেহ আর আটা বা ময়দা কিনতে চায় না। এমনকি ভারতীয় সৈন্যরাও রুটি খেতে অস্বীকার করল। এমনিভাবে লবণে হাড়ের গুঁড়া, ঘিয়ের সাথে জন্তুর চর্বি এবং কুয়ার জলে শূকর ও গরুর মাংস ফেলে জল অপবিত্র করা হয়েছে–এমন গুজবও রটে গেল। "পাউরুটিকে তখন লোকে বলত বিলিতী রুটি আর তাদের ধারণা ছিল এ বিলিতী রুটি খেলে জাত যাবে।" (তথ্য ঃ মণি বাগচি, পৃষ্ঠা ৪৫)

সমুদ্র পার হয়ে ভারতের বাইরে যুদ্ধে যাওয়া রীতি বিরুদ্ধ কাজ ছিল বলে ভারতীয় হিন্দু সৈন্যরাও ইংরেজদের উপর ক্ষেপে ওঠে। সৈন্যদের রান্নার ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান উভয়ের জন্য যে পৃথক পৃথক পাচক থাকত তা তুলে দেয়াও ক্ষোভের অন্যতম কারণ। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে সামনে করে বিধবা বিবাহ আইন পাশ করা হলে অনেকে তাঁদের ধর্মে হস্তক্ষেপ হয়েছে বলে মনে করেন। তাছাড়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক সতীদাহ প্রথাকে শুধু নিষিদ্ধই করলেন না, আইন করে দিলেন যে, সতীদাহের ব্যাপারে জড়িত ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড দেয়া হবে। শেষে পুরী জগন্নাথ মন্দিরের কর্তৃত্ব ইংরেজ কোম্পানী হাতে নিলে ক্ষোভ চরমে ওঠে। তাছাড়া তখন খৃষ্টান ধর্মপ্রচার এত ব্যাপক হচ্ছিল যে, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির সাধারণ মানুষ ও সৈন্যরা ক্ষেপে উঠতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাদ্রীরা হাট, ঘাট, বন্দর, জেল, হাসপাতাল ও স্কুল সর্বত্রই তাদের ধর্ম প্রচার করতে থাকে। প্রত্যেক স্কুলে বাইবেল শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ছাত্রদের প্রশ্ন করা হত, 'তোমাদের প্রভু কে এবং কে তোমাদের মুক্তিদাতা?' ছাত্ররা শেখান খৃষ্টীয় পদ্ধতিতেই তার উত্তর দিত। (দ্রঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ঃ আহমদ ছফা, পৃষ্ঠা ১২, ১৩ ও ১৪)

মিঃ হোম্সের উদ্ধৃতি দিয়ে আহমদ ছফা বলেছেন, "হায়দার আলীর মত সামরিক প্রতিভার অধিকারী হলেও একজন সিপাহীকে কিছুতেই (তার) অধীনস্থ একজন ইংরেজ সেপাইর মাইনে দেয়া হবে না এ বৈষম্যের কারণে কর্তৃপক্ষের প্রতি সেপাইদের বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে।" এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন, ইংরেজ অফিসাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে হিন্দু স্ত্রীলোক রাখতেন। অনেক সেপাইকে অর্থ ও নানা চাপ দিয়ে তাদের আত্মীয়াদের এনে দিতে বাধ্য করাতেন তাঁরা। অবশ্য দারিদ্র্যের কারণে, টাকার লোভে অনেকে আপন আত্মীয়াদেরকেও সাহেবদের দিয়ে দিত। (আহমদ ছফা ঃ ঐ ২৫, ৩১)

ব্যারাকপুরের সৈন্য মঙ্গলপাণ্ডে তাঁর ধর্মে হস্তক্ষেপ হয়েছে মনে করে ইংরেজদের উপর ক্ষেপে ওঠেন। তিনি লেফটেন্যান্ট বগকে গুলি করেছিলেন। মিঃ বগও পিস্তলের গুলি ছোঁড়েন। অবশ্য দুজনেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। মঙ্গলপাণ্ডে তাঁর ভবিষ্যত চিন্তা করে আত্মহত্যার জন্য নিজের বুকে গুলি করলেন। মৃত্যু হলনা, হাসপাতালে যেতে হল। পরে বিচারের নামে প্রহসনে জনসাধারণের সামনে তাঁর ফাঁসি হয় (৮ই এপ্রিল)। নিঃসন্দেহে তাঁর বুকের সে রক্ত আজ ভারতের হিন্দু মুসলমান সকলের জন্য এক গৌরবময় ইতিহাস-সম্ভার।

১৮৫৭ সনের ৩১শে মে সারা ভারতে একসাথে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও আন্দোলনের আগুন জ্বেলে অভ্যুত্থান ঘটান হবে ঠিক করা হল। আর সর্বত্র সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা হল 'চাপাটি রুটি'র মাধ্যমে। এ রুটির ভিতরে থাকত পত্র। সুদক্ষ বৃটিশ গুপ্তচরও তা টের পায়নি। মুসলমান ফকির মাওলানাদের এ কৌশলটি তাঁদের সুনপুণ বুদ্ধির পরিচয় বহন করে–"বিদ্রোহের বাণী সেদিন সারা ভারতে প্রচারিত হয়েছিল এক আশ্চর্য উপায়ে–চাপাটির মারফত।...এছাড়া, মুসলমান সিপাহীদের প্ররোচিত করবার জন্য বহু মুসলমান ফকিরের

Goto List

সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল" (মণি বাগচি, পৃষ্ঠা ৭৩)। এদিকে ৩১শে মে আসার আগেই মীরাটে ২৫ জন ভারতীয় সৈন্যকে কঠিনভাবে শাস্তি দেয়া হয়। ফলে কর্ণেল স্মিথের উপর লোক আরও ক্ষেপে ওঠে। এত হৈ চৈ সত্ত্বেও তিনি 'দিল্লি গেজেটে' লিখলেন : দিল্লী শান্ত, বিদ্রোহীদের শাস্তি দেয়ার পর মনে হচ্ছে এখানে আর কোন বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা নেই। তারপরেই দেখা যায়, ভারতীয় জনসাধারণ ও সৈন্যরা জেলখানার লোহার গেট ভেঙ্গে ফেলেন এবং বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবক ও সৈনিকদের পায়ের বেড়ি খুলে দিয়ে মুক্ত করে দেন। খবর পেয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে কর্নেল ফিনিস একদল ইংরেজ সৈন্য নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বিপ্লবীদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেদিন কিন্তু সৈন্যরা তাঁকে কোন সম্মান তো জানলেনই না, বরং সকলে সিংহের মত গম্ভীর হয়ে চোখের ভাষা দিয়ে জানিয়ে দিলেন--'আমরা তোমার গোলাম নই।' পলকের মধ্যেই বিপ্লবীদের বন্দুক থেকে ঝাঁকে গুলি বের হতে লাগল--কর্নেল মিঃ ফিনিশ সাথে সাথে মারা গেলেন।

সারা ভারতে বিশাল জনতা ও বিপ্লবীদের তখন যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তিনি সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। তাঁর সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। সৈন্যরা মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিতেন 'দ্বীন দ্বীন' রবে। মুসলমান যোদ্ধারা বলতেন, "আমরা স্বধর্ম রক্ষা করার জন্য এখানে যুদ্ধ করতে এসেছি।" আরও বলা হত--ইংরেজ শাসন ধ্বংস হোক, বাদশাহ দীর্ঘজীবী হোন [দ্রঃ মণি বাগচি, পৃষ্ঠা ৯৯-১০১] বাগচি মহাশয় 'দ্বীন' বানান 'দীন' লিখেছেন। কিন্তু ওটা 'দীন' না হয়ে 'দ্বীন' হবে। কারণ 'দীন' অর্থে দরিদ্র আর 'দ্বীন' বলতে ধর্মকে বোঝায়।

বিপ্লবী সৈন্যরা একদিন মীরাটের রাস্তা ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিলেন। মিঃ ফ্রেজার ও ডগলাস তখন ক্রোধে অধীর হয়ে বিপ্লবীদের উপর উপর গুলি ছুঁড়লে অনেকেই মারা যান। তারপর সাহেবরা অবশ্য লুকিয়ে পড়েন। এর প্রতিশোধে মিঃ ফ্রেজার, মিঃ হাচিনসন, মিঃ ডগলাস, জেনিং দম্পতি ও মিস ক্লীফোর্ডকে নিহত হতে হয় বিপ্লবীদের হাতে। পরে কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল মিঃ রিপ্লে দিল্লিতে বিপ্লবীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য বাছাই করা ইংরেজ সৈন্য এবং আরও কয়েকজন বিচক্ষণ অফিসার নিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে প্রবল গুলি বর্ষণ শুরু হলে মিঃ রিপ্লে ও চারজন অফিসার নিহত হন।

যদিও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের কঠোর নিষেধ ছিল ইংরেজ শিশু ও মহিলা যেন নিহত না হয়, তবুও বিপ্লবীরা সে চরম মুহূর্তে তাঁর এ কথা পালন করতে পারেন নি। ১৬ই মে বেসামরিক অনেক খৃস্টান নারী ও বালককে আরো ভাল বন্দীখানায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বের করে লম্বা দাড়ি দিয়ে বেষ্টনী দিয়ে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে নিহত করা হয়। এ সঙ্কট সময়ে একজন বুদ্ধিমতী মহিলা মিসেস আলডোয়েল বলেছিলেন, মারার আগে তাঁদের কি অপরাধ আছে জানিয়ে দিলে ভাল হয়, কারণ মহিলা ও শিশুরা আপনাদের তো কোন দিন কোন ক্ষতি করেনি। উত্তরে বিপ্লবীরা ওই সময় খৃস্টান জাতির কাউকে ছাড়বেন না বলে জানান। চতুর মহিলা বুঝলেন, জনতার বেশির ভাগই মুসলমান। তাদের মুখে আওয়াজ 'দ্বীন দ্বীন জিন্দাবাদ।', ইংরেজকে খতম কর ইত্যাদি। তাই মিসেস আলডোয়েল বললেন, 'আমি মুসলমান হয়েছি তবুও কি আমি রেহাই পাবনা?' এ উত্তরে বিপ্লবীরা তাঁকে ও তাঁর তিনটি পুত্রকে অবশ্য স্পর্শ করেন নি। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে'ও লেখা হয়েছে, "রক্ষা পাইয়াছিল শুধু মিসেস আলডোয়েল ও তাহার তিনটি শিশু পুত্র। সে নিজেকে মুসলমান ধর্ম অবলম্বীনী বলিয়া প্রকাশ করালে ঘাতকেরা তাহার জীবন সংহার করে নাই।" (মণি বাগচির লেখা 'সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসের ১১১ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ছিল এ আন্দোলন–তাই বলে কি এ সত্য তথ্যগুলো চাপা দিতে হবে, বর্তমান ও আগামী দিনের পাঠকদের জানতে না দেয়ার জন্য? মণি বাগচি লিখেছেন, “দিল্লিতে বিষাদ, মিরাটে লজ্জা। ছয় দল বিদ্রোহী ও নগরবাসী উন্মত্ত মুসলমান দল তাহাদের বাদশাহের নামে এ সংস্থার কার্য প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শাহজাদারা বিদ্রোহী পক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন,” (সি. যু. ই. পৃষ্ঠা ১১২)। এতে বিপ্লবীরা নিষ্ঠুর ছিলেন বলে মনে হতে পারে কিন্তু মনে রাখা দরকার, ইংরেজরা প্রথমে যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় ইতিপূর্বে দিয়েছে তার প্রত্যুত্তর ছাড়া এগুলো অন্য কিছু নয়।

ঐ মিরাটে পঞ্চাশ জন বিপ্লবী ধরা পড়লেন। তাঁদের বিচার না করে প্রত্যেকের হাত বেঁধে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে কামান দাগা হল, সাথে সাথে পঞ্চাশটি প্রাণ ও তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উড়ে গেল কামানের গোলায়। অবশ্য ঘটনার নায়ক মিঃ ফ্রেজারকে বিপ্লবী আবদুল কাহার গুলি করে হত্যা করেন।

ঠিক এ সময় (৮ই জুন রাণী ভিক্টোরিয়া এক আইন পাশ করলেন ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাছাই করা ইংরেজ অফিসারদের নিয়ে গঠিত নতুন কমিটি বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদের ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও কারাদণ্ড দিতে পারবে। আপীল করার আর কোন রাস্তা রইল না।

বেনারসে হিন্দু সংখ্যাধিক্য। সেখানে তখন এক হাজার চারশো চুয়ান্নটি দেবমন্দির এবং দুশো বাহাত্তরটি মসজিদ ছিল। মোঘল বংশের বিপ্লবী ‘ফিরোজ’ এ সময় বেনারসে পৌছাতেই তাঁকে দেখবার জন্য হিন্দু মুসলমানের ভিড় জমে উঠল। তখন কাশীর লোকসংখ্যা মিঃ মেকলের মতে পাঁচ লক্ষ। শতকরা ৯০ জন হিন্দু। মোঘল রাজকুমারদের নেতৃত্বে সমস্ত লোককে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। ব্যবসাদারদের পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করান সম্ভব হয়েছিল (দ্রঃ মণি বাগচি, পৃষ্ঠা ১৪৫)। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করতে বিপ্লবীরা টোটায় চর্বি মেশানর কথাতেই বেশি সাফল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু অতীব দুঃখের কথা যে, কাশীর রাজা ইংরেজের বিপক্ষে তো গেলেনই না, বরং ইংরেজদের সর্ব প্রকার সাহায্যই করেছিলেন। মণি বাগচি লিখেছেন, “৪ঠা জুন রাত্রে কাশীর রাজা ইংরেজ মিশনারীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দান করেছিলেন। এমনকি, অর্থ ও সৈন্য সাহায্য করতেও তিনি কৃপণতা করেন নি। শহরে জনতা, আতঙ্ক ও গোলমাল। মুসলমানেরা উড়িয়েছে সবুজ পতাকা। কয়েদীরা মুক্ত হয়েছে জেলখানা থেকে।” (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৪৯)

ইংরেজ সৈন্য নিয়ে মিঃ নীল চরম আক্রমণ করলেন বিপ্লবীদের। পরাস্ত হতে হল বিপ্লবীদের–কাশীর রাজার সাহায্য পেয়ে মিঃ নীল নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নিলেন। কাশীর বাইরে হতে আসা বিপ্লবী জনতা এবং কাশীর জনসাধারণ বহু বিশ্বসঘাতক শিখকে নিহত করলেও কিন্তু শেষ উদ্ধার হয়নি। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে লেখা হয়েছে–“বহুলোকের ফাঁসি হইল, পল্লীতে পল্লীতে নির্মম বেত্রঘাত বেপরোয়াভাবে চলিল। সারি সারি ফাঁসিকাষ্ঠে বহু নির্দোষীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। কর্নেল নীলের নির্দেশে ইংরেজ সৈনিক ও কর্মচারীরা কাশীর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে প্রবেশ করিয়া সেখানকার বহু লোককে রাস্তার দুই ধারের গাছে গাছে ফাঁসি দিয়া লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে লাগিল।” (পৃষ্ঠা ১৫৭)

মাওলানা লিয়াকত আলির নেতৃত্বও সেদিন সারা দেশকে তোলপাড় করেছিল। যে কথাকে কেন্দ্র করে তিনি জনসাধারণকে উত্তপ্ত করতে পেরেছিলেন তা হচ্ছে–ইংরেজরা ছলে বলে সমস্ত মানুষকে খৃষ্টান করে ফেলবে; কোরআন, পুরাণ সব খতম হয়ে যাবে। একদিকে মাওলানা লিয়াকত ছিলেন বিখ্যাত বক্তা, অন্যদিকে ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী ও সংগ্রামী সংগঠক। বাগচি মহাশয়ও এর সমর্থনে লিখেছেন, “ইংরেজরা এবার স্থানীয় লোকদের জোর করে খ্রীস্টান করবে কিংবা অন্যভাবে তাদের জাত মারবে–এ জনরবের মূলে ছিলেন চুম্বুবাগের এক মৌলভী। নাম লিযাকত আলী” (পৃষ্ঠা ১৫৩)।

এলাহবাদেও এ আগুন চরম রূপ নিয়েছিল একদিন ইংরেজ নেতা কর্নেল সিম্পসন চমকে উঠলেন বিপ্লবীদের কামানের আওয়াজে ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কেন এরকম করছ? 'উত্তরে সাথে সাথে বিপ্লবীরা গুলি করলেন। গুলিতে তাঁর মাথা না উড়ে চুপি উড়ে গেল। সংবাদ পেয়ে আট জন খাস ইংরেজ সৈন্য তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এল। কিন্তু গুলিবৃষ্টিতে সকলকেই নিহত হতে হল। এরপর বিপ্লবীরা জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদীদের মুক্ত করে দিল। রেলের কারখানা ধ্বংস করে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিল–"দুর্গের বাইরে যেকানে যত ইংরেজ ছিল তাদের তাদের প্রায় সবাই নিহত হল। কোতোয়ালীর মাথায় উড়ল মুসলমানদের সবুজ পতাকা। বিদ্রোহীদের তোপে তোপে রেলইয়াডেংর ইঞ্জিনগুলো চূর্ণ হয়ে যেতে লাগল।" এরপর সেনাপতি মিঃ নীল ১৮ই জনু নানা প্রদেশ হতে ইংরেজ সৈন্য যোগাড় করে একটা বড় ষ্টিমারে কামান সাজিয়ে গঙ্গা নদীর দুই ধারে বেপরোয়া ভাবে গোলা বর্ষণ করতে লাগলেন। কামানের বর্ষণে নগর জনশূন্য হল, অর্থাৎ ইংরেজ প্রতিষ্ঠা করার তাদের পুনর্শাসন।

মারাঠা নেতা নানা ঃ বাজীরাও ছিলেন মারাঠা নেতা। তাঁর সাথে ইংরেজদের ভাব ভালবাসা ছিলে পুরো মাত্রায়। ইংরেজদের প্রেম কিন্তু বাজীরায়ের মত মৌলিক বা নির্ভেজাল ছিলনা, বরং ছিল ভণ্ডামির উপর সত্যের প্রলেপ। বাজীরাওয়ের ঔরসজাত পুত্র না থাকায় তিনি ইংরেজ নেতাদের অনুমতি ও প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে পালিত পুত্র নানাকে দত্তক নেন এবং মৃত্যুর পূর্বে একটা অনুরোধ পত্র লিখে রেখে যান। নানা সে সাহসেই রাজকীয় মর্যাদা নিয়ে ইংরেজদের সাথে সুব্যবহার করে গেছেন বরাবর। এমনকি ইংরেজদের আপদে বিপদে সৈন্য দিয়ে অর্থ দিয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করে এসেছেন। দাগারাজ ইংরেজদের দাগাবাজির ইতিহাস তাঁর জানা ছিল। কিন্তু তাঁর পিতৃস্বত্ব উপক্ষো করা হয় তখন তিনি খুব বিপদে পড়েন। ঠিক তখন তিনি এমন একজন খুঁজছিলেন যিনি তাঁর পক্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডে যাবেন সরাসরি আবেদন জানাতে অবশেষে ইতিহাসে চাপা বিখ্যাত নেতা আজিমুল্লার সাক্ষাত পেলেন।

আজিমুল্লাহ খুব সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, কিন্তু খুব দরিদ্র। দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে তাঁর মাকে চাকরানীর কাজ পর্যন্ত করতে হয়েছিল। ছেলেকে মানুষ করে গড়ে তোলা ছিল তার বুক ভরা আশা। তাই শৈশবের প্রাথমিক কাজগুলো অনেক কষ্টে তিনি সেরে রেখেছিলেন বুদ্ধিমান বালক কিন্তু পরে বুঝতে পারলেন যে, স্কুলে লেখাপড়া করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এক ইংরেজের ভৃত্যের কাজ করতে শুরু করেন। সে সাহেবটি ফারসী ভাষায় ছিলেন খুব সুদক্ষ। আর ইংরাজী তো তাঁর মাতৃভাষা। কিছুদিনের মধ্যে আজিমুল্লাহও ইংরেজী ও ফার্সী ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন এবং সাফল্যের চিহ্ন স্বরূপ তিনি একটি স্কুলের শিক্ষক হলেন অবশ্য শিক্ষক হবার পূর্বে তিনি সাহেবের চাকরি, ছেড়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে নানা সাহেব ইংল্যাণ্ড যাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আলাপী, মিষ্টভাষী, সুদর্শন যুবক। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি নানান আবেদন পেশ করেন। কিন্তু তাঁকে বিফল হতে হয়। ঠিক তখন আর একজন ভারতীয় রঙ্গ বাপুজী সেতারার রাজার আবেদন নিয়ে ইংল্যাণ্ডে পৌছান। তিনিও বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে মনস্থ করলে আজিমুল্লাহ তাঁর দ্বারা নানা সাহেবকে সংবাদ দেন যে, তাঁর দেশে ফিরতে দু'তিন বছর দেরী হতে পারে। সে সাথে আরও জানালেন, 'আমার কথায় যখন কাজ হল না তখন ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়ানর রাস্তা করে তবেই ফিবর'। ওদিকে বিলেতে বিদ্রোহী দলের অনেক মুসলমান ইংরেজ-ধ্বংসের কাজে সেখানে আসা যাওয়া ও ঘাঁটি তৈরীর কাজ পূর্বেই শুরু করেছিলেন

তারা আজিমুল্লাহকে পরামর্শ দিলেন যে, নানার দ্বারা প্রত্যেক ইংরেজ প্রেমিক হিন্দু রাজাদের বিদ্রোহী দলে আনতে পারলে প্রভূত ও দ্রুত সাফল্য পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য আজিমুল্লাহও একথা ভেবেছিলেন।

আজিমুল্লাহর মিশুকে ভাব ও সুন্দর চেহারার সুবাদে তিনি সেখানে বহু রাজনৈতিক নেতাদের সাথে ও তাঁদের বাড়ির মেয়েদের সাথে আলাপ করতে সক্ষম হন। দেশে ফেরার পরেও 'ডার্লিং আজিমুল্লাহ' বলে তাঁকে অনেকে চিঠিপত্র লিখতেন–তাঁদের মধ্যে অনেক রাজপরিবারের ছেলেমেয়েও ছিলেন।

যেহেতু তখন সারা মুসলিম বিশ্ব তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলে সম্মান করত, তাই ইংল্যাণ্ড থেকে তিনি তুরস্কে গিয়েছিলেন। ওখানে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, বৃটিশরা বিশ্বের বহু জায়গায় তাদের রাজত্বে পরাজিত হচ্ছে ও মার খাচ্ছে। ওখান থেকে তিনি রাশিয়ায় যান। 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা মিঃ রাসেল রাশিয়ায় থাকতেন। আজিমুল্লাহ তাঁর আত্মীয় আত্মীয়াদের পত্র যোগাড় করে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাঁর কাছেই থাকতে শুরু করেন। মিঃ রাসেলকে তিনি 'বন্ধু' বলেন এবং তাঁকেও 'বন্ধু' বলিয়ে নিলেন। রাসেলের যুক্তি ও সহায়তায় তিনি রাশিয়া থেকে মিশরে যান। ওখানে প্রয়োজনীয় প্রচার ও অপপ্রচারের কাজ সেরে শেষে ভারতে ফিরেন। আজিমুল্লাহ খাঁনের কর্মজীবন ও মৃত্যুর সম্বন্ধে Eighteen Fifty Seven পুস্তকের ১২৬–১৪৫ পৃষ্ঠার ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন বিস্তারিত প্রামাণ্য তথ্য পেশ করেছেন।

এবার ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই ও তাঁতিয়া তোপী সম্পর্কে কিছু বলছি। রাণী লক্ষ্মীবাঈ দাগাবাজ ইংরেজের কাছ থেকে যখন অত্যন্ত আঘাত পেলেন তখন স্বামীহারা বাণী তাঁর পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে নিজেই নেতৃত্ব দিতে সংকল্প করেন। ওদিকে তাতিয়া তোপী ছিলেন নানার নিকটাত্মীয়। বলাবাহুল্য, কানপুর-বিঠুরের বিপ্লবে জড়িয়ে আছেন আজিমুল্লাহ, তাঁতিয়া তোপী, নানা সাহেব ও রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

১৮৫৭ সনের ১৮ই মার্চ মিঃ হুইলার নির্লজ্জের মত নানার কাছে পুরাতন বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সৈন্য ও সাহায্য চেয়ে পাঠান। নানা বন্ধুর পত্র পেয়ে তিন শত অশ্বারোহী ও কয়েকটি কামান পাঠিয়ে দিলেন। নানা বোধ হয় ভেবেছিলেন, বিপদে সাহায্য করলে পরে হয়ত তাঁর পুরনা সম্মান ও সম্পদ ফিরে পাওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে নবাবগঞ্জে নানাসাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে এলেন একদল ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী। দলের নেতা শামসুদ্দিন ও মুদ্দত আলী তাঁকে বোঝালেন, যে, 'আপনি ইংরেজদের সাহায্য করে ভুল করছেন। আমরা ওদের কিছু দিনের মধ্যে তাড়িয়ে দেব–ভারতবাসীর কাছে মার খেয়ে কুকুরের মত বিদায় নেবে তারা। ইংরেজ আমাদের অস্ত্রাঘাতে হবে বিতাড়িত, তকন দেশবাসীর কাছে আপনাদের লজ্জিত হতে হবে। যে বৃটিশ সারা পৃথিবীতে তাদের প্রভুত্ব ও রাজত্ব কায়েম করেছে, তাদের সাথেও আমরা যুদ্ধ করতে পিছপা নই। ইংরেজের মিত্র হিসেবে আপনার সাথে যুদ্ধ করতেও আমাদের বাধ্য ছিলনা। বাধ্য শুধু এটুকু যে আপনি আমাদের বিপ্লবী মহান নেতা আজিমুল্লাহর বন্ধু।' নানা এবার সাথে সাথে জানিয়ে দিলেন যে, 'আমি আজিমুল্লাহর মতের বাইরে যাব না। আর ইংরেজদের প্রতি আমার ভালবাসা ছলনা মাত্র। আজ থেকে আমি বিপ্লবীদের সমর্থক এবং আমার সমস্ত সাহায্য ও সহযোগিতা তাদের সাথে থাকবে।' নানা শেষ কথা বললেন–'আমিও তোমাদের একজন। বললেন নানা সাহেব। (মণি বাগচি, পৃষ্ঠা ১৭০)।' তারপরেই বিদ্রোহী দল নানার সৈন্যদের সাথে মিলিত হল। ইংরেজের ধনাগার লুঠ করল। অস্ত্রাগার হস্তগত হল। তখনও মিঃ হুইলার মনে করছেন যে, নানার সৈন্যরা যথারীতি তাঁদের অস্ত্রাগার পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তাঁর সে আশায় ছাই পড়েছিল।

বিপ্লবী দল নানা সহ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের কাছে যাবার মনস্থ করলেন। কিন্তু অনেক ভাবনাচিন্তা করার পর নানা কানপুর ছেড়ে যেতে চাইলেন না (ঐ, ১৭২)। কানপুরের সবেদা কুঠিতে আজিমুল্লাহ, নানা সাহেব ও তাঁতিয়া তোপীর পরামর্শ হল যে, ইংরেজকে ধ্বংস করা ছাড়া তাঁদের আর কোন কাজ নেই। সে মত আজিমুল্লাহ ও নানার স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে মিঃ হুইলারকে আত্মসমর্পণ করতে জানান হলে মিঃ হুইলার তা অস্বীকার করেন। পরেরদিন দারুণ দুঃসাহস নিয়ে আজিমুল্লাহ নানা সাহেবের প্রতিনিধি জোয়ালাপ্রসাদকে নিয়ে ইংরেজ শিবিরে গেলেন। সেখানে ছিলেন ক্যাপ্টেন মুর ও ক্যাপ্টেন হুইটিং। তাঁরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁহাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। আলোচনার শেষে এটাই স্থির হল যে, ইংরেজ তাদের সঞ্চিত অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করবে এবং গঙ্গার ঘাটে নৌকা প্রস্তুত থাকবে, তাতে করে তারা সকলে পরিবারসহ চলে যাবে। শেষে মিঃ হুইলার আজিমুল্লাহর হাত থেকে আত্মসমর্পণের কথা লিখিত কাগজ নিয়ে তাতে সই করেন। এরপরে চুক্তিমত যথাসময়ে ইংরেজরা দলে দলে গিয়ে নৌকায় উঠল। প্রথমে তারা জানতে পারেনি যে, ঐ নৌকাগুলোকে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করা হবে। মণি বাগচি লিখেছেনথ–"কিন্তু ওগুলো তো নৌকা নয়, নানা সাহেবের জাতিকল। কলে পড়বার আগের মুহূর্তেও ইঁদুর যেমন বুঝতে পারেনা যে ওটা ঝাঁতিকল–তারা দেখেছে এসব নৌকায় তোলা হয়েছে জলের কলসি, আটার বস্তা, চিনি, মাখন আরো কত কি! কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে, এ শুধু ছলনা এবং নানা সাহেবের ছলনার আয়োজনের খুঁত ছিলনা এতটুকু" (পৃষ্ঠা ১৮১)। নৌকা ছাড়া হল। মাঝিরা মাঝ পথে নৌকা ছেড়ে পালিয়ে এল। শুরু হল দু'দিন থেকে গুলি বর্ষণ। নৌকার উপরের ছাউনিতে আগুন ধরে গেল। তীব্র আক্রমণ ও অত্যন্ত গোলা বর্ষণে মাত্র চারজন ছাড়া সকলেই নিহত হল। সে চারজন নৌকা থেকে প্যালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন বিপ্লবীদের শত্রু, ইংরেজের অনুরক্ত দ্বিগ্বিজয়ী সিং। (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৮৩।)

এরপর নানা 'পেশোয়া' নাম ধারণ করলেন। ললাটে রাজটীকা ধারণ করলেন বটে, কিন্তু প্রভুত্ব পরিচালনা করতে পারলেন না; প্রভূত্ব ও নেতৃত্ব রইল আজিমুল্লার হাতে। দুঃখের বিষয়, ইতিহাসে নানার নাম যেভাবে চিত্রিত রয়েছে, ততটুকু সম্মান দিয়েও আজিমুল্লাকে সম্মানিত করা হয়নি।

যাহোক, এ সংবাদ পেয়ে কলকাতা থেকে লর্ড ক্যানিং মেজর রেনডকে কানপুরে পাঠালেন। সাথে চারশো ইংরেজ, তিনশো শিখ, একশো অশ্বরোহী সৈন্য ও দুটো কামান। ইংরেজরা কানপুরকে শ্মশান করার জন্য আসছে, এ সংবাদ পেয়ে নানা সাহেবের বাড়ির কাছে 'বিবির'-এ যত ইংরেজ নারী ও পুরুষ বন্দী ছিল তাদের সকলকে হত্যা করা হল। অবশ্য কোন ইংরেজ মহিলার সতীত্ব নষ্ট হয়নি। ইংরেজ সৈন্য পৌঁছে গেল কানপুরে,মিঃ হ্যাভলক তাদের নেতা। ইংরেজ সৈন্য ও তাদের সহকারী শিখ সৈন্য একধার থেকে দোকান, ঘর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে মানুষের সর্বস্ব লুট করল। "১৭ই জুলাই হ্যাভলক কানপুর অধিকার করলেন, তবে তিনি যে হত্যাকাণ্ড করেছিলেন তা অকল্পনীয়। তাছাড়া বন্দী আসামীদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ সুবেদারকে মানুষের রক্ত মেঝে থেকে জিভ দিয়ে চাইতে আদেশ করা হয়। ব্রাহ্মণ অস্বীকৃত হলে প্রচণ্ড বেত্রাঘাতে তাঁকে বাধ্য করান হয় ও শেষে তাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝোলান হয়। দ্বিতীয় আসামী এক মুসলমান। তাঁর প্রতিও এ একই আচরণ করা হয়। এভাবে একে একে সমস্ত ভারতবাসীদের হত্যা করে নিহতদের কুয়ার মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দেয়া হয়। (দ্রঃ মনি বাগচি, পৃষ্ঠা ২০২)

নানা বীরবিক্রমে লড়াই করেছেন, ইংরেজকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পোষণ করেছিলেন এবং প্রাণ বিসর্জনও করেছেন–এজন্য তিনি সাতান্নর বিপ্লবের ইতিহাসে একজন বীরবিপ্লবী। তাঁর লড়াই ও আত্মত্যাগকে ভুললে বা অবজ্ঞা করলে সত্যকে অস্বীকার করা হয়। তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়ার সুযোগ তাঁর হয়নি–মনের দুঃখ আত্মহত্যা করেছিলেন। "১৮ই জুলাই তারিখে রাতের অন্ধকারে নানা সাহেব বিঠুর ছেড়ে চলে গেলেনঃ তিনি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু গুজব রটান যে তিনি অযোগ্যা চলে গেছেন" (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসঃ আহমদ ছফা, পৃষ্ঠা ১৩৮)। নানার ইতিহাসে একটি কাল দিক আছে। সেটা হচ্ছে নানাকে যদিও ইংরেজরা বারবার ধাপ্পা দিয়েছে তবও তাঁর ইংরেজ প্রীতি কোন সময়েই সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়নি। সেটা ইংরেজদেরকে লিখিত নানার চিঠিপত্রে প্রমাণিত হয়। কর্নেল পিঙ্কনকে ২০.৪.১৮৫৯-এর একটি পত্রে নানা লিখেছেন, "আমি নিরুপায় হয়েই বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়াছিলাম। আমার দ্বারা কোন প্রকার হত্যাকার্য সাধিত হয় নাই। আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, আমি খুনী নহি কিংবা আমি বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধীও নহি, তথাপি ঘোষণাপত্রে আমার সম্পর্কে কোন আদেশ দেয়া হয় নাই।... আপান সকলের অপরাধ ক্ষমাকরিয়াছেন এবং সকলেই এখন আপনার পক্ষে যোগাদন করিয়াছে। একমাত্র আমার কথাই বিবেচনা করা হয় নাই।... মৃত্যু একদিন আসিবে অতএব তাহার জন্য আর ভয় কি?... যদি মনে করেন তাহলে আমার পত্রের উত্তর দিবেন। মুর্খ বন্ধু অপেক্ষা জ্ঞানবান শত্রু শ্রেয়। ইতি-ধুন্ধু-পন্থ নানা।" অপরটি ২২ শে রমজান, ২৬শে এপ্রিল ১৮৫৯ তারিখের পত্র, সেটা তিনি মেজর রিচার্ডসনকে দিয়েছিলেন ঃ "....কিন্তু আমি এইভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। তবে মহারাণীর (ভিক্টোরিয়া) স্বাক্ষরমযুক্ত ও শীলমোহর করা একখানি পত্র আমার নিকট যোগ্য সামরিক অফিসার মারফত যদি পৌছায় তাহা হইলে আমি পত্রে উল্লিখিত শর্তাবলী বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইতে পারি। আপনারা হিন্দুস্থানে এ পর্যন্ত যত দাগাবাজি করিয়াছেন, তাহা জানিয়া শুনিয়া আমি কিজন্য আপনাদের সহিত যোগদান করিব?... যতদিন আমার দেহে জীবন থাকিবে ততদিন আমার ও আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ চলিবে। আমি নিহত হই কিংবা ধৃত হই অথবা আমার ফাঁসী হয়, যাহা কিছু করিনা কেন অস্ত্রের সাহায্যেই তাহা করিব। তবে মহারাণীর (ভিক্টোরিয়া) স্বাক্ষরযুক্ত পত্র পাইলে আমি আত্মসমপর্ণ করিতে প্রস্তুত আছি।" এই পত্রে বোঝা গেল, তিনি আত্মসমর্পণ করতে রাজি ছিলেন, ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিতেও সম্মত ছিলেন, শুধু রাণী ভিক্টোরিয়ার আসল শীলমোহর যুক্ত পত্রের প্রতীক্ষা মাত্র। এই বঙ্গানুবাদগুলো শ্রীমণি বাগচির পূর্বোক্ত পুস্তকের পরিশিষ্ট অধ্যায়ের ১-৩ পৃষ্ঠায় আছে। অবশ্য মূল পত্রের পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের Eighteen Fifty Seven পুস্তকের (১৯৫৭ ছাপা) ৩৯২-৩৯৫ পৃষ্ঠায় মজুত আছে।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ সম্পর্কে বলা যায়, তিনিত ইংরেজ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৮৫৩ সনে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর সংগ্রাম শুরু হয়। ১৮৫৪তে লর্ড ডালহৌসী জোর করে ঝাঁসীকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তুভূক্ত করেন। রাণীর স্বামী গঙ্গাধর রাও রাজকোষে যে ৬ লাখ টাকা রেখে গিয়েছিলেন সে টাকা ইংরেজরা আত্মসাৎ করে, তবুও তারা রাণীর ভাতা দিতে এবং গঙ্গাধরের আত্মীয়স্বজনের প্রতিপালন করতে অস্বীকার করে। অবশ্য প্রথমে মেজর এলিস যখন ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন তখন রাণী সদর্পে উত্তর করেছিলেন, "মেরী ঝাঁসী নেহী দুঙ্গী"–এ কথাটি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করেছিলেন।

Goto List

ঝাঁসীতে ৫ই জুন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেখানেও বিপ্লবীদল উপস্থিত হন। মুসলমান বিপ্লবীরা এখানেও সে 'চর্বির কথা জোর প্রচার করেন। বিপ্লবীরা ক্যাপ্টেন ডানলপকে হত্যা করেন। ১৪ নম্বর গোলান্দাজ বাহিনীর লেফটেন্যান্ট ক্যাম্পবের আহত হন। ৮ তারিখে ক্যাপ্টেন গর্ডন মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ঝাঁসীর রাণীর এ বিপদের সুযোগে তাঁর ভাইপো নিজেকে ঝাঁসীর মহারাজাবলে ঘোষণা করেন। ইংরেজের পক্ষ থেকে রাণীকে যুদ্ধ না করে অপেক্ষা করতে বলা হল। ৮ই জানুয়ারির সংবাদে জানা যায়, করিম বখশকে রাণী চিঠি দ্বারা জানিয়েছিলেন—"তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। ইংরেজ সেনাবাহিনী এসে পৌঁছালে তাঁর অধীনে যতগুলো জেলা আছে সবগুলোর কর্তৃত্বভার তিনি ইংরেজের হাতে ছেড়ে দেবেন।" (দ্রঃ আহমদ ছফা, পৃষ্ঠা ২৩৮)

ইংরেজের সঙ্গে একটা বোঝাপাড়ার বিষয়ে রাণী নমনীয় হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় বিপ্লবী নেতা শাহজাদা ফিরোজ শাহ ঝাঁসীতে এলেন। তাঁতিয়া তোপী রাণীকে সন্ধি করতে মানা করলেন। তদুপরি ফিরোজ শাহ ও তাঁতিয়া তোপীর পরিচালনাধীন ২০ হাজার সৈন্য ঝাঁসীতে এর। স্যার হাফরোজ তাঁর সৈন্যবাহিনী দ্বারা তাঁতিয়াকে হটিয়ে দিলেন। তারপর ৩রা এপ্রিল হাফরোজ সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁসীর উপর প্রবল আক্রমণ চালালেন। রাণী নিজে পুরুষ সৈন্যর মত যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সৈন্য বিপ্লবীদের কোণঠাসা করে ফেলল। ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল এবং আবালবৃদ্ধবণিতা সকলকে হত্যা করতে লাগল। রাণী রাতের অন্ধকারে পুরুষের বেশে পালিয়ে গেলেন। রাণীর বাবাও ইংরেজ সৈন্যের হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। রাণীকে ধরার জন্য ক্যাপ্টেন ফর্বস এবং লেফটেন্যান্ট ডকারকে ৩১ নম্বর অশ্বারোহী বাহিনীসহ পাঠান হয়। রাণীর চল্লিশ জন মুসলমান দেহরক্ষী তাদের সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। এবং শষে ৩৯ জনই শহীদ হয়ে যান। তখনও রাণী পালাবার চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু তাঁর ঘোড়া লাফিয়ে খাল অতিক্রম করতে পারল না। সে মুহূর্তে রাণী মিঃ রোজের অস্ত্রাঘাতে ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দত্তকপুত্র দামোদর রাও মৃতদেহের অবমাননার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে ফেলেন (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃ. ১০২)। মণি বাগচির মতে, মুমূর্ষ সংজ্ঞাহীন রাণী গঙ্গাধরের পর্ণকুটিরে প্রাণত্যাগ করেন।

এ বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈয়ের নাম ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল সম্ভার সন্দেহ নেই। ঝাঁসীর রাণী? ইতিহাসে তবুও স্থান পেয়েছেন, কিন্তু যিনি রাণীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সর্বদা শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন, বিপ্লবী বাহিনীকে ঝাঁসীতে আনিয়েছেন এবং নিজে গোলাবর্ষণ করে ইংরেজদের হিমশিম খাইয়েছেন—সে ইস্পাত-কঠিন ঘাওস খাঁর নাম ইতিহাসে যেন স্থানই পায়নি। শ্রী বাগচিও লিখেছেন—"অন্যদিকে সশস্ত্র ফকীরগণ নিশানহাতে নিয়ে রাণীর জয়ধ্বনি করতে লাগল। হর্ষধ্বনি ও তোপের শব্দে ঝাঁসীর দুর্গ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। ঘাউশ খাঁ ছিলেন রাণীর প্রধান গোলন্দাজ। এ দিন ঘাউশ খাঁ দক্ষিণ দিকের বুরুজ থেকে এমন তীরভাবে গোলবৃষ্টি করলেন যে, তাতে ইংরেজ পক্ষের তোপ বন্ধ হয়ে গেল।" (পৃষ্ঠা ৩৪৬)

৭ই আগষ্ট ভিলওয়ারায় সেনাপতি রবার্টসের সাথে তাঁতিয়া তোপীর যুদ্ধ হয়, কিন্তু তিনি পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। তারপরে আরও একটি যুদ্ধে তাঁতিয়া জয়লাভ করতে পারেননি। যাইহোক, তিনি চম্বল নদী পার হয়ে ঝালবার প্রদেশের রাজধানী ঝালরপত্তনে পৌঁছালেন। পৃথ্বী সিংহ তখন সেখানকার রানা। ইংরেজদের প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ। তাঁতিয়া তোপী রানার প্রাসাদ অবরোধ কররেন এবং তাঁর সৈন্যদলকে নিজের দলভুক্ত করলেন। পরদিন যুদ্ধের খরচে জন্য তাঁতিয়া রাণার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকাও আদায়

করলেন। ওখান থেকে প্রস্থানের সময় রাজগড়ে ইংরেজের সাথে তাঁতিয়ার যুদ্ধ হয়। তাঁতিয়ার পরম বিশ্বাসভাজন বন্ধু রাজা মানসিংহ সেনাপতি মিঃ মিডের কাছে প্রস্তাব করেন–যদি তিনি ইংরেজদের শত্রু তাঁতিয়া তোপীকে ধরিয়ে দিতে পারেন তাহলে তিনি কি তাঁর সম্পদ-সম্পত্তি ফিরে পারেন? সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ওটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল। নিবিড় অরণ্যের যে গুপ্তস্থানে তাঁতিয়া ঘুমিয়ে ছিলেন সে স্থানের সংবাদ মানসিংহ জানতেন। একদিন গভীর রাতে স্বার্থপর মানসিংহ ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য নিয়ে তাঁকে বন্দী করে সেনানায়ক মিঃ মিডের হাতে ধরিয়ে দেন। সামরিক আইনে বিচারের নামে প্রহসন হল–১৮৫৯ সনের ১৮ই এপ্রিল সিপ্রীতে তাঁর ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। বরি তাঁতিয়া তোপী স্বহস্তে ফাঁসির দড়ি নিজের গলায় পরে নিয়েছিলেন। ইতিহাসে এ দেশপ্রেমিক তাঁতিয়া তোপীর নাম সগর্বে থাকার দাবী রাখে।

বিপ্লবীদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল ইংরেজদের মূল নেতাদের নিহত করা; তার প্রমাণ আগে কিছু পাওয়া গেল আরও কিছু প্রমাণ পরে আসছে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, এ সকল কাজে হতে নিরপরাধ অসামরিক ইংরেজ কিছু নিহত হলেও সেগুলো অসাবধানবশতঃ এবং উত্তেজনার মুহূর্তেই ঘটেছে। নিঃসন্দেহে সেগুলো বিপ্লবী নেতাদের মতের প্রতিকূল ছিল, যেমন দেখা গেছে অদ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সময়ে।

মহাবিদ্রোহের সময় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ছিলেন মিঃ গাবিন্‌স। তিনি মেজর গল্‌কে ছদ্মবেশে এলাহাবাদ পাঠালে মিঃ গল বিপ্লবীদের হাতে ধরা পড়ে নিহত হন। স্যার হেনরী লরেন্স অযোধ্যার এলাহাবাদ পাঠালে মিঃ গল বিপ্লবীদের হাতে ধরা পড়েন ও নিহত হন। স্যার হেনরী লরেন আযোধ্যায় সাহাগঞ্জের রাজা মানসিংহের সাহায্য চাইলে তিনি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সব রকম সাহায্য দিয়ে বিপ্লবের ক্ষতি করেন। ওদিকে গুরুবখ্‌শ ও মুসলিম ভূস্বামী নবাব আলি কিন্তু সর্বশক্তি দিয়ে ইংরেজ বিতাড়নে বিপ্লবীদের সাথে যোগ দিলেন এ সময় ওখানে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন বরকত আহমদ ও খাঁন আলি খাঁন।

বিচারের নামে প্রহসনকারী বিচারবিভাগীয় বিখ্যাত ইংরেজ নেতা মিঃ এম. এম. ওম্যানির মস্তকে বিপ্লবীদের গুলি লাগলে তিনি নিহত হন। চীফ কমিশনার মেজর ব্যাঙ্কস্‌ ২১শে জুলাই গুলিবিদ্ধ হন। স্যার হেনরি লরেন্স রাজা মানসিংহের সহায়তায় প্রথমে বেঁচে গেলেও পরে একদিন নিজ কক্ষে বিশ্রামরত অবস্থায় জানালা দিয়ে গুলি এসে তাঁর মাথায় লাগে। আহত অবস্থায় ডাঃ ফেরাবের কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু তিনিও মারা গেলেন। গোয়েন্দা প্রধান মিঃ গাবিনস ২১শে জুলাই স্বকক্ষে আলোচনারত ছিলেন। হঠাৎ বাইরে থেকে একটা গুলি ছুটে আসে। গুলি তাঁকে না লেগে মিসেস ডোরিন নাম্নী তাঁর এক অতিথিকে লাগলে তিনি সাথে সাথে মারা যান।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার মেজর জেনারেল মিঃ আণ্ডারসন খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংখ্যা একলাখ। তিনি অবস্থাকে আয়াত্তে আনার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন, ফলে খেয়ে না খেয়ে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়লেন। হঠাৎ হৃদরোগে তিনিও মারা গেলেন। ১৪ই মার্চ তারিখে ইংরেজ নেতা ক্যাপটেন ক্যান্টনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এসব কাণ্ড দেখেশুনে লেফটেন্যান্ট জেমস্ আত্মহত্যা করেন। শেষে মিঃ হ্যাভলকও আউটরাম বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আলমবাগে পৌঁছালেন। দুঃখের বিষয়, যে সৈন্যরা ভারতীয়দের হত্যা করতে এসেছিল তার মধ্যে ৩৪১ জন ছিল শিখ'; (দ্রষ্টব্য আহমদ ছফা, পৃষ্ঠা ২০১)। এভাবে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম চলতে লাগল এবং এটা

সত্য যে উভয়পক্ষই দিন দিন দুর্বল হচ্ছিল। এ দুঃসময়ে রাজা জংবাহাদুর বৃটিশ সরকারকে অর্থ ও অস্ত্র তো দিলেনই, সে সাথে দিলেন তিন হাজার গোর্খার এক সেনাবাহিনী। শুধু তাই নয়, পরে ইংরেজ নেতা স্যার কলিন ক্যাম্পবেল জেনারেল ফ্রাঙ্ক এবং আরও ইংরেজ নেতার অনুরোধে রাজা জংবাহাদুর বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে স্বয়ং দশ হাজার সেনা নিয়ে হাজির হলেন। যুদ্ধে বিপ্লবীরা বুঝতে পারলেন যে, রাজা জংবাহাদুরের হিন্দু সৈন্যের গুলিতেই তাঁদের পতন হতে চলেছে। তবুও প্রবল বিক্রমে তাঁরা যুদ্ধ চলিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত ৮৬০ জন বিপ্লবী ভারতের মাটিতে শহীদ হলেন। ১৮ তারিখে শহরের দুর্ভেদ্য দুর্গ বৃটিশের হস্তগত হল।

রাজপুতানা ও মধ্য ভারতেও বিদ্রোহের উত্তাপ অল্প ছিলনা। নিমাচের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফিরোজ শাহ, যাঁর নাম পূর্বে বলা হয়েছে। 'ফিরোজ' নামধারী সাতজন যুবরাজ মোঘল বংশের ছিলেন।ইনি নিজাম বখ্‌তের পুত্র। ১৮৫৬তে তিনি দিল্লি পরিত্যাগ করে মক্কা গিয়েছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবের চরম মুহূর্তে তিনিসমগ্র ভারতে ছুটে বেড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন শাহজাদা ফিরোজ শাহের জন্য লিখেছেন। একশো বছর আগে অথবা একশো বছর পরে জন্মালে তিনি বিফল হতেন না এবং জনপ্রিয় দেশনেতা হতে পারতেন। যাহোক, তিনি জুন মাসে সীতামুণ্ডতে পৌছালেন এবং পরে তিনি মন্দিসরে বৃটিশের বিরুদ্ধে ইসলামী সবুজ পাতাকা ওড়ালেন, জিহাদ ঘোষণা করলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রচণ্ড বলপ্রয়োগে শাসনকর্তা তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করেন রাজপুত্র ফকিরের পোশাক পরে মসজিদে আশ্রয় নিলে সংগঠন চলতে থাকল ঐ অবস্থাতেই। অসংখ্য অনুগামী তাঁর দিকে আকৃষ্ট হল—যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। এরপর এর নবগঠিত দল পুনরায় শহর অধিকার করে শাসনকর্তা ও কোতোয়ালকে বন্দী করে। (দ্রষ্টব্য ডঃ এস, এন, সেন পৃষ্ঠা ৩১০-১১) ফিরোজ শাহ 'মির্জাজী' নামে আনুষ্ঠানিক ভাবে সিহাসনে বসলেন। তারপর প্রতাপগড়, ঝাওয়ারা, সীতামুণ্ড, রাতলাম প্রভৃতি এলাকার হিন্দু-মুসলমান রাজা ও নবাবদের কাছে পত্র পাঠালেন তাঁকে সমর্থন করতে বা বিপ্লবীদের সাথে যোগ দিতে। কিন্তু ঝাওয়ারার শাহজাদা আবদুস সাত্তার ছাড়া (কেহই তা গ্রাহ্য করলেন না। আবদুস সাত্তাবের জন্য ডক্টর সেন পরিষ্কার ভাবে লিখেছেন, গোয়ালিয়র বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এ শাহজাদা, কিন্তু শেষাবধি তাঁকে পরাজিতই হতে হয়।

পাঞ্জাবের মূলতানেও এ বিদ্রোহের বহ্নিশিখা হু হু করে জ্বলে উঠল। এখানে যিনি নেতৃত্ব দিলেন সে নেতার নাম সর্দার আহমদ খাঁ। তাঁর নেতৃত্বে মেজর চেম্বারণেল ক্ষুদ্র এক সরাইয়ে বন্দী হয়ে পড়লে তাঁর এক ইংরেজ সহযোগী কোন রকমে তাড়াতাড়ি একদল অশ্বারোহী শিখ সৈন্য পাঠিয়ে চেম্বারনেলকে মুক্ত করেন। অবশেষে সর্দার আহমদ খাঁনের মৃত্যু হলেও বিপ্লবীরা কিন্তু সংগ্রাম থামালেন না। মীর ভাওয়াল ফতোয়ানা সাহেবকে বিপ্লীবরা নতুন নেতা নির্বাচন করলেন। তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রাম চলল, বটে, কিন্তু অবশেষে তাঁদের পরাজয় বরণ করতে হয়। এভাবে গুজারিয়া বিদ্রোহেরও পরিসমাপ্তি ঘটল।

মনে হল যেন অযোধ্যা থেকে ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হয়ে ভারতীয় শাসন ফিরে এল। বিপ্লবীরা রাষ্ট্র পরিচালনার দপ্তর বন্টনের ব্যবস্থাও করলেন। বিপ্লবী শরফুদ্দৌলা হলেন প্রধানমন্ত্রী। মাম্মুখাঁন হলেন প্রধান বিচারক। আর নাবালক বীরজিস্ কাদিরের জননী হযরত মহলের হাতে সমস্ত বিভাগের কর্তৃত্ব থাকবে স্থির হল। পরিষদে যাতে সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ না লাগে তার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী করা হল জয়লাল সিংকে, অর্থমন্ত্রী হলেন বালকিষণ। (দ্রষ্টব্য আহমদ ছফা, পৃষ্ঠা ১৯৮)

ডক্টর সেন তাঁর Eighteen Fifty Seven-এ আযোধ্যার ফৈজাবাদের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, একজন নেতা "জৈজাবাদের মৌলুবী' বলেই বিখ্যাত হয়ে গেলেন। কোথেকে তিনি এলেন, তাঁর পরিচয়ই বাকি তা জানা মুশকিল ছিল। সশস্ত্র এক বাহিনী নিয়ে তিনি সারা ভারত ঘুরে বেড়ালেন। প্রকাশ্যে ইরেজদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করেন। এ ভয়ঙ্কর মারাত্মক শক্তিশালী নেতাকে বঙ্গের আলাউদ্দিন সাহেবের মতই বন্দী করে ফেলা হয়েছিল। তাঁকে সর্বদা মিলিটারী প্রহরায় রাখা হত (পৃষ্ঠা ১৮৬)। ফৈজাবাদের বিপ্লবীরা যখন ইংরেজদের কোষাগার দখল করেছিলেন তখন স্পর্ধার সাথে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, শিশু, নারী বা অসামরিক মানুষের হতাহত আমরা চাই না, আমরা চাই ইংরেজরা তাদের ফৈজাবাদের ধনসম্পদ নিয়ে দেশ পরিত্যাগ করুক। এ ঘটনায় তাঁর দৃঢ়চরিত্র ও কঠোর নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। আর একটি দৃষ্টান্তে এটা আরও পরিষ্কার হয়-মিঃ লিনক্স (Lennox) বলেন, একদিন ফৈজাবাদের মৌলবী সাহেব তাঁর এবং তাঁর পরিবারের শিশু ও নারীদের প্রত্যেকের জীবন রক্ষা করেন।

বিহারেও আন্দোলনের প্লাবণ কম ছিলনা। ওখানকার বিপ্লবীদলের যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম একজনের নাম মুহাম্মদ নজীব। প্রচারকার্যে তিনি এত সুদক্ষ ছিলেন যে, শিখদের কাছেও তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালান এবং শিখদেরকে নিজেদের অনুকূলে আনতে চেষ্টা করেন। ঠিক সে সময় তিনি ইংরেজের হাতে ধরা পড়েন। বিচারের ভণ্ডামীতে তাঁকে ফাঁসি কাঠে ঝোলান হয়। যে সমস্ত নেতারা জীবিত রইলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নেতারা হলেন মাওলানা মহম্মদ হোসেন, মাওলানা আহমদুল্লাহ ও মাওলানা ওয়াজহুল হক। এ নেতাদের মিঃ টেলর পরার্শম করার নামে ডেকে বন্দী করেন। মিঃ টেলর সে সাথে ঘোষণা করলেন, যার বাড়িতে যা যা অস্ত্র আছে তা জমা দিতে হবে। রাত নটার পর থেকে কার্ফুও জারী করা হল। ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতায় ধর্মোম্মত্ত মুসলমানদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হল। ৩রা জুলাই সন্ধ্যা বেলা পাটনার প্রকাশ্য রাজপথে বিদ্রোহীরা আত্মপ্রকাশ করলেন। নাকাড়া বাজিয়ে অন্য লোকেদেরও যোগদান করতে আহ্বান জানালেন। মিঃ টেবল যখন বুঝলেন যে, কার্ফু জারী করেও ভয় দেখান সম্ভব নয় তখন তিনি বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্য ইংরেজ-অনুগত একদল শিখ সৈন্য প্রেরণ করেন। শিখ সৈন্যদের সাথে ছিল উন্নত ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র আর বিপ্লবীদের ছিল অত্যন্ত সাধারণ অস্ত্র। লড়াইয়ে অনেক হতাহত হয়। শেষে অবশ্য বিপ্লবীদের গা ঢাকা দিতে হয়েছিল।

আর একজন বিপ্লবী নেতা পীর আলীকে বিচারের নামে ভণ্ডামি করে ফাঁসি দেয়া হয়। ফাঁসির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পীর আলী বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন, "আমার ফাঁসি দিতে পার, কিন্তু (মনে রেখ) আমার জায়গায় হাজার হাজার লোক দাঁড়াবে।"

এবার আর এক বীরের নাম উল্লেখ করছি, যিনি কুমার সিংহ নামে পরিচিত শ্রীমণি বাগচি ঐতিহাসিক গাবিনস-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "বিভিন্ন ইংরেজ লোক কুমার সিংহের চরিত্র বিভিন্নভাবে চিত্রিত করেছেন। কেহ তাঁকে দেখিয়েছেন একজন রাজভক্ত ভূম্যধিকারী হিসেবে, আবার কেহ তাঁকে দেখিয়েছে রাজবিদ্রোহী রূপে" (পৃষ্ঠা ২৯৫)। সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে তিনি ইংরেজদের বন্ধুই ছিলেন। ইংরেজদের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় ছিল যে, রাজপুরুষরা প্রায়ই তাঁর বাড়িতে সপরিবারে চিত্তবিনোদণের জন্য আসতেন। 'সবরকম' আপ্যায়নের খরচ সামলাতে জমিদারি বন্ধকের বদলে তাঁকে ঋণ করতে হয়। হঠাৎ সে টাকা এক মাসের মধ্যে শোধ করতে আদেশ দেয়া হয় এবং তা শোধ করতে না পারলে তাঁকে জমিদারি হতে বঞ্চিত হতে হবে বলেও জানান হয়। ইংরেজদের এ

দাগাবাজি ও কুকৌশলে তিনি অত্যন্ত ব্যথা পান। ঠিক তখনই তিনি আজিমুল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। কুমার সিংহ ছিলেন রাণা প্রতাপ সিংহের বংশধর। ইংরেজ জানত তাঁর যুদ্ধ কৌশলের কথা–তাই তাঁকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে নানা সাহেবে তাঁকে বোঝালেন যে, দাগাবাজ ইংরেজকে বিশ্বাস না করা ভাল। কুমার সিংহ ও বিপ্লবী মাওলানা-ফকিরের দল একযোগে ইংরেজের সাথে সামনা সামনি যুদ্ধ করলেন। ইংরেজরা সেবার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য পরেরবারে কুমার সিংহকে পরাস্ত হতে হল। তাঁর রাজধানী জগদীশপুর ইংরেজের অধিকারে চলে গেল। তাঁর বাসভবনও ও পবিত্র দেবালয়ও ইংরেজদের আক্রশণ থেকে রক্ষা পেলনা। কুমার সিংহ বহু অর্থব্যয় করে একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইংরেজ সেনাপতি তা বিনষ্ট করে ফেললেন। প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তির সাথে মন্দিরটি ধ্বংস হওয়াতে বৃদ্ধ রাজপুতের প্রাণে মর্মান্তিক বেদনা লেগেছিল।...(তারপর ইংরেজ সৈন্য] কোন দিকে দিকপাত না করে তারা পল্লীদাহে. নরহত্যায় ও লুণ্ঠনে তাদের প্রতিসিংসা চরিতার্থ করতে লাগল।' কুমার সিংহ এরপরে আজমগড় দখল করেছিলেন। তিনি পাল্কিতে চড়ে একদিন যাচ্ছেলেন এমন সময় ইংরেজের কামান গর্জে উঠল। কুমার সিংহের একটা হাত নষ্ট হয়ে গেল। হাতটা শুধু চামড়ায় গেলে ছিল মাত্র। তিনি এত শক্ত হৃদয়ের মানুষ ছিলেন যে. অন্য হাতে অস্ত্র ধরে এ হাতটা কেটে অনুচরকে আদেশ করলেন গঙ্গায় ফেলে দিতে। আহত কুমার সিংহ একটা বৈঠকখানায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তিনি আর গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারলেন না। আর তখন এত সুচিকিৎকার ব্যবস্থাও ছিলনা। ফলে এ ভাতরীয় 'বৃদ্ধ সিংহ' চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন ২৪শে এপ্রিল তারিখে (মণি বাগচিঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস পৃষ্ঠা ২৯১-৯৫: Eighteen Fifty Seven. p. 262-63)

আর একটি স্বর্ণোজ্জ্বল নাম মাওলানা রহিমুল্লাহ. যাঁকে বিচারের সময় 'ওহাবী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

খাঁন বাহাদুর খাঁন একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাম। এ মুসলমান রোহিলা নেতা এত প্রভাবশালী ছিলেন যে. ইংরেজরা তাঁকে 'বিপজ্জনক ব্যক্তি মনে করত। তাঁর নেতৃত্বে ঝাঁক-ঝাঁক বিপ্লবী 'দ্বীন দ্বীন'' গর্জন করতে করতে অফিসে আদালতে আগুন লাগাতেন। জেলখানার গেট ভেঙে সমস্ত কয়েদীকে মুক্ত করা হত। তারমধ্যে বিপ্লবী বন্দীরাও মুক্ত হয়ে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেন। মিঃ সিভালড় অশ্বারোহী রেজিমেন্ট নিয়ে বীরদর্পে মোকাবিলা করতে এলেন. কিন্তু বিপ্লবীদের অভ্যর্থ গুলিতে তাঁর মস্তক গুলিবিদ্ধ হয় এবং তিনি মারা যান। নেতার আদেশে সবুজ রঙের পাকা উড়িয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বিপ্লবী বীর সেনানীরা। বাহাদুর খাঁন কামান ও অন্যান্য অস্ত্র নির্মাণের একটা কারখানাও তৈরি করলেন। সে কারখানার তৈরি কামান, বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠিত হয়। সমস্ত বিভাগে বিশ্বস্ত কর্মী নিয়োগ করা হয়। মোট সৈন্যের পরিমাণ ছিল চব্বিশ হাজার তিনশ ত্রিশ জন। আশাপাশের রাজা. মহারাজা, জমিদাররা বেশির ভাগই ইংরেজদের বিপক্ষীয় ছিলেন না। বাহাদুর খাঁ তাঁদের কাছে ইরেজের বিরুদ্ধাবাদী হওয়ার জন্য আবেদন করেন। যাঁরা আবেদনে সাড়া দিলেন না তাঁদের উপর তিনি বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। তাই ইংরেজ প্রেমিক রাজা রঘুনাথ সিংকে শায়েস্তা করতে তিনি সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। এ অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত বিজনোর. বুরাদাবাদ, পিলবিত ও শাহজাহানপুরের ভূস্বামীরা নতুন সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেন। কল্লান খাঁনকে পুর্ণ শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব দেয়া হল। আর মৌলবী ইসমাইল. হাকিম সইদুল্লাহ. শেখ খাইরুল্লাহ ও গালিব আলীকে তাঁর অধীনে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। এ সময় কিছু রাজপুত্র শক্তিশালী নেতা নতুন সরকারকে মেনে নিতে না পেরে বিরোধিতা করলে মর্দান আলী নেতৃত্বে তাঁদের দমন করা হয়।

"১৮৫৭ তে বাদাউন একটা স্বতন্ত্র জেলা ছিল। মিঃ এডওয়ার্ড দেশের গরম হাবভাব দেখে কর্ম ছেড়ে পলায়ন করেন– তখন বিপ্লবী নিজেরা শাসনভার গ্রহণ করেন। আবদুর রহমানকে নাজিম পদে ও আজমউল্লাকে বখশী পদে ভূষিত করা হয়। তফাজ্জল, কেরামতুল্লাহ ও ওয়ালীদাদ খাঁনকে সামরিক বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ সময় বুদ্ধিমান ইংরেজ রাজপুতদের নানা প্রলোভনে উত্তেজিত করে বিদ্রোহী করতে সক্ষম হয়। একজন রাজপুত জমিদার 'ধাপদুশ' উপাধি নিয়ে বাদাউন আক্রমণ করেন কিন্তু বিপ্লবীরা তাঁকে ও তাঁর সৈন্যদের পরাস্ত করেন জমিদার বিশ্বনাথকে দিয়েও নতুন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করান হয়। অবশ্য নতুন সরকার তা সহজেই দমন করতে সক্ষম হয় (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ২৪৮-২৫০ পৃষ্ঠা)।

রোহিলাখণ্ডের আর একটি জেলা শাহজাহানপুর। এখানেও বিপ্লবের প্লাবন পৌছাল। অবশ্য আগে থেকেই বিপ্লবের ক্ষেত্র যিনি তৈরি করে রেখেছিলেন এবং চিত্ত ও বিত্ত দিয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁর নাম মৌলবী সরফরাজ আলী–এসব যেন চাপা পড়া ইতিহাস। বিপ্লবীরা তারপরে ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেটকে নিহত করেন। তখন ইংরেজ পাঠান তাদের বিশ্বস্ত শিখ রেজিমেন্টকে। এ বার শিখ সৈন্য পরাজিত হলে বিপ্লবীরা কারাগার দখল করে বন্দী-মুক্তির ব্যবস্থা করে ট্রেজারী দখল করেন। এখানে বিপ্লবী কুদরত আলী ও তাঁর ভাই নিয়াজ আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। কাদির খাঁনকে জেলা প্রশাসক এবং নিজামুদ্দিন, হামিদ হাসান ও খাঁন আলীকে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। আবদুর রউফকে করা হয় সেনাপতি। এমনিভাবে মীরনপুর জেদলার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বিপ্লবী গোলাম মুহাম্মদ ও ফয়েজ মুহাম্মদ। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, এ বিরাট কর্মকাণ্ড যাঁর জ্ঞান বুদ্ধি ও কৌশলে ঘটছিল তিনি সে খাঁন বাহাদুর খাঁন। পাওয়াইনের প্রভাবশালী রাজা জগন্নাথ খাঁন বাহাদুর খাঁনের কর্তৃত্ব অস্বীকার করলেন। অবশ্য তার কারণ ইরেজদের সাথে তাঁর ঘাড় বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু কোন একটা অজুহাতে ইংরেজ সৈন্য জগন্নাথের রাজ্যে হামলা করলে আকস্মিক আক্রমণে রাজা নগদ এক লাখ টাকা কর আর ত্রিশ হাজার টাকা নজরানা দেয়ায় অঙ্গীকারে রক্ষা পান। ১৮৫৭-র জুলাই মাসেই বাহাদুর খাঁন এক সৈন্যদল সহ এডওয়ার্ড ইউলসনের বিরুদ্ধে আবদুর রহমানকে পাঠালে। উইলসন পরাস্ত হল।

অবশেষে বিখ্যাত নেতা খাঁন বাহাদুর খাঁন যখন পরাজিত হলেন তখন তিনি অযোধ্যায় আত্মগোপন করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সেখানে পরিস্থিতি প্রতিকুল মনে না হওয়াতে তিনি নেপাল চলে গেলেন। নেপাল সরকার তাঁকে বীরের মত সম্মান দিয়ে আশ্বাস দিলেন, কিন্তু তা ছিল ছলনামাত্র। বিশ্বাসঘাতকতা বশতঃ বৃটিশের সাথে যোগাযোগ, করে নিষ্ঠুর ভাবে বাহাদুর খাঁনকে ধরিয়ে দেয়া। ইংরেজ মহলে খুশীর ঢল নেমে এল–তাদের বিখ্যাত শত্রু হাতের মুঠোয়। সাথে সাথে বিচার। আর বিচার মানেই ফাঁসি। কোতোয়ালীর সামনে তাঁর ফাসি দেয়া হল। এসব তথ্য যেন গল্প মনে হচ্ছে, অথচ এগুলোই প্রকৃত ইতিহাসের জ্বলন্ত ও সত্য অধ্যায় তা আমাদের সবারই মনে রাখা দরকার।

মুসলমান-প্রধান এ বিপ্লবে রাজা, জমিদার ও চৌধুরীরা অত্যন্ত বিরোধিতা করার জন্য এ আন্দোলন বাধ্য হয়। তবুও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিপ্লবীরা মিলন ও মৈত্রীর জন্য অনেক জায়গায় কমিটি গঠন করেছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আহমদুল্লাহ খাঁন, আহমদ ইয়ার খাঁন, শফীউল্লাহ, আবদুর রহমানও ও আহমদ শাহ এ রকম একটা পরিষদের সদস্য ছিলেন। অনেক করেও কিন্তু জমিদার চৌধুরীদের সাথে মিলনের পথ তৈরি হয়নি। বর এর জন্য নতুন ভারতীয় অস্থায়ী সরকারকে চূড়ান্ত আঘাত হানতে চৌধুরী জমিদাররা একতাবদ্ধ হয়ে বিশাল সৈন্য বাহিনী তৈরি করেছিলেন। বাধ্য হয়েই শেষে শফীউল্লাহ ও মাহমুদ খাঁনের

নেতৃত্বে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জমিদারও চৌধুরী বাহিনী পরাস্ত হলে তাঁদের নেতা শ্রীরণধীর চৌধুরী বন্দী হন। ইংরেজের সহয়োগিতা বরাবরই তাঁদের সাথে আর্থাৎ বিপ্লবের বিরুদ্ধে ছিল। তাই ইংরেজ বাহিনী সহায়তায় পরে যখন বিপ্লবীরা পরাজিত হলেন, তখন বিপ্লবী নেতা জালালুদ্দিন ও শাহদুল্লাহকে তারা গুলি করে হত্যা করেন। তেমনি ভাবে বিপ্লবী ওয়াজুদ্দিনকেও শহীদ হতে হয়েছে। আমরাহার বিপ্লবের নেতা ছিলেন গুলজার আলী। ২৪শে এপ্রিল বৃটিশ সৈন্য যখন মোরাদাবাদ দখল করলো তখন মইজুদ্দিন খাঁ সহ সমস্ত বন্দী নেতাদের বিনা বিচারে হত্যা করা হয়। ইতিহাসের পুরানা পাতায় মইজুদ্দিন, আসাদ আলী, বখত্ খাঁ প্রভৃতি আরও বহু নাম্ সগর্বে জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু ইতিহাসের নতুন পাতায় অজ্ঞাত চক্রান্তে এসব নাম যেন মুছে দেয়া হয়েছে।

বিপ্লবী বীর সৈয়দ আহমদুল্লাহ শাহজাহানপুরে ব্রিগেডিয়ার মিঃ জোনস্-এর সৈন্যদের সাথে সামনা সামনি যুদ্ধ করেন। আহমদুল্লাহর সৈন্য ছিল মাত্র দেড় হাজার। আর ইংরেজ-সৈন্য সংখ্যায় বেশি তো ছিলই, সে সাথে ছিল উন্নততর অস্ত্র, বিশেষতঃ আগ্নেয় অস্ত্রে। যুদ্ধে কিন্তু বিপ্লবীদের সঠিকভাবে পরাস্ত করা গেল না, তাই ইংরেজরা ঘাটিতে ঘাটিতে সংবাদ দিয়ে আরো সৈন্য আনার ব্যবস্থা করল। দু পক্ষের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হল। বিপ্লবীরা বন্দুকের আঘাত দেন, বৃটিশ কামানের গোলায় তার উত্তর দেয়। শেষে পরাস্ত হতে হল বিপ্লবীদের। মাওলানা আহমদুল্লাহ তাঁর প্রধান ঘাটি মোহাম্মদী অঞ্চল ছেড়ে গা ঢাকা দিলেন এ আশায় যে, আবার তৈরি হবেন কঠিন আঘাত হানতে। বৃটিশ সৈন্য মোহাম্মদী অঞ্চলকে কামানের গোলায় শ্মশান বানিয়ে ছাড়ল। কি নিষ্ঠুর সে লড়াই। একদল চাইছেন শোষণ, শাসন আর অত্যাচার করতে। অন্য দল চায়, যা চলছে তাই-ই চলবে।

সৈয়দ আহমদুল্লাহ শহীদ হন খুবই মর্মান্তিকভাবে। বৃটিশের শ্রেষ্ঠ সৈয়দ আহমদুল্লাহর জন্য ঘোষণা করা হল, তাঁকে জীবন্ত ধরে দিতে না পারলেও শুধু তাঁর মাথা জমা দিতে পারলেই পঞ্চাশহাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। পাওয়াইনের তালুকদার রাজা জগন্নাথ যদিও প্রথমে ইংরেজ দরদী ছিলেন, কিন্তু ইংরেজদের আক্রমণের পর থেকে তিনি যে ইংরেজের বিরুদ্ধে, তা সবাই জেনে যান। গোপনে তিনি খাঁন বাহাদুর খাঁনকে কিছু অর্থ সাহায্যও করেছিলেন। সুতরাং বিপ্লবীরা নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, রাজা জগন্নাথ ইংরেজদের দালাল হতে পারেন না। মাওলানা আহমদুল্লার প্রধান কাজ ছিল জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে জনমত গঠন, অর্থ সংগ্রহ ও প্রাণ দেয়ার জন্য সংগ্রামী যোদ্ধা সংগ্রহ করা। ইংরেজ বিরোধী অর্থ ও লোক সংগ্রহের কাজে রাজা জগন্নাথের অঞ্চলে সভা করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানান হয়। তিনি যথানিয়মে বক্তব্য রাখলেন, অর্থ সংগ্রহ করলেন ও স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা প্রস্তুত করলেন। জনসভা ভঙ্গের পর রাজা জগন্নাথ মাওলানাকে তাঁহার প্রাসাদে ঢাকিয়া লইয়া গিয়া গুলি করিয়া হত্যা করেন। অতঃপর তাঁহার মস্তকটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাপিষ্ঠ জগন্নাথ স্বয়ং উহা সহ শাহজাহানপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্রের নিকট উপস্থিত হন। উৎসাহী ম্যাজিস্ট্রেট মস্তকটি প্রকাশ্য স্থানে দুই দিন ঝুলাইয়া রাখিয়া অনিচ্ছুক জনসাধারণকে উহা দর্শন করিতে বাধ্য করিবার জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী বৃটিশ গভর্ণমেন্ট রাজা জগন্নাথকে সঙ্গে সঙ্গে ৬৫ হাজার টাকা এবং বিদ্রোহ প্রশমিত হবার প্রর একটি জমিদারী প্রদান করিয়াছিলেন।" (দ্রষ্টব্য আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ৯৪)

আহমদ ছফা তাঁর পুস্তকে এ ঘটনাকেই সমর্থন করেছেন। সে সাথে মাওলানার শরীর দগ্ধ করে দেহভষ্ম নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল বলেও তিনি জানান। তিনি আরও লিখেছেন যে, শুধু মাওলানার মাথাটা পরে শাহাজাহানপুরে কবর দেয়া হয়। ডক্টর এস. এন. সেন তাঁর মূল্যবান আকর গ্রন্থেও এ তথ্য লিখেছেন। তবে পুরস্কারের অঙ্ক ৬৫ হাজারের পরিবর্তে ৫০

হাজার উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ৩৫৬)। আমাদের মনে হয়, ৫০ হাজার টাকাই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু মহাশত্রুর মৃত্যুতে খুশীতে আত্মহারা হয়ে ইংরেজরা এ ১৫ হাজার টাকা এবং জমিদারী উদ্বৃত্ত দিয়েছিল। যাহোক, এ বিখ্যাত আলেম ও ভারত জুড়ে যাঁর প্রচুর শিষ্য সে প্রকৃত পীরের দেহ নরপিশাচরা পুড়িয়ে দেয়ার সময় এটা চিন্তা করেনি যে, নশ্বর দেহ পোড়ান যায় কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস পোড়ান যায়না। এ বিপ্লবী বীরের নাম ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বা ইতিহাসে যেভাবে থাকা প্রয়োজন তার শতকরা এক ভাগও নেই! সে শহীদ বীর হাতিতে চড়েই বেশির ভাগ যাওয়া আসা করতেন। ১৮৫৮ সনের ১৫ই জুনও একাকী হাতির পিঠে চড়ে রাজা জগন্নাথের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি আর ফিরতে পারেন নি। শুধু অশ্রুপ্লুত নয়নে থেকে গেল বাকহীন মর্মাহত তাঁর হাতিটি।

এ বিদ্রোহে কত মানুষ শহীদ হয়েছেন তার সঠিক হিসেব দেয়া সম্ভব নয়। যাঁদের কথা আরোচনা করা হচ্ছে তাঁরা হলেন বিপ্লবের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি। এ সনেই ১০ই ফেব্রুয়ারী মৌলবী আমীর আলী শাহ শহীদ হন। এমনি ভাবে শহীদ হন বিপ্লবী ইমাম বখশ। শহীদ ইমাম বখশ্ ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি ও লেখক। একদিকে কলম ধরেছেন, অন্য দিকে প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্রও ধরেছেন। দিল্লীর পতনের পর মাওলানা ইমাম বখশ্‌কে তাঁর দুই পুত্র সহ আরও ১৪০০ বিপ্লবীকে রাজঘাটে সমুদ্রের তীরে হাজির করা হয়। মাওলানা ইমাম বখ্‌শের সামনে তাঁর দুই পুত্রকে যন্ত্রণা ও নিষ্ঠুরতার সাথে হত্যা করার পর সবশেষে মাওলানা ইমাম বখশ্‌কে হাত বাঁধা অবস্থায় বন্দুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলা হয়। বন্দুকের গুলি তাঁর মুখের দিকে ছোঁড়া হল, মুখমণ্ডল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। রক্তাপ্লুত দেহে নির্বাপিত হল বিপ্লবী মাওলানার জীবন।

শহীদ ইমাম বখ্‌শের বন্ধু মুফতি সদরুদ্দিনও এক উল্লেখযোগ্য নাম। যুবক অবস্থায় তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে চীফ্ জজের পদে বহাল হন। সাতান্নর বিপ্লবে তিনি ফতোয়া দিলেন যে, ইংরেজের চলাল অনেক নির্যাতন তবুও কারাগারে তাঁর মূল্যবান লেখনী বন্ধ করেননি। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে তাঁকে জেল থেকে ছাড়া হল বটে. কিন্তু চাকরি, থেকে চিরবঞ্চিত করা হল এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। দেশের লোক বিপ্লবী মুফতী ও তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিজনদের অসুবিধার কথা স্মরণ করে ভয়ানক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তাই দেখে অবশেষে তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি ফেরত দেয়া হয়েছিল। কিছুদিন পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

আর একটি অপ্রচারিত নাম–জনাব জৈমীগরী। সাতান্নর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ সংগ্রামী। অনেক সংগ্রাম, বিপ্লব ও আন্দোলনের ভিতর দিয়ে তিনি নিজেকে চালিত করেন। অবশেষে বৃটিশের হাতে তিনি ধরা পড়ে বিচার হয়. আর বিচার মানেই তো দাগাবাজী। সে বিচারের তার ফাঁসি হয়।

থানেশ্বরের বিপ্লবী মাওলানা জাফর একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ইনি ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী এবং ভাল পরামর্শদাতা। দুজন বিপ্লবী সহ তাঁরা মোট তিন জন এক সাথে বন্দী হন। তিনজনকেই ফাঁসি ঘরে রাখা হয়েছিল। মিঃ পার্সন সাহেব যুদ্ধের পরিকল্পনা ও পরামর্শের কথা ফাঁস করার আদেশ দেন। তাঁরা অস্বীকার করলে চলতে থাকে অমসৃণ চাবুকের আঘাত। মাওলানা জাফর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। মিঃ টলি আগামীকাল আরও শাস্তি দেয়া হবে বলে বেত্রাঘাত বন্ধ করতে বলেন। তারপর মাওলানা জাফরকে লোভ দেখান হয় যে, যদি তাঁরা ভিতরের তথ্য ফাঁস করে তাহলে ফাঁসি থেকে রেহাই দেয়া হবে। এবারও তিনি অস্বীকার করলে চাবুক শুরু হল সকাল ৮টা থেকে। পালাপালি করে সে বেত্রাঘাত চলতে লাগল রাত ৮টা পর্যন্ত। সেদিনই মাওলানা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন। কারণ সেদিন তিনি রোযা রেখেছিলেন।

আব্বাস নামে জাফর সাহেবের একটি পালিত পুত্র ছিল। তাঁকে মাওলানার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার জন্য বিচারকের সামনে হাজির করা হল। কিন্তু বালক আব্বাস মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে মিথ্যা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করল। এ প্রিয় পালিত পুত্র আব্বাসকে সে রাত্রে এত প্রহার করা হয়েছিল যে, তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অবশ্য ঘোষণা করা হল–অসুখ হয়ে মারা গেছে।

আর এক মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ মাওলানার কাছে পৌছাল। তাহল, মাওলানার নিজের এক ভাইকে প্রচণ্ড শাস্তি দিয়ে জোর করে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। মাওলানা ভাইকে সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি সাক্ষ্যে যা বলেছেন তাই-ই যেন বলেন–তাঁরও যেন ফাঁসি না হয়, মা তাহলে বেশি শোক পাবেন। এরপরে বিচারের মাওলানার ফাঁসির রায় হল। সে সাথে তাঁর সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। মাওলানা জাফর ফাঁসির রায় হল। মাওলানা জাফর ফাঁসির রায় শুনে বিচারককে যা উত্তর দিয়েছিলেন তা এক ঐতিহাসিক বিস্ময়। সেটা হচ্ছে এ–'প্রাণ দান আর প্রাণহরণ আল্লাহ্‌র কাজ, আপনার কোন অধিকার নেই। সম্মানের মালিক সে আল্লাহ্ মহাশক্তির অধিকারী–তিনি আমার মৃত্যুর পূর্বেই আপনার প্রাণ হরণ করতে পারেন। এরপরে আশ্চর্যের বিষয়টুকু হল, মাওলানা জাফরের ফাঁসির পূর্বেই সে বিচারকের মৃত্যু হয়েছিল। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হল, ১৬ই সেপ্টেম্বর আম্বালার ডেপুটি কমিশনার একটি কাগজ হাতে করে পড়ে শোনালেন যে, 'তোমরা ফাঁসির জন্য লালায়িত শহীদের গৌরব পেতে চাও। তাই তোমাদের ফাঁসির পরিবর্তে চিরনির্বাসন দেয়া হল।' মাওলানা জাফর, মোহাম্মদ শফী ও মাওলানা ইয়াহিয়ার দাড়ি ও মাথা মুণ্ডন করে দেয়া হল। পাঠিয়ে দেয়া হল আন্দামানে। মাওলানা জাফর আন্দামানে সুদীর্ঘ দিন অতিবাহিত করে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অনেক যন্ত্রণা ও জ্বালা সহ্য করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। চিরনির্বাসিত করা হয়েছিল বটে, কিন্তু ইংরেজ দেখল, এ অকেজো বৃদ্ধদের কারাগারে রাখা মানে শুধু খাদ্য পানীয় বিনষ্ট করা; সে জন্যই শাস্তি লাঘব করে ছেড়ে দেয়।

শহীদ আহমদ খাঁও একটি বিপ্লবী নাম। তাঁর দলবল মূলতান এলাকায় প্রায়ই হামলা করতেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন সুবাদার মেজর নাহির খাঁ। নাহির খাঁ ধরা পড়েছিলেন এবং বিচারের নামে তাঁর হয়েছিল নিষ্ঠুর প্রাণদণ্ড। প্রত্যক্ষ সংগ্রামী সর্দার আহমদ খাঁ-ও ইংরেজ বিতাড়ন সংগ্রামে শহীদ হয়ে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধন্য করেছেন।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ স্বাধীনতা আকাশের আর এক জ্যোতিষ্ক। তিনি মক্কারই বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। তবে ভারতের এ বিপ্লবের মুহূর্তে তিনি ভারতে পৌছে এবং বহু ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। ১৮৫৭ সনে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে হাতে তিনি অস্ত্র ধরেছিলেন। বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি আবার মক্কায় ফিরে যান ও ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

এভাবে গাঙ্গু'র মাওলানা রশীদ আহমদ ও মাওলানা মুহাম্মদ কাসিমও প্রত্যক্ষভাবে সাতান্নর আন্দোলনের ঝাঁপিয়ে পড়েন আলী ইমদাদুল্লাহ এবং এ মাওলানা ও তাঁদের অনুগামীরা এ অঞ্চলের বিরাট এলাকা জুড়ে ইংরেজদেরকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেখানে দেশীয় শাসনতন্ত্রও চালু করেছিলেন। সাহারানপুর জেলার অভ্যন্তরে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি দখল করার ভয়ে ও হতাশায় পিছু হটতে বাধ্য হন। বিপ্লবী দল যে কমিটি গঠন করেছিলেন তার প্রধান উপদেষ্টা হন হাজী ইমদাদুল্লাহ। মাওলানা কাসেম হন সেনাপতি আর মাওলানা রশিদ আহমদ হন প্রধান বিচারপতি (দ্রষ্টব্য হায়াতে মাদানী ও আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজ, পৃষ্ঠা ৪১৯)। মনে রাখার কথা হল, ঠিক এ রকম একটা

সময়ে ফাঁসিতে গলা কাটা গেছে কমপক্ষে সাতশ' পীর, মাওলানা-মুফতীর। আর শুধু ফাঁসিতে কম করে ২৮ হাজার সাধারণ মুসলমানকে শহীদ হতে হয়েছে। নিখোঁজ হওয়া, জেলখানায় প্রহৃত হয়ে শহীদ হওয়া, গুলি খেয়ে শীহদ হওয়ার বিপুল সংখ্যা এর সাথে নয়।

নবাব তোফাজ্জল হোসাইন একজন ভূস্বামী বা ছোট রাজা ছিলেন। আঠারশো সাতান্নর বিপ্লবে সৈন্য ও সম্পদ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন ইংরেজ বিতাড়নে, কিন্তু পরাজিত হন। ক্ষমার বিনিময়ে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব ইংরেজ পক্ষ থেকে দেয়া হলে নবাব তা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁকে খতম করার প্রস্তাবে ইংরেজপক্ষ হতেই আপত্তি উঠল; প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করেও কিভাবে শেষ করা যায়? শেষে নবাবের সমস্ত কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফল এ দাঁড়িয়েছিল যে, যিনি ছিলেন ফররোখাবাদের নবাব, তাঁকে কিছুদিন পর ফররোখাবাদেই চৌরাস্তার মোড়ে ভিক্ষা করতে করতে মৃত্যু বরণ করতে হয় (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১০৪)। মোবারকপুরের মুসলমান ভূস্বামী ইরাদত খাঁ জৌনপুরের বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন। প্রথমে ইংরেজকে উৎখাত করেছিলেন তাঁর এলাকা থেকে, কিন্তু পরে রাজা জংবাহাদুরের সৈন্যরা চিৎ করে ফেলে বন্দুকের অগ্রভাগ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে শহীদ করে। (দ্রষ্টব্য ঐ, পৃষ্ঠা ১০৫)

নবাব মেহেদী হোসেন ছিলেন একজন প্রভাবশালী নেতা। ১৫ হাজার সৈন্য তাঁর অধীনে ছিল। সেনানায়কের নাম ছিল ফজলে আজিম। তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল চান্দা নামক স্থানে। এখানেও নেপালের জংবাহাদুরের দেয়া সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজরা জয়ী হয়। আর বিপ্লবী মেহেদী হোসেনকে আন্দামানে চিরনির্বাসন দেয়া হয়। সেখানে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে তিলেতিলে শেষ হতে হয়। তাঁর সমস্ত সম্পদ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ইংরেজ অনুগতদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

আগ্রায় বিপ্লবীদের শ্রেষ্ঠ নেতা মুরাদ আলী। তিনি পুলিশ বাহিনীর কর্তা ছিলেন। যখন বিপ্লব শুরু হয় তখন তিনি তাঁর অধীনস্থ সমস্ত বাধ্য পুলিশ নিয়ে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের কাছে লড়াই-এর শপথ নেন। আগ্রার পতন হলে তিনি আলিগড় ও এটপাওয়ার বিপ্লবে যোগ দেন। অবশেষে বহু অনুচরসহ তিনি বন্দী হন। নিষ্ঠুর ইংরেজ মুরাদ আলীসহ প্রত্যেককে শহীদ করে। এমনই এক সেনাপতি আবদুল গফ্ফার। তিনি বিপ্লবীদের যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। হঠাৎ বিপক্ষীয় কামানের গোলা তাঁকে শহীদ করে। এমনিভাবে অনেকেই শহীদ হয়েছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে এ নামগুলো উল্লেখযোগ্য এজন্য যে, এ সমস্ত নেতাদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। আর সাধারণ বিপ্লবীদের শুধু প্রাণনাশ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শহীদ আবদুল গফ্ফারের সমস্ত সম্পত্তিও কেড়ে নেয়া হয়েছিল। এভাবে নেতৃত্ব দানকারীদের মধ্যে সালিন্দার চৌধুরী মনসার আলি, হাশমত আলি ও জৌনপুরের গোলাম হোসেনকেও শহীদ করা হয়।

গুরগাঁও জেলার বিখ্যাত বিপ্লবী আবদুল হক–যিনি দু লাখ লোকের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেনাপতি মিঃ সওয়ারস্ বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাঁকে বন্দী করতে সক্ষম হন। বিচারকের নয়, এ সোনাপতির আদেশেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ্যে তাঁকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ করা হয়। (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১০১)। মৌলুবী আলাউদ্দিন আর এক বিপ্লবী নেতার নাম। ইনি হায়দারাবাদে নেতৃত্ব দেন ও শেষে ধরা পড়লে এর চিরনির্বাসন দেয়া হয়, কুখ্যাত আন্দামান জেলে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটান হয়। অবশ্য হায়দ্রাবাদের যে সকল বিশ্বাসঘাতকদের জন্য তাঁদের পরাজয় হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম বিশ্বাসঘাতক ছিলেন নিজাম।

ইন্দ্রোরে যিনি বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দেন তিনি শাহাদাত খাঁন। বৃটিশ রেসিডেন্সী আক্রমণ করে তা অধিকার অধিকার করেছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁকেও শহীদ হতে হয়। ওলিদাদ খাঁনও এমনই এক বিখ্যাত নাম। ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করে বিপ্লবীদের নিয়ে মালগড়ের দুর্গ তিন মাস ধরে দখলে রেখেছিলেন। অবশেষে ধরা পড়েন, তাতে বন্দী হন ও ফাঁসি হয়। সে সাথে তাঁর যত আত্মীয়-স্বজনকে ধরা সম্ভব হয়েছিল তাঁদেরকেও ফাঁসি দেয়া হয়।

বিপ্লবী রজব আলী ১৮৫৭-র ১৮ই নভেম্বর বিরাট দলবল নিয়ে চট্টগ্রাম ট্রেজারী দখল করেন এবং জেল দখল করে বন্দীদের মুক্তি দিয়ে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারে আগুন লাগিয়ে পলায়ন করেন। সিলেট এ সংবাদ পৌছালে সেখানকার ডেপুটি কমিশনার একদল সৈন্য পাঠান। মাঝপথে লাটুতে দু পক্ষের যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে ইংরেজ ও অনেক বিপ্লবী নিহত হন। এভাবে মণিপুর অঞ্চলেও পর পর কয়েকটি যুদ্ধে অধিকাংশ বিপ্লবী শহীদ হন। রেঙ্গুনের পার্বত্য জঙ্গলেও বিপ্লবীরা পথহারা হয়ে ঘুরে খাদ্যাভাবে জরাজীর্ণ হয়ে বন্দুকের সাহায্যে শিকার করে প্রাণ ধারণ করেন। শেষে গুলি বারুদ শেষ হলে হিংস্র জন্তুদের খাদ্যে পরিণত হতে হয় সে বিপ্লবীদের। এদিকে চট্টগ্রম বিদ্রোহের সংবাদ ২২শে নভেম্বর ঢাকায় পৌছালে সেখানকার অনেক বাঙালী সৈন্যদের বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়। সৈন্যদের অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়। ফলে বড় রকম বিদ্রোহের রূপ নেয়। বিদ্রোহীদেরকে চরম নৃশংসতার সাথে বর্তমান ঢাকার সদরঘাটই বাহাদুর শাহ্ পার্ক নামক স্থাসে ফাঁসি দেয়া হয়। তাঁদের অন্যতম একজন নেতা পাতলা খাঁনকে ইরেজরা হাতির পায়ের তলায় নিষ্পেষিত করে। (দ্রষ্টব্য আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১১০-১৩)

বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা মাওলানা ইয়াহিয়ার জন্য মুসলমান বিদ্বেষী হান্টার লিখেছেন, "এ মহান ব্যক্তি ছিলেন পাটনার মওলবী ইয়াহ্ইয়া আলী, ভারতীয় বিপ্লবীদের (ও) ধর্মীয় অধিকর্তা। আর গোপন উদ্দেশ্যটা ছিল মহাবনে অবস্থিত বিপ্লবী (ও) বসতিতে নতুন মুজাহিদ ও যুদ্ধ-সামগ্রী পাঠান, কারণ বৃটিশরাজের সাথে তখন তাদের প্রকাশ্যে সংঘর্ষ চলছিল।.... প্রধান খলীফা ও খতিব ইয়াহয়িয়া আলী পাটনা প্রচার কেন্দ্র সুদৃঢ় অথচ শান্তভাবে চালনা করতেন। নিম্নবঙ্গের জিলাগুলো থেকে যে-সব নবমুজাহিদকে সফলকারী প্রচারকরা চালান দিত....ভারতীয় বিপ্লবীদের (ও) ধমীয় অধিকর্তা হিসেবে তাঁকে সমস্ত সফলকারী প্রচারকের সাথে পত্রালাপ করতে হত।... তিনি মসজিদের নামাযে ইমামতি করতেন। মুজাহিদদের জন্য তিনি যেমন প্রত্যেকটি রাইফেল পরীক্ষা করতেন, সে রকম ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ধর্মতাত্ত্বিকতার বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন।... কিন্তু এ ষড়যন্ত্রকারীদের সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল নবমুজাহিদদেরকে পাটনা প্রচার কেন্দ্রে অর্থাৎ তাদের সাংকেতিক ভাষায়, ছোট কারখানা থেকে সীমান্তের বিদ্রোহী-বসতি অর্থাৎ বড় কারখানায় চালান দেয়া। বাঙালী মুজাহিদকে সফরকালে রাস্তায় হাজারো বিশ্রী প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত। পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমের প্রদেশগুলোর ভিতর দিয়ে তাদের প্রায় দু'হাজার মাইল অতিক্রম করতে হত...পথিপার্শ্বের খানকাহগুলির রক্ষ করা সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক, কিন্তু সকলেরই এক লক্ষ্য ছিল, তা বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন।... স্যার হারবার্ট এডওয়ার্ডস্ যেরূপ মর্মস্পর্শী ভাষায়–এ ব্যক্তির ফাঁসির হুকুম দান করেন, পূর্বে কখনো সেরূপ ভাষা আদালতে আর উচ্চারিত হয়নি।" স্যার হার্বাটের ভাষায়–"বাংলাদেশে তাঁর হিন্দু স্বদেশবাসীদের মত যুক্তি ও বিবেকের কাছে আহ্বান না জানিয়ে তিনি সরাসরি রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মাধ্যমে মনোবাসনা সফল করতে চেয়েছেন।"" দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্ পৃষ্ঠা ৮৪-৮৭। এ বীর মাওলানা ইয়াহিয়া শহীদ হয়ে ভারতবাসীকে ঋণী করে গেছেন। উচ্চ আদালতে তাঁর ফাঁসির রায় পরিবর্তন হয়ে আন্দামানে চিরনির্বাসনের দণ্ড দেয়া হয়। সে কুখ্যাত জেলেই ফাঁসির চেয়েও কষ্টের সাথে তিনি প্রাণ দান করেন তিনিই বিপ্লবীদের জন্য একটা সাংকেতিক ভাষা দৃষ্টি করেছিলেন।

বিপ্লবীরা পশ্চিম বালার মালদহে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। লক্ষ্ণৌ-র মাওলানা আবদুর রহমান ছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠাতা। মালদহে একটা মাদ্‌রাসা তৈরি হয়। সেখানে পড়ান এবং জেলায় জেলায় জিহাদের বাণী ছাড়ান চলতে থাকে। সে সময় বিখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন মালদেহের রফিক মণ্ডল। প্রথম দফায় তাঁর জেল হয়, পরে মুক্তি দেয়া হয়। তারপর মালদহের মাওলানা আমীরুদ্দিন বিপ্লবী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তিনি মালদহ ছাড়া মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহীরও দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে এসব বিরাট এলাকা হতে মুসলমানদের যাকাত, সাদকা, কোরবাণীর জন্তুর চামড়ার দাম বিনা বাক্যব্যয়ে পৌছাত। তিনি যথাসময়ে তা সীমান্তে পাঠিয়ে দিতেন। কয়েক শত যুবককেও তিনি বাংলা হতে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছিলেন। পরে এসব তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়লে তিনি বন্দী হন এবং তাঁকে আন্দামান জেলে এগার বছর রাখা হয়। (তথ্য ঃ ঐ, পৃষ্টা ১৫৫-৫৬)

এভাবে পাটনার মামলায় বিপ্লবী পীর মহাম্মদ আমীর খাঁন হাসমতদাদ খাঁন, মোবারক আলী, তাবারক আলী, হাজী দীন মহাম্মদ এবং আমিনুদ্দিনকে আসামী করা হয়। বোম্বাই, কলকাতা ও সাম্রাজ্যের বড় বড় ইংরেজ ব্যরিস্টার দেয়া হয়েছিল। মামলায় আমীর খাঁন ও হাসমত খাঁন এ দুজনে সে বাজারে এক লাখ টাকা খরচ করেছিলেন। শেষে এ দুজন বাদে বাকী পাঁচ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। (দ্রষ্টব্য আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১৫৭)

আর একটি ভারতরত্নের নাম আল্লামা ফজলে হক। জন্ম ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে। বাড়ী অযোধ্যার খয়রাবাদে বলে তাঁকে খয়রাবাদী বলা হত। তাঁর প্রথম পরিচয়-তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠতর একজন আলেম, বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি ও ঐতিহাসিক। তাঁর সম্মানময় দ্বিতীয় পরিচয় হল, তিনি ১৮৫৭-র বিপ্লবের একজন প্রত্যক্ষ সংগ্রামী। তাঁর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে আসসাওরাতুল হিন্দিয়া, কাসিদায়ে ফিতনাতুল হিন্দ, তাহকিকুল ওজুদ, তাহ্‌কীকে হাকিকাতুল আজসাম, হাশিয়া কাজী মোবারক, হাশিয়া উফুকুল মুবিন, রিসালায়ে গদর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতকে স্বাধীন করতে গিয়ে ফজলে হককে বন্দী হতে হয়। বিচারের নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তে তাঁর সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তি বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে এবং পৃথিবীর কুখ্যাত আন্দামান জেলে ছোট্ট কুঠরীতে প্রবেশ করায়। সেখানেই হযরত খয়রাবাদীকে বাকী জীবনটা কাটাতে হয়েছিল।

জেলের ডেপুটি জেলার সাহেব প্রাচ্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর কাছে অত্যন্ত পুরাতন মহামূল্যবান একটা ফার্সি পাণ্ডুলিপি ছিল। তিনি তার পাঠোদ্ধার ও মর্মোদ্ধারে পূর্ণ ক্ষমতা রাখতেন না বলে চিন্তা করছিলেন কাকে দিয়ে এ কাজ করান যায়।

হযরত ফজলে হককে এক অস্বাস্থ্যকর ঘরে রাখা হয়েছিল। তার ছাদ দিয়ে বৃষ্টি পড়ত। ফলে পায়খানার মত ছোট্ট কামরায় পানি জমে যেত। হাফপ্যান্ট আর ছোট জামা পরতে দেয়া হয়েছিল। খাদ্য হিসেবে দেয়া হত নানা জাতের মাছ সিদ্ধ, যা ছিল অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ও খাবার অযোগ্য। সময়ে সময়ে বালি মিশান রুটি দেয়া হত। যা হোক তাই দিয়েই ক্ষুধা নিবৃত্তি করতেন। ঠাণ্ডা পানির পরিবর্তে গরম পানি দেয়া হত। অবশ্য কিছুক্ষণ রাখলেই তা ঠাণ্ডা হবার কথা, কিন্তু তার উপায় ছিল না—তাড়াতাড়ি পানি না খেলে পানির পাত্র ফিরিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ ছিল। প্রতিদিন নিয়মিত বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা ছিল স্যাঁতসেঁতে ঘরে থাকতে হত। রাত্রে অন্ধকারে রাখা হত। কাঁকড়া বিছেতে প্রায়ই দংশন করত, তার যন্ত্রণায় সারাক্ষণ ছটফট করতে হত। কক্ষে দ্বিতীয় কেহ ছিলনা যে তাঁর

থেকে একটু সাহায্য ও সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে। সর্বাঙ্গ দাদ, চুলকানি ও একজিমাতে ছেয়ে গিয়েছিল। তদুপরি চিকিৎসা ও ঔষধ দেয়া ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ভারতরত্ন যত্নের অভাবে যেন নোংরা আস্তাকুড়ে চাপা ছিলেন। আরও দুঃখের কথা, হযরত ফজলে হককে দিনের বেলায় সাধারণ মেথরের মত নিজের ও অন্যান্য কয়েদীদের পায়খানা পরিষ্কার করতে হত। বন্দী বীর তাই-ই করতেন।

এদিকে ডেপুটি জেলার সাহেব তাঁর সে ফার্সি পাণ্ডুলিপিটার যোগ্য অনুবাদক খুঁজতে গিয়ে ফজলে হকের নামই পেলেন। তাই কারাকর্তা কাগজ-কলম দিয়ে পাণ্ডুলিপিগুলো তাঁর কাছে পাঠালেন। অসুস্থতা ও অস্বাভাবিক মানসিকতা সত্ত্বেও মাওলানা টীকাসহ অনুবাদের কাজ শেষ করলেন। সে সাথে তথ্যগুলো কোন্ লেখকের কোন্ পুস্তকের কোন খণ্ড হতে নেয়া তাও লিখে দিলেন। জেলার সাহেব সেটা পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হলেন এজন্য যে, বহু পুস্তকাদির সাহায্য ছাড়া এ কাজ এভাবে সম্পন্ন করা বিস্ময়কর কঠিন। তাই তিনি সাক্ষাৎ করতে এলেন ফজলে হকের সাথে। ঠিক তখন তিনি পায়খানা পরিষ্কার করে বিষ্টামাখা টিন ও ঝাঁটা নিয়ে অর্দ্ধোলঙ্গ পোশাক পরে ধীরে ধীরে আসছিলেন। সাহেব তাঁকে হাত খালি করে দাঁড়াতে বললেন। তাঁর পর মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থাতেই মাওলানাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন এবং ক্ষমা চাইলেন। ভুলবশতঃ তাঁকে ময়লা পরিষ্কার দায়িত্ব দেয়ার জন্য। ফজলে হক নিজেও কেঁদে ফেললেন এবং ক্ষমা করলেন। সাহেব তাঁকে পুরস্কার দিতে চাইলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কাছ থেকেই পুরস্কার নিব, মানুষের কাছ থেকে নয়।'

তাঁর মনের কিছু অন্তিম কথা তিনি কাফনের কাপড়ের উপর লিখে যেতেন। সেহেতু আগেই এ সাহেব কারাকর্তাকে বলেছিলেন, 'আমার আনা কাফনখানি আমি আমার ছেলেদের কাছে পৌছে দিতে চাই। যদি আমার এখানেই মৃত্যু হয় তাহলে আপনারা সরকার অনুমোদিত কাফন দিয়েই আমার কবর দিবেন।' এ কাপড়ের উপর কাব্য আকারে যে কাহিনী তিনি চিত্রিত করেছিলেন সেটাই 'আস্‌সাওরাতুল হিন্দিয়া' নামক পুস্তক।

মাওলানার দু'জন পুত্র যথাক্রমে মাওলানা আবদুল হক ও মাওলানা শামসুল হক জনসাধাররেণর সহযোগিতা সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে পিতার মুক্তির দরখাস্ত করেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রোগে শোকে দুর্বল, মৃত্যুপথযাত্রী সে বন্দীকে ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দান করে। তাঁরা উভয়ে এ সুসংবাদ দেশের লোককে বলতেই দেশের হিন্দু মুসলমান খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কারণ তারা আবার দেখতে পাবে তাঁদের মহাপণ্ডিত বৃদ্ধ, প্রত্যক্ষ সংগ্রামী কারাগার ফেরতা রত্ন খয়রাবাদীকে। যথা সময়ে তাঁর পুত্রেরা বৃদ্ধ পিতাকে সাথে নিয়ে দেশে ফেরার আশায় আন্দামান পৌছালেন। কিন্তু সেখানে পৌছে জানতে পারলেন, তাঁর পিতা কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছন। অশ্রুপ্লুত নয়নে পিতার কবরে শেষ দেখা করে ফিরে এলেন খয়রাবাদে ?লাখ লাখ মানুষ কেঁদে ফেলল তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেল না বলে।

মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা ছুঁতে পারে না শিশু বেলায়। আবার মানুষ বহু অন্যায়, ভেদাভেদি, পক্ষপাতিত্ব অত্যাচার করেও ক্লান্ত হয় মৃত্যুর পূর্বক্ষণে, যখন সে জানতে পারে মৃত্যু তার অবধারিত। সে সময় যে কথাগুলো তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয় অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো হয় বড় খাঁটি ও মূল্যবান্ কথা। খয়রাবাদী মৃত্যুর পূর্বে যে কথাগুলো কাফনের কাপড়ে আরবী ভাষায় লিখে গিয়েছিলেন, উর্দুতে অনুবাদ করে ভারতে যখন তার প্রচার শুরু হল, সাথে সাথে বইটি বাজেয়াপ্ত করা হল। গোটা পুস্তিকা এখানে জানান সম্ভব না, তবে তার কয়েকটি বাক্য এখানে তুলে ধরছি। অবশ্য এজন্য মুহিউদ্দিন খাঁনের অনূদিত 'আযাদী আন্দোলনে'রও সাহায্য নেয়া হচ্ছে।

মহাবিপ্লবের সময়ে ভারতের মুসলমানদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নামায-রোযার মত জরুরী বলে তিনি ফতওয়া দিয়েছিলেন। তাঁর এ অপরাধ নাকি অমার্জনীয় ছিল। আর তাই আন্দামানে ইংরেজের চরম অত্যাচার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন–'আমি এমন বিপদের মধ্যে পড়েছি বা কল্পনা প্রবণ ব্যক্তির পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়।" "এ সমস্ত নীচ প্রকৃতির লোকেরা আমার উপর নতুন নতুন নানা ধরণের অত্যাচার করায় মনের ভারসাম্য রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।.....লালমুখো, কটাচোখে, সাদা চামড়ার চুল-কাটা অত্যাচারীদের হাতে পড়ে আমায় নিজস্ব রুচির পোশাক কেড়ে নিয়ে ছোট ছোট মোটা জঘণ্য ধরণের পোশাক পরিয়েছে।"

তাঁর লেখায় তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী অযোধ্যার নবাবের ব্যক্তিগত চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, "একজন শাসনকর্তার মত দূরদৃষ্টির যথেষ্ট অভাব ছিল তাঁর মধ্যে।" আরো লিখেছেন, তিনি "দিন রাত শুধু গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গীত ও বাদ্য ভোগ করার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকতেন।"

বিপ্লবীদের পরাজয়ের কারণ বলতে গিয়ে কিছু কুখ্যাত সংগ্রামী নেতার চরিত্র প্রসঙ্গে বলছেন "বস্তুতঃপক্ষে তারা সংগ্রাম পরিচালন বাদ দিয়ে আরাম ও ভোগবিলাসে নানা প্রকার পাপাচারে নীচতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে।" "অস্ত্রচালনা ও শত্রুর মোকাবেলা করার কোন অভিজ্ঞতা তাদের ছিলনা। একটি আক্রমণের ঘটনায় অযোধ্যার হিন্দু বাসিন্দাদের বীরত্বের বর্ণনায় লিখেছেন, "ইংরেজ সৈন্যদের উপস্থিতির কথা শুনে সেখানকার মুর্খ সংগ্রামী নায়করা ও সর্দাররা সরে পড়ল। সাথে সাথে সংগ্রামীদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি হল। সকলেই পালিয়ে প্রাণ বাঁচান ভাল মনে করল। কিন্তু সে এলাকার কয়েক শত হিন্দুবাসিন্দা বীরত্বের সাথে ইরেজ সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করল। অবশ্য ইংরেজ বাহিনী তাদের ধ্বংস করে দিল। বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ বলতে গিয়ে লিখেছেন, "সর্বশেষ আক্রমণের সময় হিন্দু দেশীয় রাজারা বিপ্লবী বাহিনীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল।" রাজা শ্রীবলদেও সিং এর জন্য লিখেছেন, "এ হিন্দু রাজা মুখে বিপ্লবী নেতা আহমাদুল্লার অনুগত হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ইংরেজদের বন্ধু। ইংরেজ সেনানায়কদের নির্দেশক্রমেই তিনি বিপ্লবীদের সাথে এসে যোগ দিয়েছিলেন। "দেশীয় রাজা বলদেও সিং চার হাজার সৈন্য নিয়ে বিপ্লবীদলের যোগ দিলেন সত্য, কিন্তু সাহায্য না করে পিছন দিক হতে বিপ্লবীদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলেন। দু দিককার আক্রমণ সহ্য করা বিপ্লবী বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।" "এ সময়ে হিন্দু বণিক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও কিছু যুক্তিদাতা বিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করায় বণিক ব্যবসাদারেরা শহরের সমস্ত মজুত খাদ্য শস্য কিনে গুদামে ভরে ফেলল...বিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করল বণিক ব্যবসাদারেরা শহরের সমস্ত মজুত খাদ্য শস্য কিনে গুদামে ভরে ফেলল...বিপ্লবী বাহিনী ও দেশপ্রেমিক জনসাধারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হল।" "এভাবে ফাঁসি ও গুলিতে প্রাণ-দানকারীর সংখ্যা অসংখ্য। হাজারে হাজারে অত্যাচারীদের বর্বর নির্যাতনের যারা শিকার হয় তাদের অধিকাংশই ছিল উৎকৃষ্ট মুসলমান নাগরিক। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ চতুর্দিকে হিন্দু জমিদার ও আমলা শ্রেণীকে নির্দেশ দেয় যে, যে কোন সন্দোহজনক লোককে গ্রেফতার করে যেন দিল্লীতে যেন প্রেরণ করা হয়। এর ফলে হাজার হাজার পালায়নকারী দেশপ্রেমিক গ্রেপ্তার হয়ে গণহত্যার শিকারে পরিণত হয়।" ফজলে হক তাঁর পুস্তিকায় জানিয়েছেন, সবশেষে ইংরেজদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে দেশবাসীর প্রত্যক্ষ সাহায্যেই তারা জয়লাভ করেছে। আর সাহায্যদাতারা বেশীর ভাগ রাজা, মহারাজা ও জমিদার শ্রেণী। আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর পুস্তিকার আস্বাদ পরিবেশনের যবনিকা টানছি–"অত্যাচারী

বিচারকরা আমাকে আজীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও নির্বাসনের নির্দেশ দেয়। সে সাথে আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি, বহু পুরুষ ধরে সঞ্চিত আমার বিরাট গ্রন্থভাণ্ডার এমনকি অসহায় স্ত্রী-পুত্র পরিজনের বাস করার বাড়ী-ঘর পর্যন্ত রাজেয়াপ্ত করে।...সবশেষে এ কাহিনী আল্লাহ্‌র প্রিয় মুহাম্মদের (সাঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গীদের উপর দরুদ ও সালামের সাথে শেষ করছি। আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর। সমস্ত কাজের পূর্ণতা বিধান তাঁর দ্বরাই সম্ভব।"

এ মহানায়ক ভারতরত্ন মাওলানা ফজলে হক (রহঃ) যদি প্রচলিত ইতিহাসে স্থান না পান তাহলে একদিন না একদিন আমাদের এ বেঈমানীর কৈফিয়েত দিতে হবে ভবিষ্যত বংশধরদের সামালোচনার এজলাসে।

বিপ্লবী মজনু শাহ ঃ ১৭৫৭ হতে ১৮৫৭ এ একশ বছরের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ধারা বলতে গিয়ে এ বই-এর এ অধ্যায়ের অত্যন্ত সংক্ষেপে কিছু ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে মাত্র। সেখানে ভিক্ষুক, ক্ষুধার্ত ও 'ডাকাত দলে'র বিদ্রোহের কথা লেখা আছে। এ ফকীর, ভিক্ষুক বা সর্বহারাদের অভ্যুত্থানের যিনি নেতা তাঁর নাম ফকীর মজনু শাহ ' চলতি ইতিহাসে শুধু এ টুকুই মাত্র বস্তুতঃ তিনি ছিলেন এক মহান নেতা, মহাবিপ্লবী ভারত সুহৃদ।

স্বৈরাচারী হেস্টিংস এ মহান বিপ্লবকে সন্ন্যাসী ও ফকীর বিদ্রোহ বললেও তা মূলতঃ ছিল বঙ্গদেশের প্রথম কৃষক বিদ্রোহ। (দ্রষ্টব্য ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সুপ্রকাশ রায়, পৃষ্ঠা ১৭)। 'ফিউচার রেজাল্টস্ অব ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া'তে কার্লমার্কসও বলেছেন এ বিদ্রোহ ছিল বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাংলা ও বিহারের কৃষক বিদ্রোহ। এ তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবু তালিব তাঁর 'ফকীর মজনু শাহ' পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠায়। তাছাড়া ১৭৬৩ হতে ১৮০০ এ ৩৭ বছর যারা একটা আন্দোলন চালায়, তাঁরা কেমন ফকীর অনুমান করা শক্ত নয়। আরও বলা যায়, মজনু আড়াই হাজার বিপ্লবী নিয়ে যখন ঘোড়াঘাটে পৌছান তখন মিঃ পার্লিংকে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ক্যাপন্টেন টমাসের কাছে সৈন্যের জন্য আবেদন করতে হয়। (ঐ পৃষ্ঠা ৯৭)। এ থেকেও এ বাহিনীর সুস্পষ্ট পরিচয় মিলে।

বৃটিশ আমলে ইংরেজ কর্মচারীরা ও তাদের পদলেহীরা অসৎ উপায়ে উপর্জিত অর্থকে তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে নিত সুদ ব্যবসার মাধ্যমে। এতে শোষিত হত দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকরা বিশেষতঃ মুসলমান ও অনুন্নত হরিজনরা। ক্যাপটেন ডানকানসন চৌদ্দ হাজার নশো এক টাকা সুদে খাটিয়ে এক বছর পর মোট একুশ হাজার টাকা পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি (দ্রষ্টব্য আমানত উল্লাহঃ কোচবিহারের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২২৭)। মজনু তাই গরীব জনসাধারণকে এ শোষকদের হাত হতে বাঁচাবার জন্য বিনা সুদে ঋণ দান করতেন। সে টাকা শোধ নিতে এবং বিভিন্ন সুফী সন্তদের করব দর্শনে (জিয়ারত) তাঁরা নানা জেলায় ঘুরে বেড়াতেন। তাছাড়া ইংরেজদের দালাল অত্যাচারী জমিদারদের সরাসরি অথবা পত্রে জানিয়ে দিতেন, শাস্তি স্বরূপ এত হাজার টাকা চাই; আর তা আদায়ও করতেন। সে টাকা বিপ্লবে ও দরিদ্রের সেবায় লাগান হত। ইংরেজ পক্ষীয় জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর কাছে পত্র মারফত ৫০ হাজার টাকা দাবী করলে তিনি ভীত হয়ে অন্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে ব্যসস্থান স্থানান্তরিত করেন। (অধ্যাপক আবু তালিব; পৃষ্ঠা ৬৯-৭০)

বিপ্লবী ফকীরগণ বর্তমানে আমাদের দেশের গাঁজা খাওয়া মুসলমান আউল-বাউলদের মত ছিলেন না। তাঁরা পুরোপুরি ভাবেছিলেন মোজাহিদ। তাঁদের নিম্নাঙ্গের পোশাক ছিল আধাকমলা রঙের, আর উপর দিকের পোশাকের রঙ ছিল নীল। তাঁদের শিক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনী এমন কি উট পর্যন্ত ছিল। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা তাঁদের ক্যান্টনমেন্ট বা দুর্গ

ছিল বগুড়ার মহাস্থানগড়ে এবং মালদহ সংলগ্ন জঙ্গলে। মহাস্থানগারে মজনু শাহের উপস্থিতিতে মিঃ গ্লাডউইনের মত নামজাদা লোকেরও বীত হয়ে উপর মহলে সৈন্য ও অস্ত্রের জন্য সাহায্য চাইতে হয়েছিল। উল্লেখ্য তখন বিপ্লবী মজনুর আক্রমণবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। অধ্যাপক এ. তালিব পৃষ্ঠা ৬৩.৬৫ ও ৭৪]। যামিনী মোহন ঘোষের ইংরাজী বই Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal-এ মজনু সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তবে জমিদার লেখক ইংরেজদের ইঙ্গিত তাঁর লেখায় মজনু বাহিনীকে অত্যন্ত হেয় করে দেখিয়েছেন।

যদি ধরে নেয়া যায় তাঁরা ডাকাত ছিলেন, লুটপাট করে মানুষের ক্ষতি করতেন তাহলে তাঁদের ধরার ব্যাপারে গ্রামবাসীরা কোন রকম সাহায্য ও সংযোগিতা করত না কেন? উপরন্তু ফকীর বাহিনীকে বাড়ী পিছু নজরানা দিয়ে গ্রামবাসীরা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করত। বিপ্লবী মুসাকে বন্দী করার জন্য মি: খৃষ্টী যখন গ্রামবাসীদের সাহায্য চাইলেন গ্রামবাসীরা কোনও পরিমানে সাহায্য করেনি। অপরদিকে. এক্ষেত্রেও ইংরেজ পক্ষে দালালী করেছেন একমাত্র দেশের মজিদার শ্রেণী। কারণ মি: উত্তসন যখন ফকীর বাহিনীর ব্যাপক ও প্রচণ্ড আক্রমণের ঘটনা বুঝলেন বা দেখলেন তখন তাঁদের দমন করার জন্য আদেশ দিলেন দিনাজপুর. রংপুর ও পূর্ণিয়ার সমস্ত অনুগত ভূস্বামী বা জমিদারদের। সরকারিভাবে সংবাদ পাঠালেন. তাঁরা যেন এ ফকীর-বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে লড়াই-এ নামেন/ (অধ্যাপক এ. তালিব, পৃষ্ঠা ৮৩)

বিপ্লবী মজনু শাহ্ অনেক লড়াই এবং সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শেষে কালেশ্বরের যুদ্ধে আহত হন এবং বন্দী না হয়ে আত্মগোপন করে বেশ কিছু দিন ভুগে তাঁর দায়িত্ব দেশবাসীর হাতে দিয়ে ১৭৮৭-র মার্চমাসে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে বিপ্লবী নায়ক মুসা শাহ ছ'হাজার সংখ্যার এক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। উল্লেখ্য যে, মজনু শাহের মৃত্যুর পর প্রায় প্রত্যেক নেতাই মজনুকে সম্মান দেখিয়ে তাঁর নামের সাথে 'শাহ' যোগ করেছিলেন. যেমন করীম শাহ্ চেরাগা শাহ্, পরাগ শাহ্. সুবহান শাহ্, জহীর শাহ্ রমজান শাহ্. শামশের শাহ্ প্রভৃতি।

'ডাকাত দল' ও লুণ্ঠনকারী দল' বলে যাঁদের চেপে রাখা হয়েছিল, মানুষের সামনে এখন সেগুলো তুলে ও খুলে দেয়া হচ্ছে যাতে আমাদের পররোকগত বিপ্লবীদের আমরা স্মৃতির সিংহাসনে বসাতে পারি।

* * *

চেপে রাখা মোপ্‌লা বিদ্রোহ

'মোপলা' মালাবারের একটা মুসলমান সম্প্রদায়। এঁদের সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পূর্বেই দেয়া হয়েছে। মোপলাদের বড় দোষ অথবা গুণ হচ্ছে, তারা বরাবর ইংরেজ বিরোধী। তাঁরা ছোট বড় অসংখ্য বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে পাঁচটি বিদ্রোহ 'বিপ্লবের' দাবীদার। সাতান্নর বিপ্লেবের পরেও তাঁদের এ বিদ্রোহগুলো যথাক্রমে হয়েছিল ১৮৭৩, ১৮৮৫, ১৮৯৪, ১৮৯৬, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে।

বিপ্লবীদের একশ ভাগই ছিলেন মুসলমান। আর যেহেতু সেখানকার রাজা-মহারাজা-জমিদাররা বারেবারে ইংরেজদের হয়ে সাহায্য করে এসেছেন, তাই বিপ্লবী মোপলা বাহিনী হিন্দু বিত্তবানদেরও শত্রু মনে করতে দ্বিধা করেনি উপেক্ষিত শোষিত অনুন্নত নিম্নেশ্রেণীর অমুসলমানরা প্রতিবারেই মোপলাদের সাথে যোগ দেয়ার ইচ্ছা কররেও নেতৃস্থানীয় ধনী মধ্যবিত্তদের কৌশলময় প্রচারের তাদের বোঝান সম্ভব হয়েছিল যে ওটা হিন্দু-মুসলমানের লড়াই। আর তাই অনেক ক্ষেত্রে 'ধর্মের অপব্যবহারের ফলে নীল বিদ্রোহের মত মিলিত হিন্দু-মুসলমানানের লড়াই । আর তাই অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের অপব্যবহারের ফলে নীল বিদ্রোহের মত মিলিত হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হতে পারেনি। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন এবং মাওলানা মহাম্মদ আলীদের খিলাফত আন্দোলনেও এ মোপলা বাহিনী রক্তাক্ত সাড়া দিতে ভোলেনি।। ইংরেজ সরকার সারা ভারতে যা করেনি তা করেছে মোপলাদের মালাবারে। তাঁরা সভা-সমিতি ও সম্মেলন করতে পারতেন না, কারণ কঠোরভাবে তা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাতেও বিপ্লবকে দমান যায়নি, বরং আগুণে পেট্রোল ঢালা হয়েছে। ফল হিসেবে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মোপলারা মালাবারকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেন। সৈন্যদের সাথে মুসলমান মোপলাদের ভয়াবহ সংগ্রাম শুরু হয়। একদিকে শোষক ও শাসক ইরেজ ও তাদের ধামাধরা স্থাবকের দল, অন্য দিকে শাসিত শোষিত মৃত্যু পথযাত্রী বিপ্লবী দল। ইংরেজ সৈন্যদের হাত হতে ওয়ালুভানাদ ও এরনাদ নামক দুটি স্থান ছিনিয়ে নেয়া হলে যুদ্ধ আরো জোরদার হয়।

তাছাড়া, সে সময় এ এলাকার বাইরে চিঠি পত্র, টেলিগ্রাম ইত্যাদির যোগাযোগ বন্ধ রাখা হয়। আর বাইরে থেকে আসা প্রত্যেকটি চিঠি পরীক্ষা করে তবে বিলি করা হত। সামান্য ক্ষতির গন্ধ থাকলে তা বিনষ্ট করা হত। তবে সরকারি খবরাখবর আদান প্রদান অব্যাহত ছিল। মোপলা বাহিনী ইংরেজের সাহায্যকারী কিছু ভারতীয় নেতাদের এ সময় নিহত করেন। চতুর ইংরেজরা 'মুসলমান কর্তৃক হিন্দু আক্রান্ত এ কথাটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রচার করে সাফল্য লাভ করে। ইংরেজের এ সমস্ত কুকীর্তি সরকারিভাবে গোপন রাখার চেষ্টা করা হলেও কিন্তু ভারতীয় নেতৃমহলে তা পৌঁছে যায়। সাথে গান্ধীজী, মাওলানা মহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী মোপলা হত্যা এবং নকল সাম্প্রদায়িকতার খেলা বন্ধ করতে মালাবারে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে, ইংরেজ তাঁদের মালাবারে ঢুকতে না দিয়ে এবং জানিয়ে দেয়া হয়, কাউকে এখন মালাবারে ঢুকতে না দেয়ার আইন চালু রয়েছে। (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম পৃষ্ঠা ২৩০-১)। এবার ব্রিটিশ সরকার মালাবারে হাজার হাজার সৈন্য নানা ধরনের ট্যাঙ্ক, কামান, বোমা কতকগুলো গানবোট এবং রণতরী নিয়ে আসে। তার আগে ইংরেজী কায়দায় অপপ্রচার হয়েই ছিল। সুতরাং হিন্দুরা বিপ্লবী মুসলমানদের তাদের শত্রু মনে করে

লড়াইয়ে নেমে পড়েন একদিকে ইংরেজ শক্তি তো আছেই, অন্য দিকে বাড়িতে পল্লীতে হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই-এ লড়াই এক বীভৎস রূপ নিল। যুদ্ধ চলল এক মাস। তারপর একদিন ইরেজরা আকাশ হতে বোমা বর্ষণ রণতরী হতে শেল বর্ষণ, ট্যাঙ্ক ও কামান হতে গোলা বর্ষণ করে মোপলাদের গরবাড়ি, দোকান পাট, ভষ্মস্তূপে পরিণত করে। যুদ্ধ শেষে মোপলা বাহিনীর দশ হাজার পুরুষ নারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। আর জীবন্ত যাদের পাওয়া যায় তাদের বন্দী করে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বিচারের পূর্বেই অনেক পুরুষ ও শিশুকে হত্যা এবং নারীদের উপর লজ্জাকর পাপাচার করা হয়। বাকী বেঁচে থাকা আসামীদের বিচার-ফল এমন দাঁড়ায়-এক হাজার জনের ফাঁসি দু হাজার লোকের দ্বীপান্তর অর্থাৎ সে আন্দামানে শ্রমসহ নির্বাসন আর আট হাজার লোকের পাঁচ হতে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। শাস্তির কি সুষম পরিবেশন।

এ অত্যাচারের ইতিহাসে আর একটি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে। জীবন্ত বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাছাই করা আশিজনকে ট্রেনের একটা ছোট্ট কামরায় দরজা জানালা বন্ধ করে কালিকটে নিয়ে যাওয়া হয়। পথে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বন্দী বিপ্লবীরা পানির জন্য চিৎকার করেন এবং পানি ভিক্ষা চান। কিন্তু সে আর্তনাদে নিষ্ঠুরদের প্রাণবিগলিত হয়নি। যখন ট্রেন কালিকটে পৌছাল তখন দেখা গেল অধিকাংশই শহীদ হয়েছেন। আরও দেখা গেল, একজন অপর জনের জিভ চুষে পিপাসা মেটাবার চেষ্টা করেছেন। কিনতু সে শুষ্ক রসনা ততটুকু রস দিতে পারেনি বা তাঁদের বাঁচাতে পারত। যাহোক এতবড় একটা কাণ্ড ঘটবার পরও তখনকার ভারতীয় নেতারা সবাই যেন ক্ষেপে গেলেন ব্যাপারটা মুসলমানদের মনে বেদনা সৃষ্টির এটাও অন্যতম একটা কারণ বলা যায়। খিলাফত কমিটির নেতা মাওলানা মহাম্মদ আলী এটা নিয়ে হৈ চৈ করতে গিয়ে বাধা পেয়ে খুব আঘাত পান এবং কংগ্রেসের উপর আস্থা হারান। (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৩)

* * *

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসক ইংরেজকে তাড়িয়ে শোষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য সর্বভারতীয় আন্দোলন, অভ্যুত্থান, সংগ্রাম বা বিপ্লবের কথা অনেক আলোচিত হল। তাতে কিন্তু অনেকেরই মনে হবে, উপরোক্ত আন্দোলনগুলোতে প্রধানতঃ মুসলমান বিপ্লবীরাই মোটা অংশীদার, আর হিন্দু বিপ্লবীদের যোগ থাকলেও তা সমকক্ষতা সীমার অনেক নীচে। কিন্তু এটা কি সত্যি? পূর্ব আলোচনায় এও মনে হতে পারে যে, অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই বৃটিশের পক্ষে কাজ করেছেন বা কোন কোন ক্ষেত্রে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধতা করেছেন–একথাগুলো ততক্ষণ মেনে নেয়া যায় না, যতক্ষণ সে যুগের খ্যাতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা তাঁদের জীবনী, তাঁদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকা ও লেখার উপর নজর না করা যায়।

আমরা যেন ভুলে না যাই যে, স্বাধীনতার ইতিহাসে যাঁদের 'বীর বলে আখ্যায়িত করা হয়, সে মহামান্য মতিলাল, জওহরলাল, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীদের ১৮৫৭ সনের প্রকৃত স্বাধীনতা বিপ্লব পর্যন্ত জন্মই হয়নি। যাঁদের এ সময়ে জন্ম হয়েছিল এবং সে সময়ে যাঁরা সমাজে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হয়েছিল তাঁদেরই সম্ভাব্য আলোচনা করা হয়েছে প্রথমে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

এঁর জন্ম হয় ১৮১২ খৃষ্টাব্দে। ১৫ বছর বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়। অবশ্য 'পত্নী দুর্গামণি দেবীর সাথে তিনি আজীবন সংসার করেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোন সাধারণ লোক ছিলেন না, বরং অসাধারণই ছিলেন। কারণ, সে যুগের অত্যন্ত সীমিত সংখ্যাক পত্র-পত্রিকার বাজারে তিনি বিখ্যাত পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর-এর সম্পাদনা করতেন। এছাড়াও 'সংবাদ রত্নাবলী', 'পাষণ্ড পীড়ন' প্রভৃতি তাঁর সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা ছিল। শুধু পত্র-পত্রিকা পরিচালনাতেই তিনি খ্যাতি লাভ করেননি, 'প্রবোধ প্রভাকর,' 'হিত প্রভাকর', 'বোধেন্দু বিকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁর দ্বারা রচিত হয়। সবচেয়ে মনে রাখার মত উল্লেখযোগ্য কথা হল, স্বাদীনতা আন্দোলনের যিনি প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত সে বঙ্কিমচন্দ্রের ইনি ছিলেন 'গুরু (দ্রষ্টব্য আশুতোষ দেব সংকলিত নূতন বাঙ্গালা অভিধানের চরিতাবলী অধ্যায়ের ১১১৫ পৃষ্ঠা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ)। শ্রীগুপ্তের প্রভাব তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে বঙ্কিমের উপরেই যে বেশি পড়েছিল তা পরের আরোচনায় পরিষ্কার হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা বঙ্কিম প্রসঙ্গেই হবে, এখন শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখনী প্রতিভা কোন দিকে কিভাবে কাজে লেগেছে তার পর্যালোচনা করা যাক।

কলমের কালি লেখকের শিল্পনিপুণতায় যেমন দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারে, তেমনি কলমের অপব্যবহারে দেশে সৃষ্টি হতে পারে বিদ্বেষ-বাষ্প, হিংসার হিংস্রতা ও সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডবলীলা।

অখণ্ড ভারতবর্ষে যখন ইংরেজের রাজত্ব তখন তাদের প্রয়োজন হয়েছিল একদল লেখক, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, ঐতিহাসিক ও বিশ্বস্ত কর্মচারীর। অবশ্য ইংরেজ জাতি সাফল্যের সাথে তা সংগ্রহ করেছিল হিন্দু এবং অহিন্দু সম্প্রদায় হতে। আর এ হিন্দু লেখক গোষ্ঠীর গুরু হিসেবে ধরা যেতে পারে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে, কারণ তাঁর জন্যই বলা হয় আমাদের দেশের 'সকলের কবি:–অর্থাৎ শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত এবং নিরক্ষরদের কাছেও তিনি সমানভাবে জনপ্রিয়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য জগতের গুরু শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশংসার বলেছেন, 'রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি।... আর যেই যা বলুক ঈশ্বরগুপ্ত মোচা বলেন। তিনি আরও লিখেছেন, "মধুসূদন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর করি–ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না–জন্মিবার যো নাই–জন্মিয়া কাজ নাই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাথে তুলনা করে শেষ সিদ্ধান্তে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য লিখেছে, "তাঁহার যাহা আছে তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা। (দ্রষ্টব্য শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় সংকলিত 'সমালোচনা সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ২১৫-২১৭)

"শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে..... তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বরগুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। 'অশ্লীলতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। তবে ইহাও জানি, ঈশ্বরগুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলতা নহে....ঈশ্বরগুপ্ত ধর্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে কবি। ঈশ্বরচন্দ্রের অশ্লীল লেখনীর স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে ঋষি বঙ্কিম ব্যারিষ্টারের মত বলেছেন, "পক্ষান্তরে, স্ত্রী-পুরুষের মুখ চুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার, কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য (ঐ, পৃষ্ঠা ২১৯-২২৩)

"তিনি ঈশ্বরকে (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে) নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মুর্তিমান পিতা বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করতেন ঋষি বঙ্কিম ঈশ্বরগুপ্তকে। সৃষ্টিকর্তার পুত্র প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হলেন না, শেষে লিখলেন, 'ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সামালোচক হইবার যোগ্য নহি। (পৃষ্ঠা ২২৬)

বঙ্গের সমস্ত কবিদের সামনে রেখে বঙ্কিম লিখেছেন, "এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বরগুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই–আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভাষা নহে, ভাবও তাই।" বঙ্কিম শ্রীগুপ্তের রাজনীতির উপর মন্তব্য করে বলেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্রের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম। (পৃষ্ঠা ২৩০, ২৩২)

বঙ্কিম যে ঈশ্বরগুপ্তের এক নম্বর ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন উপরের লেখাতেই তা প্রমাণ হল কি না সেটা ছেড়ে দিয়েও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 'বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বরগুপ্ত যখন সাহিত্য গুরু ছিলেন, বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। (ঐ, পৃষ্ঠা ২৫৩)

সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে ঈশ্বরগুপ্তের জন্য বলেছেন, তিনিই হচ্ছেন আধুনিক কালের 'কবি গোষ্টীর প্রথম প্রবর্তক। আরও বরেছেন, "রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়–তাঁর এ চার

মুখ্য শিষ্যের মধ্যে একমাত্র রঙ্গলালই কবিতার সরণি শেষ অবধি আঁকড়াইয়া ছিলেন। দ্বারকানাথ অল্প বয়সে মারা যান। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের পথ ধরেন, দীনবন্ধু নাটক প্রহসনের।" (পৃষ্ঠা ১০১)

যাঁরা বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত তাঁদের উদারতা, মহত্ব বীরত্ব ও স্বাধীনতা-প্রবণতা থাকলে তা যেমন মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি সম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, কাপুরুষতা ও গোলামীপ্রবণতা থাকলে তার প্রভাবও সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। তাই এখানে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের লেখার কিছু চাপা পড়া নমুনা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে মাত্র। কলমের কালি কেমন করে হিন্দু-মুসলমানের মাঝে প্রাচীর তুলতে পারে, কেমন করে দেশকে ভাগা-ভাগি করতে পারে, কেমন করে ইংরেজের বন্দনা করতে পারে, কেমন করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে চেপে দিতে পারে তা গভীর চিন্তাসহ লক্ষ্য করার বিষয়।

মুসলমানদের খুশী করার জন্য অথবা হেয় করার জন্য ঈশ্বরগুপ্ত নিজে বা কারোর গোপন ইঙ্গিতে লিখলেন–

"একেবারে মারা যায় যত চাঁপদেড়ে (দাড়িওয়ালা)।
হাসফাঁস করে যত প্যাঁজখোর নেড়ে।।
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥
কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাঁড়িপাল্লা ধরি।
কাছাখোল্লা তোবাতাল্লা বলে আল্লা মরি।।"

মুসলমান জাতি কত অসভ্য, মুর্খ ও শুদ্ধ কথা বলায় অপটু, অথবা তার বিপরীত কিছু একটা প্রমাণের জন্য তিনি লিখেছেন:

"দিশি পাতি নেড়ে যারা,   তাতে পুড়ে হয় সারা,
মলাম মলাম মামু কর।
হ্যাঁদুবাড়ি খেনু ব্যাল   প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল
নাতি তবু নিদ্ নাহি হয়।
এঁ্যদে দেয় ফুফু নানী   কলুই ভেলের পানি
ক্যাঁচাক্যালা কেচুর ছাল।...."

ইংরেজ বিতাড়নে যখন মুসলমানরা উঠে পড়ে লেগেছেন তখন বঙ্কিমবাবুদের গুরু লিখলেন–

"চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়!
ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির যেন রয়॥"
"ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।।"

('দিল্লির যুদ্ধ', 'গ্রন্থাবলী', পৃষ্ঠা ১৯১)

প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনকে কৌশলে 'সিপাহী যুদ্ধ নাম দিয়ে ইতিহাসকে কেমনভাবে পাল্টাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তখনকার পত্রিকা, কবি-সাহিত্যিক ও উপন্যাস-স্রষ্টাদের ভূমিকা মন দিয়ে দেখলে তা বোঝা যাবে। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের প্রকৃত রূপরেখা অঙ্কনেও তা যথেষ্ট সাহায্য করবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লড়াই থেকে হিন্দু বীর যুবক ও বীরাঙ্গনা যুবতীদের কোন কায়দায় থামিয়ে রাখা হয়েছিল, এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়–কলমের যাদু।

ব্যাপকভাবে যখন অমুসলমান জোয়ানরা আন্দোলনে যোগ দিলেন না তখন স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের পরাজিত হতে হল। দখল করা দিল্লি ছেড়ে পালাতে হল। ঠিক তখন ঈশ্বরগুপ্ত লিখলেন ঃ

"ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর।
শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার।
পুনর্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার।..."

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ও বেগম জিনাত মহল যখন বন্দী হলেন তখন তাঁদের পুত্রদের হত্যা করে কাটা মাথাগুলো বাহাদুর শাহকে উপঢৌকন দিয়ে নিষ্ঠুর উপহাস করা হয়েছিল। ঈশ্বরগুপ্ত ঐ ঘটনাকে সামনে রেখে লিখলেন–

"...বাদশা বেগম দোঁহে ভোগে কারাগার।।
অকারণে ক্রিয়াদোষে করে অত্যাচার।
মরিল দু'জন তাঁর প্রাণের কুমার।।
একেবারে ঝাড়ে বংশে হল ছারখার।"

এক সময় অত্যাচারী ইংরেজরা যখন মুসলমানদের হাতে মার খাচ্ছিল তখন বেদনায় ব্যথিত হয়ে 'গুরু' ঈশ্বরগুপ্ত লিখলেন ঃ

"দুর্জয় যবন নষ্ট, করিলেক মান ভ্রষ্ট
সব গেল ব্রিটিশের ফেম।...
শুকাইল রাঙ্গা মুখ, ইংরাজের এত দুখ,
ফাটে বুক হায় হায় হয়।"

বঙ্কিম-গুরুর কামনা ছিল, মুসলমানরা পরাজিত হয়ে ইংরেজরা যেন জয়ী হয়–তাই লিখলেন ঃ

"যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস
সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা।"
"গরু জুরু (স্ত্রী) লবে কেড়ে চাঁপদেড়ে যত নেড়ে
এই বেলা সামাল সামাল।"

বিপ্লবে মুসলমানদের সাথে হিন্দুরা কেহ যোগ দেন নি, এ কথা ঠিক নয়। লক্ষীরাঈ, তাঁতিয়া তোপী, নানা সাহেবও কুমার সিংহের মত অনেক বীর যে তাঁদের প্রাণ বিসর্জণ দিয়েছেন ইতিহাস তার জীবন্ত সাক্ষী। নানার মত বীরকে তিনি 'পুষ্যি এঁড়ে দস্যি ভেড়ে' বলেই ক্ষান্ত হননি, আরও লিখলেন:

"নানা পাপে পটু 'নানা' নাহি শুনে না, না।
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা।
তাল-দোষে তাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছে ঘুঘু শেষে দেখ ফাঁদ।।

(নানা সাহেব–'গ্রন্থাবলী'', পৃষ্ঠা ১৮৯)

সম্মানীয়া নারী শহীদ লক্ষীবাঈ-এর জন্য লিখেছেন–

"হ্যাদে কি শুনি বাণী. ঝাঁসীর রাণী.
ঠোঁট কাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি!
"নানা তার ঘরের ঢেঁকি...
হয়ে শেষে 'নানা'র নানী. মরে রাণী
দেখে বুক ফাটে
কোম্পানীর মুলুকে কি বর্গিগিরি খাটে।"

(কানপুরের যুদ্ধ জয়-'গ্রন্থাবলী. পৃষ্ঠা ১৯০)

অপর দিকে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভক্তিতে লিখলেন :

"এই ভারত কিসে রক্ষা হবে
ভেব না মা সে ভাবনা।
সেই তাঁতিয়া তোপীর মাথা কেটে
আমরা ধরে দেব 'না না।" (পৃষ্ঠা ১৩৬)

বৃটিশের প্রতি আনুগত্যে ও বৃটিশ-অনুগত যারা তাদের সাহস যোগাতে লিখলেন:

"জয় হোক ব্রিটিশের, ব্রিটিশের জয়।
রাজ-অনুগত যারা. তাদের কি ভয়।"

('গ্রন্থাবলী: পৃষ্ঠা ৩২০)

এ ধরণের লেখাই যে আজ ভারতকে বিভক্ত করেছে. মানুষের মনে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে. এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? অবশ্য কেহ কেহ বলতে পারেন. উল্লিখিত উদাহরণগুলো তো সব কবিতার অংশ, কবিতায় কবির ভাব কখন কি হয় বলা দায়। যদি তাই-ই হয়. তাহালে এবারে তাঁর অন্যান্য লেখনী অর্থাৎ তখনকার যে কাগজের তিনি সম্পাদক ছিলেন সে বিখ্যাত সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় কলমের উপর দৃষ্টি দেয়া যাক।

একেবারে ১৮৫৭-র জুন মাসের ২০ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হল–"কয়েকদল অধার্মিক অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনাবিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অর্ধার্মিকতা প্রকাশ পূর্বক রাজবিদ্রোহি হওয়াতে রাজ্যবাসী শান্ত স্বভাব প্রজা মাত্রেই" দুশ্চিন্তাগ্রস্থ।

ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদকীয় কলমে আরও লিখলেন–"যবনাধিকারে আমরা ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই. সর্বদাই অত্যাচার ঘটান হত। মহরমের সময়ে সকল হিন্দুকে গলায় 'বদ্দি অর্থাৎ যাবনিক ধর্মসূচক একটি সূত্র বান্ধিয়া দর্গায় যাইতে হইত. গমি অর্থাৎ নীরব থাকিয়া 'হাসান' 'হোসেনে'র মৃত্যুর জন্য শোক চিহ্ন প্রকাশ করিতে হইত। কাছা খুলিয়া কুর্ণিস করিয়া 'মোর্চে নামক গান করিতে হইত। তাহা না করিলে শোণিতের সমুদ্র প্রবাহিত হইত। এক্ষণে ইংরাজাদিকারে সেই মনস্তাপ একেকালেই নিবারিত হইয়াছে. আমরা অনায়াসেই 'চার্চ নামক খ্রীষ্টীয় ভজনামন্দিরের সম্মুখেই গভীর স্বরে ঢাক, ঢোল, কাড়া, তাসা. নহবত. সানাই. তুরী. ভেরী. বাদ্য করিতেছি. 'ড্যাডাং' শব্দে বলিদান করিতেছি. নৃত্য করিতেছি. গান করিতেছি. প্রজাপালক রাজা তাহাতে বিরক্ত মাত্র না হইয়া উৎসাহ প্রদান

Goto List

করিতেছেন।..... নবাবী সময়ে 'আদর' কায়দা করিতে করিতে কর্মচারিদিগের প্রাণান্ত হইত : গাড়ি, পালকি চড়া দূরে থাকুক হুজুরদিগের চক্ষে পড়িলে জুজুর মত সং সাজিয়া প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হইত। বর্তমান রাজ মহাত্মারা যে বিষয়েই একেকারেই অভিমানশূন্য সমস্ত কর্মচারি যথোচিত মর্যাদার সহিত সুখে স্ব স্ব কর্ম নির্বাহ করিতেছেন, পথিকেরা কি মহারাণী কি গভর্ণর জেনারেল সকলের পাশ ঘেসিয়া নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে গমনাগমন করিতেছে। কেহ যদি 'সেলাম' না করে তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই... যবনাধিকারে এই বঙ্গদেশের লোকেরা সময়ে সময়ে দস্যু, তাস্কর বিশেষত: বর্গির হেঙ্গামায় হৃতসর্বস্ব হইয়া কি পর্যন্ত আন্তরিক যাতনা সম্ভোগ না করিয়াছেন। এইক্ষণে সেই যাতনার জাত নাই।"

সাম্রজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের প্রতি হিন্দুর রাজভক্তি কমবে না—এ কথা স্মরণ করিয়ে সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছেন: "জগীশ্বর আপন ইচ্ছায় বিদ্রোহিদিগ্যে শাসন করুন, যাহারা বিদ্রোহি হয় নাই, তাহারদিগের মঙ্গল করুন, কোন কালে যেন তাহাদিগের মনে রাজভক্তির ব্যতিক্রম না হয়।" হিন্দু সমাজের পক্ষ হতে সম্পাদক আরও লিখলেন, "হে ভাই, আমারদিগের শরীরে বল নাই, মনে সাহস নাই, যুদ্ধ করিতে জানি না, অতএব প্রার্থনাই আমারদিগের দুর্গ, ভক্তি আমাদিগের অস্ত্র এবং নাম জপ আমাদিগের বল..."।

১৮৫৭-র অগ্নিবর্ষের ২৯শে জুনের সম্পাদকীয় থেকে আর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি—"অবোধ যবনেরা উপস্থিত বিদ্রোহ সময়ে গবর্ণমেন্টের সাহায্যার্থ কোন প্রকার সদনুষ্ঠান না করাতে তাহারদিগের রাজভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ প্রচার হইয়াছে এবং বিজ্ঞ লোকেরা তাহারদিগের নিতান্ত অকৃতজ্ঞ জানিয়াছেন....যে সকল স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাবত স্থানেই যবনেরা অস্ত্র ধারণ পূর্বক নিরাশ্রয় সাহেব বিবি বালক বালিকা এবং প্রজাদিগের প্রতি হৃদয় বিদীর্ণকর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে, সাহেবের মধ্যে অনেকে আপনাপন বহুকালের যবন ভৃত্যের দ্বারা হত হইয়াছেন, অধুনা যখন প্রজাদিগের প্রতি গবর্ণমেন্টের এতম অবিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এই নগরে যে স্থানে অধিক যবনের বাস সেই স্থানেই অধিক রাজপ্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে, নাগর্য বলন্টিয়ার সেনাগণ অতি সতর্কভাবে মাদরাসা, কলেজ রক্ষা করিতেছেন, যবনদিগের অন্তঃকরণে কি কারণ গবর্ণমেনেন্টর প্রতি বিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই নিরূপণ করিতে পরিলাম না।"

মুসলমান বিপ্লবীদের যখন নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হচ্ছির ঠিক তখন—২২.৬. ১৮৫৭-র 'সংবাদ প্রভাকরে'র সংবাদে নয়, সম্পানকীয়তে ছাপা হল—"বন্য পশু শিকার নিমিত্ত শিকারিগণ যেমন পরমানন্দে দলবদ্ধ হইা গমন করে, শ্বেতাঙ্গ সৈন্যগণ সেরূপ পুলকিত চিত্তে সিপাই শিকারে গমন করিতেছে, নরাধম অকৃতজ্ঞদিগের আর রক্ষা নাই..."।

অপর একটি সম্পাদকীয়তে ঈশ্বরগুপ্ত মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়ে লিখলেন, তোরা এখনো ক্ষান্ত হ....তোদের কুমন্ত্রণাতেই তৈমুর বংশ একেবারে ধ্বংস হইল, তোদের দোষেই প্রাচীন রাজধানী দিল্লিনগর রসাতলশয়ী হইল, তোদের দোষেই দিল্লীশ্বরের কারাবাস হল...দওরে দুরাত্মারা.....গলবস্ত্রে বিশ্ববিজয়ী বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট শির নত কর....দয়াবান গভবর্ণমেন্ট অপরাধ মার্জনা করিবেন....রাজানুগত্য স্বীকার করিলে জগদীশ্বর তোদের প্রতি কৃপানেত্রে নেত্রপাত করিবেন।"

স্বাধীনতা আন্দোলনের মুক্তিযোদ্ধারা পরাজিত হয়ে যখন নেপালের গভীর অরণ্যে ও পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করেছিলেন তখন বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে বঙ্কিমের গুরু শ্রীঈশ্বরচন্দ্র এ সংবাদ প্রভাকরেই লিখলেন—"....নেপাল-দেশের অরণ্য পর্বতাদি স্থানে কিলবিল কিলবিল করিতেছে, দূরাত্মাদের দুরাবস্থা দৃষ্টে কান্না পায়, দুঃখও বোধ হয়, আবার

রঙ্গরস দেখিয়া হাসিতেও হয়....অরগুণে নয়, বরগুণে দড়...প্রায় ভাবতেই কেহ জেনেরল, কেহ কর্ণেল, কেহ ক্যাপ্টেন ইত্যাদি উপাধি ধারণ করিয়াছে, নবাব, দৌলা, খাঁ, বাহাদুরের তো ছড়াছড়ি হয়েছে, আবার দুই চারিজন নাক-কান-কাটা কমাণ্ডার ইন-চিফ বাহাদুর এবং লার্ড গবর্ণর জেনেরল সাহেব ইত্যাদিও হয়েছে, বাবাজীদের রাজ্য তো পাঁচপোয়া কিন্তু কলেক্টর মেজিষ্ট্রেট, জজ, দেওয়ান, খাজাঞ্চি সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে, আহা। নেড়ে চরিত্র বিচিত্র, ইহারা অদ্যজুতা গড়িতে গড়িতে কল্য 'সাহাজাদা' 'পিরজাদা' 'খানজাদা' নবাবজাদা' হইয়া উঠে, রাতারাতি একে আর হইয়া বসে, যাহা হউক বাবাজীদের মুখের মতন হইয়াছে, জঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া অন্তরঙ্গভাবে গদগদ হইয়াছিলেন, এদিকে জানেন না যে 'বাঙ্গাল বড় হেঁয়াল...'।"

আন্দোল থামার পর ব্যাপকভাবে ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও কারাবাসের শাস্তি বিশেষতঃ মুসলমানদের ভাগ্যে যখন নেমে এর তখন সম্পাদকীয়তে সম্পাদক আরও জানালেন, ফাঁসির জন্য তিনি বা তাঁরা খুব খুশী, তবে শ্বেতাঙ্গদের শাস্তির ব্যাপারেও যেন পক্ষপাতিত্ব না করা হয়। (বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত 'সাময়িক পত্রে বালার সমাজ চিত্র' প্রথম খণ্ড, 'সংবাদ প্রভাকর,' রচনা সংকলন, কলিকাতা ১৯৬২-র ২২৬-৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নিরপেক্ষ কোন হিন্দু তখন দেশে ছিলেন না, একথাও ঠিক নয়। অবশ্য এও ঠিক যে, নিরপেক্ষ যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রভাব এঁদের তুলনায় ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ।

বঙ্কিমচন্দ্র, সুকুমার সেন প্রভৃতি লেখকরা ঈশ্বরগুপ্তের জন্য অনেক কিছু লিখে থাকলেও শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় কিন্তু লিখেছেন—'সংরক্ষণশীল মনের সুদৃঢ় সংস্কারের যখন কম্পন লাগিয়াছে তখন ইংরেজের শিক্ষা সভ্যতার উপর তিনি বিষোদ্গার করিয়াছেন, ইহা ছাড়া প্রকৃত দেশপ্রীতি ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল বলিয়া মনে হয়না।" (দ্রষ্টব্য: 'আধুনিক বাংলা কাব্য" মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫৯, পৃষ্ঠা ৫৭)

অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ও তাঁদের গ্রুপের মহান গুরু ঈশ্বরগুপ্তের জন্য যা লিখেছেন তা বহু মানুষের ভক্তিমাল্য ছিন্ন করে। তাঁর ভাষায়—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "খাটি জিনিস বড় ভালবাসিতেন, মেকির বড় শত্রু"। একথা যদি সত্য হয় তাহলে মেনে নিতে হবে—যেহেতু ঈশ্বরগুপ্ত ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা বিপ্লবের তীব্র বিরোধিতা ও শত্রুতা করেছিলেন সেহেতু এ স্বাধীনতা আন্দোলন আসল ছিলনা, বরং তা 'মেকি ও নকল ছিল। এও মেনে নিতে হবে যে, স্বাধীনতার চেষ্টা করা ছিল অন্যায় কাজ আর ইংরেজের গোলামী করা ছিল মহান কাজ। সে সাথে স্বভাবতই এ প্রশ্নও আসে—ভারতের স্বাধীনতা বিপ্লবীরা কি তাহলে সবাই সুপথগামী, না কুপথগামী?—এর উত্তর চিন্তাশীল পাঠক ও সূক্ষ্মদর্শীরাই দিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন, আর পরলোক গমন করেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। বাল্যকাল হতেই তাঁর হৃদয়ে ঠাকুর দেবতার উপর ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু পরে কয়েকবছর তিনি নাস্তিকও হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য পরিণত জীবনে সাধু-সন্ন্যাসীদের সংসর্গে এসে তিনি পূর্ণ আস্তিক হয়ে ওঠেন (দ্রষ্টব্য সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়: বাঙালী রাষ্ট্রচিন্তা, পৃষ্ঠা ১০৭)

পূর্বেই জানান হয়েছে যে, তিনি ঈশ্বরগুপ্তের প্রথম শ্রেণীর একজন শিষ্য ছিলেন। বিলেতী ভাবধারায় স্পেনসার, ডারউইন, কোঁৎ প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতদের প্রভাবেও তিনি বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। যার কারণেই তিনি সমাজ ও জীবনের প্রতিটি দিকে নূতন মূল্যবিচারে প্রবৃত্ত হন।

Goto List

রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্ম ও হিন্দু ধর্মকে সামনে রেখে তিনি 'অনুশীলন ধর্ম" নামে একটি নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেন। বিপিনচন্দ্র পালের মতে, "তাঁহার অনুশীলন-ধর্ম ব্রাহ্ম ধর্মেরই নামান্তর মাত্র" (নবযুগের বাংলাঃ বিপিনচন্দ্র পাল, পৃষ্ঠা ১৯০) রাজা রামহোমন রায়ের ব্র্যাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর যে সংহত লড়াই চলেছিল তা অস্বীকার করা যায়না। লড়াইয়ের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিধবা বিবাহ বন্ধ, বহুবিবাহ রোধ, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের তিনি নিষ্ঠুর ভাবে বিরোধিতা করেছিলেন (সৌরেন্দ্রমোহন, ঐ, পৃষ্ঠা ১০৮)।

প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী ও প্রগতিবাদী। পরিণত বয়সে তিনি হয়ে পড়েন প্রাচীনতার পক্ষপাতী। নবীণ বয়সে মিল ও বেন্থামের প্রভাবে তিনি 'সাম্য' গ্রন্থ রচনা করেন। এমনকি অধিকার-ভেদ স্বীকার করে বলেন, 'সকলে তুল্যরূপে মোক্ষাধিকারী নহে'। নারী-পুরুষের সমান অধিকারেও তাঁর অনুমোদন ছিল না। (ঐ, পৃষ্ঠা ১১০)

যখন তিনি নাস্তিক হয়েছিলেন তখন তাঁর ধর্মবিরোধী মতামত থাকা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু পরে তাঁর মতিগতি বদলাবার পর তিনি বলেন-"ব্রহ্ম ও পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার একত্রই মুক্তি। জীবাত্মার পরমাত্মা লীন হওয়াই মুক্তি। ব্রহ্ম জ্ঞানই মুক্তির পথ। এ ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তি লাভ হয়।" সৌরেন্দ্রমোহন তাই বলেন, "রামমোহনের মত তিনিও ব্রহ্মকে খণ্ডন কিন্তু নিরাকার জ্ঞান করতেন। কারণ সাকার তাঁর মতে সর্বব্যাপী হতে পারেনা।" স্রষ্টাকে নিরাকার বলার পর মত পরিবর্তন করে পুনরায় বললেন, "সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না।..... অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সে আদর্শের আরোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই রকম দুমুখো কথার জন্য তিনি নিজেই স্বীকার করে বলেছেন, "আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি-কে না করে? মত পরিবর্তন-বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। (দ্রষ্টব্য ঐ, পৃষ্ঠা ১৩২)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় পরিপুষ্টি সাধনে একজন অন্যতম শিল্পী ও নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জন্য যে কলমে লিখেলেন-"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁর পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ প্যারে নাই" (সমালোচনা সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৫৫, পৃ. ২৪২)। এ বঙ্কিমচন্দ্রই অন্যত্র আবার লিখলেন-'বিদ্যাসাগর কঠিন সব সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাঙ্গালা ভাষার ধাপটা খারাপ করে গেছেন। বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত রচনা' সীতার বনবাস'-এর জন্যও লিখলেন-স্যেটা "বঙ্কিমচন্দ্রই অন্যত্র আবার লিখলেন-"বিদ্যাসাগর কঠিন সব সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাঙ্গালা ভাষার ধাপটা খারাপ করে গেছেন। বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত রচনা 'সীতার বনবাস'-এর জন্যও লিখলেন-সেটা 'কান্নার জোলাপ ব্যতীত কিছুই নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে সমালোচনার অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার করা পাণ্ডিতের কাজ না মুর্খের কাজ তা ভেবে পাওয়া মুশকিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন। তিনি আবার একখানি বিধবার বিবাহের বই বাহির করিয়াছে। যে বিধবার বিবাহ দেয় সে যদি পণ্ডিত হতে তবে মুর্খ কে?" [অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমরের 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ দ্রষ্টব্য)

বঙ্কিমবাবু যে কলমে লিখেছিলেন, "পর-সমাজের অনিষ্টসাধন করি আমার সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহাকেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিবনা। ইহাই যথার্থ সমদর্শন"। আবার সেই কলমেই লিখলেন, "হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয় আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয় করিব। অফিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে। হয় হউক, আমরা সেইজন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না। পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিত হয়, তাহাও করিব। (বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯)

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সাম্যের পূজারীরূপে বঙ্কিমচন্দ্র সুপরিচিত। এ সম্পর্কে লেখাগুলি তাঁর বঙ্গদর্শণে ১৮৭৩-৭৫ সাল নাগাদ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গ্রন্থাকারে সেগুলি প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন যে, ঐ বিষয়ের তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে" (সৌরেন্দ্রমোহন; বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃষ্ঠা ১২৮)।

"সাম্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে পূর্বেই তিনি তাঁর 'সাম্য' নিবন্ধে উপসংহারে লিখেছিলেনঃ 'আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখনো হইতে পারেনা। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে-কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না (বঙ্কিম রচনাবলী-উপসংহার 'সাম্য', পৃষ্ঠা ৪০৬)।"

'সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমের ক্ষেত্র না হলে এ রকম দ্বিমুখী লেখাকে পাগলের প্রলাপ বলতে অনেকের আটকাত না। ঋষি বঙ্কিমের ঋষিত্ব সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এ 'ঋষি' উপাধি কে বা কারা কিভাবে দিলেন এবং কেন দিলেন? দেয়া সঠিক হয়েছে না বেঠিক?

ঋষি বলতে বোঝায়, "যাঁরা সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া ধর্ম চিন্তায় মনোনিবেশ করেন এরূপ ব্যক্তি।" পুরাণ মতে ঋষির অর্থ, "যাঁহা হইতে বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি এই সকলসম্যক রূপে নিরূপিত হয়, অথবা যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হন, তাঁহার নাম ঋষি; নীতিশাস্ত্র মতে যিনি পরমার্থে সম্যক দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক সর্বতোভাবে প্ররোপকার করেন, তিনিই ঋষি।" ঋষি সাত প্রকার 'যথা শ্রুতর্ষি, কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি।" ব্রহ্মর্ষি শব্দের দ্বিতীয় অর্থ, "শাস্ত্র প্রণেতা সুত্রকৃৎ আচার্য; গোত্র প্রবর্তক মুণি।" তৃতীয় অর্থ "চামার জাতিবিশেষ"। (দ্রষ্টব্য আশুতোষ দেবঃ নূতন বাঙ্গালা অভিধান, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৮৮)

এত প্রকার ঋষির মধ্যে তিনি কোন্ ধরণের ঋষি ছিলেন তার ব্যাখ্যা সাধারণের আজও বোধগম্য হয়নি। তবে সাধারণ মানুষ ঋষি বলতে বোঝেন-তিনি হবেন নিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক, বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে পরোপকারী, অপরের কল্যাণে প্রাণ উৎসর্গকারী ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র কি নিজেই চেয়েছিলেন যে লোকে তাঁকে ঋষি বলুক? তাই কি তিনি অনুশীলন ধর্ম নাম দিয়ে একটি নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছিরেন? বঙ্কিম রচনাবলীর সংসদ সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৬৬ পৃষ্ঠায় 'ধর্মতত্ত্বে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তিনি লিখেছিলেন-"প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্নএবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্যাদা ও অনাদর করিবে না....আমিও সেই আর্য ঋষিদের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি।" তাঁর আদেশ মত এই

উক্তিতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি-যা বঙ্কিমচন্দ্রকে ভক্তি করতে হবে, অমর্যদা ও অনাদর করা চলবে না–যেহেতু তিনি ধ্যান পূর্বক আর্য ঋষিদের অনুসরণেই চলেছেন। কিন্তু তিনি কতটুকু কিসের জন্য ধ্যান করেছেন তা বিশ্লেষণ করে দেখলে ক্ষতি কোথায়?

শহীদ ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, প্রফুল্লচাকী, বিণয়, বাদল, দীনেশ, ভগত সিং আসফাকউল্লা, নিসার আলী, মাসুম আলী, মিসকিন খাঁ, পীর মাহাম্মদ, খাঁন বাহাদুর খাঁন, সৈয়দ আহমদ বেলবী, আহমদুল্লাহ এঁরা সকলেই বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন ভারতের মাটিতে। এঁরা কেহ চাকরিও পাননি, চাকরির পদোন্নতিও হয়নি, অথবা ঘৃণাভরে ইংরেজের চাকরির চেষ্টা বা পরোয়া করেননি। আর একদিকে দেখা যায়, মহম্মদ আলী, শওকত আলী, চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাস বসু, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতারা কেহ চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন আবার কেহ ইংরেজের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন এবং বিনা দ্বিধায় জেল খেটেছেন। উপরোক্ত এ মনীষীরা কোন রকম সরকারি উপাধি বা পুরস্কারে পুরস্কৃত হন নি। অবশ্য তাঁরা পুরস্কার পাবার কল্পনাও করেন নি। সরকারি অনুরোধে অথবা আদেশে অথবা চাপে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে হয়ত উপরোক্ত নেতাদের মত সম্মান প্রদর্শন করব কিংবা তাঁদেরও উপরে উচ্চাসন দিয়ে সম্রাটের মত শ্রদ্ধাস্পদ মনে করব–সেটা ঠিক বা বেঠিক যাই-ই-হোক, তাঁর জীবন-ইতিহাস কিন্তু লুকিয়ে রাখার উপায় নেই। তাতেই প্রমাণ হবে তাঁর জীবনের আলো অথবা কাল দিকের রূপরেখা।

অনেক ক্ষেত্রে পিতার মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ে সন্তানের উপর। অন্যদিকে পিতার চৌর্যবৃত্তি পাপাচার, গোলামি ও দালালি করার ছাপ পড়াও অস্বাভাবিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ সরকারের ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে ইংরেজ সরকার তাঁর কাজে খুশী হয়ে তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে দিয়েছিলেন। সেকালে ভারতীয়দের পক্ষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদটি পাওয়া খুব সহজ ছিল না–সরকারের অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত না হলে এ পদ পাওয়া যেত না। বঙ্কিমচন্দ্রের বড় ভাই শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতে পেয়েছিলেন। বঙ্কিমের আর এক ভাই সঞ্জীবচন্দ্রও হন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সুণীল কুমার বসু তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' পুস্তকে লিখেছিলেন, "একই পরিবারে এতগুলো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সদস্য দেখা যায় না। সেদিনের বিদেশী শাসনের যুগে ভারতীয়রা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটর চেয়ে উচ্চতর পদ পাওয়ার আশা করতে পারতে না। (পৃষ্ঠা ১৩)

তাঁর জীবনকাল (১৮৩৮-'৯৪) সংক্ষেপে সমীক্ষা করলেই দেখা যাবে, ইংরেজের করুণায় অথবা ক্রোধরোষে তাঁর কতটা উন্নতি বা অবনতি হয়েছে।

১৮৪৪ সনে মেদিনীপুরে তিনি ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৪৯ সনে হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন এবং এ সনেই তিনি পাঁচ বছরের একটি বালিকাকে বিবাহ করেন ৫২ তে তাঁর গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সাংবাদ প্রভাকরে" লিখতে শুরু করেন। ১৮৫৬ তে প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়ার জন্য প্রবেশ করেন। ১৮৫৭ তে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৮৫৮ অর্থাৎ প্রথম স্বাধীনতা বিপ্লবের পরের বছর তিনি বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু ইতিহাস লুকিয়ে লাভ নেই–তাঁর প্রতিভা স্বীকার করে ও তাঁর উন্নতিতে শ্রদ্ধা রেখে জানাতে অসুবিধা নেই যে, তিনি বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন। অবশ্য ইংরেজ সরকারের পক্ষ হতে সুব্যবস্থার প্রশ্রয় নেয়া হয়েছিল অর্থাৎ সাত নম্বর 'গ্রেস' দিয়ে তাঁকে পাশ করিয়ে দেয়া হয়। এর পূর্ণ তথ্য পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম দৈনিক "আজকাল পত্রিকায় ১৭.৬.৮৪ তারিখে 'যে প্রশ্নে বঙ্কিম ফেল করেছিলেন শিরোনামে ছাপা হয়েছে।

এ ১৮৫৮ তেই তিনি বাবা, দাদা ও ভায়ের মত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৯-এ প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হলে ১৮৬০ সনে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। ১৮৬৩ সনে তাঁর বেতন বৃদ্ধি হয়। অবশ্য ভারতীয় বলে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে গণ্য হন। ১৮৬৪ সনে ইংরেজদের জনপ্রিয় পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে' ইরেজী উপন্যাস Rajmohans's Wife ধারাবাহিক ভাবে লিখতে শুরু করেন। এর ফলে উনি যে একজন বিখ্যাত লেখক তা ইংরেজরা আঁচ করতে পারে ও তাঁকে কি কাজে লাগান যায় তা সরকারের হিসেব করতে বিলম্ব হয়নি। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর চাকরি পদ চতুর্থ শ্রেণী হতে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নত হয়। ১৮৬৭ তে সরকারের 'মন্ত্রীসভার কর্মচারীদের' বেতন বৃদ্ধির বিদ্রোহ থামাবার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সে কমিটির সেক্রেটারী হন। ১৮৬৯-তে আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। এ সময় তিনি বহরমপুরে বদলী হন। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এ্যাসেসিয়েশন'-এর সভাব তাঁর লেখা ইংরেজী প্রবন্ধ পড়ে শোনান। তাতে ইংরজরা মুগ্ধ হয় এবং আনুগত্যের পরিচয় পায়। ১৮৭০ তে বেঙ্গল সোশ্যাল এ্যাসোসিয়েশনের অপর এক সাহেবী অধিবেশনে তাঁর লেখা 'এ পপুলার লিটারেচার ফর বেঙ্গল' নামে একটি ইংরজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। আগেই চতুর্থ শ্রেণী হতে তৃতীয় শ্রেণীতে তাঁর পদোন্নতি হয়, এবারে তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনি উন্নীত হন। এখানে বলে রাখা ভাল যে, রাজা রামমোহন বায়ের হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধ অভিযানে তখনকার আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' দল ইংরেজের প্রভাবে সনাতন ধর্মে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। তখন ইংরেজের অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি যে, হিন্দুধর্ম সুসংস্কার মুক্ত হলে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইংরেজী শিক্ষিত হলে তাদের পক্ষে তা মরণফাঁদ হবে। সুতরাং হিন্দুদের কুসংস্কার জিইয়ে রাখতে হলেও সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বুনতে হলে ভারতীয় কিছু ভাল লেখক ও সংগঠকের প্রয়োজন।

১৮৭১ সনে তাঁকে রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত করা হয়। এ সনেই 'বেঙ্গলী লিটারেচার অ্যাণ্ড বুদ্ধিজিম' ও 'দি সংখ্যা ফিলজফি' নামে দুটি ইংরেজী প্রবন্ধ "ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার বেনামীতে প্রকাশিত হয়েছিল। সুনীলকুমার বসু এ দুটি বঙ্কিমের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন (দ্রঃ 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', পৃষ্ঠা ২৩৪)। ১৮৭২ সনে 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' নামক ইংরেজী পত্রিকার 'দি কনাফেশাসন অব এ ইয় বেঙ্গলী নামেও একটি ইংরেজী প্রবন্ধ বেনামীতে প্রকাশিত হয। সুনীলকুমার বসুর মতে ওটাও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা।

১৮৭২ তে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা শুরু হয়। দামী ও নামী লেখক কবিরা তাতে সংযুক্ত হন। বঙ্গ দর্শণই ছিল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনার প্রথম মুখপত্র। অনেকের মতে, সমালোচনার প্রথম প্রবর্তক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। অবশ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত (১৯৫৫) 'সামালোচনা সংগ্রহ" পুস্তকে সম্পাদক শ্যীঅমরেন্দ্র নাথ রায় তা অস্বীকার করে বলেন, 'কিন্তু ইতিহাসসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে এ প্রচলিত মতকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।" সে সাথে তিনি এও বলেছেন যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গদেশে সমালোচনামূলক লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই শুরু করেছিলেন। অমরাবাবু আরও জানান, ইওরোপীয় সাহিত্য সমালোচনার অনুকররণেই এর সৃষ্টি হয়েছে।

১৮৭৩ তে মুখার্জীস ম্যাগাজিনে বঙ্কিমচন্দ্র 'দি ষ্টাডি অব হিন্দু ফিলজফি' নামে আর একটি প্রবন্ধ। লেখেন। ১৮৭৫ সনে তাঁকে সুদীর্ঘ ছুটি দেয়া হয়। এ সময় তিনি লেখায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। ১৮৭৩-৭৫ সনের মধ্যেই 'বষবৃক্ষ', 'যুগলাঙ্গুলীয়',

'লোকরহস্য, 'বিজ্ঞানরহস্য''. 'চন্দ্রশেখর' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশিত হয়। অবশ্য তার বেশ কয়েক বছর পূর্বে 'দুর্গেশনন্দিনী. 'কপালকুণ্ডলা ও 'মৃণালিনী'' প্রকাশিত হয়েছিল।' এভাবে ১৮৭৭-'৭৯-র মধ্যে 'রজনী. 'উপকথা, কৃষ্ণকান্তের উইল'. 'প্রবন্ধ পুস্তক' ও 'সাম্য' প্রকাশিত হয়। ওদিকে সরকার কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কাজের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করতে ভোলেননি।

১৮৮১ সালে বঙ্গ সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রটারী পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৮২ তে 'কলকাতায় বঙ্কিম প্রায়ই হিনদুধর্ম বিষয়ে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতেন।' (সুনীল কুমার, পৃষ্ঠা ২৩৫)। কোন্ নির্দেশে হঠাৎ তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা বলা মুশ্কিল। এ বছরেই তিনি 'রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠ' প্রকাশ করেন সেই বই দুটির কারণে অবিভক্ত বঙ্গের মুসলমান তাঁর কলমের আঘাতে আহত হন।

১৮৮৪ তে তাঁর 'সীতারাম', 'কৃষ্ণচরিত্র', হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে লিখিত প্রবন্ধাবলী. 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্ম' নামে পুস্তক ও 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা' 'প্রচার' পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হচ্ছিল। সুনীলকুমার বসু লিখেছেন, 'প্রচার নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় বঙ্গিমের আনুকুল্যে' (পৃষ্ঠা ২৩৫)। এ সনেই প্রগতিবাদী রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মের সাথে তিনি বাদানুবাদ শুরু করেন ফলে রামমোহনের কাজে ভাটা পড়ে। ১৮৮৫ তে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের 'ফেলো' নিযুক্ত হন। এ সনেই তাঁর গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ সম্পাদনা করেন। তাতে একটি চিত্তাকর্ষক ভূমিকা লেখেন। ১৮৮৭-র মধ্যে ছোট বড় আরও কিছু বই প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ তে তিনি 'অনুমীলন' পত্রিকায় 'ধর্মতত্ত্ব' প্রকাশ করেন। ইংরেজ সরকারের বুঝতে অসুবিধা ছিলনা যে. বঙ্কিমের গতি এখন হিন্দুধর্মের দিকে এবং মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে মোড় নিয়েছে।

১৮৯১-এ ইংরেজের মনোনীত 'লিটারারি সেকশান অব দি সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন' বা 'ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট' নামে বিখ্যাত সংস্থার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৮৯২-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রাস পরীক্ষার পাঠ্য 'বেঙ্গলি সিলেকশানস'-এর সম্পাদকের পদ পান। এ সনেই ইংরেজ সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব দান করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মুসলিম মানস আঘাতকারী 'রাজসিংহ' বইটি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 'সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেনে' দুটি ভাষণ দেন. সরকার তাতে খুব মুগ্ধ হন। এ সনে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার তাঁকে বিখ্যাত সি. আই. ই. খেতাব দান করেন এবং ঐ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটে।

ইংরেজ সরকারের সাথে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল এখানে তা প্রমাণিত হল। সাধারণ পাঠক সব কিছু তলিয়ে না দেখে মনে করতে পারেন যে. সি. আই.ই. উপাধি বোধ হয় তাঁর ইংরাজী বা বাংলায় পাণ্ডিত্যের জন্য দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যাঁরা একটু গভীরে চিন্তা করতে জানেন বা পড়াশোনার উপর গবেষণা করেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, এ সি. আই. ই. খেতাবটি তখন সরকারের কোন্ শ্রেণীর লোককে দেয়া হত। C.I.E. পুরো কথাটা হল Companion of the Indian Empire—যার বঙ্গার্থ দাঁড়ায় ভারত সাম্রাজ্যের সহযোগী। বলাবাহুল্য, তখন ভারত ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের হাতের মুঠোয়। সে সময়ে এ খেতাব যাঁকে দেওয়া হয়েছে তাঁকে দালাল ও পদলেহী বলতে অনেকেরই দ্বিধা নেই। অবশ্য সাধারণ মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে সে অভিযোগে অভিযুক্ত করেন কি না. এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

সাহিত্যে যে তিনি সম্রাট ছিলেন এতে হিন্দু মুসলমান সকলেই একমত। তাঁর লেখনী প্রতিভা সকলের কাছে অনস্বীকার্য। তিনি যে প্রচণ্ড ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন তাতেও সকলে একমত। কিন্তু তিনি যদি ইংরেজের শ্রেষ্ঠতম অনুগত প্রমাণিত হন তাহলে ভারতের শ্রেষ্টতম সম্মান–স্বাধীনতা আন্দোলোনের নায়ক তাঁকে বলা যাবে কি না এবং ঋষি নামের তিনি প্রকৃত অধিকারী কি না সে আলোচনা স্তব্ধ করে দেবার অবকাশ নেই। তাঁর লেখনী সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট না অসাম্প্রদায়িকতার গুণে পরিপুষ্ট তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

শ্মশ্রুধারী বা দাড়িওয়ালা মুসলমানদের প্রশংসা অথবা হেয় করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "ভারতবর্ষের নগরে নগরে কংগ্রেসের দোষোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে শ্বেত কৃষ্ণ হরিৎ কপিল নানা বর্ণের দাড়ি একত্রিত হইয়া বদ্ধা আন্দোলিত....হইয়াছিল। সেই সকল ছিন্ন অছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন শ্মশ্রুরাজির গতি, প্রক্রিয়া, বেগ আবেগ, সদ্বেগ ও উদ্বেগ সন্দর্শনে ভারতবর্ষে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মুসলমান কংগ্রেসে আসিতে চাহে না।... এক্ষণে শুনিতেছি, চাচাদিগের কোনই দোষ নাই। তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন। বালক কলের পুতুল লইয়া খেলা করে দেখিয়াছি। সেগুলির কল টিপিলেই দাড়ি নাড়ে শুনিয়াছি। পাহাড়ে বসিয়া বড় বড় লোকে নাকি কল টিপিতেছে, তাহ ইহারা দাড়ি নাড়িতেছেন।" (২৩ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, দৈনিক বসুমতী, ভুলে যাওয়া ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫)

'সাহিত্য সম্রাটে'র মুসলমান প্রীতির অথবা অপ্রীতির বিচারে মুসলমান জাতির উপর কী ধারণা ছিল তা জানার তাঁর আর একটি লেখার নমুনা দেওয়া যেতে পারে–"ঢাকাতে দুইচারিদিন বাস করিলেই তিনটি বস্তু দর্শকদের নয়ন পথের পথিক হইবে–কাক কুকুর এবং মুসলমান। এই তিনটিই সমভাবে কলহপ্রিয়, অতিদুর্দ্দম, অজেয়। ক্রিয়াবাড়ীতে কাক আর কুকুর, আদালতে মুসলমান।" (বাংলা ১২২৭ সালের অগ্রহায়ণের 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠা ৪০১ দ্রষ্টব্য)

বঙ্কিম দেশের কল্যাণে 'আনন্দমঠ' রচনা করেছেন। তাতে বঙ্কিম লিখেছেন, "মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি ইংরাজের হইয়া লড়িল। হিন্দুরা রাজ্য জয় করিয়া ইংরাজকে দিল। কেননা হিন্দুর ইংরাজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরাজের অধীন ভারতবর্ষে (হিন্দু) অত্যন্ত প্রভুভক্ত।"

একথা বললে বোধ করি অন্যায় হবে না যে, এ লেখার সাথে লেখকের পুরস্কারদাতা গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখার দারুণ মিল আছে। বঙ্কিমের যুগের সংবাদপত্রওয়ালা যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরগুপ্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ওপর কোঠার লোক। আর বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার প্রভাব শুধু বাংলা পত্রিকা নয়, ইংরেজী পত্রিকাতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাই তখন অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলো এ দুই মহান লেখক ও সম্পাদকের অনুসরণ ও অনুকরণের প্রয়োজন অস্বীকার করেনি। তাতে জাতি ও দেশ কতটুকু উপকৃত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিচার্য বিষয়।

১৮৫৭-র মহাবিপ্লব বা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় (১৮ই জুন) 'সংবাদ ভাস্করে'র বাংলা সংস্করণে যা ছাপা হল তা থেকে কলকাতার হিন্দু-মুসলমানের অবস্থা, বড় ছোট জমিদারদের অবস্থা প্রশাসনের ব্যবস্থা, ইংরেজ সরকারের অবস্থা এবং পত্রিকার পরিচালকদের মানসিকতার পরিমাপ করা কঠিন কাজ নয়। ঐ পত্রিকাতে ছাপা হোল–"নগরীর ধনী মহাশয়েরা মেট্রোপলিটন কলেজে এবং ভারতবর্ষীয় সভায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, গভর্ণমেন্টের সাহায্য কার্যে প্রাণপণ সে প্রতিজ্ঞানুরূপ যুদ্ধসজ্জা করিয়াছেন,

Goto List

কলিকাতার উত্তর সিতিব। পোলের উত্তরাংশে পাইকপাড়া রাজবাড়ী অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর আপনাদিগের বাড়ীর সম্মুখে রাজপথে নূন্যাদিক দুই সহস্র অস্ত্রধারী লোক নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে ৪০/৫০ জন গোরা. আমরা এতদ্দেশীয় লোক, গোরাদিগের হস্তে গুলিপোরা বন্দুক রহিয়াছে. দেশীয় সৈন্যরা ঢাল. তলবার, বন্দুকাদি লইয়া চতুদিক নিরীক্ষণ করিতেছে, কলিকালের মধ্যে শোভাবাজারীয় উভয় রাজবাটিতে সিপাহি সকল বন্দুক লইয়া খাড়া রহিয়াছে মঙ্গলানিবাসী দত্তবাবুদিগের এবং জানবাজার নিবাসিনী শ্রীমতী রাণী রাসমণির বাটীতে গোরা সৈন্যসকল বন্দুক সহিত হৈ হৈ থৈ থৈ করিতেছে. নগরে মধ্যস্থল কলুটোলা অবধি বাগবাজার পর্যন্ত সেন. শ্রী দত্ত. মল্লিক. ঠাকুর. সিংহ ঘোষ মিত্র. বসু দেবাদি প্রত্যেক ধনীর বাড়ী দেশীয় সৈন্য ও গোরা সৈনারা যুদ্দোধ্যমে বাদোদ্যম করিতেছে. আমরা তাদৃশ ধনি নহি অথচ ঢাল, তলবার শড়কী বল্লম ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রধারী কয়েকজন দেশীয় পাইক রাখিয়াছি, এইরূপ যিনি যেমন মনুষ্য তিনি সেই প্রকার সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সকল (হিন্দু) প্রজার বাড়ীতেই-ছাদের উপর ঝামা: ইট, কাড়ি কাড়ি সাজাইয়াছে. ধনী দরিদ্র সাধারণ সকলে বাজপক্ষে হইয়াছেন. ধনী লোকেরা কেহ অশ্বারোহণে কেহ সকটারোহনে কেহ পদক্ষেপণে সমস্ত রাত্রি নগর ভ্রমণ করেন. অতএব নগর মধ্যে শত্রু প্রভেশ করিতে পরিবেক না. নগর মধ্যস্থ কলিঙ্গাদি খাঁ সাহেবরাও দাড়িঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিলেন, গভর্ণমেন্ট প্রত্যেক যবন পাড়ায় গোরা খাড়া করিয়া তাহাদিগের কান মলিয়া দিয়াছেন. আর নেড়ে ভায়ারা দাড়ি নাড়িয়া বাক্যলাপ করিতে পারেন না. তাহাদিগের একজন প্রধান অযোধ্যর বাদশা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গমধ্যে কোর্ট মার্শাল বিচারে আসিয়াছেন. দিল্লীস্থানীয় বঙ্গভঙ্গ বাদশাহ গৌরাঙ্গ রঙ্গ দর্শন করিয়া শয্যাগত হইয়াছেন।"

ইংরেজরা দিল্লী পুনর্দখন করলে ঐ ১৮৫৭-র অগ্নিবৎসরের ডিসেম্বর মাসে অবিভক্ত বিশাল বঙ্গের ২৫০০ ভাগ্যবান জমিদার ও নামী দামী হিন্দুর সই করা এক অভিনন্দন পত্র বর্ধমানের মহারাজার নেতৃত্বে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেলের নিকট পঠান হয়। তাতে লেখা হয়-"My Lord,-we, the undersigned Rajahs, Zemindars, Talookdars, Merchants and other Natives of the province of Bengal take the earliest opportunity, on the retaking of Delhi, to offer your Lordship in council our warmest congratulation on the signal success which has attended the British armis, under circumstances unparalleled in the annals of British India....We have derived sincere consolation from the reflection that in Bengal proper there has been no disturbances, not even a symtom of disaffection; but that on the contrary, the people have maintained that loyalty and devotion to the British Government whichled their ancestors to hall, and as far as they could to facilitate, the rising ascendancy of that power." [Bengaless' Address to the Governor-General of India, December 1857]

অর্থাৎ-হে প্রভু, আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী রাজা, জমিদার, তালুকদার, ব্যবসায়ী এবং বাংলা মুলুকের অন্যান্য অধিবাসী আপনার সেনাবাহিনী দিল্লী পুনরুদ্ধার করে যে স্মরণীয় সাফল্য লাভ করেছে। যা ব্রিটিশ ভারতে অতুলনীয়। তার প্রতি আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন পাঠাবার সত্বর সুযোগ গ্রহণ করছি।-আমাদের গভীর সান্ত্বনা যে আমাদের এই বাংলায় কোন রকম গোলযোগ হয়নি, এমনকি (ইংরেজের প্রতি) সামান্য আনুগত্যহীনতাও নয়। বরং জনগণ সেই আনুগত্য ও অনুরাগ দেখিয়েছে যা তাদের পূর্বপুরুষরা প্রদর্শন করেছিল। তারা এই উদীয়মান ক্ষমতার প্রতি পত্তিকে সহজ করে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

Goto List

ওদিকে 'সংবাদ ভাস্করে' লেখা হোল. 'হে পাঠক, সকলে উর্ধ্ববাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য কর. শত্রুরা দিল্লী দুর্গ অধিকার করিয়াছে, দিল্লীর বাইরে মোটা করিয়া তোপ রাখিয়াছে. নানা স্থানে তাবু ফেলিয়া সমর মুখে রহিয়াছে, গাজীউদ্দিন স্থানে রাজকীয় সৈন্যদিগের উপরে কয়েকবার আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারদিগের ইত্যাদি আক্রমণের কথা তোমরা শুনিয়াছ, এইক্ষণে জয়ধ্বনি কর। আমাদিগের প্রধান (ইংরেজ) সেনাপতি মহাশয় সসজ্জ হইয়া দিল্লী প্রদেশে প্রভেশ করিয়াছেন.... । রাজসৈন্যারা ন্যূনধিক ৪০ তোপ এবং শিবিরাদি কাড়িয়া লইয়াছে হতাবশিষ্ট পাপিষ্ঠেরা দুর্গ প্রবিষ্ট হইয়া কপাট রুদ্ধ করিয়াছে আমারদিগেও-----দিল্লির প্রাচীরের উপর উঠিয়া নৃত্য করিতেছে, সম্বাদ পাইয়াছি পরদিনই দুর্গ লইবে, কি মঙ্গলসমাচার, পাঠকসকল জয় জয় বলিয়া নৃত্য কর. হিন্দু প্রজাসকল দেবালয়ে সকলে পূজা দেও, আমারদিগের রাজ্যেশ্বর শত্রুজয়ী হইলেন। (সংবাদ ভাস্কর. ২২.৬. ১৮৫৭: ভুলে যাওয়া ইতিহাস। (পৃষ্ঠা ৪৯)

.ইংরেজের সঙ্গে সহায়তা প্রসঙ্গে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) লিখেছেনঃ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বার বার উল্লেখ করেছেন, দেশের সর্বত্রই মধ্যবিত্ত সমাজ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজ রাজশক্তির সহায়তা করেছে।

Eighteen Fifty Seven-এর ডক্টর S.N.Sen বলেছেন; কলিকাতার শিক্ষিত ভদ্র নাগরিকগণ এবং মদ্রাজের ন্যায় বাংলার তাবৎ ভূমাধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় এ বিদ্রোহের ও বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেছেন। (পৃষ্ঠা ৪০৮)

Autobiography of Debendranath Tagore-এ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, কলিকাতার নব্য সম্প্রদায়, যেটি পাশ্চাত্য প্রভাবজাত, সেদিন সে-সম্প্রদায় শুধু চুপ করে থাকেনি, সক্রিয়ভাবে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে।–এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের এ উক্তিটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য–"If we were to be asked what Government we would prefer English or any other. we would one and all reply: English by all means-even. in preference to the Hindu Government." [Daily Reformer. July. 1931] অর্থাৎ আমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, আমরা ইংরেজ অথবা অন্য সরকার–কাকে বেশি পছন্দ করি, তাহলে একবাক্যে বলব যে. সবরকম ভাবে আমরা ইংরেজ সরকারেকই পছন্দ করি–এমনকি যদি হিন্দু সরকার হয় তার থেকেও।

"নেটিভ-বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র প্রথম প্রেসিডেন্ট রাজা রাধাকান্ত দেব কলকতার টাউন হলে ইংরেজীতে যে বক্তব্য রাখেন তাও উল্লেখযোগ্য: "The Hindus in this part of India. I am happy to observe. have always been the most loyal subjects of the British Crown. evinced deep interest in its prosperity and were greatly instrumental in procuring for it. its earliest terrtorial acquisition in India." অর্থাৎ–এ মন্তব্য করতে আমি আনন্দ বোধ করছি যে, ভারতের এ অংশের হিন্দুরা বরাবরই ইংরেজ রাজ্যের সর্বাপেক্ষা অনুগত প্রজা হয়ে থেকেছে. আর সমৃদ্ধির ব্যাপারে সংশয়াতীত আগ্রহ দেখিয়েছে ও সমৃদ্ধি ঘটাবার চেষ্টা করেছে, এবং ভারতে ইংরেজের প্রাথমিক রাজ্য দখলের ব্যাপারে খুব সহায়ক হয়েছে।

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশ মুখার্জী এ বিদ্রোহ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে. "সিপাহী বিদ্রোহ কেবলমাত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীদের কর্ম মাত্র। দেশের প্রজাবর্গের সহিত তাহার কোন যোগ নাই। প্রজাকুল ইংরেজ গভর্ণমেন্টের প্রতি অনুরক্ত ও কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের রাজভক্তি অবিচলিত রহিয়াছে।"

"সংবাদ ভাস্কর,' 'সংবাদ প্রভাকর', 'হরকরা', 'রিফর্মার,' 'ফ্রেণ্ডস্ অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলোর লক্ষ্যও বিপ্লব-বিরুদ্ধ ছিল। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রধানতঃ মুসলমানদের এ অভ্যুত্থান ও আন্দোলন ব্যর্থ হোক। অবশ্য এ সম্পর্কে বহির্ভারতীয় নিরপেক্ষ চিন্তাবিদ লেখক কার্লমার্কস জানিয়েছে, "অভ্যুত্থানের পেছনে প্রধান চালিকাশক্তি ছিল ভারতীয় জনগণ, অসহনীয় পীড়নের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রামে নামে। বৃটিশ শাসক শ্রেণীরা (এ) অভ্যুত্থানকে কেবল সশস্ত্র সিপাহী বিদ্রোহরূপে দেখাতে চায় তার সাথে যে ভারতীয় জনগণের ব্যাপক অংশ জড়িত তা লুকাতে চায় তারা..." (প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ-১৮৫৭-১৮৫৯, পৃষ্ঠা ১০)।

অত্যাচারী ইংরেজ শাসকের সৃষ্টি করা জমিদার শ্রেণীর নির্যাতনেও শোষণে দেশ কিভাবে ধ্বংস হয়েছে তা ইতিহাসে স্বীকৃত; সে বিষয়ে পূর্বেও আলোচনা হয়েছে। সারা দেশ যখন অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে এবং অস্ত্র ধরেছে তখন 'সাহিত্য সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, "সকল জমিদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচার পরায়ণ জমিদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই-যাহা আছে, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাতে এবং অভিমত বিরুদ্ধে নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারা হয়।.... আমরা জমিদারের দ্বেষক নহি। কোন জমিদার কর্তৃক কখনো আমাদিগের অনিষ্ঠ হয় নাই। বরং অনেক জমিদারকে আমরা প্রশংসাভাজন বিবেচক মনে করি।" (বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯২, ২৯৭)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই একজন কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামী বা জমির মালিক ছিলেন। (বদরুদ্দিন উমরঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ)।

জমিদারদের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখলেন, "যাঁহারা জমিদারদিগকে কেবল মিথ্যা নিন্দা করেন আমরা তাঁহাদের বিরোধী। জমিদারদের দ্বারা অনেক সৎকার্য হইতেছে।" (দ্রঃ বঙ্কিম রচনাবলী)

কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বৃহত্তর দরিদ্র শ্রেণী অর্থাৎ শোষিত ও প্রজাশ্রেণী সরকারের বিরুদ্ধে যখন গুমরে উঠল তখন ইংরেজের সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীর জন্য সুচিন্তিত যে বাণী দান করেছিলেন তা হচ্ছে এ-"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধ্বংসে বঙ্গ সমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যে দিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্খী হইব সেই দিন সে পরামর্শ দিব।" (বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩০৯-১০)

ইংরেজের নির্দেশে কর আদায়ের নামে জমিদারদের যে অত্যাচার চলছিল সে প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ অথবা জমিদার-যে কোন এক পক্ষের সমর্থনে লিখলেন, "অনেক জমিদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজনা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজনা আদায় করিতে গেলে জমিদারের সর্বনাশ হয়।" (ঐ, পৃ-২৯৮)

এ সময় ইংরেজদের শোষণ বন্ধ করার প্রতিবাদে বিলেতী জিনিস ব্যবহার বয়কট করার ঝড় চলতে থাকে। মুনাফা লুটার পরিমাণ কমে যাবে বলে ইংরেজরা তাতে সন্ত্রস্ত হয়। সেই সময় 'ঋষি' দেশের কোন এক কল্যাণে সুচিন্তিত বাণী দান করলেন-"যদি (ইংরেজরা) কাহারও ক্ষতি না করিয়া মুনাফা করিয়া থাকে, তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে কাহারও ক্ষতি নাই, সেখানে দেশের অনিষ্ঠ কি? আপত্তির মীমাংসা এখনও হয় নাই।

আপত্তিকারকেরা বলিবেন যে, ঐ ছয়টি টাকায় দেশী তাঁতীর কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশে থাকিত।....স্থূলকথা, ঐ ছয় টাকা যে দেশী তাঁতী পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই।....তার্কিক বলিবেন তাঁতীর ক্ষতি আছে। এ থানের আমদানির জন্য তাঁতীর ব্যবসায় মারা গেল। তাঁতী থান বুনে না ধূতি বুনে। ধুতির অপেক্ষা থান সস্তা, সুতরাং লোকে থান পরে, ধুতি আর পরে না। এজন্য অনেক তাঁতীর ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে।

উত্তর। তাহার তাঁতবুনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য ব্যবসা করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া আর খাইতে পায় না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই।" (বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১১-১২)

চাপা পড়া সত্য ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে ইংরেজ শাসনকালে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে টাকায় একমন পাঁচ সের চাল মিলত। ১৮১৪ সনে অর্থনৈতিক অবনতি হয়ে টাকায় ৩৭ সের চাল হল। ১৮২১-এর আরও অবনতি হয় টাকায় ৩০ সের হয়। ১৮৩৫-এ তা নেমে এসে ২৪ সেরে দাঁড়ায়। ১৮৭৫ সনে কমতে কমতে টাকায় ১৭ সেরে পৌছায়।

ভারবতর্ষের বিশ্ববিখ্যাত তাঁতশিল্প ধ্বংস করার জন্য সুবিখ্যাত তাঁত শিল্পীদের বুড়া আঙ্গুল কেটে দেয়া হয়েছিল–এ তথ্য প্রচলিত ইতিহাসে না থাকলেও চাপা পড়া ইতিহাসে মজুত আছে। ১৯৭২ তে ছাপা S. D. Sawant সংকলিত Our Freedom Movement নামক সচিত্র ইংরেজী ইতিহাসের ৩ পৃষ্টায় গোলটুপি পরা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মুসলমান তাঁতশিল্পীর বুড়া আঙ্গুল কাটা অবস্থায় শোকাহত স্ত্রী এবং ক্ষুধায় লুটিয়ে পড়া শায়িত বাচ্চা সন্তানের ছবি মুদ্রিত হয়েছে। ছবিটির নির্দেশমুলক বক্তব্যে লেখা আছে–"The British even cut the thumbs of expert artisans."

দেশী কাপড়কে অচল করার জন্য ১৮১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ৮ লাখ গজ বিদেশী কাপড় কলকাতায় আনা হয়। ১৮২১ সনে বিলেত থেকে একেবারে ২৫ গুণ অর্থাৎ ২ কোটি গজ বিলেতী কাপড় এসে পৌছয়। সুতরাং সুস্পষ্ট বোঝা যায়, ১৮১৪-২১ পর্যন্ত বস্ত্রশিল্পের কতটা অবনতি হয়েছিল। ১৮৩৫-এ ৫ কোটি গজ কাপড় আনা হল। ১৮৭৫ তে আনা হল ৬১ কোটি গজ। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আসে ১ অর্বুদ ৫৬ কোটি গজ কাপড়।

বিলেতী মাল এনে দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়ার নমুনা দেখার সাথে সাথে ভারতীয় সম্পদ কিভাবে পাচার করা হয়েছে তার নমুনা দেখাতে বলা যায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দেই শুধু ৬ কোটি ৭৫ লাখ মণ চাল আর ৩ কোটি ৫০ লাখ মণ গম ভারত থেকে বিদেশে চালান করা হয়েছে। সে সাথে ১ কোটি ৫০ লাখ মণ তুলা ও ২ কোটি ৫০ লাখ মন পাট পাচার করা হয়েছে। এ একই বছরে চা ভারত থেকে বিদেশে পাঠান হয়েছে ৩৬ লাখ মন (মায়ীশাতুল হিন্দ পৃষ্ঠা ৯৫)। ১৯১৮ থেকে ১৯১৯ এর মাঝের একটা হিসেবে পাওয়া যায়, ভারত থেকে ৫৬ কোটি ৫০ লাখ মণ চাল বিদেশে পাঠান হয়েছে। (শ্রীদয়াশঙ্কর দোবে ঃ মজলুম কিষাণ, পৃষ্ঠা ৮২)

পূর্ব আলোচনায় দেখান হয়েছে, তাছাড়া দেশি বিদেশি বেশির ভাগ ঐতিহাসিকই এ বিষয়ে একমত যে, তাঁতীদের ধংস করে দেয়া হয়েছে, তাদের বুড়া আঙ্গুল কেটে দেয়া হয়েছে এবং 'Drain Theory' অনুযায়ী দেশের ধনসামগ্রী স্রোতের মত প্রবাহিত হয়ে জমা হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। অবশ্য মহাজ্ঞানী বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা, 'তাঁতীরা তাদের নিজের দোষেই ধ্বংস হয়েছে।" তাঁর মতে তাঁত শিল্প ধ্বংস হয়ে যাক বা ক্ষতিগ্রস্থ হোক–তারা তাদের জাতব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসা অর্থাৎ চালু করুক না কেন! তাঁর ভাষায় "চাষীর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের লাভ কমিবে না। অতএব বাণিজ্য হেতু যাহাদের পূর্বব্যবসায়ের হানি হয়,

Goto List

নূতন ব্যবসায়াবলম্বনে তাহাদের ক্ষতিপূরণ হয়। তাহা হইলে বিলাতী থান খরিদে তাঁতীর ক্ষতি নাই। তাঁতীরও ক্ষতি নাই. ক্রেতাদিগেরও ক্ষতি নাই। তবে কাহার ক্ষতি? কাহারও নহে। যদি বণিক থান বেচিয়া যে লভ্য করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষতি হইল না. তবে তাহারা ঈংরেজরা) এ দেশের অর্থভাণ্ডার লুঠ করিল কিসে? তাহার (ইংরেজের) লভ্যের জন্য এ দেশের অর্থ কমিতেছে কিসে?" (বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১২) আমাদের মনে হয়. মহান বঙ্কিমের এটা মনের কথা হলেও এরকম উক্তি সৃষ্টি করে ইতিহাসের ইন্ধন বাড়াতে তাঁর দ্বিধা থাকা উচিত ছিল।

আমরা ভক্তিতে অথবা আতঙ্কে যদি মেনেই নিই যে, ইংরেজের কোন অত্যাচার ছিল না. শুধুই তাঁরা ভারতীয়দের 'ধনবৃদ্ধি' ও 'শ্রীবৃদ্ধি 'সাধনে নিয়োজিত ছিলেন, তাহলে পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ পত্র-পত্রিকা. সরকারী রেকর্ডস, ভারতীয় ও অভারতীয় লেখকদের লেখা এখন অবিশ্বাস করা অথবা সম্রাট ও ঋষির সম্মানে তা নষ্ট করা ছাড়া উপায় কি?

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু 'ডিস্‌কাভারী অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে তখনকার কর্মহারা অসহায় বেকার ভারতীয় শিল্পীদের জন্য লিখেছেনঃ তাদের কি গতি হবে? পুরান পেশা তাদের বন্ধ হয়ে গেল. নতুন পেশার দ্বার উম্মুক্ত নেই। তাদের অবশ্য মৃত্যুর পথ খোলা ছিল. এবং তারা লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যবরণ করল। ভারতের ইংরেজ গভর্ণর লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৪ সনের রিপোর্টে বলেছিলেন: তাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনীর কোনও তুলনা নেই বাণিজ্যের ইতিহাসে। তাঁতীদের অস্থিতে ভারতের পথ প্রান্তর শুভ্র হয়ে উঠেছে। (পৃষ্ঠা ৩৫২)

বঙ্কিমচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়াবার নায়ক ছিলেন—একথা যদিও জোর করে মানতে এবং দেশের ছেলেদের মানাতে বাধ্য করা হয়. কিন্তু তাঁর লেখনীকে কিভাবে অস্বীকার করা যাবে? তাঁর মতামত সমর্থিত লেখনীই প্রমাণ করবে তাঁর উদ্দেশ্যে কথা। যেমন তিনি লিখেছেন; "ইংরেজ ভারতবর্ষের পরম উপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নতুন কথা শিখাইতেছে. যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই. শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে. বুঝাইতেছে: যে পথে কখন চলি নাই. সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য যে সকল অমুল্য রত্ন আমরা ইংরেজদের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি. তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্রপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে. তাহা হিন্দু জানিত না।" (বঙ্কিম রচনাবলী. পৃষ্ঠা ২৪০-৪১)

ইংরেজ বিচারপতিরা ভারতীয় প্রত্যেকের বিচার করার অধিকার রাখতেন. কিন্তু অত্যন্ত অন্যায় এবং আশ্চর্য ব্যাপার যে ভারতীয় বিচারপতিরা কোনক্রমেই কোন ইংরেজ আসামীর বিচার করার অধিকার পাননি। এ বৈষম্যমুলক আচরণে শিক্ষিত গ্রুপ বিক্ষোভের ঝড় তুলবেন জেনে ভারতপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেনঃ 'ভারতীয়রা ইংরেজদের বিচার করতে পারে না কিন্তু শূদ্রেরা কি ব্রাহ্মণদের বিচার করতে পারত?' 'তিনি (দেশবাসীর নিকট) প্রশ্ন করেছেন যে. 'দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের একজন জজ, রামরাজ্যে তাঁর স্থান কোথায় ছিল? প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের ছিল দোর্দণ্ড দাপট. কিন্তু ইংরেজ আমলে এরূপ শ্রেণীর জোরে কেহ আধিপত্যের অধিকারীর নয়।' (বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা. পৃষ্ঠা ১৩৬-৩৭)

ভারতীয় মুসলমানরা যখন ইংরেজ বিতাড়ন ও দেশীয় শাসনতন্ত্র কায়েম করতে যত্নবান হলেন তখন অনেক অমুসলমানও বুঝতে পারলেন–বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করে দেশীয় শাসক দ্বারা স্বদেশীয় শাসন প্রবর্তিত হলে বোধ হয় ভালই হয়। ঠিক তখন নেতা ঋষি বঙ্কিম লিখলেন, "স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানী 'লিবার্টি' শব্দের অনুবাদ,...ইহার এমন তাৎপর্য নয় যে, রাজা স্বদেশীয় হইতেই হইবে।"

ইতিহাসের সত্য তথ্য একথা প্রমাণ করে যে ভারতীয় কোন ইংরেজ বিরোধী আন্দালনে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল না, এমনকি ইংরেজের বিরুদ্ধে যে তিনি লেখালেখি করছেন সে প্রমাণও দুর্লভ। তাই সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "তাছাড়া সরকারী চাকুরে হওয়ার ফলে পাছে সরকারে রোষা নজরে পড়েন সে আশঙ্কায় রাজনীতি সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে লিখতেও দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন।" [বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃষ্ঠা ১১৩]

তখনকার বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের মত তিনিও ১৮৫৭-র বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন না। এমনকি তাঁর বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে লেখনীকেও তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ও এ বক্তব্যের সমর্থন লিখেছেন–"বাংলার সমকালীন বুদ্ধি জীবীদের মতো তিনিও সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। আবার দীনবন্ধু মিত্রের একান্ত বান্ধব বঙ্কিমচন্দ্রে নীলকরদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও সে বিষেয়ে নীরব থাকেন।" (বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃষ্ঠা ১১৪)

মহাভারতকে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাস বলে তিনি দাবী করেছেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তিনি মহাভারত বিভক্ত ঋষি, তা সত্ত্বেও তিনি কেন দেশবাসীর স্বার্থে সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃতর জন্য, অন্ততপক্ষে বাংলা ভাষার জন্যও সুপারিশ করলেন না? উপরন্তু সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। (বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃষ্ঠা ১৬৬.১৪৩)

ভারত-ঋষি সংস্কৃত ভাষার কথা যে ভুলে যাননি তার প্রমাণ মেলে তাঁরই ভাষায়–"ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরার্মী একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য একপরামর্শীত্ব একোদ্যম কেবল ইংরেজীর দ্বারা সাধনীয়; কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলজী, পাঞ্জাবী ইহাদের সাধারণ মিলন-ভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।" (বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৬-১৭–যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত ভূমিকায় উদ্ধৃত)

ইংরেজ শাসকের অধীনে ভারতবাসীকে অনুগত করার জন্য অথবা ইংরেজকে ভারতবাসীর পদানত করার জন্য–যে কোন একটি কারণে তিনি লিখেছেন, "গৃহস্থ পরিবারে যে গঠন সমাজের সেই গঠন। গৃহকর্তার ন্যায় পিতা-মাতার ন্যায় রাজা সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেরূপ সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র।"

ইংরেজের শাসনের নামে শোষণের দৃশ্য শিক্ষিত নিরক্ষর সকলকেই অবাক করে। একদল সাহসী হয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত, আহত প্রহৃত অথবা কারাগারে নির্বাসিত হন; তাঁরা ভারতবাসীর শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক উপাদান। আর যাঁরা বেদনায় মর্মাহত হয়ে চুপ করে সহ্য করে গেছেন, সাধ্য হয়নি তা রুখবার–তাঁরাও জাতির কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র নন। কিন্তু যাঁরা অপশাসন আর শোষণের স্বপক্ষে ওকালতি করেছেন, কলম ধরেছেন এবং হৃদয় দিয়ে সমর্থন করেছেন, তাঁদেরকে দেশের শত্রু বলতে কেহ লজ্জা করবে না। ঋষি, সাহিত্য সম্রাট, ভারতের স্বাধীনতার স্রষ্টা বলে কথিত বঙ্কিমচন্দ্রকে

সরকারের প্রচারযন্ত্রে নিষ্পেষণে শ্রেষ্ঠতম সম্মানের আসনে বসাতে গিয়ে ভাবতে হয় কি করে তিনি একথা লিখতে পেরেছিলেন—"উষ্ণতাজনিত শারীরিক শৈথিল্য, পরিশ্রমে নিস্পৃহতা ও ভিন্নদেশে গমনেচ্ছার ভবাবে দেশের (ভারতের) ধনোৎপাদন যথোচিত বর্ধিত হয়নি;"—এখানে বুঝতে বেশি অসুবিধা হবে না যে, তিনি অবনতির কারণ হিসেবে ইংরেজকে বাদ দিয়ে ভারতবাসীকেই অভিযুক্ত করেছেন।

আমাদের ভারতে রামমোহন হতে দাদাভাই নৌরজী পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক নামকরা নেতারা দেখিয়েছেন ভারতের ধন-ঐশ্বর্য কিভাবে ইংল্যাণ্ডে স্রোতের মত চলমান গতিতে বয়ে গিয়ে জমা হয়েছে, যেটা ড্রেইন থিওরী (drain theory) নামে পরিচিত। কিন্তু মহাভাগ্যবান, বহু খ্যাতি, খেতাব ও পুরস্কারপ্রাপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র লিখেলেন ঃ "এই সকল তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছেন না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এদেশে ব্যয় হইতেছে।" (দ্রষ্টব্য বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের এসব কথাগুলো সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করতে গিয়ে যদি মত শত পণ্ডিত ঐতিহাসিক ও লেখকের লেখাকে মিথ্যা বলতে হয় তাও ভাল, তবুও সরকারি কৃপায় যে শিক্ষা পাওয়া যায় সে শিক্ষা বজায় রাখতে বঙ্কিমকে ভারতের স্বাধীনতার স্রষ্টা এবং ঋষি বলতে ক্ষতি কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার দায়িত্ব কারো একার নয়, সমগ্র চিন্তাশীল জাতির।

অত্যাচারী ইংরেজের সপক্ষে প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁদের অত্যাচারের কাহিনী ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ব্যরিষ্টার মিঃ ফুলার তাঁর ভারতীয় চাকরকে সামান্যতম ত্রুটিতে লাথি মেরে হত্যা করেন। ইংরেজ-আদালতে জরিমানা হয় মাত্র ৩০ টাকা। ত্রিবাঙ্কুরের দুজন ইংরেজ নীলকর সাহের তাঁদের সুজন চাকরকে নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলে বিদালোকে মাটিতে পুঁতে ফেলেন বিচারে অবশ্যই ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মাত্র তিন বছর বিনা শ্রমে কারাদণ্ড দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। কানপুরে এক ইংরেজ অফিসার ভারতীয় শ্রমিককে লাথি মেরে হত্যা করেন। শ্বেতাঙ্গ জজের বিচারে তার মাত্র ২০০ টাকা জরিমানা হয়। ইংরেজ এজেন্টরা ভারতীয় শ্রমিকদের "প্রকাশ্যে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করত, অথচ বলত, নেটিভকে (ভারতীয়কে) বেত্রাঘাত করার অধিকার আছে, তার জন্য শাস্তি হয় না....আসামের চীফ কমিশনার কটন ইংরেজদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন নেটিভদের বেত্রাঘাত, জখম ও খুন করার।" (দ্রষ্টব্য জাস্টিস্ এ, মওদুদ): স্বাধীনতা দিয়েছিলেন নেটিভদের বেত্রাঘাত, জখম ও খুন করার।" (দ্রষ্টব্য জাস্টিস এ মওদুদ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃষ্ঠা ১৮০)

এসব ঘটনাগুলো যদিও বঙ্কিম এর জানা ছিল তবুও তাঁর ধৈর্যও সহনশীলতার প্রশংসাই করছি। তাঁর নিজের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করছি—"বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে ১৮৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর ক্যান্টনমেন্টের কমাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল ডাফিন কর্তৃক অপ্রত্যাশিতভাবে প্রহৃত হন। মুর্শিদাবাদ পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র পাল্কি চেপে কোর্ট থেকে বাড়ী যচ্ছিলেন একটি ক্রিকেট খেলার মাঠের উপর দিয়ে। তখন ডাফিনসহ ইউরোপীয়রা মাঠে ক্রীড়ারত ছিল। ডাফিন (সাহেব) বাবুর বেয়াদবিতে ক্রুদ্ধ হন এবং বাবুকে প্রহার করেন ও কয়েকটি ঘুঁষি মারেন।" (দ্রষ্টব্য জাস্টিস এ, মওদুদ: মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃষ্ঠা ১৮০)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকৃত মুসলমানকে যে বেদনা দিবেই তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, হিন্দু জাতি যেমন সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি মহিলাদের শ্রদ্ধা করেন, তেমনি মুসলমানদের কাছে তাপসী রাবেয়া, মহীয়সী জেবুন্নেসা এ রকম শ্রদ্ধার পাত্রী। যে জেবুন্নেসা কলঙ্কমুক্ত চন্দ্রের মত প্রভাময়ী, তাঁকে কুলটার মত ভ্রষ্টার চরিত্র নামিয়ে এনে মোবারক খাঁনের প্রণয়ী সৃষ্টি করেছেন 'সাহিত্য সম্রাট'। এ 'রাজসিংহ' ভারত স্বাধীন হবার পরে আজও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হওয়া উচিত নয়। অতএব এ 'রাজসিংহে'র প্রেমিকদের ও স্তাবকদের প্রতিও প্রকৃত মুসলমানের শ্রদ্ধা রাখা মশকিল। হিন্দু মুসলমানের মৈত্রীর পথে ফাটল ধরাতে 'রাজসিংহে'র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

'আনন্দমঠ' পুস্তকটিও মুসলিম মানসে ব্যথাদায়ক। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, পরাধীনভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য যাঁরা কলম ধরেন বা ধরেছেন তাঁদের কলম অগ্নিবর্ষণ করেছে শাসকের বিরুদ্ধে, কিন্তু ঋষি ও 'সম্রাট' বঙ্কিমের কলম শোষিত, দারিদ্রক্লিষ্ট, উপেক্ষিত মুসলমানদের বিরুদ্ধেই চালিত হয়েছে কিনা তা চিন্তাশীলদের কাছে সহজেই অনুমেয়।

মজার কথা হল, যে 'আনন্দমঠে' মুসলমানদের বিরুদ্ধে কলম ধরে বঙ্কিমচন্দ্র 'হিরো' হয়ে গেলেন সেই ঘটনাটা যে ঐতিহাসিক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার, সেটা মজনুশাহ ও তাঁর অনুগামীদের ঘটনা—যে মজনুশাহের কথা এ পুস্তকে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। 'সম্রাট' সেখানে মুসলমানদেরকে ফকিরের পরিবর্তে সন্ন্যাসী বা সন্তান দল সৃষ্টি করে ফকির সন্ন্যাসীদের ইংরেজ-বিরুদ্ধ সংগ্রামকে তিনি তাঁর কলমের নিপুণতায় হিন্দু-মুসলমানের লড়াই বলে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। তাঁর এ শিল্পনিপুণতা সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছে ও দেশ বিভাগের ক্ষেত্র তৈরি করেছে—একথা যে অসত্যতা শপথ করে বলা যায় না। অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু তালিব লিখিত 'ফকীর মজনুশাহ' পুস্তক পড়লে এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হবে।

প্রকৃত ইতিহাসের চাপা পড়া পাতায় এত জীবন্ত তথ্য থাকতেও আমরা ভারতবাসী বঙ্কিমচন্দ্রের গুণ গেয়ে গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছি। এসবের কি তাহলে কেহ খবর রাখেন না? নাকি খবর রাখা সত্ত্বেও সত্যের অপলাপ করেন? একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, আইনস্টাইন, ফ্যারাডে ও নিউটনের মত বৈজ্ঞানিক যদি কোন অখ্যাত লোকের জন্যও লেখেন যে তিনি বিজ্ঞানী—সেখানে প্রখর চিন্তাশক্তি থাকা সত্ত্বেও মানুষ সত্যাসত্য নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করতে যাবে না।

এখানে মনে পড়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা, যিনি বিলেত থেকে নোবেল প্রাইজ এবং ইংরেজের কাছ থেকে 'নাইট' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি যদি বলে থাকন অথবা বলান হয়ে থাকে যে বঙ্কিমচন্দ্র হিমালয়ের মত উঁচু ছিলেন—সেখানে সাধারণ মানুষ জানবার চেষ্টাই করবে না যে তিনি বস্তুতঃ পর্বত ছিলেন, না উইটিপি। ভারতবিখ্যাত তথা বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জন্য লিখেছেন—"যেখানে মাতৃভাষায় এত অবহেলা, সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা, দৈন্য কেহই দূর করিতে পারেনা। এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন।" তিনি আর লিখেছেন, "কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন।....বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক সুস্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।...কিন্তু সাহিত্য মহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালনা করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন।...তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন।...এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ এবং সুজলাসুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি।"

তাহলে দেখা গেল বিশ্বকবি নিজেই বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য লিখলেন, 'শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ', 'সাহিত্যে কর্মযোগী', 'সাহিত্য-মহারথী', 'ভগীরথের ন্যায় সাধনাকারী', 'বাংলা লেখকদিগের গুরু' ইত্যাদি। অবশ্য সেকালে নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক হিন্দু লেখক যে ছিলেন না তা নয়। তাঁরা বঙ্কিমের বিরুদ্ধে যে কলম ধরেননি তাও নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমের তুলনায় তাঁরা ছিলেন অতীব দুর্বল ও ক্ষীণ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও যেটুকু একেবারে অস্বীকার করেন নি—যেমন তিনি লিখেছেন, "যে কালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।" আরও লিখেছেন, "মনে আছে বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিলনা। শত শত অযোগ্য লোক তাঁকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।" (দ্রষ্টব্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা—সমালোচনা সংগ্রহ, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ২৪৪-৫৫)

আমাদের মতে, কিছু শক্তিশালী স্বাধীনচেতা মানুষ আগেও ছিলেন, আজও আছেন, আগামীতেও থাকবেন যাঁরা নিজস্ব বিবেচনা ক্ষমতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। প্রচলিত ধারণায় মনে করা হয়ে থাকে, বঙ্কিমচন্দ্র একজন ঋষি, নিরপেক্ষ, উদার, মহান, ভারতের উন্নতির মন্ত্রের স্রষ্টা, প্রথম শ্রেণীর আর্য সন্তান, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্মীয় পুস্তকাদির পৃষ্ঠপোষক এবং উন্নতির পথপ্রদর্শক। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যাবে অন্যরকম—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্য তিনি লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর কঠিন সব সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার ধাপটা খারাপ করে গেছেন।" প্যারীচাঁদ মিত্রের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য-অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত—'আজ্যই' বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চিৎকার করিতে হইবে...পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যখন এইরূপ ছিল, তখন তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত; কেন না কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।" (ঐ, পৃষ্ঠা ২৪১)

এরকম ঐতিহাসিক দলিল ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সরকারি সাহায্য ও উৎসাহে যদি তার বিপরীত শেখান হয় তাহলে তাতে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হল না ভক্ষিত হল এখনই সে বিচারে আমরা যাচ্ছি না।

রাজা রামমোহন রায়

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় আর ১৮৩৩ সনে হয় তাঁর পরলোকগমন। অবশ্য জন্ম সাল নিয়ে মতান্তর আছে। 'চেপে রাখা ইতিহাসে'র উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা অপসারণে মুসলমানদের মূল্য নির্ণয়, সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি রহস্য এবং সমাধানের উপায় ইত্যাদিকে সামনে রেখেই তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। সুতরাং এখানে রামমোহনের গোটা জীবনী লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বা সদিচ্ছা কি ছিল তা বলতে গিয়ে ডক্টর অমলেন্দু দে উল্লেখ করেছেন—"...রামমোহন ভারতে বৃটিশ শাসন সমর্থন করেন। বৃটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি ভারতে ব্রিটিশ কলোনাইজেশন সমর্থন করেন। এমন কি বৃটিশ নীলকরদেরও তিনি প্রশংসা করেন। তাঁর মতে নীলকরেরা দেশের

উপকার সাধন করেছে। তাছাড়া তিনি ভারতীয়দের সভ্য করার বিষয়ে ইংরেজের ভূমিকার প্রশংসা করেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন জমিদারী প্রথার সমর্থক। মোটকথা, দেশাত্মবোধের বাস্তব প্রকাশ রামমোহনের মধ্যে পাওয়া যায় না।...তাই তিনি এ দেশের মঙ্গলের জন্যই ইংরেজ প্রভুত্ব কামনা করেন। সর্ব বিষয়ে উন্নতি সাধন করায় তিনি ইউরোপের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।...তাঁর ধারণা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকলে গণতান্ত্রিক প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগ প্রকাশের ব্যবস্থা না থাকলে বিপ্লব ঘটতে পারে। কিন্তু স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র তা নিবারণ করতে পারবে। তাতে ইংরেজ শাসনও শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হবে।" (বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা ৮-১০)

অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের জন্য রামমোহনের মনে হয়েছিল যে এ অত্যাচার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অমলেন্দু দে লিখেছেন, "রামমোহন নীলকরদের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তবে বেন্টিঙ্ক ও দ্বারকানাথের মত তাঁরও মনে হয়েছে নীলকরেরা যে উপকার করেছে তার 'তুলনায় তাদের কদাচিৎ দুর্ব্যবহার ধর্তব্যের মধ্যেই নয়'। তাঁরা মনে করেন, যেখানে নীলের কারখানা বসেছে সেখানকার চাষীরা যেখানে নীলের চাষ নেই সে সব এলাকার চাষীদের চেয়ে অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নত (পৃষ্ঠা ১২)।" নীল বিষয়ক আরো তথ্য পরে আরও আলোচিত হয়েছে।

আমাদের দেশের মানুষ যে লবণ বা নুন তৈরি করে জীবিকা অর্জন করত এবং অন্যের চাহিদা মেটাত, সে রাস্তা বন্ধ করার জন্য ইংরেজ বিলেত থেকে নুন আমদানি করে নুন প্রস্তুতকারীদের সর্বনাশ সাধন করে। "রামমোহন বলেন যে, ভারতবর্ষে ইংলণ্ড থেকে লবণ আমদানীর ব্যবস্থা করলে ভারতীয়রা খুশীই হবে।"

এবারে তাঁর শিক্ষার দিকটা আলোচনা করতে গিয়ে বলা যায়—"যদিও তখন দেশে ইংরেজ শাসনের পত্তন হয়েছে, তবুও আইন-আদালত ও অন্যান্য সরকারী কাজে ফার্সী ভাষাই প্রচলিত ছিল। তাই বাংলা অ আ ক খ-র সঙ্গে ফার্সী আলেফ, বে, পে, তে, টে, সে শিখতে লাগলেন রামমোহন।" (দ্রষ্টব্য রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মাইকেল: ইন্দুভূষণ দাস, পৃষ্ঠা ৬)

রামকান্ত তাঁর পুত্র রামমোহনকে ফার্সী উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র পাটনায় পাঠান। সেখানে তিনি ফার্সীতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। "কোরআনে নারীজাতির প্রতি সুবিচার এবং সদ্ব্যবহারের যে সব কথা আছে সেগুলোও রামমোহনকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে। হিন্দু সমাজে সে আমলে নারীজাতির প্রতি সুবিচার করা হত না। পণ্ডিত নামে পরিচিত এক শ্রেণীর গোঁড়া লোক তখন হিন্দুসমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এঁরা নানারকম বাধা-নিষেধের বেড়াজালে নারীজাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, কোন নারী বিধবা হলে সমাজপতিরা জোর করে তাকে স্বামীর চিতায় তুলে দিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করতেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, এ ভয়াবহ নৃশংস কার্যটি ধর্মের নামে সম্পন্ন করা হত। কোরআন পড়ার পরে রামমোহনের মন হিন্দুসমাজের এ নৃশংস প্রথার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে।" (শ্রীইন্দুভূষণ দাস, ঐ, পৃষ্ঠা ৭)

এখানে প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে, সতীদাহ প্রথার সময় জোর করে ভাং, ধুতরা পাতার রস বা এ রকম কোন নেশার জিনিষ খাইয়ে আগুনে ফেলে বাঁশ দিয়ে টিপে ধরা হত এবং খুব বেশী ধুনোর ধোঁয়া করা হত যাতে অন্য লোকে দেখতে না পায়। মৃত্যুর ভয়াবহ করুণ আর্তনাদ ঢাকার জন্য "এত রাজ্যের ঢাক ঢোল কাঁশি ও শাঁখ সজোরে বাজান হত যে, কেহ যেন তাহার চিৎকার, কান্না বা অনুনয় বিনয় না শোনে"। (শরৎ রচনাবলী—নারীর মূল্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭১-৭২: কনক মুখোপাধ্যায় : উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা ৯)

কোরআন শিক্ষার পর রামমোহন কাশীতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত্য অর্জন করেন। বাড়ী ফিরে তিনি সতীদাহ প্রথা বা হিন্দুধর্মের কিছু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলে তাঁর মা তারিণী দেবী তাঁকে 'বিধর্মী' বলে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেন। রামমোহন তাঁর পিতাকে

বোঝাতে চাইলেন যে, তাঁদের পথ বেঠিক আর তাঁর (রামমোহনের) পথ সঠিক। চারিদিকে একথা প্রচার হয়ে গেল যে, রামমোহন বিধর্মী হয়ে গেছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত, সংক্ষেপে বলা যায় রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ বীভৎস সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ ও ব্রাহ্ম ধর্মের সৃষ্টির পিছনে কোরআন শরীফের অবদান অনস্বীকার্য। 'বীভৎস' প্রথা এজন্য বলছি যে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতার যা লোকসংখ্যা ছিল তা এখনকার চেয়ে অনেক কম। সেই ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শুধু কলকাতার বুকে ৫৩৩ জন মহিলাকে সতীদাহের নামে পোড়ান হয়েছিল। তাহলে সারা বাংলায় তথা সারা ভারতে প্রতি বছরে কত যে মহিলা-নিধন করা হয়েছে তা অনুমান করলে গা শিউরে ওঠে। (তথ্যঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ঃ বাংলার সংবাদ পত্র বাঙ্গালীর নবজাগরণ, পৃষ্ঠা ১১৭)

রামমোহনের মা তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করলেন যাতে তাঁর মৃত স্বামীর জমিদারির অংশ রামমোহন না পান। রাজা রামমোহন মামলায় মাকে পরাজিত করেন এবং পরে মা'র কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেন, বাবার জমি সম্পত্তিতে তাঁর কোন লোভ নেই। অবশ্য রাজা রামমোহন পরবর্তীকালে নিজের চেষ্টাতেই জমিদারের মর্যাদা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন অর্থাৎ জমিদারী কিনেছিলেন।

রামমোহন ইংরাজীতে সুপণ্ডিত হওয়ার পর তাঁর পাণ্ডিত্যের খবর চারিদিকে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় আকবর শাহ তখন দিল্লীর বাদশাহ–নামে মাত্র বাদশাহ ছিলেন, ক্ষমতা ছিল আসলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। তাই বাদশাহ রামমোহনকে ডেকে তাঁকে বিলেত যাবার জন্য অনুরোধ করেন। রামমোহন এ সুযোগকে স্বর্ণমণ্ডিত মনে করে রাজি হয়ে যান–কারণ, খরচপত্র সব বাদশাহের পক্ষ হতে পাওয়া গেল।

বিলেতের বড়কর্তারা ভারতীয় হেঁজিপেঁজি লোকদের সাথে কথা বলতে ঘৃণা বা আপত্তি করতেন; শুধু ভারতীয় রাজা মহারাজাদেরই সরাসরি কথা বলার সুযোগ দিতেন। তাই রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে দিল্লির বাদশাহ ইংলণ্ডে পাঠালেন। বাদশাহের পক্ষ হতে নিবেদনে কোন ফল না হলেও রামমোহনের বিলেত যাত্রা এবং হঠাৎ প্রাপ্ত 'রাজা' উপাধি রামমোহনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করতে সাহায্য করে। আর তাই রামমোহন যখন বিলেতে তখন ভারতের বিখ্যাত ইংরেজ নেতা ডেভিড হেয়ার বিলেতে তাঁর ভাইকে পত্র লিখলেন রাজা রামমোহনের থাকা, খাওয়া ও নানাস্থানে বক্তৃতাদি করার সমস্ত রকম সহযোগিতা করার জন্য। পত্র মোতাবেক সব রকম ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশ্য বিলেতে অসুস্থ হওয়ার জন্য তিনি পার্লামেন্টে তাঁর বক্তব্য লিখে পাঠিয়েছিলেন। সে বিবৃতিতে পাঁচটি দাবী ছিল। অনেকের মতে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবী হল–"ভারতে ফার্সী ভাষা এবং আরবী ভাষা এবং আরবী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করতে হবে এবং সরকারী কাজকর্ম ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই করতে হবে।" এটা অবশ্য পরে কার্যকরী হয়েছিল অর্থাৎ ইংরেজ সরকার ফার্সী ও আরবীর মৃত্যু ঘটিয়ে ভারতীয় বা বঙ্গীয় মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে মূর্খ বেকার সমাজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। (দ্রষ্টব্য ইন্দুভূষণ ঃ ঐ, ৪৭ ও ৫০ পৃষ্ঠা)

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের তুলনা করতে গিয়ে কনক মুখোপাধ্যায়ের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর' পুস্তকের মুখবন্ধে নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন, "...কিন্তু ভুললে চলবে না রামমোহন এসেছিলেন সামন্তের সুবিধাভোগী অভিজাত স্তর থেকে আর বিদ্যাসাগর ছিলেন নেহাৎই এক দরিদ্র 'টুলো' ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান।...আর ইংরেজ নির্ভরতার কথাই যদি ওঠে, তবে রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে কম যান কিসে? বরং রামমোহনের ইংরেজ মুখাপেক্ষিতা ছিল প্রয়োজনের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী মাত্রায় প্রকট এবং জমিদারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের গরজে কিয়ৎমাত্রায় স্বার্থ দোষদুষ্ট। ...রামমোহন এক সময়ে এদেশে স্থায়ী ইংরেজ উপনিবেশ গড়ার অনুকূলে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং নীলকর সাহেব বনাম নীলচাষীদের মামালায় তিনি ছিলেন নীলকরদের (ইংরেজদের) পক্ষে।" (পৃষ্ঠা ৫)

তদানীন্তন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল কলকাতা। তাই কলকাতার একটা শিক্ষিত দালাল দল তৈরি করে ইংরেজ সরকার ভারতের প্রত্যেক বিপ্লব ও বিদ্রোহকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল–একথা বলা খুব সহজ নয় এবং পূর্বেও সহজ ছিল না। তাই কমরেড আবদুল্লাহ রসুলের 'কৃষক সভার ইতিহাসে'র উদ্ধৃতি দিয়ে বলছি–"...সে সাথে প্রয়োজন ছিল দেশের অনিশ্চিত ও অশান্ত অবস্থার মধ্যে মোটামুটি একটা শান্তি স্থাপন করবার এবং তার সরকারের জন্য একটা সামাজিক সমর্থন পাবার। তাই এ নতুন জমিদার শ্রেণীকে সৃষ্টি করা হল কোম্পানির সরকারের সামাজিক সমর্থন ও সহায় হিসেবে; সোজা কথায় বিদেশী কোম্পানি-সরকারের একটা দালাল শ্রেণী হিসেবে।" (পৃষ্ঠা ১০-১১)

শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন হিন্দু জাগরণ, হিন্দু উন্নতি ও প্রগতির নামে এত বাড়াবাড়ি হয় এবং ইংরেজদের সাথে এত দহরম মহরম হতে থাকে যা মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও প্রতিকূল মনে হয় এবং এর ফলে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের প্রাচীরও মজবুত হতে থাকে। এ কথার সমর্থনে শ্রী সুশীলকুমার গুপ্ত লিখেছেন–"(উনবিংশ) শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে হিন্দু জাগৃতির ফলে হিন্দু সভ্যতা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠতার বাণী বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল...ইহা ব্যতীত হিন্দুরা ইংরাজদের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্যও মুসলমানদের বিরাগভাজন হইয়াছিল..."। (উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ, পৃষ্ঠা ২৪৭, ২৫৪)

সত্যিই রামমোহনের ব্যক্তিত্ব বড় সতেজ ছিল। তিনি তাঁর বাবা মা'র জমিদারীর পরোয়া না করে বেশ অভাবে পড়েছিলেন। যখন তাঁর স্ত্রী প্রসব করলেন তাঁদের পুত্র রাধামোহনকে, তখন অভাব এত বেশি ছিল যে, তাঁর স্ত্রী উমা স্বামীকে তাঁর বাবার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেন। কিন্তু রামমোহন সে কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তাঁর বাবা-মা তাঁদেরকে বাড়ি হতে তাড়িয়ে দিয়েছেন, সে জন্য সেখানে সাহায্য চাওয়ার কথা বলা বাতুলতা হবে। ওদিকে ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ অবশ্য অব্যাহত ছিল। ইংরেজরা তাঁকে যাচাই-বাছাই করে চাকুরি দিতে মনস্থ করেন। শেষে মিঃ ডগবী তাঁকে চাকরিতে বহাল করেন। (শ্রী ইন্দুভূষণের ঐ পুস্তক দ্রষ্টব্য)

রামমোহন পরবর্তীকালে একজন জমিদার, ঋণদাতা ধনী মহাজন এবং কলকাতার বাড়ীওয়ালা হয়েছিলেন বলে ইতিহাসে প্রমাণিত; "তিনি (রামমোহন) কোম্পানির কাগজ কিনতেন এবং ব্যবসা করতেন, ইংরেজ সিভিলিয়ানদের টাকা ধার দিতেন, তাঁদের কয়েকজনের আনুকূল্যে তিনি কয়েক মাস ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী এবং কিছুকাল টমাস উডফোর্ডের ও দীর্ঘ কয়েক বছর জন ডিগবীর ব্যক্তিগত দেওয়ানরূপে কাজ করেন। এসব বৈষয়িক কর্ম, ব্যবসা এবং ইংরেজ রাজপুরুষদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ-সহচর্য থেকে 'রাজা'র প্রভূত অর্থ সমাগম হয়েছিল, তিনি বিভিন্নস্থানে তালুক (জমিদারী) এবং কলিকাতার একাধিক বাড়ী ক্রয় করেছিলেন।" (উনবিংশ শতাব্দীর পথিকঃ অরবিন্দ পোদ্দার, পৃষ্ঠা ১০-১১; জাষ্টিস মওদুদের পুর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৭৪)

রামমোহন যে একজন মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, আরবী ও ফার্সীতে তাঁর ভালভাবে দখল ছিল। এটা বলতে সহজ লাগলেও বিষয়টি কিন্তু বেশ কঠিনই ছিল। যেদিক দিয়েই হোক তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন এবং ইংরেজদের সাথে মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরতে দেননি। দেশের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিশেষ করে সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধনে তাঁর অক্ষয় অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি ব্লাড প্রেশার রোগে আক্রান্ত হন। তখন এ ব্লাড প্রেশারকে 'ব্রেন ফিভার' বলা হত। ডক্টর কার্পেন্টার তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেন। অবশেষে রামমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু ডক্টর ক্যারিককে ডাকা হল। তিনিও এ পূর্ণ বিশ্রামের কথা বললেন। কলকাতার ঘড়ি ব্যবসায়ী মিঃ ডেভিড হেয়ারের ভাই দেশে অর্থাৎ বিলেতে থাকতেন তা আগেই বলা হয়েছে। সেখানেই তিনি

বিশ্রাম নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে কুমারী হেয়ার ও কুমারী ক্যালেন তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কিন্তু 'শত চেষ্টা করেও ডাক্তার তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর কুমারী হেয়ারের কোলে মাথা রেখে ভারতমাতার সুসন্তান রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।' তারপর তাঁর দেহ স্টেপলটন গ্রোভ নামক একটি নির্জন স্থানে কবর দেয়া হয়। পরে কবর থেকে তাঁর অস্থিসমূহ তুলে আর্নাইভেল নামক একটি স্থানে দ্বিতীয়বার কবর দিয়ে সেখানে একটি স্মৃতি স্তম্ভ তৈরি করা হয়; যেটা এখন ব্রিসটলের পথচারীদের স্মরণ করিয়ে দেয় রামমোহনের জীবন্ত ইতিহাস। (দ্রষ্টব্য রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মাইকেলঃ ইন্দুভূষণ দাস, পৃষ্ঠা ৫৩)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর। স্থানটি ছিল মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

১৮৫৭-র সে বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৭ বছর। এ সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা কি ছিল স্বাভাবিকভাবেই জানার ইচ্ছা হয়-কিন্তু সে সম্বন্ধে অনুকূল কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

১৮২৯ থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত তিনি পড়াশোনা করেন। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে তিনি চরম জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এ সময় (১৮২৭) হিন্দু কলেজে মিঃ ডিরোজিও শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর খৃষ্টীয় মনোভাবাপন্ন শিক্ষাদানে ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুধর্মের উপর বিরাগ সৃষ্টি হয়। ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতৃত্বে 'হিন্দু ধর্ম ধ্বংস হোক', 'গোড়ামী ধ্বংস হোক' প্রভৃতি স্লোগানগুলো চলতে থাকে (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা ২০-২১)। প্রসঙ্গতঃ, এ হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্রদের পড়তে দেয়া হত না।

১৮৩৯ সনে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে। ১৮৪১ সনে 'ন্যায়ের শেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে' ইংরেজের পক্ষ থেকে ১০০ টাকা পুরস্কার পান। সংস্কৃত কবিতা রচনার জন্য এ সরকার আরও ১০০ টাকা পুরস্কার দেয়। দেবনাগরী হাতের লেখার জন্য তাঁকে আরও ৮ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। কোম্পানির আইনে ব্যুৎপত্তির জন্য ২৫ টাকা পেয়েছিলেন। তাছাড়া ইংরেজ সরকার তাঁকে মাসিক ৮ টাকা হিসেবে বৃত্তি দিয়ে যেতেন ১৮৪১ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে সরকারের পক্ষ থেকে প্রশংসাপত্র দেয়া হয়। এ সনেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ সনে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 'হেড রাইটার' ও কোষাধ্যক্ষ পদে বহাল হন।

যে সমস্ত কলেজে শুধু ব্রাহ্মণদের পড়ার ব্যবস্থা ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিষদকে সুপারিশ করেছিলেন অন্ততঃ কায়স্থ ছেলেদেরও তাদের সাথে পড়তে অনুমতি দেয়া হোক। "কলেজের পণ্ডিতেরা, যাঁরা বেশীর ভাগই বিদ্যাসাগরের শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে এ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে লাগলেন" (দ্রষ্টব্য ডঃ বিনয় ঘোষঃ ঐ পৃষ্ঠা ৪০)। বিনয় ঘোষ আরও লিখেছেন-"বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ছিল মানবকেন্দ্রিক, ঈশ্বরকেন্দ্রিক নয়।" (পৃষ্ঠা ৪৬)

রামমোহন যেমন সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধনে অমর হয়ে আছেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন বা প্রচলন করার প্রচেষ্টায় ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। "বীরসিংহ গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যাসাগরের খেলার সাথী ছিল। বালিকাটি বাল্যবিধবা। বিদ্যাসাগর তাকে খুব পছন্দ করতেন এবং মনে হয় বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরস্পরের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল। বিদ্যাসাগর যখন জানতে পারলেন যে সে বিধবা এবং শাস্ত্রের

নির্দেশে সে বালিকাকে আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, তখন তিনি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রবর্তন করার সংকল্প করলেন।...এ অবস্থা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করে। বিদ্যাসাগর যখন সে অসহায় বিধবার শোচনীয় পরিণামের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি শপথ করলেন যে তিনি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার সমাজে প্রচলিত করে সরকারকে দিয়ে তা বিধিবদ্ধ করাবেন" [দ্রষ্টব্য ডক্টর বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা ৭৬]। বিনয় ঘোষের এ কথ্য সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। কারণ বিদ্যাসাগর ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করা পছন্দ করতেন না এবং তিনি যে ধার্মিক তারও কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু যেহেতু তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন তাই ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রমাণ করলেন যে, বিধবা বিবাহ বৈধ। বিদ্যাসাগরের ধর্ম-ধারণা সম্বন্ধে ডক্টর বিনয় ঘোষ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—"ওহে হারাণ, তুমি তো কাশীবাস করছ, কিন্তু গাঁজা খেতে শিখেছ ত?" তার উত্তরে তিনি (শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা) বললেন, "কাশীবাস করার সাথে গাঁজা খাওয়ার কি সম্বন্ধ আছে?" বিদ্যাসাগর বললেনঃ "তুমি তো জান, সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে কাশীতে মরলে শিব হয়। কিন্তু শিব হচ্ছে ভয়ানক গাঁজাখোর। সুতরাং আগে থেকে গাঁজা খাওয়ার অভ্যাসটা করে রাখা উচিত নয় কি? তা না হলে যখন প্রথম গাঁজা খাবে তখন তো মুস্কিলে পড়তে পার।" [দ্রষ্টব্য এ, পৃষ্ঠা ১৫২]

রামমোহন-পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের পৌত্র ললিতমোহনকে বিদ্যাসাগর একদিন ডেকে স্নেহের সাথে বললেন—"ললিত তুমি সত্যই বিশ্বাস কর যে মৃত্যুর পরে জীবন আছে? আমরা আমাদের এ পার্থিব জীবন সম্বন্ধেই অনেক কিছু জানিনা। কিন্তু তুমি ভাগ্যবান, কারণ তুমি শুধু এ পার্থিব জীবন সম্বন্ধেই জান তা নয়, এমন কি মৃত্যুর পরে পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধেও তোমার জ্ঞান আছে।"... বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার কথা শুনে বেশ মধুর লাগছে, যদিও হাসিও পাচ্ছে। আমার এ জরাজীর্ণ বাধ্যক্য অবস্থায় শুনে খুব সান্ত্বনা পেলাম যে মৃত্যুর পর আমি উপযুক্ত প্রতিদান পাব।" [বিনয় ঘোষ, ঐ, ১৫৪-৫৫]

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিদ্যাসাগরের বাসায় গিয়ে হাজির হলেন তাঁকে শিষ্য করতে বা ধার্মিক করতে। তিনি বিদ্যাসারকে বললেন, "আমি সাগরে এসেছি, ইচ্ছা আছে কিছু রত্ন সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।" বিদ্যাসাগর বললেন, "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে বলে তো মনে হয় না, কারণ এ সাগরে কেবল শামুকই পাবেন।" তাই পরে রামকৃষ্ণ তাঁর জন্য বলেছিলেন, 'এমন কি তাঁর নিজের (বিদ্যাসাগরের) মোক্ষলাভের জন্য ভগবানের নাম করবারও তাঁর কোন স্পৃহা নেই, সেইটাই বোধ হয় তাঁর সবচেয়ে বড় ত্যাগ। অন্য লোকের উপকার করতে গিয়ে তিনি নিজের আত্মার উপকার করার প্রয়োজন অগ্রাহ্য করেছেন।' (বিনয় ঘোষঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

তিনি পুরোপুরিভাবে রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন বলে ইংরেজ সরকার তাঁর উপর কোন কুধারণা রাখতেন না। একবার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি স্যার উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তাঁকে কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য স্বয়ং আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তিনি উত্তরে বলেছিলেন—"আমাকে বাদ দিয়েই তোমরা কাজে এগোও।" [শ্রীইন্দুভূষণ দাস, পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫৪]।

কনক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় বিদ্যাসাগর যে ইংরাজ সরকারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন তা তাঁর জীবনীকারদের রচনা থেকেই বোঝা যায়" (পৃষ্ঠা ৭২)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "...তিনি গভর্ণমেন্টের একজন প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন..." [পৃষ্ঠা ৭৩]। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "...ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতিকামী ইংরেজবর্গ একজন সহকর্মী পাইলেন।" (পৃষ্ঠা ৭৩)

বিদ্যাসাগর সরকারি চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর শাসক ইংরেজের সাথে তাঁর সম্বন্ধ কেমন ছিল সে সম্বন্দে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর এখন আর সরকারী বেতনভোগী কর্মচারী নন। না হইলেও, বে-সরকারী পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি সরকারের উপকার সাধন করিতে লাগিলেন। পরপর বহু ছোটলাটই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।...অবসর গ্রহণের বিশ বৎসর পরে ১৮৯০ সালে নববর্ষের প্রথম দিনে ভারত গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন।" আগেই বলা হয়েছে এই C.I.E. বলতে বোঝায় Companion of the indian Empire; যার বঙ্গার্থ হয়-ভারত সাম্রাজ্যের সহযোগী।

কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যা বলেছেন তা চাপা দেওয়া যায় না-"এ দশশালা বন্দোবস্ত ইহাই নির্ধারিত হইল, এ পর্যন্ত যে সকল জমিদার কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছেন; অতঃপর তাঁহারাই ভূমির স্বামী হইবেন; প্রজারা তাঁদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবেন।...চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে বাঙ্গালা দেশের যে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াচে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।"

'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে ঈশ্বরচন্দ্র যে বাক্য রচনা করেছেন তার প্রতি চোখ বুলালে ইংরেজদের প্রতি তাঁর ভক্তি ও আনুগত্যের পরিচয়ই পাওয়া যায়-"বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযুক্ত মার্শম্যান সাহেবের রচিত ইংরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনপূর্ব সংকলিত,...এ পুস্তকে অতি দুরাচার নবাব সিরাজউদৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি, চিরস্মরণীয় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক মহোদয়ের অধিকার সমাপ্তি পর্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।" (দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫)

ঈশ্বরচন্দ্রের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অসিত বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন; "বিদ্যাসাগর প্রায় মার্শম্যানের অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। মার্শম্যানের সাম্রাজ্যবাদী ও ইসলামবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গিমাও তিনি হুবহু স্বীকার করিয়া লইয়া অনুবাদ করিয়াছেন।" (পৃষ্ঠ ৩২১)

এ প্রসঙ্গে সবশেষে আর একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি-"বলাবাহুল্য, মার্শম্যানের নকলে লেখা ইতিহাসের মাধ্যমে সুকুমার-মতি বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যাসাগর ইংরেজ সরকারের যে ভাবমূর্তি উপস্থিত করেছেন তা না করলেই ভাল হত।" (দ্রষ্টব্য উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর : কনক মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭৪)

১৮৫৭-র বিপ্লবের মুহূর্তে তাঁর প্রধান কাজ ছিল বহু বিবাহ বন্ধের ব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ভাষাতেই লিখেছেন, "কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা বিদ্রোহের নিবারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন; বহু বিবাহের নিবারণ বিষয়ে আর তাঁদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না।" (পৃষ্ঠা ৭৫)

বিপ্লবী ও বিরোধীদের ইংরেজ-বিরুদ্ধ গতি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে তিনি বলেছেন, "বাবুরা কংগ্রেস করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন, আস্ফালন করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, ভারত উদ্ধার করিতেছেন। দেশের সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রতিদিন মরিতেছেন তাহার দিকে কেহই দেখিতেছেন না। রাজনীতি লইয়া কি হইবে?..." (কনক মুখোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭)

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় তাঁর নিজস্ব বাড়ীতে তিনি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হন এবং তাতেই তিনি মারা যান। তাঁর প্রতিভা, বাংলা সাহিত্যে পুষ্টিসাধন, দান এবং বিধবা বিবাহের প্রচলনের জন্য তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

এ গ্রন্থটি কবি-সাহিত্যিকদের শুধু জীবনী নিয়ে নয়–১৮৫৭-র আন্দোলন, বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের বুদ্ধিজীবী কলমদারীদের মানসিকতার নমুনা পরিবেশন করে দেখান যেতে পারে কেমন করে ভারতের এ স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল এবং হিন্দু-মুসলমানের মাঝে বিভেদের প্রাচীর কিভাবে উঁচু হয়েছিল।

কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়-এর কথাই বলি। ১৮৩৮-এ তাঁর জন্ম এবং ১৯০৩ সনে তাঁর মৃত্যু। তাঁর 'বীরবাহু' কাব্যে তিনি লিখেছেন–

"শোন রে পাপিষ্ঠ মুসলমান
বাল্যে বিনামিয়া পতি   মোর কৈলি এই গতি
মম বাক্য না হইবে আন॥...
জগতে পবিত্র স্থান   গিয়াছে তাহারও নাম,
সে পুরীও ম্লেচ্ছ পদ অপবিত্র করেছে।...
ম্লেচ্ছ 'মহম্মদ' ডাকে   'হরহর হিন্দু হাঁকে
মহাক্রোধে দুই দল সমবেতে মাতিল।'
আরে রে নিষ্ঠুর জাতি পাষণ্ড বর্বর।
পোড়াবো যবন-রক্তে শমন-খর্পর॥
সাক্ষাতে হেরিলি কার কত বাহুবল
এবে রে যবনরাজ্য গেল রসাতল॥
যতদিন ম্লেচ্ছহীন না হইবে দেশ।
ততদিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ।...
হারিল যবনদল   হিন্দুপক্ষ কোলাহল।...
বিজয় হুঙ্কার নাদে চরাচর পুরিল।...
পুনঃ হিন্দুরাজগণে   ম্লেচ্ছ পরাজিবে রণে
পুনর্বার এই রাজ্য করতল করিবে॥"

নবাব সিরাজউদ্দৌলার জন্য কবি লিখেছেন–

"গর্ভবতী রমণীর জঠর খণ্ডিয়া
দেখিত জরায়ু পিণ্ড জীবিত জীবের দণ্ড
করিত অশেষরূপ দুর্মদে ডুবিয়া।"

অবশ্য সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে তার আগেই কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে বললে অত্যুক্তি হবে না যে, কবি ও সাহিত্যিকরা এ একটা মূল বিষয়ে প্রায় একতাবদ্ধ।

নাট্যকার ও কবি দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন এবং বলাবাহুল্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যও ছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের নিন্দায় লিখেছেন–

"অপকৃষ্ট আওরঙ্গজীব রাজা দুরাচার
        প্রজার মনের ভাব না করি বিচার...
ভাঙ্গিয়া মন্দির তার মসজিদ গঠিল
প্রস্তর বিগ্রহে ধরে দূরে ফেলাইল।
ওরে দুষ্ট আওরঙ্গজীব নীচাত্মা কেমনে
নাশিলি এমন কীর্তি! ছিলনা কি তোর
কিছুমাত্র পূর্বকীর্তি অনুরাগ জোর!"

Goto List

সিরাজউদ্দৌলার জন্য ইনিও লিখেছেন–

"...কৌতুক দেখিতে আর নদী মধ্যস্থলে,
"মানব পুরিত তরী না ডুবায়ে জলে,
"দেখিত উদরে সুত কিরূপে বিহরে
"নাহি আর গর্ভিনীর উদর বিদরে।"

অবশ্য দীনবন্ধুর বিরাট বৈশিষ্ট্য যে তিনি নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সমর্থন করেননি; যেটা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করার অবকাশ রইল।

নবীনচন্দ্র ১৮৪৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন আর ১৯০৯-এ তাঁর মৃত্যু হয়। এঁর লেখাতেও ইংরেজ বিরোধিতা এবং মুসলমানদের প্রতি উদারতার কত অভাব তা অনুমান করা কঠিন নয়। তাঁর লেখনীর কিছু নমুনা পেশ করছি মাত্র–

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্নজাতি, তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল...
একই ভরসা মিরজাফর যবন।
যবনেরা যেইরূপ ভীরু প্রবঞ্চক..."

কৃষ্ণচন্দ্র ও উমিচাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা সুকৌশলে স্বীকার করে লিখেছেন–

"ধিক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র! ধিক উমিচাঁদ!
যবন-দৌরাত্ম্য যদি অসহ্য এমন,
না পাতিয়া এই হীন ঘৃণাস্পদ ফাঁদ
সমুখ সমরে করি নবাবে নিধন,
ছিঁড়িলে দাসত্ব পাশ, তবে কি এখন
হ'ত তোমদের নামে কলঙ্ক এমন!"

আন্দোলনে মুসলমান বিপ্লবীদের পরাজিত হওয়ার পরে দেশবাসীর জন্য তিনি লিখলেন–

"ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন
আজি হতে যবনেরা হ'ল হতবল
কিবা ধনী মধ্যবিত্ত কিবা দীন হীন
আজি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।...
জানি আমি যবনের পাপ অগণিত;
জানি আমি ঘোরতর পাপের ছায়ায়
প্রতিছত্রে ইতিহাস আছে কলঙ্কিত।"

নবীনচন্দ্র সেন শুধু কবি ও কাব্যকার ছিলেন না, তিনি ছিলেন ইংরেজ সরকারের একজন বাছাই করা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এ পদ পাওয়ার আগে তিনি মিঃ হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।

ভারতের স্বাধীনতাকামী বীর বিপ্লবী আলাউদ্দিনের ইতিহাস আমরা এই পুস্তকে পূর্বেই আলোচনা করেছি। তাঁর সুবিখ্যাত সন্তান আবদুর গফুর ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী বিপ্লবী নেতা। তাঁর গেঁয়ো নাম ছিল 'নোয়ামিয়া'। ইংরেজ সরকার তাঁকে শায়েস্তা করতে না পেরে নবীনচন্দ্রকে সেখানে পাঠান। নবীনচন্দ্র বিপ্লবী আলাউদ্দীনের ইংরেজ বিরোধী কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করার পর শেষে লিখেছেন—"আইন প্রমাণের অধীন। নোয়ামিয়ার কার্যাবলী প্রমাণের বাহির। তাহার প্রতিকূলে কার্য নহে। ইহার জন্য অন্য বিধি অবলম্বন করিতে হইবে।" (দ্রষ্টব্য নবীনচন্দ্র সেনঃ আমর জীবন, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৪৯-৫০)

বিপ্লবী বীর মাওলানা আবদুল গফুর সাহেব এবং বিখ্যাত পণ্ডিত-প্রবর মাওলানা কেরামত আলির মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে একটি বিতর্ক সভা হয়েছিল। সেখানে পুলিশও উপস্থিত ছিল। সে ঘটনাকে নবীনচন্দ্র সেন এমন বিকৃত করেছেন এবং মুসলমান মাওলানাদের সম্বন্ধে, তাঁদের দাড়ি, পাগড়ি ও তাঁদের শুদ্ধ আরবী বলার ভঙ্গিমাকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা থেকে মুসলমান জাতির প্রতি তাঁর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁরা ইংরেজের একনিষ্ঠ প্রতিনিধি নবীনচন্দ্র সেনের সাথে নাকি উর্দুতে কথা বলেছিলেন। তাই ইংরেজের সত্যনিষ্ঠ কর্মচারী সে সত্য উর্দু উদ্ধৃতিগুলো তুলে দিয়েছেন। এখন জনসাধারণের বিচারে নির্ধারিত হবে তাঁর লেখা সে ঘটনার গুরুত্ব ও সত্যবাদিতার আলেখ্য। সে ঘটনার বর্ণনা তাঁর নিজের ভাষায় যেভাবে করেছেন তা হুবহু তুলে দিচ্ছি—"এক প্রকাণ্ড সামিয়ানাতলে ফরিদপুর অঞ্চলের সমস্ত আবক্ষচুম্বিত-শ্মশ্রু (অর্থাৎ বুক পর্যন্ত দাড়িওয়ালা) মৌলবীগণ বড় বড় 'মুড়াস্থা' (পাগড়ি) বাঁধিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।...নিদ্রান্তে পাঁচটার সময়ে গিয়া দেখিলাম সবডিভিসন ভাঙ্গিয়া যেন সমস্ত কাছাবিহীন বিরাটমূর্তি বিপ্লবীগণ (ফা.) সমবেত হইয়াছে। মৌলবী যুগলকে আমি সভার দুই প্রান্তে বসাইয়াছিলাম। এখন দেখিলাম, তাঁহারা পশ্চাৎদেশ (অর্থাৎ পাছা) ঘর্ষণ করিতে করিতে প্রায় সম্মুখীন হইয়াছেন, এবং আর কিছু বিলম্ব করিলে বিতণ্ডা ঘন বিলোড়িত জিহ্বা ও ঘন আন্দোলিত শ্মশ্রুজাল হইতে বাহু চতুষ্টয়ে সঞ্চালিত হইবে, এবং তখন প্রায় পাঁচ সহস্র মুসলমানের সেখানে একটা 'করবল্লা' (অর্থাৎ কারবালা) হইবে। আমি কিছুক্ষণ অতিশয় গম্ভীরভাবে সেই কণ্ঠতালু ও মূর্দ্ধা হইতে অপূর্বরূপে উচ্চারিত আরব্য শব্দাবলী শ্রবণ করিয়া তাহাদের অপরিজ্ঞাত অর্থে আপ্যায়িত হইয়া বলিলাম—আপনারা উভয়ে বিখ্যাত মৌলবী; তাঁহারা উভয়ে প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেলাম করিলেন—আপনাদের এই তর্ক আজ যে শেষ হইবে বোধ হইতেছে না। কারণ বিষয় বড় গুরুতর; তাঁহারা উঠিয়া আবার আমাকে সুপ্রসন্নভাবে সেলাম করিলেন...নোয়ামিয়া তাহার পরদিন বুক কুটিতে কুটিতে আমার কাছে সহচর-শূন্যভাবে উপস্থিত। 'হাম এক দমছে বরাবাত গেয়া। হমারা লাখো রুপেয়াকা ইজ্জত গিয়া' ইত্যাদি শোকসূচক বাক্যাবলী উদ্গীরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন...তিনি তাঁহার বজরা হইতে কোরান আনাইয়া অতিশয় সন্তুষ্টির সহিত এ প্রতিজ্ঞা করিলেন। এবং আমার অনেক প্রশংসা করিয়া লিখেন—'এতদিনে মাদারিপুরে একজন বিচক্ষণ লোক আসিয়াছে। অতঃপর আমার কোন কার্যে অপ্রীত হইবার আপনি কোনও কারণ পাইবেন না। আমি ঠিক আপনার একজন তাবেদারের মত কার্য করিব'।" (দ্রষ্টব্য নবীনচন্দ্র সেনঃ আমার জীবন, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৪৯-৫৫)

যাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে গেলেন, রক্ত দিলেন, প্রাণ বিসর্জন করলেন তাঁরা ইংরেজ অনুগত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কোরআন নিয়ে শপথ করলেন এ কথা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? কোরআন কি এতই সহজ বস্তু যে, বজরা থেকে নিয়ে এসেই অমনি তাঁর সামনে এক সামান্য বিষয়ে হলপ করে ফেললেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য তাঁদের সেই আলোচনা বা তর্কসভা ছিল—ভারতবর্ষে 'দারুল হারব' [যুদ্ধক্ষেত্র] না 'দারুল ইসলাম' এই বিষয়ে। একপক্ষ বলেছিলেন, এটাকে দারুল হারব বা যুদ্ধক্ষেত্র বলে মনে করতে হবে, তাই

এখানে জুমার নামায পড়া আবশ্যিক নয়। অপর পক্ষের বক্তব্য ছিল গোটা ভারতবর্ষকে দারুল হারব মনে না করে যতদিন না দেশে স্বাধীন হয় ততদিন জুমার নামায পড়া হোক। –এখানে 'লাখো' রুপেয়া নষ্ট হবার কোন গল্পই আসে না। এটা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অতিরঞ্জিত ও লেখক কর্তৃক উল্লিখিত উর্দু বক্তব্য যে অশুদ্ধ তা প্রাথমিক উর্দু জানা বালকও সহজে বুঝতে পারবে।

কোন ব্যক্তি মুসলমান-বিরোধী প্রমাণিত হলেও তিনি ইংরেজ বিরোধীও হতে পারেন; অর্থাৎ ইংরেজের স্তাবক নাও হতে পারেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র সেনের ইংরেজ বিতাড়নের বা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা ছিল বলে আমরা কোন তথ্য এখনো পাইনি। তবে চাপা পড়া যে তথ্য পেয়েছি তা হচ্ছে এই ঃ

মহারথী ভিক্টোরিয়ার প্রথম পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে যখন এখানে আসলেন তখন ভারতের বিপ্লবী ও ইংরেজ বিরোধীরা চিন্তা করছিলেন কিভাবে তা রোখা যায়। অবশ্য শক্তিতে না কুলালেও ভাবনা চিন্তা করতে তো কোন বাধ্য ছিল না। অথচ ঠিক সেই সময় নবীনবাবু সুন্দর একটি উপহার ঐ রাজপুত্রের হাতে দিলেন–সেটা ছিল তাঁর স্বরচিত মানপত্র। তাতে ছিল ইংরেজের স্তবস্তুতি ও জয়গাঁথার প্রাচুর্য। শিরোনাম দিয়েছিলেন 'ভারত উচ্ছ্বাস'। বড় খুশী হলেন ইংরেজ জাতি তথা রাণী ভিক্টোরিয়া এবং রাজকুমার স্বয়ং। আগামীতেও এই উৎসাহ বজায় রাখার জন্য নবীন সেন পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পেলেন। পরে আবার রাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবোরা'র হাতেও একটি কবিতা উপহার দিয়ে প্রমাণ করে দেন যে, "মুসলমান শাসনে 'অশেষ যন্ত্রণা' ভোগের পর বাঙ্গালী হিন্দুরা ইংরেজদের 'সমাদরের' সঙ্গে আহ্বান করে আনে।" (দ্রষ্টব্য ডক্টর মনিরুজ্জামান; আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, পৃষ্ঠা ৪২)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ১৮৬৩ - তে জন্ম ও ১৯১৩ - তে মৃত্যু হয়। তিনি আর্য সন্তানের বেদনায় লিখেছেন–

"বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে
চৌদ্দশত পুরুষ আছি পরের জুতো খেয়ে...
লজ্জা নাই। 'আর্য' বলি চেঁচাই হাসি মুখে।..."
(দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা ৩৮৮)

সিরাজদ্দৌলার জন্য লিখেছেন–
"ইংরাজ করে নি সিরাজ তোমায় কভু পরাজিত,
মীরজাফরও করেনি তোমায় আজি দমন;
দিবারাতি প্রজাদিগের এত বেশী খেয়েছো যে
জীর্ণ হয়নি, সে সব আজি কর্ত্তে হল রমন।"
আরও লিখেছেন–
"বিলাসের সে চরম সীমা–নারী নিয়ে খেলা
মনে কর আজি সে সব–জীবন ত ভোগ ক'রে নেছ,
কিসের দুঃখ, উঠে যারা তাদেরই হয় পতন..."

সিরাজউদ্দৌলাকে দুর্নাম প্রায় প্রত্যেকেই যে করেছেন এ সম্বন্ধে নিশ্চয় বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, সিরাজউদ্দৌলাকে যত দুর্নামের পোশাক পরানো যাবে ততই প্রমাণ হবে–কাল শাসক সিরাজউদ্দৌলাকে সরিয়ে ভাল শাসক ইংরেজের আবির্ভাব সত্যই সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছু ছিলনা।

দীনবন্ধু মুসলমানদের সম্বন্ধে যে ধারণাই পোষণ করে থাকুন না কেন, একটা বিষয়ে সেকালের বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁরও গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিনি বিরোধিতা করতে পিছপা হননি–সেটা হচ্ছে নীলবিদ্রোহ। এখন মনে হতে পারে যে, নীলকর সাহেব কারা বা কেমন ছিল? সংখ্যায় কত জনই বা ছিল? কাদের উপর কেন এবং কিভাবে অত্যাচার করেছিল? তথ্য না জানা থাকলে মনে হবে যে এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ দিক নয়। আর সে উদ্দেশ্যেই এগুলো চাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে যাতে সত্য ইতিহাসের স্বরূপ প্রকাশিত না হয়। তাই নীলচাষ সম্বন্ধে এবং বিশাল ভারতবর্ষে সে প্রচণ্ড অত্যাচারের কাহিনী সম্বন্ধে কিছু তথ্য তুলে ধরার প্রয়োজন আছে।

১৮৫৭-র মহাবিপ্লব ইংরেজ হানাদারা কাগজে কলমে দমন করলেও বিপ্লবের স্রোতস্বতী গতি কিন্তু থামানো যায়নি। ১৮৫৯ হতে ১৮৬১ পর্যন্ত আর একটি বিপ্লবের কথা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য–সেটা হচ্ছে 'নীলবিদ্রোহ'। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ ভট্টচার্যও তাঁর 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস' পুস্তকে এ কথা স্বীকার করেছেন (পৃষ্ঠা ৩২)। 'পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ' পুস্তকে গবেষক মেসবাহুল হক এ নীল বিদ্রোহকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ইংরেজবিরুদ্ধ আন্দোলন ও সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান বেশি বললে অনেকের কাছে তা সুস্বাদু হবে না। আমাদের দেশের মুসলমান-প্রধান কৃষক সমাজ লড়েছে, ইংরেজরা তাদের মেরেছে আর জমিদার শ্রেণী নিজেদের শুধু গড়েছে–তাঁরা তেমন কোন সহযোগিতা সংগ্রামীদের সাথে করেন নি–এ কথা প্রমাণের জন্য এক প্রখ্যাত সন্ত্রাসবাদী নেতার উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ "এ কাজে (সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে) সরকারী ছোট-বড় কর্মচারীদের মধ্যে এমনকি পুলিশের কাছেও সাড়া পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু জমিদার শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে কম সাড়া পেয়েছি।" (হেমচন্দ্র কানোন গোঃ 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' দ্রষ্টব্য)

নীল চাষ পৃথিবীতে বহু রাষ্ট্রে হয়ে থাকে কিন্তু অনেকের মতে ভারতের নীল সব দেশে অধিক জনপ্রিয়। বঙ্গদেশে বোনার্দ নামে একজন বিদেশী লোক সর্বপ্রথম নীলচাষ করেন। হুগলী জেলার তালডাঙ্গায় প্রথম নীলকুঠি তৈরি হয়। পরে চন্দন নগরের কাছে গোন্দল পাড়ায় কুঠি সরিয়ে আনা হয়। এ সময় শোষক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ নায়করা বঙ্গদেশে ব্যাপক নীলচাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মিঃ ক্যাবেল ব্লুম দাবী করেন যে তিনি এ লাভজনক ব্যবসার প্রতিষ্ঠাতা। (The Economic History of Bengal : N.K. Sinha, P. 207)

বঙ্গদেশে সাহেবেরা এত বেশি নীলকুঠি তৈরি করল যে তাতে মনে হোল, ধান ও পাটের চাষ বন্ধ করে শুধু নীল চাষই করতে চায় শ্বেতাঙ্গের দল। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নীলকুঠি তেরি হল। যে জেলায় হত নীল চাষ হয়েছে সে জেলার চাষীরা ততো দারিদ্র্যের শিকার হয়েছে। আর দুর্ভিক্ষে, অনশনে, অর্ধাশনে মারা গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। কিন্তু কিভাবে তারা চাষীদের জমি দখল করেছিল? ইংল্যাণ্ড হতে তারা খালি হাতে এসে বড় কর্তাদের সহায়তায় জোর করে জমি চিহ্নিত করত এবং জোর করে নীল চাষ করাতে বাধ্য করত। অত্যাচার করবার জন্য একদল মারকুণ্ড বাহিনী বা লাঠিয়াল পোষা হত, তাদের কাজ ছিল ইংরেজদের আদেশে চাষীদের উপর অত্যাচার করা (দ্রষ্টব্য Bengal Peasant Life : Lal Behari Dey, p. 327)। জোর করে তারা গরীব চাষীকে দাদন দিত; দাদন মানে চাষ করতে সাহায্য বাবদ অগ্রিম ঋণ। দাদন না নিলে বেঁধে চাবকান হত। চাষীরা তাদের ইচ্ছামত চাষ করবার অধিকার হারালো। ঐ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করে কিছু করা যেত না, বরং বিপরীত ফলই হত। কারণ যারা কুঠির মালিক ছিল তারা কেউ ম্যাজিস্ট্রেটের 'শালা, কেহ ভাই, কেহ ভগ্নিপতি কেহ পিসে, কেহ জ্ঞাতি, কেহ

কুটুম্ব, কেহ গ্রামস্থ, কেহ সমধ্যায়–এভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্ক আছে।' পুলিশ দারোগারা পর্যন্ত গরীব চাষীদের পক্ষে ছিল না। কারণ তাদের মনিবদেরকে নারাজ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই তারাও সত্য রিপোর্ট দিতে সাহসী হয় নি। (দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ঃ সংবাদপত্র সেকালের কথা, পৃষ্ঠা ১০৮-১০৯)

একবার কোন রকমে দাদন দিতে পারলে চাষীকে সারাজীবন বাধ্য হতে হত নীলচাষ করতে। ঐ দাদন শোধ করবার শক্তি ও ইচ্ছা থাকলেও কোন উপায় ছিল না। (দ্রষ্টব্য নীলবিদ্রোহঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৭)। প্রজাদের গরু-ছাগল জমির কাছে গেলে তা আর ফিরে আসত না–হয় মেরে ফেলা হত অথবা খেতে না দিয়ে আধমরা অবস্থায় রেখে মালিকের কাছ থেকে টাকা আদায় নিয়ে তবে তা ফেরত দিত ইংরেজরা।

যশোর জেলার ফুলে গ্রামের আসাদুল্লা, গোলাপ মণ্ডল, জাকের মণ্ডল, তোতাগাজী ও আকবর দফাদার প্রভৃতিদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল তার প্রতিবাদে মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ হেনরী ম্যাকেঞ্জীর নিকট লিখিত প্রতিবাদ পাঠান (মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ১৪৮)

ইংরেজদের দেখাদেখি অনেক দেশী জমিদারও নীলকুঠি করেছিলেন, যেমন রাণাঘাটের জমিদার জয়চাঁদ পাল। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তাঁর কাছে এ প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়েছিল যে, এত অত্যাচার সহ্য করেও চাষীরা কেন নীল চাষ করল? উত্তরে জমিদার বললেন, "প্রহার, কয়েদ, ঘর জ্বালান প্রভৃতি অত্যাচারের ফলে এবং ভয়ে" (ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৬)। এ নীল লাভজনক ব্যবসা ছিল কুঠিয়ালদের জন্য, আর চাষীদের জন্য ছিল ধ্বংস হওয়ার কারণ। একমণ নীলের দাম পরত দুশ' টাকা। তার মধ্যে সমস্ত খরচ-খরচা বাদ যেতে ৭০ টাকা। মোট লাভ হত মণ প্রতি প্রায় ১৩০ টাকা। কিন্তু আসলে লাভ হত আরও বেশী–২০০ টাকা খরচ করে যে নীল উৎপন্ন হোত তাতে কুঠিয়ালদের লাভ হতো প্রায় ১৯৫০ টাকা। আর যদি উৎপাদন করচা ২০০ টাকা ধরা যায় তাহলেও ১৭৫০ টাকা লাভ, যা কল্পনা করা যায় না। আর এজন্যই নীলকরদের লোভ ও চাষীদের উপর অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছেছিল (দ্রষ্টব্য নীল বিদ্রোহ : সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৪৬) তখন এক বিঘা জমিতে নীলচাষ করতে খরচা হত তিন টাকা চৌদ্দ আনা অর্থাৎ চার টাকার কিছু বেশি। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার হল নীলচাষে চাষীর লাভের পরিবর্তে লোকসান হোত এক টাকা চৌদ্দ আনা আর এ জমিতে ধান চাষ করলে লাভ হত খরচ খরচা বাদ দিয়ে পাঁচ টাকা পনের আনা বা কিছু কম ছ' টাকা। তখন ধানের দর ছিল এক টাকা মণ। তবুও চাষীদের ধানের মত এ রকম লাভজনক চাষ করতে দেয়া হত না। সে সময় দুর্ভিক্ষে অবিভক্ত বঙ্গের তিন ভাগের এক ভাগ লোক মারা যাবার অন্যতম কারণ ছিল নীল চাষের জন্য ধান চাষের ক্ষতি। তাছাড়া নীলের সব লাভটুকুই চলে যায় ইংল্যাণ্ডে। অতএব নীল চাষ দুর্ভিক্ষের জন্য কায়েমী আসন পেতে বসেছিল। অথচ সত্য তথ্য প্রমাণ করে যে, এ সময় নীলকরদের অত্যাচারে জমিদাররা ইংরেজকেই সাহায্য করে গেছেন। [Indigo Commission Report-Evidence, p. 9]। নীলকরদের ব্যবসা ব্যক্তিগত হলেও সরকারি সহযোগিতা প্রত্যক্ষভাবেই তাঁরা পেয়েছিলেন।

বিপ্লবীরা এবারেও মাথা তুললেন। মুনিম, কুতুবুদ্দিন, শাহেদুল্লা, প্রভৃতিরা সশস্ত্রে রুখে দাঁড়ালেন। সাথে সাথে লাঠিয়াল বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো বিপ্লবীদের উপর। তিনজন নেতাই আহত হলেন। কিন্তু পরে মুনিম শহীদ হলেন [Letter from Mr. L. S. Jackson, Judge of Rajshahi to Registerer, Nijamat Adalat. P. 111-114]। নদীয়া মুসলমান প্রদান জেলা ছিল। সেখানকার চাষীদের জোর করে নীল চাষ করান হয়–যেমন মেলেপোতা, পাথরঘাটা, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামে। (মেসবাহুল হক, ঐ, পৃষ্ঠা, ১৮১)। নদীয়া জেলায় যখন চাষীদের সর্বনাশ করা হয় তখন ইংরেজ সরকার প্রকাশ্যভাবে পুলিশ দিয়ে নীলকরদের সাহায্য করে (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৮, ৬০)। বিদ্রোহী বিপ্লবী ও

আপত্তিকারীদের সমস্ত জমির ফসল কেটে নেয়া হত, ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেয়া হোত এবং চাবকাতে চাবকাতে মেরে ফেলত তারা। সপরিবারে সইতে হত অত্যাচারের ধাক্কা। বিপ্লবী বিষ্ণু ঘোষকে সাহেবরা হত্যা করে তাঁর লাস ভাসিয়ে দেয়। মামলা করা হয় কিন্তু তাতে রায় হয়–ও কেস সাজান এবং মিথ্যা। তার পরেও আপীল করা হলে তা নামাঞ্জুর হয়।

মিঃ ডাম্বাল একটা গোটা গ্রাম আক্রমণ করে বেশির ভাগ লোককে আহত করেন। ডাম্বালের ছেলের গুণ্ডামীই বেশি ক্ষতি করেছিল। এক্ষেত্রেও মামলা করা হলে মিঃ ডাম্বাল বেকসুর খালাস হন। আর পুত্র তো কোর্টে হাজিরই হননি। অবশ্য কিছু আসামীর এক বছর করে জেল ও একশত টাকা জরিমানা হয়। কিন্তু সব চোরে চোরে মাসাতুত ভাই। যেমনি আপীল করা হল অমনি সব বেকসুর খালাস। কারণ সব যে ভদ্রলোক আসামী। (দ্রষ্টব্য Indigo Commission Report, Appendix II) জামালপুরের কালু নীল চাষ করতে অস্বীকার করেন। মিঃ ব্রুস ঘোড়ায় চড়ে চাবুক হাতে করে হাজির। কিন্তু কালু একটা মোটা লাঠি দিয়ে সাহেবকে কুকুর পেটান করলেন। তার কিছুদিন পর বৃন্দাবনপুরে ইউসুফ মিঃ হিলস্-এর নীলকুঠি আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলেন। (গোলাম মোহাম্মদের লেখা 'জালালপুরে গণ ইতিবৃত্ত' হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন মেসাবাহুল হক, পৃষ্ঠা ২৫)

ইংরেজরা মেরে ধরে জেলে ভরে অত্যাচার করে যেভাবে ভারতবাসীকে সন্ত্রস্ত করেছিল তাতে মানুষ বোবার মত, বাকহীন পশুর মত সহনশীল হয়ে উঠেছিল। তা না হলে এক একটা কুঠিতে যা শ্রমিক থাকত তা বিস্ময়কর। যেমন রুদ্রপুরে নীলকুঠির সংখ্যা ছয়। তাতে কাজ করত ৭৩৮৩৯ জন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এ এলাকার কাঠগড়ায় বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠতে বাধ্য হয়েছিল। [মেসবাহুল হক, ঐ, ২০৭]। তবে সবচেয়ে দুঃখের কথা "দেশীয় জমিদারগণ সাধারণতঃ শ্রেণীগতভাবে নীলকরদের বিরোধী ছিল না" [দ্রষ্টব্য Buckland: Bengal Under the Lt. Governors, Vol-1, p. 248]। আর একটা লাড়াই হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে, তাতে ইংরেজ নায়ক ছিলেন মিঃ আর্চিবল হিল। আর আমাদের দেশীয় নায়কের নাম করম আলী। করম আলী ইংরেজদের অত্যাচারকে সাময়িকভাবে থামিয়ে দিয়েছিলেন (হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ১২ই মে, ১৮৬০)। নদীয়া জেলার গাছা গ্রামের বিপ্লবী বিশ্বনাথ ইংরেজদের বেশ মার দেন এবং হিমশিম খাওয়ান। অবশ্য শেষে তাঁকে ফাঁসি দেয়া হয়। তাঁর ভাল নাম চেপে তারা তাঁকে 'বিশে ডাকাত' বলে উল্লেখ করেছে। তবে দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশীয় লেখকরাও তাঁকে 'বিশে ডাকাত' বলেই উল্লেখ করেছেন (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃষ্ঠা ২১২-১৩)। নীল চাষ ও নীলকরদের অত্যাচার শহীদ নিসার আলীর সময়েও ছিল। বলাবাহুল্য, তাঁর মহান সংগ্রাম ছিল এ অত্যাচারেরই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ স্বরূপ। আর সেই জন্যই তিনি ইংরেজ ও তাঁদের দালাল জমিদারদের একসাথে আক্রমণ করেছিলেন। যদিও এর সাথে তাঁর আন্দোলন বিজড়িত, তবুও যেহেতু তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে সে জন্য এখানে আর পুনরুল্লেখ করা হল না।

বিপ্লবের হাওয়া বইতে থাকে। শিবনাথ, সাদেক মোল্লা, গয়রুল্লা, ফকীর মামুদ, খাঁন মামুদ, আফাজুদ্দিন, রামচন্দ্র ও চন্দ্রকান্ত সকলে মিলে বেনীর ছত্রিশখানা নীল ও চিনির নৌকা ডুবিয়ে দেন। এমনিভাবে ৫০ লাখ চাষী একতাবদ্ধ হয়ে ঘোষণা করে যে তাঁরা নীল আর বুনবেন না। Calcutta Review পত্রিকাতেও যা ঘোষিত হোল তার মর্মার্থ হল, বাংলার কৃষকদেরকে নির্বাক যন্ত্র মনে করতাম; এখন তাঁরা স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন, জেগে উঠেছেন তাঁরা–তাঁরা আর নীল চাষ করবেন না। নদীয়া, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, ফরিদপুর, ২৪ পরগণা শেষে গোটা বঙ্গের চাষীরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে তাঁরা নীল বুনবেন না; ভিক্ষা করে খাবেন সেও স্বীকার। (দ্রষ্টব্য নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ ঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৮৭)

Goto List

ওদিকে শ্বেতাঙ্গ হানাদারদের চিন্তা বাড়ল। ফলে সিদ্ধান্ত হোল, অত্যাচারের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। গ্রামের পর গ্রাম পোড়ান হতে লাগল। পুরুষদের ধরে বন্দীখানায় অমানুষিক অত্যাচার করা হতে লাগল। স্ত্রীলোকদের জোর করে ধরে তাদের উপর পাশবিক পাপাচার করা হল। ধানের গোলা ধ্বংস করা হল। তবুও বিপ্লবী চাষীরা মাথা নত করেননি। (হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ১৯শে মে, ১৮৬০)

রফিক মণ্ডলের নেতৃত্বের কথা হান্টারও স্বীকার করেছেন। মাষ্টার আবদুর রহমান রফিক মণ্ডলকে একটা সরকারি চাকরি জুটিয়ে দেন তিনি সরকারি মর্যাদা পেয়ে বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন বলে তাঁর কঠিন শাস্তি হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নীল বিপ্লবে যোগ দেন। তিনি ব্যক্তিগত পুঁজি চাকরি করে ও চাষ করে যা সংগ্রহ করেছিলেন তা অকাতরে চাষীদের বা বিপ্লবীদের বিপদে খরচ করে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। পুত্র-পরিজনেরও তিনি সঠিকভাবে খোঁজ নিতে পারেননি, শুধু সংগ্রাম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এমনকি খাজনা-ট্যাক্স সব বাকী থেকে যাবার কারণে গরীব দরদী বিপ্লবীর জমিজমা সব নিলাম হয়ে যায়–তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে যান। (দ্রষ্টব্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যদ্ধের ইতিহাস ঃ ডঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়)

নীলবিপ্লবের আর এক উজ্জ্বল নাম রহীমুল্লা। মিঃ মোরেল ছিলেন খুব প্রভাবশালী ইংরেজ। নিজের নামানুসারে একটি জায়গার নাম রাখেন মোড়েলগঞ্জ। তাঁর ইচ্ছা ছিল, বিপ্লবী নেতা রহীমুল্লাকে দিয়ে নীল চাষ করাতে পারলে নেতার অবস্থা দেখে সকলেই ভয় পেয়ে যাবে এবং নীল চাষ করতে কেহ আর আপত্তি করতে পারবে না। কিন্তু রহীমুল্লা সাহেবের আদেশ পেয়েও গর্বভরে তা অস্বীকার করলে শুরু হয় সংগ্রাম। ১৮৬১-র ২৬শে নভেম্বর গভীর রাতে ঘেরাও করা হল রহীমুল্লার গ্রাম বারুইখালি। অবরোধকারীদের হাতে বন্দুক ও নানা অস্ত্রশস্ত্র। দলনেতা হয়ে এসেছিলেন মিঃ হিলি। যাইহোক, অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে গ্রামের জোয়ানরা অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রহীমুল্লা বন্দুক নিয়ে সেনাপতির কায়দায় যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোরেলের অনেক লোক নিহত ও আহত হল। সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হল, রহীমুল্লার স্ত্রীও স্বামীর পাশে পাশে থেকে সাহায্য করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা গুলি এসে রহীমুল্লার পায়ে লাগে। এক পায়ে লাফ দিয়ে বন্দুকে ভর দিয়ে তিনি বাড়ী এলেন। স্ত্রী ক্ষিপ্রগতিতে নিজের শাড়ী ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছিলেন। রহীমুল্লা তখনো স্ত্রীকে বলছিলেন, আরো তাড়াতাড়ি কর, আজ মোরলের কাউকে জ্যান্ত রাখব না। স্ত্রী বলছেন, একটু থাম, আমিও তোমার সাথে থাকবো। ওদিকে গুলি চলছে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে। হঠাৎ আর একটা গুলি এসে রহীমুল্লার বুকের মাঝে লেগে বুকটাকে বিদীর্ণ করে ফেলল। বীরাঙ্গনা স্ত্রী স্বামীকে জড়িয়ে ধরে কোলে শুইয়ে নিতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। রহীমুল্লার মৃত্যুতে তাঁর দল শোকাহত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়। মিঃ হিলি বিজয়ী হয়ে মৃতদেহ নিয়ে যান এবং পুরুষ মহিলা অনেকের সাথে রহীমুল্লার স্ত্রীকেও বেঁধে নিয়ে যেতে লজ্জাবোধ করেন নি। (বঙ্কিম জীবনী ঃ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা–১৩৩৮, পৃষ্ঠা ৯০-৯৩)। এর পরে বিচারে ৩৪ জনের যাবতজ্জীবন কারাদন্ড ও বাকী প্রত্যেকের নানা মেয়াদে জেল আর চৌকিদার দৌলতের ফাঁসি হয়। কিন্তু নরঘাতক হিলির কোন শাস্তি হয়নি, কারণ তিনি যে ছিলেন শ্বেতাঙ্গ শোষকদের দলভুক্ত।

মিঃ ফেল্টনকে রাস্তায় খাল করে রেখে আহত করা হয়। সাহেবের পা ভেঙ্গে যায়। মিঃ ফেল্টন একদল পল্টন নিয়ে গ্রাম শায়েস্তা করতে এলে রইস খাঁ, গুলজার খাঁ ও জাহানদার খাঁ এমন প্রতি আক্রমণ চালালেন যে পশু-পেটা হয়ে তাঁদের পালাতে হয়। এমনিভাবে চলনবিল এলাকায় নাড়ী-বুড়ির বিক্ষুব্ধ জনতা নীলকর সাহেবকে পিটিয়ে হত্যা করে। (দ্রষ্টব্য দৈনিক আজাদ, ১৭ই আগষ্ট, ১৮৬৭)

উত্তরবঙ্গে পিয়ারী গ্রামে ৫২ খানা গ্রামের লোক একত্রে ক্ষেপে ওঠে এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আক্রমণ করে। অবশ্য তাঁর বিপদ ঘোড়ার উপর দিয়ে যায় অর্থাৎ ঘোড়াটা আহত হয়। এ দল হতে বন্দুকের ব্যবহারও হয়েছিল বলে জানা যায় (প্রমোদ সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত পুস্তক, ৮৬ পৃষ্ঠা)। মল্লিকপুরের মীরগঞ্জে ইংরেজ বিরুদ্ধ আন্দোলন পাঁচু শেখ শহীদ হন। বগুড়ায় বিপ্লবীরা কৃষ্ণপ্রসাদের নেতৃত্বে মিঃ ফার্গুসনের নীলকুঠি আক্রমণ করে ফার্গুসনকে হত্যা করেন। এ ঘটনার পর বগুড়া জেলায় অত্যাচারের পরিমাণ কমে যায়। (বগুড়ার ইতিহাসঃ প্রভাতচন্দ্র সেন দেবশর্মা, পৃষ্ঠা ২৪৮)

ইংরেজরা এবার ভীত হয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করেন। তাতে ছিলেন মোট পাঁচজন সদস্য, চারজন ইংরেজ ও একজন বাঙ্গালী–চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জি। এ চ্যাটার্জি মশায় ছিলেন পোশাক পরিচ্ছেদ একেবারে সাহেব। সেটাই বড় কথা নয়, বড় কথা হল, তিনি ছিলেন বাঙালী বিদ্বেষী। তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যে 'ব্লাক বিল' পাশ হয় তা একজন মাত্র বাঙালীই সমর্থন করেন–তিনিই হচ্ছেন চন্দ্রমোহন চ্যাট্যার্জি। আর তাই এ কমিশন গঠন করা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা খুশী হননি (নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ : সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১২৯)

নীল বিদ্রোহের সঠিক মুহূর্তে যে হিন্দু নেতারা ইংরেজ বিরোধী সত্য তথ্য বেশি করে তুলে ধরেছিলেন তাঁদের অন্যতম দুজন হচ্ছেন হরিশচন্দ্র ও শিশিরকুমার। হরিশচন্দ্র নীলকরদের অনাচারের বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে বা বিপ্লবীদের পক্ষে কাজ করতে করতে শেষে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তাই তাঁর ইতিহাস সকলের কাছে শ্রদ্ধার সামগ্রী। ৩৭ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঠিক এমনি আর এক নাম দীনবন্ধু মিত্র। যদিও তিনি সরকারি কর্মচারি ছিলেন, যদিও 'রায়বাহাদুর' খেতাব নিয়েছিলেন তবুও নীলকরদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন চিরদিন। যদি এটুকু তিনি না করতেন তাহলে তাঁর পোস্টমাস্টার জেনারেল এবং পরে ডাইরেক্টর জেনারেল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিলনা। অবশ্য এ উক্তি করে গেছেন হুশিয়ার হিসেবী 'সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র।

বীরভূম জেলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন দুজন বিখ্যাত বিপ্লবী কৃষক নেতা। যাঁরা ছিলেন পূর্বোল্লিখিত বিপ্লবী মাওলানা আলাউদ্দিনের দীক্ষায় দীক্ষিত। তাঁদের একজন হলেন বিপ্লবী শেখ রাজন, অপরজন হচ্ছেন বিপ্লবী করিম খাঁ। অবশ্য পরে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয় এবং ইংরেজের 'ন্যায়বিচারে' দেশদরদী দুই নেতার নিষ্ঠুর ভাবে ফাঁসি হয়। এ সমস্ত বিপ্লবীদের বিশেষতঃ বীরভূম জেলার এ বীরদের নাম ইতিহাস যেন ভুলে যেতে চায়। এমনিভাবে মেদিনীপুরের বিপ্লবী নেতা মীরজঙ্গু ও শেখ জমিরুদ্দিনেরও কারাগারের অভ্যন্তরে তিলে তিলে ধ্বংস নেমে আসে। এ নীলকর সাহেবের যাঁরা সমর্থন করেছেন অথবা প্রতিবাদ করেননি তাঁরা অনেকের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হলেও বহু মানুষের কাছে তাঁরা দেশের শত্রু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বরীন্দ্রনাথের বিষয় বাস্তবিকই বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৬১-তে। আর তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৪১ সনে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি তাঁর ভূমিকাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে শুরুতেই বলে রাখা ভাল যে, 'পরিবেশ' এমন একটা জিনিস যার কিছু না কিছু প্রভাব মানুষকে প্রভাবিত করেই। রবীন্দ্রনাথের যুগে বুদ্ধিজীবী-কলম বেশিরভাগ যেদিকে চলছিল, যদি তিনি তার উল্টো পথে চলতেন তাহলে যেভাবে আজ তিনি সমাদৃত হয়েছেন হয়ত তা নাও হতে পারতেন। আর তাই তিনিও লিখেছিলেন ঃ

"ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী
তস্করের মত আসে আক্রমিতে দেশ।"

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্র জীবনী, ১৩৫৩, পৃষ্ঠা ৩৭)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে পূর্বে তার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই আনন্দমঠে রচিত 'বন্দেমাতরম' গানটির কবি সুর দেন এবং নিজে গেয়ে বঙ্কিমকে শোনান। (রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬)

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানুষ। যখন তিনি বুঝলেন যে, মিলিত হিন্দু-মুসলমান সকলে এ গানকে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারে না, তখন কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি স্বয়ং আপত্তি করেছিলেন যাতে ওটা 'জাতীয় সঙ্গীত' না হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই অধিবেশন কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এ সভার সভাপতি ছিলেন রহমতুল্লা। "...সমগ্র 'বন্দেমাতরম' গানটি কংগ্রেসের 'জাতীয় সঙ্গীত' রূপে সর্বজাতির গ্রহণীয় নয় বলে মত প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ উগ্রপন্থীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও 'বন্দেমাতরম' প্রথম স্তবক কংগ্রেসে জাতীয় সঙ্গীত রূপে গৃহীত হয়। (১৯৩৭)।" (অধ্যাপক (ঢাকা বিশ্বঃ) ডক্টর মনিরুজ্জামানঃ আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, পৃষ্ঠা ২৬৯–প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনকথা, পৃষ্ঠা ২৬০-৬১)

শিবাজী সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বে হয়েছে এবং অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিবাজীকে সীমাহীন মহত্ব দান করার পিছনে ছিল সাম্প্রদায়িক(?) নেতা তিলকের হাত। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি শিবাজী উৎসব পালন করেন। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের শিবাজী-ভক্ত নেতা। তারপর তিনি করেছিলেন 'গণপতি পূজা'। আর ১৮৯৩ এ পুণায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'গোরক্ষিণী সভা'। এ প্রসঙ্গে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র জীবনকথা'র ৬৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি খুব মূল্যবান-"গোরক্ষিণী সভা স্থাপিত হয়, সেটাই হল হিন্দু ধার্মিকতার প্রতীক। অচিরকালের মধ্যে মুসলমানের পক্ষে ধর্মের জন্য গোবধ অতি আবশ্যক, ও হিন্দুর পক্ষে গোবধ নিবারণ ধর্ম রক্ষার জন্যই অনিবার্য হয়ে উঠল। রক্তারক্তি শুরু হল। গরু মারতে ও গরু বাঁচাতে গিয়ে বিস্তর মানুষ মারতে লাগল।"

ভারতবাসীর এ ভয়াবহ রক্তারক্তির মূলে তিলকের নেতৃত্ব থাকার জন্য অনেক শান্তিপ্রিয় হিন্দু-মুসলমান দুঃখিত হলেন। ইংরেজ সরকার তা নিয়ন্ত্রণ করতে ১৮৯৭ সনে তিলককে বন্দী করলেন। মামলা চলতে থাকলো। ঠিক তখন রবীন্দ্রনাথ মোকদ্দমা চালাবার খরচ এবং তাঁকে কারাগারে থেকে মুক্ত করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বা ভিক্ষা করতে নেমে পড়লেন। অবশ্য এটা তাঁর দয়ালু মনের পরিচয়; তবুও এটাকে পরিবেশের প্রভাব না বলে

পারা যায় না। শুধু ওতেই শেষ নয়–কবি তাঁর কবিতায় শিবাজী ও মারাঠাদের যথেষ্ট গুণকীর্তন করে গেছেন; যা আজও দলিল হয়ে আছে। কবির এ লেখনীতে শিবাজী-ভক্ত সৃষ্টি করে লাভ হল এ যে, গো-খাদক মুসলমানদের অনেকেই বিদ্বেষী হয়ে পড়ল। কারো মনে তখন এ প্রশ্নটাএসেছিল বলে কোন প্রমাণ নেই যে, মুসলমান গোমাংস খেলে যদি শত্রু হয়, যদি তাদের হত্যা করতে শাসক খৃষ্টানদের কথা আগে ভাবা উচিত নয় কি? তারা কি মুসলমানদের থেকে অনেক বেশী গোমাংসাশী নয়? কিন্তু কবিও লিখে ফেললেন ঃ

> "এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
> করিব সম্বল।"

শেষে আরও লিখলেন ঃ

> "মারাঠা সাথে আজি হে বাঙ্গালী এক কণ্ঠে বল
> 'জয়তু শিবাজী'।"

কলকাতায় মুসলমান শ্রমিক গাড়োয়ান ও গরীব দল যখন ইংরেজকে মার! মার! করে ইট পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলো তখন ইংরেজের 'দেশীয় দালালরা তা সমর্থন করেন নি; বরং তার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে ইচ্ছামত লিখে গেছেন এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন এমন নজিরও আছে। এ প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের 'রাজা প্রজা' প্রবন্ধের কিছু অংশ তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন–

"কিছুদিন হইল একদল ইতর শ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্র খন্ড হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরেজদের প্রতি। তাহাদের যথেষ্ট শাস্তিও হইয়াছিল। ...কেহ বলিল মুসলমানদের বস্তিগুলো একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া যাক...।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৮-২৯)

মহান রবীন্দ্রনাথের দুর্ণাম করার উদ্দেশ্য আমাদের নয়, বক্তব্য হচ্ছে–পরিবেশ মহান মানুষকেও প্রভাবিত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলে আমরা জেনে ও মেনে তৃপ্তি বোধ করি, তাঁর প্রতিভাকে আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি–কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসের অঙ্গহানি করে সত্য চাপা করে দেয়ার পক্ষপাতী আমরা হতে চাই না।

শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত 'পথের দাবী' যখন বাজেয়াপ্ত হয় তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা চেয়ে একটি পত্র দিয়েছিলেন। চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তাকে স্বাগত জানান সকলের পক্ষে সম্ভব নয় ঃ

"কল্যাণীয়েষু, তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। ...আমি নানা দেশে ঘুরে এলাম-আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম–একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ছাড়া স্বদেশী প্রচার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্ণমেন্ট এতটা ধৈর্যের সাথে সহ্য করে না। ইতি ২৭শে মার্চ, ১৩৩৩–তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

এ পত্রে আমরা ইংরেজ সরকারের প্রতি কবি রবীন্দ্রনাথের আনুগত্য অস্বীকার করি বা না করি তা বাদ দিয়ে শরৎচন্দ্র এ চিঠির জন্য নিজে কি লিখেছিলেন তার একটু অংশ তুলে দিচ্ছি–

"সে কি উত্তেজনা! কি বিক্ষোভ! রবীন্দ্রনাথ নাকি 'পথের দাবী' পড়ে ইংরেজের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন। এ বইয়েতে নাকি ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আছে ব'ল মত প্রকাশ করেছেন। আমার 'পথের দাবী' পড়ে আমার দেশের কবির কাছে যদি এ দিকটাই বড় হয়ে থাকে, তাহলে স্বাধীনতার জন্যে আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে তো ইংরেজদের কাঁধে করে নেচে বেড়ান উচিত। হায় কবি, তুমি যদি জানতে তুমি আমাদের কত বড়

আশা–কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয় এমন কথা বলতে পারতে না। কবির কাছে আমার 'পথের দাবীর' যে এত বড় লাঞ্ছনা হবে, এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কি মন নিয়েই যে আমি এ বইখানা লিখেছিলুম, তা আমি কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। " (নিষিদ্ধ বাংলাঃ শ্রীশিশির কর, পৃষ্ঠা ২৪,৩২; দরদী শরৎচন্দ্রঃ মণীন্দ্রচক্রবর্তী; শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল দ্রষ্টব্য)

কবিকে সম্মান করার অর্থ এ নয় যে, তাঁর জীবনের ইতিহাসকে চেপে দিতে হবে, সত্যের অপলাপ করতে হবে। আমরা যদি সত্যকে চেপেই যাই তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য লেখকরা তাঁদের সত্যের কলমকে কি থামিয়ে রাখবেন?

'জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে–ভারত ভাগ্য বিধাতা...' বিশাল ভারতের স্বাধীনতা সঙ্গীত। কিন্তু এটা রচিত হয়েছিল স্বাধীনতার পূর্বে (১৯১২)। তাছাড়া ইংরেজের ভারত ছাড়ার পূর্বেই কবির মৃত্যু হয়। আসলে অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি পঞ্চম জর্জ যখন দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট তখন কবির লেখা এ কবিতায় পঞ্চম জর্জকে 'ভারতের ভাগ্য-বিধাতা' বলে উল্লেখ করে সেটা উপহার দেয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এ কবিতায় পঞ্চম জর্জকেই স্বাগত জানান হয়েছিল এবং তাঁরই স্তুতি করা হয়েছিল বলে ভারতীয় সাধারণ এবং রাজনৈতিক মহলে তখন খুব ঝড় উঠেছিল। ইংরেজদের চলে যাবার পরেও এ নিয়ে কম তোলপাড় হয়নি। ষাটের দশকে আসামে ও এ দশকে কেরলে বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক ও পন্ডিতরা কবিতার উদ্দেশ্যে ও সারবস্তু নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছেন (দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকা, ৩০.৪.১৯৯২)। পশ্চিমবঙ্গেও সম্প্রতি প্রতিবাদ উঠেছে বলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেছে। আমরা নানা বাধা বা দ্বিধায় এসব যদি নাই-ই প্রকাশ করি তাহলে আর কি কেহ এসব তথ্য প্রকাশ করবেন না? চট্টগ্রাম থেকে ১৯৭৫-তে একটা গুরুত্বপূর্ণ বই বের হয়েছে যেটার নাম–'ভুলে যাওয়া ইতিহাস'। সে পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় এ মূল্যবান তথ্য মুদ্রিত হয়েছে।

এ সমস্ত তথ্যে তাঁর ইংরেজ-প্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায় বলে যাঁরা দাবি করেন, তাঁদের দাবি যেমন সহজে উড়িয়ে দেয়া যায় না তেমনি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ বিরোধী ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিঃ ডায়ারের নেতৃত্বে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজদের গুলিতে যে নৃশংস হত্যাকান্ড হয়েছিল তাতে কবি ব্যথিত হয়েছিলেন। আর তারই প্রমাণ দিতে তিনি ইংরেজ প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করা হল তাতে যাই-ই প্রমাণিত হোক না কেন, তিনি অবশ্য পরে সাম্প্রদায়িক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরে মুসলমান জাতির বৈশিষ্ট্য ও অধিকার উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে সঙ্গে ইংরেজের প্রকৃত চরিত্রও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। উল্লেখিত তথ্যে যেমন সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব দেখা যায় তেমনি আবার তাঁর ভাষাতেই তিনি লিখেছেনঃ"হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশে একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোন মতেই নিস্তার নাই।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেনঃ"তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি কি করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোন বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয়, তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোনদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে পানি খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদের জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে।" (এ মূল্যবান তথ্য চাপা পড়ে আছে 'রবীন্দ্র রচনাবলী', ১০ম খন্ড, ৬২৮-২৯ পৃষ্ঠায়)

রবীন্দ্রনাথ আরও বুঝতে পারলেন এবং স্বীকার করে তাঁর নিজের ভাষায় বললেন–"...যে একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং হইলে কখনই স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে না তখনই আমরা উভয়ই ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম পৃষ্ঠা ৫০২)

১৯২০-২১ সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে মাওলানা মহাম্মদ আলী ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের পূনর্মিলনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বুঝেছিলেন যে এ মিলন স্থায়ী হবে না। কারণ রাজনৈতিক ও সামাজিক ষড়যন্ত্রে মুসলমানদেরকে উন্নতির ধাপ হতে চরম অবনতিতে নামান হয়েছে। তাই কবি 'সমস্যা' নামে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধে লিখলেন। তাতে তিনি জানালেন–হিন্দু-মুসলমানের 'মিলন' অপেক্ষা সমকক্ষতা' প্রয়োজন আগে। (তথ্যঃরবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৩-৫৮,৩৬২)

কবি মুসলমানদের শক্তি এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা অনুভব করে লিখেছেনঃ "বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশী–সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে..."–এ তথ্যাংশ 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র দশম খন্ডের ৫২৩ পৃষ্ঠায় আছে।

ইংরেজকে যে তিনি মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন তা প্রমাণিত হয়েছে। এ মুগ্ধ করার পিছনে কবিকে যেসব 'কাজ' করতে হয়েছে তাতে ভারতের একটা দল তাঁর সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। তবে এও সত্য যে, কবি নিজেকে নিজেই সংশোধন করে নিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজের বিচার মানে অবিচার; আর হিন্দু-মুসলমানের মিলিত নেতৃত্ব ছাড়া সমস্যার সমাধান হবে না। এ প্রসঙ্গে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামক নিজের লেখা যে প্রবন্ধহিব কলকাতার টাউন হলে পড়েছিলেন তার একটু অংশ উদ্ধৃত করলাম–"দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমারা এই সভার অধিনায়ক করিব–তাঁদের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব–তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া দেশকে সম্মানিত করিব।" (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৭১, পৃষ্ঠা ৬১২)

ভারতে অনেক জাতি ও উপজাতি আছে। এখন যদি রবীন্দ্রনাথের সত্য-ভক্তদের প্রশ্ন করা যায়–বিশ্ববিখ্যাত রবিবাবু কি ভারতের নানাজাতি, নানামত, নানা পরিধানের কথা জানতেন না? তবুও কেন তিনি 'হিন্দু-মুসলমান' নিয়ে এত লেখালেখি করলেন? আর কোন জাতিকে নিয়ে কেন লিখলেন না? তিনি কি মুসলিম জাতির মর্যাদা, অধিকার ও প্রকৃত মূল্যায়নকে তাঁর লেখনী প্রতিভায় ফুটিয়ে তোলেন নি? এখানেও প্রমাণস্বরূপ তাঁর ভাষাতেই বলা যায়–"এদিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কত শত স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে। এই দুর্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোন মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভব হইবে না...আমরা গোড়া হইতে ইংরেজদের স্কুলে বেশি মনোযোগের সাথে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গভর্ণমেন্টের চাকরী ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। ...এইটুকু ('পার্থক্য') কোন মতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না।"

রবীন্দ্রনাথ আরও জানালেন ঃ "আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ দিই নাই, অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ...আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোক জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃত্বভাব অত্যন্ত জাগরুক–আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহার কোন প্রমাণ নাই।"

রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের গুরুত্ব এত বেশি অনুভব করেছিলেন, যে তা তিনি তাঁর লেখায় সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ "স্বদেশীযুগে আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম। সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রু গদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারী রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না....। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সাথে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সাথে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।"

ডাঃ কালিদাস নাগ বিলেত থেকে পত্র-মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলেন—'হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কি?' সেটা ছিল ১৯২২ সাল। পত্রোত্তরে কবি লিখেছিলেন ঃ "খিলাফত উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষে সাথে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেখানেই পদে পদে হিন্দু নিজেদের বেড়া তুলে রেখেছে। ...অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি ব'লে গণ্য করার মত মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছুই নেই।" চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব; যদি না আসি তবে 'নানাঃ পন্থা বিদ্যুতে আয়না'।" (শ্রীসত্যেন সেন ঃ পনেরই আগস্ট, পৃষ্ঠা ১১০-১১৪)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেরার দেবনান্দপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮-এর ১৬ই জানুয়ারি তিনি পরোলোকগমন করেন। তাঁর গেঁয়ো নাম বা ডাক নাম ছিল 'নেড়া'। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল ছেড়ে তিনি তাঁর মামার বাড়ি ভাগলপুর যান এবং সেখান হতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাশ করেন। ১৮৯৫-এ তিনি জুবিলী কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মায়ের মৃত্যুতে পড়াশোনায় ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। ১৮৯৬ থেকে খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা, অভিনয় ইত্যাদি করে সুনাম অর্জন করে আদমপুর ক্লাবের সম্মান ও শ্রীবৃদ্ধি করেন। ১৯০১ হতে হাতে লেখা পত্রিকা 'ছায়া'-তে তাঁর কিছু লেখা বের হতে থাকে। গান বাজনায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন বলে জমিদার মহাদেব সাহুর অধীনে অনেক দিন ছিলেন। সে সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় তাঁর এক মামা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায় আসেন। ১৯০৩-এ রেঙ্গুনে তাঁর মেসোমশাই উকিল অঘোরনাথ বাবুর কাছে চলে যান। ১৯০৫ সনে তাঁর মেসোর মৃত্যু হলে তিনি কেরাণীর চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯০৭ সনে তাঁর 'বড়দিদি' উপন্যাস মাসিক পত্রিকা 'যমুনা'-তে প্রকাশিত হয়, ১৯১৩-তে তা পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর 'বিরাজ বৌ' প্রথম পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়; পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাস্থ্যহানির জন্য তিনি এক বছরের ছুটি নিয়ে বাজেশিবপুরে আসেন। ১৯১৯-এ 'বসুমতী'-তে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২১-এ তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২২ সনে তাঁর 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের ইংরাজি অনুবাদ করেন থিও ডোসিয়া টমসন। ১৯২৩ সনে তিনি 'জগত্তারিণী পদক লাভ করেন। ১৯২৫-এ ঢাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর সাহিত্য-শাখার তিনি সভাপতিত্ব করেন। শরৎচন্দ্র অনেকগুলো উপন্যাস রচনা করেন—যেমন বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, দেবদাস, রামের সুমতি, পথ নির্দেশ, বিন্দুর ছেলে, নারীর মূল্য শ্রীকান্ত ৪র্থ খণ্ড, চরিত্রহীন, মহেশ, পরিণীতা, বৈকুণ্ঠের উইল, বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশাই, অরক্ষণীয়া, গৃহদাহ, দত্তা, পল্লীসমাজ, নিষ্কৃতি, বামুনের মেয়ে, স্বামী, দেনা-পাওনা, নব বিধান বিপ্রদাস, শেষের পরিচয়, শুভদা, ষোড়শী শেষ প্রশ্ন পথের দাবী ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের প্রকাশ্য রাজনীতি করতেও কোন দ্বিধা ছিলনা। তিনি সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাস ও গান্ধীজির সাথে একত্রে কাজ করেছেন।

যে সব বীর বিপ্লবী লেখকদের লেখা ইংরেজের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র এক বিশিষ্ট গ্রহরত্ন। তাঁর 'পথের দাবী' ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। সুতরাং শুধু 'কথাশিল্পী' উপাধি দিলেই তাঁকে প্রকৃত সম্মান দেয়া হয় বলে মনে হয় না, তাঁকে 'স্বাধীনতা শিল্পী' বলে চিহ্নিত করা অনেক আগেই প্রয়োজন ছিল। আমরা যাঁদের স্বাধীনতার অগ্রদূত বলে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছি, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁদের এমন কোন রচনা পাওয়া যায় না যা সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল।

শরৎচন্দ্র এ বিখ্যাত 'পথের দাবী' ১৯২৭ সনের ১৫ই জানুয়ারি বাজেয়াপ্ত হয়। বইটি সম্বন্ধে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল–"The most powerful of sedition in almost every page of the book".

'পথের দাবী' বাংলা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ায় শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হন, কারণ এ বইখানির প্রতি তাঁর বিশেষ মমতা ছিল। হঠাৎ তাঁর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যদি 'পথের দাবী'-র উপর সরকারের এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে একটু প্রতিবাদ জানান তাহলে হয়তো বইখানি রাহু মুক্ত হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে একদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একখানি বই উপহার দেন (নিষিদ্ধ বাংলা ঃ শিশির কর, পৃষ্ঠা ২৩-২৪)। রবীন্দ্রনাথ বইটা পড়ে শরৎচন্দ্রকে কি লিখেছিলেন বা কি রকম ভূমিকা নিয়েছিলেন তা এ পুস্তকে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হওয়ার যে কত বেদনা পেয়েছিলেন তা তাঁর ভাষা থেকেই জানা যায়। অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশানের প্রথম অধিবেশন যখন অনুষ্ঠিতব্য তখন তিনি অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী বিশেষ ব্যক্তিদের বলেছিলেন–"আচ্ছা তোমাদের এটা তো সারা বাংলার লাইব্রেরীর ব্যাপার। তোমরা একটা কাজ কর না, আর তোমাদেরই তো এটা কাজ। এই যে সরকার আমার 'পথের দাবী'-কে আটকে রেখেছে, এটা ছাড়াবার একটা প্রস্তাব সভা থেকে মঞ্জুর করাতে না? প্রকাশ্য সভা থেকে আর একটা প্রতিবাদ হলে অনেক কাজ হবে–সরকারের একটু টনক নড়বে। আমার আর পাঁচখানা বই যদি সরকার বাজেয়াপ্ত করত, তাহলে আমার এত দুঃখ হত না।" (নিষিদ্ধ বাংলা, পৃঃ ৩৩)

বিপ্লবী শরৎচন্দ্র মৃত্যু যন্ত্রণার সময়ও তাঁর এ বইয়ের কথা ভুলতে পারেন নি। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি এ বইকে 'রাহুমুক্ত' দেখে যেতে পারেন নি। শ্রীশিশির কর লিখেছেন, "সুখের বিষয়, এ সভার দুই মাসের মধ্যে বাংলা সরকার কর্তৃক 'পথের দাবী'-র উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় ফজলুল হকের মন্ত্রীত্বকালে। এবং অচিরেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়" (পৃষ্ঠা ৩৪)। ১৯৩৯-এর ১৩ই মে 'পথের দাবী' নাটকরূপে অভিনীত হয়। অবশ্য অবশেষে ১৯৪০ সনে এ নাট্যাভিনয়ের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

আমাদের মতে শরৎচন্দ্র 'কথাশিল্পী' বলে, শুধু সাহিত্যিক বলে, আর নজরুলকে শুধু 'বিদ্রোহীকবি' বলে শেষ করা একটা ভাঁওতাবাজী ছাড়া কিছু নয়। একথা মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে, শরৎচন্দ্র হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি কেন? আসল কারণ যাই-ই হোক শরৎচন্দ্রের লেখায় একটা জিনিসের বড়ই অভাব। সেটাই কি তাঁর অযোগ্যতা? সেটা হচ্ছে–তিনি তাঁর বই-পুস্তকের কোন স্থানে ইসলাম ধর্ম, মুসলমান জাতি ও মুসলিম মানসকে আঘাত দেননি বা অপমান করেন নি। শরৎচন্দ্র নিজেই গর্ববোধ ও আনন্দবোধ করতেন যে, তিনি মুসলমান বিদ্বেষী নন। তাই তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "দেশবন্ধু [চিত্তরঞ্জন] বলিলেন, আপনার মুসলমান-প্রীতি প্রসিদ্ধ। ভাবিলাম, মানুষের কোন সাধু ইচ্ছাই গোপন থাকিবার যো নাই, খ্যাতি এতবড় কানে আসিয়াও পৌঁছিয়াছে।" (বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি ঃ এন. জে. চৌধুরী. পৃষ্ঠা. ১০৯. টীকা ২)

তিনি একটা জেলার কংগ্রেসের একটানা নেতৃত্বের চেয়ার গ্রহণ করেছিলেন বটে কিন্তু এ রাজনীতি তাঁকে দোদুল্যমান অবস্থায় দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল। তাই তিনি চন্দন নগরের আলাপ-সভায় বলেছিলেন ঃ "এই যে দেশটা ত্যাগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আমার মনে হয় ঠিক এরই মধ্যে কোথায় একটা গলদ ঢুকে আছে-সেটা খুঁজেও পাচ্ছি না।...কোন উপায় চোখের উপর দেখতেও পাইনা...কোনখানটায় গলদ আছে-যার জন্য এত বড় শাস্তি ভোগ করছি। আমিও মনে করেছি Politics-এ আর থাকব না।" (দ্রঃ ঐ, পৃষ্ঠা, টীকা ১ঃ)

চিত্তরঞ্জন দাসের অনুরোধেই তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ নিয়েছিলেন। তিনি চিত্তরঞ্জনকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। যেটা তাঁর বুঝে আসত না তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করতেন। সন্ত্রাসবাদীদের ডাকাতি করা ও রক্তারক্তির ঘটনা তাঁকে বিচলিত করতো, কিন্তু চিত্তরঞ্জন যেহেতু কংগ্রেসে আছেন সেহেতু স্বাধীন মত প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধা করতেন। একদিন তিনি চিত্তরঞ্জন দাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-শরৎচন্দ্রের ভাষায় ঃ "আমি জিজ্ঞেস করিলাম আচ্ছা, এ রিভোলিউশনারদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?...তিনি-আস্তে আস্তে বলিলেন, এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এ এ্যাক্‌টিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ পঁচিশ বছর পিছিয়ে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সাথে ঘৃণা করি, শরৎবাবু!" (দ্রষ্টব্য বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা ৭৬)

শরৎচন্দ্র কংগ্রেস করলেও তিনি গান্ধীজীর সকল পন্থায় একমত ছিলেন না। গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র তাঁর জন্য লিখেছেন-"তাঁর আসল ভয় সোশিয়ালিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।" (বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, চতুর্থ সম্ভার, পৃষ্ঠা ৩৯৮)

গান্ধীজীর সাথে তাঁর মতবিরোধের অর্থ হচ্ছে গান্ধী ছিলেন অহিংসবাদী, তাঁর এ মতবাদে শরৎচন্দ্র পূর্ণভাবে বিশ্বাসী ছিলেন না। অপরদিকে হিংসাবাদীদের সাথে তাঁর সমর্থন থাকলেও তিনি ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন-যেহেতু তাঁর পিছনে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। কিন্তু দেশবন্ধুর ১৯২৫ সনে অকাল মৃত্যুতে তাঁর ভারসাম্য আর বজায় রাখা সম্ভব হয়নি বা রাজনীতির মঞ্চে তাঁর ভাবান্তর শুরু হয়।

কমিউনিস্ট নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ও স্বীকার করেছেন যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ থেকে তিনি নিজেকে তো বাঁচিয়ে ছিলেনই উপরন্তু তাঁর কল্যাণ কামনা ছিল বিশ্ব-মানুষের জন্য; সেখানে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি ও খৃষ্টান কেহ অবহেলিত নয়। ঠিক এভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কিল থেকে নিজস্ব শক্তিতেই উঠতে পেরেছিলেন এবং উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, বহু সম্প্রদায় ও জাতি থাকলেও হিন্দু-মুসলমানের একত্র মিলন ও শক্তি ছাড়া সর্বভারতীয় উন্নতি ও শান্তি সম্ভব নয়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, শরৎচন্দ্রের সারা জীবনের অসাম্প্রদায়িক নীতি-ব্যূহে কার আঘাতে যে ফাটল ধরল এবং তা বিদীর্ণ হয়ে গে তা বলা মুশকিল। সারা জীবন যে কলমে অমৃতবর্ষণ করলেন সেই কলমের অমৃতধারা শুকিয়া কিভাবে তা বিষধারায় পরিণত হোল তা চিন্তার বিষয়। উদাহরণস্বরূপ শরৎচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করা যায়-"মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটাকয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কিনা। ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না।" (বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা, অষ্টম সম্ভার, পৃষ্ঠা ৩৭২)

পরে দেখা গেল তিনি গান্ধীজীর বিরুদ্ধেও তরুণ দলকে আহ্বান করতে ছাড়েন নি। যেমন তিনি বলেছেন, "...কিন্তু অন্ধের মত নয়, মহাত্মাজী হুকুম করলেও নয়, কংগ্রেস সমস্বরে তার প্রতিধ্বনি করে বেড়ালেও নয়আরতের বিশ লাখ টাকার খাদি দিয়ে আশি ক্রোর টাকার অভাব পূর্ণ করা যায় না, গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না।" (তরুণের বিদ্রোহ, শরৎ সাহিত্য সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৭)

গান্ধীজীর প্রতি শরৎচন্দ্রের ভক্তির পাল্লা একদিকে যেমন হাল্কা হতে থাকলো তেমনি চরমপন্থীদের দিকে ভক্তির পাল্লা ক্রমশ ভারী হতে থাকলো–তাঁর বক্তব্যের প্রতি চিন্তা করলে এটা খুব সহজেই প্রমাণিত হবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের রচনাবলী'-তে সংকলিত হয়েছে–যেটা শরৎচন্দ্র তাঁর নিবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন–"বস্তুত মুসলমান যদি কখনও বলে–হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের 'পরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই। দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয় এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে...হিন্দু নারী হরণ ব্যাপারে সংবাদ পত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এত বড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য মুখ বুঝিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কী? কিন্তু আমার ত মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয় বশতঃই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করিব কি, সময় এবং সুযোগ পেলেও কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।" (শরৎচন্দ্রের রচনাবলী, পৃষ্ঠা ১৯৬-৯৭)

ডক্টর রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন–"তিনি (শরৎচন্দ্র) এই প্রবন্ধে হিন্দুদের সংঘ ও ঐক্যবদ্ধভাবে বীর্য এবং শক্তি সঞ্চয়ের আহ্বান জানালেন। এক কথায়, হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীগুলি এতদিন যা প্রাণপণ চিৎকার করে হিন্দুদের বোঝাবার চেষ্টা করে আসছিলো শরৎচন্দ্র প্রায় একই সুরে সেই আবেদন জানালেন।" [শরৎ সম্পুট, পৃঃ ২৭১]

শরৎচন্দ্র আরও লিখলেন, "হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে–এ দেশে তাহার চিত্ত নাই।" [দ্রঃ শরৎচন্দ্রের রচনাবলী; শরৎ সম্পুট, পৃষ্ঠা ২৭১]

সারা জীবন ধরে এতগুলো গ্রন্থ-পুস্তক উপন্যাস লেখবার সময় সম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত অগ্নি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতির কাছে যেমন জনপ্রিয় ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী জনপ্রিয় ও মনপ্রিয় ছিলেন মুসলিম জাতির কাছে। তবে এ কথা সত্যি যে, মুসলমান সমাজ শরৎচন্দ্রকে উন্নতির চরম চূড়ায় যখন টেনে তুলছিল তখন হিন্দু সমাজের অনেক বুদ্ধিজীবী তাঁকে টেনে নীচে নামাবার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখা থেকেই তা প্রমাণ করা যায় ঃ

"যাদবপুর (বিশ্ববিদ্যালয়) তো শরৎচন্দ্রকে 'তুলনামূলক সাহিত্যে'র তুলনায় বাতিল করে দিয়েছেই,–অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল কলকাতা বিশ্বদ্যিালয়ও শরৎচন্দ্রকে নিয়ে তেমন কিছু ঘটাপটা করতে নারাজ। জগত্তারিণী পদকের মর্যাদা সে তাঁকে দেয়নি। ঐ পদকটি অনেক রাম-শ্যামও পেয়েছেন। অথএব শরৎচন্দ্রও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে লেখক হিসাবে একজন রাম বা শ্যাম। বাংলা অনার্সে শরৎচন্দ্র পাঠ্য নন; স্পেশাল বাংলা পর্যন্ত শরৎচন্দ্র

Goto List

উঠতে পারেন, তার বেশী নয়। স্পেশাল পেপারে সমগ্র author হিসাবে আছেন মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কদাপি নন। পাশ কোর্সে চিরকাল বঙ্কিমচন্দ্র কখনও শরৎচন্দ্র নন। এম. এ.-তে শরৎচন্দ্র কোন একটা পত্রের অর্ধেকও পাঠ্য হতে পারেন না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্রের নামে এ বছরে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হল, কিন্তু এত দীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীরব উপেক্ষায় যথেষ্ট শরৎ নিগ্রহ হয়নি কি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় [সর্বপ্রথমে] শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট. দিয়ে সম্মানিত করেছিল। এপার বাংলার বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতগণের কাছে শরৎচন্দ্রের মত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীহীনের এই সম্মানটা আদৌ মনঃপূত হয়নি। শরৎচন্দ্র ডি. লিট. পাওয়ায় তাঁকে নিয়ে কাগজপত্রে গালিগালাজের বন্যা বয়ে গেল' (অবিনাশচন্দ্র ঘোষালঃ শরৎচন্দ্রের টুকরো কতা, পৃ. ৭২; শরৎ সম্পূট, পৃষ্ঠা ৪৩৮)।

মুসলিম-বহুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উপাচার্য আব্দুর রহমান সাহেবের হাত দিয়ে শরৎচন্দ্রকে যখন ডি. লিট. উপাধি দেওয়া হল তখন হিন্দু-পরিচালিত পত্রিকা ও বিরুদ্ধবাদী হিন্দু পণ্ডিতদের লেখার কিছু নমুনা ডক্টর রবীন্দ্র গুপ্তও উল্লেখ করেছেন ঃ "হায় শরৎচন্দ্র, তোমার প্রাণের দায়ে কাঙ্গালপনা দেখিয়া সত্যই তোমাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা হয়" [একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়]। "বহু বাঞ্ছিত ডি. লিট. যখন নভেল লিখেই পাওয়া গেল এবং তা যখন রহমান সাহেবের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) হাত দিয়েই এল তখন এই ব্রাহ্মণ বটু আতিশয্যে বলে ফেললেন, তিনি (শরৎচন্দ্র) অতঃপর মুসলমান ভাইদের নিয়ে নভেল চালাবেন।" (শরৎ সুম্পূটঃ বরীন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ৪৩৮)

তাহলে প্রমাণিত হোল যে, মুসলমান জাতির বুকভরা ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার পুষ্পার্ঘ পেয়েছিলেন দরদী ও বিপ্লবী শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রও তাঁর কাজকর্ম এবং লেখনী নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক মহান লেখকের মত লিখে গেলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মত ইংরেজ বিরোধী ভূমিকাও নিলেন। এই বাজেয়াপ্ত হওয়ার বেদনাও সহ্য করলেন। কিন্তু অবশেষে সেই সাম্প্রাদায়িকতার পরিবেশ তাঁকেও রেহাই দিল না। প্রথমে তিনি বিষকৃষ্ণ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হলেন। পরক্ষণেই সাম্প্রদায়িকতার লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তাঁর অসাম্প্রদায়িকতার সাধ ও স্বপ্ন। তাঁর কীর্তি-পোড়া ছাই ছড়িয়ে দিয়ে আজ সাম্প্রদায়িক দলগুলো মানুসকে বোঝাতে চাইছে-আমাদের দলে বহু বড় মানুষ আছেন, বহু ঋষি, বহু 'সম্রাট'-এর সাথে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও আছেন; এস, তোমরা আমাদের সঠিক (!) পথের যাত্রী হও।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৮৯৯ সনের ২৪শে মে জন্মগ্রহণ করেন এ বিখ্যাত কবি। পরলোকগমন করেন ১৯৭৬ সনের ২৯শে আগস্ট। খুব গরীব ছিলেন তিনি। 'অন্নের জ্বালায় তাঁকে বাল্য বয়সে রুটির দোকানে খেটে খেতে হয়েছে।' পরে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি সৈন্য বিভাগে যোগ দেন। আরো পরে তিনি হাবিলদারের পদ পান। ১৯২১ সনে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে আসেন। শুরু হয় তাঁর সাহিত্য সাধনা।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পড়াশুনায় অকৃতাকার্য হয়ে অনেকে পড়া ছেড়ে দেয়। কিন্তু নজরুল ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যখন রাণীগঞ্জে শিয়ারশোল স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়তেন তখন কিন্তু তিনি ক্লাসের প্রথম ছাত্র অর্থাৎ ফাষ্ট বয় ছিলেন। সুতরাং বোঝা যায়, তাঁর পথ পরিবর্তনের কারণ একমাত্র দারিদ্রতা, অন্য কিছু নয়।

বাঙ্গালীরা যখন সৈন্য বিভাগে সহজে ঢুকতে পারত না, শুধু সাধারণ পুলিশ হতে পারত তখন খুব লেখালেখি করে ইংরেজ সরকারকে রাজী করান গেল যে বাঙালী ফৌজ গঠন করা হবে। তখন দেশের নেতারা বাঙালী যুবকদের সৈন্য বিভাগে নাম দিতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেন। ঠিক সে সময় ১৯১৭-তে নজরুল ইসলাম দেশের ডাকে দশের স্বার্থে মিলিটারীতে নাম দেন। (দ্রঃ মুজফ্‌ফর আহমদ ঃ 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' পৃঃ ৯)

নজরুল প্রথমে আরবী ও ফার্সী ভাষায় বেশ কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ফলে তাঁর ধর্মীয় ভাব বেশ গাঢ় ছিল। তাঁর প্রথম কবিতায় ধর্মের ঘ্রাণ বেশ তীব্রভাবে অনুভূত হয়। তাঁর জীবনের প্রথম কবিতা 'মুক্তি' ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে 'বঙ্গীয় মুসলমান' পত্রিকাতে প্রথম ছাপা হয়; যেটা একটা মুসলমান ফকীরের অলৌকিক কাহিনী নিয়ে রচিত। তার একটা অংশ হচ্ছে, "রক্তাক্ত সে চূর্ণ বক্ষে বন্ধ দুটি হাত–থুয়ে ফকির পড়ছে শুধু কোরআনের আয়াত।" দারিদ্রের তাড়নায় সৈন্য বিভাগে যাওয়ার পূর্বে রেলওয়ে গার্ড সাহেবের চাকর থাকাতেও তাঁর আটকায়নি। দারিদ্রের দায়ে তাঁকে লেটোর দলের গান তৈরি করে সুর দেয়ার কাজও করতে হয়েছিল। (দ্রঃ এ. পৃঃ. ১১)

তখন সন্ত্রাসবাদী দল যুগান্তর ও অনুশীলন দলের কর্মী হতে হলে নিয়ম ছিল–সেখানে গীতা হাতে করে ঠাকুরের সম্মুখে তরবারি নিয়ে পরিপূর্ণ হিন্দু পদ্ধতিতে দীক্ষা নিতে হত। দেশের স্বার্থে স্ব-ধর্মের বিশ্বাস ও বাঁধন ছিন্ন করেও নজরুল এ, 'যাগান্তরে' নিজেকে যুক্ত করার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু তখনো তাঁর লেখা অমুসলমান সমাজে আশানুরূপ চিত্তাকর্ষক হয়নি। নদীয়ার শান্তিপুরের মোজাম্মেল হকের 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা ও কিছু মুসলমান পরিচালিত পত্রিকা নজরুলের গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা ছাপতে আরম্ভ করে। 'মোসলেম ভারতে' নজরুলের তেরটি লেখা বেরিয়েছিল। নজরুল যতই তাঁর ধর্মীয় উদারতা প্রদর্শন অথবা ধর্মের মস্তক মুণ্ডন করুন না কেন, সাম্প্রদায়িকতা তখন বেশ শিকড় গেড়ে বসেছিল ভারতের মাটিতে। সে সময়ের অবস্থা এমন ছিল–মুসলমানরা অনেকে হিন্দুদের সাথে মিশতে চাইতেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মুসলমানদের কেমন্ চোখে দেখত তার প্রমাণে ডক্টর শহীদুল্লার ভাষায়, "আমরা কয়েকজন (মুসলমান) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য ছিলাম। সেখানে হিন্দু মুসলমান কোন ভেদ না থাকলেও আমরা বড় লোকের ঘরে গরীব আত্মীয়ের মতন তার সভায় যোগদান করতাম। আমাদের মনে হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাথে সম্বন্ধ বিলোপ না করেও আমাদের (মুসলমানদের) একটি নিজস্ব সাহিত্য সমিতি থাকা উচিত। এ উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ৯নং আন্তনিবাগান লেনে মৌলবী আবদুর রহমান খাঁনের বাড়ীতে ১৯১১ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক সভা আহুত হয়।" (বাঙ্গালা সহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২১৭)

নজরুল প্রবন্ধ গদ্য রচনা ও কবিতাই সৃষ্টি করেন নি, তিনি একজন বক্তাও ছিলেন। বহু সভায় তিনি ইংরেজ-বিরোধী বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর বিরোধী মনের পরিচয়ের জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর কবিতা। তাই তাঁকে আমরা 'বিদ্রোহী কবি' নাম দিয়ে 'কৃতার্থ' করে দিয়েছি।

আমাদের ইতিহাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক তাঁরাই যাঁরা জেল খেটেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, যাঁদের বই পত্রিকা বা প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে বঙ্কিম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবীন সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের নাম না থাকলেও গান্ধীজী, জহরলাল, প্যাটেল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। কারণ তাঁরা যে কারাবরণ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কবি নজরুল শুধু শুকনো কবি নন, তাঁর একদিকে ছিল দারিদ্র্য অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার বাধা। তাও তিনি তাঁর প্রচণ্ড ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর লেখায় হিন্দু মানসে আঘাত না দিয়েই শুধু লিখে গেছেন তাই নয় বরং সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠেই তিনি কলম ধরেছেন। দেশের একথা এবং ইংরেজ বিতাড়নে তিনি স্বধর্মের বিরোধিতা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কোরআন, হাদীস ও আলেম সমাজকেও আঘাত দিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে। তবুও আশানুরূপ সমর্থন তিনি পাননি।

মোহিতলালের 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে লেখা আরম্ভ হয়। তবু কবি আঘাতের পরিবর্তে পাল্টা আঘাত না দিয়ে আরও নমনীয় হলেন। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করতে তাঁর কবিতা বের হতে লাগল, যা শুধু ঠাকুর দেবতার কথা, রামায়ণ মহাভারতের কথা, প্রাচীন মুনি ঋষিদের কথায় ঠাসা সম্ভার ছিল। এবার যেন তাঁর উপর অনেকের দৃষ্টি পড়ল। তবুও তা যথেষ্ট নয় বলে তিনি মনে করলেন। তাই নার্গিসের সাথে তাঁর বিবাহ বাতিল হওয়ার পর তিনি শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলাকে বিয়ে করলেন। তাতে একদল হিন্দু খুশী হলেন বটে, কিন্তু আর একদল অসন্তুষ্ট হলেন এজন্য যে, হিন্দুর মেয়ে মুসলমানদের হাতে চলে গেল। কমপক্ষে একজন হিন্দু কমে গেল এবং গর্ভজাত সন্তানরা আসবে মুসলমান হয়ে।

কবি আরো নমনীয় হয়ে আরো নেমে এলেন পূর্ব-পুরুষের ধর্মীয় গণ্ডির সীমা থেকে। নামায রোযা তো আড়াল করে দিলেনই উপরন্তু তাঁর পুত্রদের হিন্দু কায়দায় নাম রাখলেন। যেমন ছেলেদের নাম রাখলেন সব্যসাচী, অনিরুদ্ধ, বুলবুল প্রভৃতি। তাছাড়া ছেলেদের জন্য এমন পরিবেশ তিনি গড়লেন যাতে তাঁর পুত্রেরা কল্পনা করতে পারতেন না যে তাঁরা মুসলমান পাত্রীকে বিয়ে করবেন। আর হলও তাই। তাঁর ছেলেরা পুরোপুরি হিন্দু কায়দায় বড় হলেন, হিন্দু মেয়ে বিয়ে করলেন এবং তাঁরাও তাঁদের ছেলেমেয়েদের নাম হিন্দু পদ্ধতিতেই রাখলেন। ফলে এতদিনে প্রমাণিত হল যে, তিনি মুসলমান সমাজ হতে নিজেকে বের করতে চান। এর পরেও নজরুল আরো দেবতাভক্ত হলেন কালী দেবীর নামে অনেক শ্যামাসঙ্গীত সৃষ্টি করলেন, তাতে সুর লাগালেন, নিজে তা ভাবাবেগের সাথে গেয়েও শোনালেন। অনেকে তাঁকে তাঁদের মত মনে করেন বরণ করলেও কিছু 'কঠিন হৃদয়ে' এ কথা মনে হয়েছিল যে, লেখা আর কাজ এক নয়।

তাই নজরুল আরও নেমে এলেন–কালী সাধনায় নিমগ্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তারপর কবি বাকহীন ও পঙ্গু হয়ে গেলেন। এবার ভক্তিমাল্য ঝরতে লাগলো জ্ঞানবিলুপ্ত কবির উপর। আজ কবির পুত্র, পৌত্র ও কন্যাদের হিসেবের অঙ্ক বড় জটিল হয়ে পড়েছে–না তাঁদের মুসলমানত্বের কোন মর্যাদা আছে, না তাঁরা পরিপূর্ণ হিন্দু হতে পেরেছেন। মোটকথা, ঠিক বেঠিক যাই হোক, নজরুল হিন্দু মানসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন। জীবিতাবস্থায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের মত ধনী হতে পারেননি। সারা জীবন শুধু ঋণ করে গেছেন আর বুকের বেদনা ভুলতে মদ পান করেছেন। গান গেয়ে হাসির আবরণে সুপ্ত কান্নার মিনার গড়েছেন। নিজের বংশ ধ্বংস হওয়ার দিকে দৃষ্টি দিতে ফুরসত পাননি।

তাঁর জন্ম হয়েছিল পুরোপুরি মুসলিম পরিবেশে, মুসলিম বাবা-মা'র সন্ধিক্ষণে। আর মৃত্যুর পর মুসলিম পদ্ধতিতে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর কবরও রচনা হয়েছিল–এটা কবির দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকে গেল।

নজরুল ইংরেজের রুক্ষ রোষে জেলে গেলেন, প্রহারের পুরস্কার পেলেন, জেলের অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে অনশন করলেন, কত লুকিয়ে বেড়ালেন, তবু তো তিনি কাপুরুষের মত ইংরেজের সাথে হাত মেলাননি। তাঁর অগ্নিবর্ষক কলমে লিখে চললেন কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প। অবশ্য গল্প ও প্রবন্ধের চেয়ে তিনি কবিতাতেই বেশি সুখ্যাতি বা বিখ্যাত।

নজরুলের বিখ্যাত বই 'ভাঙ্গার গান' ইংরেজের দরবারে কুখ্যাত বলে বিবেচিত হওয়ায় বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে। অনেক সুপুরুষকে দেখা গেছে, তাঁর বই বা লেখা বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর তিনি ভীত হয়ে পড়েন অথবা, কোন দুর্বলতায় কলমের গতির পরিবর্তন করেন। কিন্তু নজরুল এ অভিযোগ থেকে বিমুক্ত। যেহেতু তাঁর 'যোগবাণী' বইও বাজেয়াপ্ত হয় এ বছরেই। তবুও তিনি থামলেন না। তাঁর 'চন্দ্রবিন্দু' 'বিষের বাঁশি'ও বাজেয়াপ্ত হল।

বঙ্কিমের গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হাতে অনেক পত্রিকা ছিল–সেগুলো শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে ও ইংরেজদের স্বপক্ষে গর্জে উঠেছিল কি না সে আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। তেমনি নজরুলের অঙ্গুলি হেলনে তখন সে পত্রিকাগুলো চলত সেগুলো হচ্ছে নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙ্গল প্রভৃতি। এগুলোর পিছনে ছিল তাঁর সম্পাদনা ও প্রচেষ্টা। এ প্রত্যেকটি পত্রিকা অত্যাচারী সরকার নিষ্ঠুর হাতে বাজেয়াপ্ত করেছিল। তাছাড়া তাঁর 'অগ্নিবীণা' বইটিও সরকার বরদাস্ত করতে পারেনি।

ইংরেজের আমল থেকে নিয়ে তাদের চলে যাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রায় চারশো বই ও পত্র পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। শুধু ১৯২০–১৯৩৪ পর্যন্ত ১৭৪টি বাংলা বই নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৯৩৪ সালের পরও ১৯৩৭–১৯৪৭ সাল পর্যন্ত একশোরও বেশি বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কোন্ কোন্ মুসলমান ও হিন্দু মনীষীর বাংলা-অবাংলা বই ভারতের ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল তার মোটামুটি আলোচনা আমার লেখা 'বাজেয়াপ্ত ইতিহাসে' করেছি।

যাঁরা ইংরেজের কাছ থেকে তাঁদের লেখনীর জন্য পুরস্কার, প্রচুর উপাধি, ধনী ও মানী হওয়ার সুযোগ পেলেন এবং ইতিহাসে তাঁরা অনেকে স্বাধীনতার নায়ক বলে 'হিরো' হয়ে পড়লেন, সেখানে তুলনামূলকভাবে নজরুল ইসরামকে উচ্চাসনে বসান তো দূরের কথা সেই তথাকথিত 'হিরো'দের পদপ্রান্তেও তাঁর স্থান কতটুকু হয়েছে তার হিসেব করার অবকাশ আছে।

এবারে নজরুলের লেখনীর কিছু নমুনা দিচ্ছি মাত্র। হিন্দু-মুসলমানের উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন ঃ

"ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুসলেমিন!
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন।
ধর্ম কলহ রাখ দুদিন।
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া, গণ্ডুষ ফের করিবি কাঁচিয়া
আসিবে না ফিরে এই সুদিন।
বদনা গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ
সিংহ যখন পঙ্কলীন।"

তিনি হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করে লিখে বোঝাতে চাইলেন হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে একাকার হওয়া উচিত। তাই পুরোহিত ও উলামা গোষ্ঠীকে সমানভাবে আঘাত দিয়ে তিনি লিখলেন ঃ "হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব ও দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা এ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব! তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লার মারামারি। হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়।"

তিনি কালী-ভক্তদের খুশী করতে কালীকীর্তন লিখলেন ঃ

"আমার কাল মায়ের পায়ের নীচে দেখে যা আলোর নাচন
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যার হাতে মরণ বাঁচন।
আমার কাল মেয়ের আঁধার কোলে শিশু রবি শশী দোলে
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন।"

তাঁর কলমে তিনি আরও লিখলেন–

"মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানের মন্ত্রণাগার
রে অগ্রদূত ভাঙ্গতে এবার আসছে কি জাঠ কালা পাহাড়।"

এটা ঠিক নজরুলের ইতিহাস লেখা হচ্ছে না। নজরুলের মৃত্যুর পরও তাঁর মূল্যায়ন এখনো যে বাকী আছে শুধু এই ইঙ্গিত দিয়ে তার দায়িত্ব নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বিচারকমণ্ডলীর হাতেই ছেড়ে দেয়া হল।

নজরুল 'ধূমকেতু' কাগজে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'দ্ব্যর্থহীন' ভাষায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানান। বাংলাদেশে নজরুলই প্রথম কবি যিনি সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তুলে ধরেন (বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ঃ ডঃ অমলেন্দু দে, পৃঃ ৩০৩)। অথচ আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের দামী ও নামী নেতাদের অনেকের বুলি ছিল—শুধু স্বরাজ চাই। তাঁদের 'স্বরাজ' ও নজরুলের 'স্বাধীনতা'য় যে কত গভীর পার্থক্য তা পরবর্তী আলোচনায় পরিষ্কার হবে।

অরবিন্দ ঘোষ

"১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন অরবিন্দ। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৫০ সাথে। ভারতে তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তের অভাব নেই। আর সে জন্যই বঙ্কিমের মত তাঁর নামের সাথে "ঋষি" যোগ করে তাঁকে 'ঋষি অরবিন্দ' বলা হয়ে থাকে।

ধর্মের দিক দিয়ে অরবিন্দ অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী ছিলেন অর্থাৎ বঙ্কিমের মূল আদর্শের সাথে তিনি একমত ছিলেন। খুলে বললে বলতে হয় হিন্দু জাগরণ, হিন্দু উন্নতিই ছিল তাঁর এবং তাঁর গ্রুপের মতাদর্শ। কিন্তু বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, রামমোহন প্রভৃতি নেতাদের সাথে তাঁর একটা পার্থক্য ছিল—ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ জাতিকে তিনি মোটেই সুনজরে দেখেননি বা তাদেরকে সমর্থন করিননি। এটা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত মানসিক ব্যাপার ছিল না, ইংরেজ বিতাড়নে তিনি বা তাঁর দল অস্ত্র ধারণ করেছিলেন এটাও ঐতিহাসিক সত্য। তাঁর এ মহান দিক তাঁকে আরও স্মরণীয় ও বরণীয় করত যদি তাঁর জাগরণের আওতায় ক্লান্ত বিপ্লবী মুসলিম জাতির জন্য আহ্বান থাকত। ভুলক্রমে যদি তিনি মুসলমানদের না নিয়েই এগিয়ে চলার চেষ্টা করে থাকেন তাহলে তা অপরাধ না বলে অসাবধানতা বলে আচ্ছাদনের প্রলেপ প্রয়োগ করা চলত কিন্তু যে পথ ও মত তিনি বা তাঁর দল গ্রহণ করেছিলেন তা মুসলমানদের পুরোপুরি নীতি-বিরোধী এবং মর্যাদা-বিরোধী বলে অনেকে মনে করেন। কে কি মনে করেন তার কোন একটা বেছে নেয়ার দায়িত্ব পালন না করে বরং অরবিন্দের কাজ, কথা ও জীবনী জেনে বা পড়ে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা ভোগ করা অধিকতর কার্যকরী।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ধারার ভগীরথ লাল-বাল-পাল ও অরবিন্দ প্রমুখ 'জাতীয়তাবাদীরা' ভক্তিবাদ, অবতারবাদ, লীলাবাদ, অলৌকিকত্ব প্রভৃতিতে বিশ্বাস করতেন। শক্তির বোধনকল্পে তাঁরা কালী, দূর্গা, ভবানী, বগলা প্রভৃতি দেবীর পূজা করতেন। শিবাজী ছিলেন তাঁদের আদর্শ। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ সরস্বতীর হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ চিন্তাকে অনেকাংশে ভিত্তি করে এ ধারা গড়ে উঠে।" (দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ২৫৯)

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ৪৯৯ পৃষ্ঠার এই পুস্তকে নানা গ্রন্থের উদ্ধৃতি তুলে বইটিকে মজবুত করেছেন। তাতে তিনি আরও লিখেছেন—"পূর্বতন আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদকে তাঁরা হিন্দু পুনর্জাগরণে পরিমিশ্রিত করেন। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় (১৮৫৬–১৯২৮) ছিলেন মুসলমান ও অহিন্দু ধর্মবিরোধী আর্যসমাজে দীক্ষিত। মহারাষ্ট্রে হিন্দু অতীতের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৭–১৯২০) গণপতি ও শিবাজী উৎসবের (১৮৯৩–১৮৯৫) সাথে গোরক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উদ্ভাবক বিপিনচন্দ্র পাল হিন্দু জাতীয়তাবাদে পুরোপুরি উদ্বুদ্ধ না হলেও শ্রীকৃষ্ণকেই ভারতের অন্তরাত্মা মনে করতেন। লালা লাজপতের উপর বর্মায় অন্তরীণ আদেশ (১৯০৭) জারি হওয়ায় বিপিনচন্দ্র ত্রস্তচিত্তে সারাদেশে রক্ষাকালী পূজা ও শ্বেতছাগ বলির নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রচ্ছদে থাকত জগদ্ধাত্রীর ছবি। অন্যদিকে

Goto List

'যুগান্তর' পত্রিকার প্রচ্ছদে থাকত খড়্গসহ মা কালীর হাত। জনশক্তির বোধন ও শত্রু নিধনকল্পে বরোদায় অরবিন্দ বগলা মূর্তি গড়িয়ে পূজা করেন (১৯০৩)। গুপ্ত সমিতিতে নবাগত কর্মীদের তিনি এক হাতে গীতা এবং অপর হাতে তলোয়ার দিয়ে বিপ্লবের শপথ গ্রহণ করাতেন। লাল-বাল-পাল নামে অভিহিত এ তিনজন আর অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন চরমপন্থী দলের প্রধান চার স্তম্ভ। এঁদের মধ্যে অরবিন্দ ছাড়া আর কেউ হিংসাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন না।" (বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ২৬০)

এ উদ্ধৃতি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, কোন মুসলমানের পক্ষে এ পন্থায় শপথ নিয়ে ঐ মত সমর্থন করে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়া কত কঠিন ছিল। অথচ এ তথ্য চাপা পড়ে থাকলে মনে হবে মুসলমানরা এসব গুপ্ত সমিতিতে ব্যাপকভাবে যোগ দেয়নি; সুতরাং স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমান জাতির কোন অবদান নেই। কিছু ভাল ভাল হিন্দু নেতা বা উপযুক্ত হিন্দুকর্মী তাতে যোগ দিয়েছিলেন এজন্য যে, তাঁরা বুঝেছিলেন—লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা প্রভৃতি শরীরচর্চা নিশ্চয় শুভকর্ম, আর ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজনও আছে। কিন্তু মুসলমান তাতে যোগ দিতে পারে না এটা অনেকে বুঝতে পারলেও মৌনতা অবলম্বন করেছিলেন হয়ত বৃহৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করে। কিন্তু যখন দেখা গেল যেখানে সেখানে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ চলছে তখন অনেকেই বিবেকের তাড়নায় দল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। চিত্তরঞ্জনদাস, প্রমথনাথ মিত্র, সরলা দেবী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৬২)

'অনুশীলন' ও 'যাগান্তর' এ দুটি তখন ছিল প্রধান সন্ত্রাসবাদী গুপ্তদল। ১৯০৯ সনে ইংরেজ সরকার এক এক করে এ সমস্ত দলকে নিষিদ্ধ করে। তখন এসব দল থেকে বেরিয়ে আসা অনেক কর্মী কংগ্রেসে যোগ দেন। পরের দিকে গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এ দুটি বিপ্লবী দলের অনেক কর্মী ও নেতা কংগ্রেসের সদস্যপদ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। (সৌরেন্দ্রমোহন ঃ পৃঃ ২৬২)

"বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাই ছিল তাঁর (অরবিন্দের) প্রেরণার উৎস। 'আনন্দমঠে'র আদর্শে অরবিন্দ ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।" (ঐ, পৃঃ ২৬৩)

তিনি কংগ্রেস বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেস পার্টির জন্য তিনি আক্রমণমূলক কথা বলতেন। কংগ্রেসের কর্মপন্থাকে বলতেন Political Mendicancy বা রাজনৈতিক ভিক্ষুকতা এবং কংগ্রেসকে বলতেন Unnational Congress অর্থাৎ অজাতীয় কংগ্রেস। অবশ্য এ কথাগুলো অরবিন্দ বললেও তার পিছনে যুক্তি দেখাবার মত ক্ষমতা অরবিন্দের ছিল; যেটা ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া সহজ ছিলনা। তিনি বলেছিলেন, "A Body like the Congress, which represents not the mass of the population, but a single and very limited class, could not honestly be called national."—যার ভাবার্থ হল—কংগ্রেস অল্প কিছু সীমিত লোকের দল, তারা সর্বসাধারণের প্রতিনিধি নয়, তাদের সত্যকার জাতীয় দল বলা যায় না।

অরবিন্দ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'ভবানী মন্দির' বই লেখেন। তাতে তিনি তাঁর এমন কর্মপন্থার বর্ণনা দেন যা মুসলমানদের নিরাশ করে। ১৯০৬-এ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে যেভাবে লেখালেখি হয় তাতে মুসলিম মানস চমকে ওঠে। তার পূর্বেই গোরক্ষা আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল, যা মুসলমানদের চিন্তিত করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, মুসলমানদের হাত হতে গরুকে বাঁচাবার জন্য যে তোড়জোর চলে, শাসক খৃষ্টানদের হাত হতে গোরক্ষার তেমন কোন তোড়জোর করার ইতিহাস সহজলভ্য নয়। তারপরেই ১৯০৬-এ 'মুসলিম লীগ' নামে মুসলমান সংস্থার সৃষ্টি হয়। অবশ্য মুসলিম লীগের প্রকৃত জন্মদাতা জিন্নাহ না কতকগুলো সংস্থা ও নেতৃবৃন্দের ভ্রান্ত পদক্ষেপ—তা বলতে গিয়ে ভাবতে বাধ্য হতে হয়।

বিরুদ্ধবাদীরা অরবিন্দের জন্য ডাকাতির অভিযোগ, মুসলমান বিদ্বেষের অভিযোগ যতোই তুলে ধরুন না কেন, তিনি যে ইংরেজ শাসনকে পুরোপুরিভাবে খতম করতে চেয়েছিলেন তাতে আদৌ সন্দেহ নেই।

সত্যের খাতিরে সত্যান্বেষীদের একথা ভোলা সম্ভব নয় যে, পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রের মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করেছেন, কারাবরণ করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন, পথের ভিক্ষুক হয়ে গেছেন তবুও অন্যায়ের কাছে অসত্যের কাছে পরাধীনতার কাচে মাথা নত করেননি, টার্গেট হতে মুখ ফিরিয়ে নেননি।

অরবিন্দ বোমা রিভলভার নিয়ে গুপ্তহত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি করতে গিয়ে অপরকে আঘাত দিয়েছেন সত্য কথা, তবে তাঁর নিজের কতটুকু আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা ছিল তাও বিচার্য বিষয়। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "অরবিন্দ রাজনৈতিক ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা কর্মতৎপরতার অধিনায়করূপে অভিযুক্ত হয়ে বছরকাল (১৯০৮-'০৯) বিচারাধীনে কারারুদ্ধ থাকেন। তাঁর এ কারাজীবন পরবর্তীকালের চিন্তাভাবনার দিক থেকে বিশেষ অর্থবহ" (ঐ, পৃঃ ২৬৮) অবশ্য বিচারে অরবিন্দ নির্দোষী প্রমাণিত হন। কিন্তু জেলে এক বছর ধরে তাঁর উপর প্রহার ও উৎপীড়ন চালানো হয়। যখন তিনি জেল থেকে বেরিয়ে এলেন তখন দেখা গেল জেলের শাস্তি এবং বন্ধু-বান্ধবদের অনাগ্রহের ফলে অরবিন্দের শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে যে মনোভাব ছিল তার পরিবর্তন হয়ে একটা ভাবান্তর ঘটেছে। শাসকের প্রহার বা হাতুড়ির আঘাতে বিপ্লবীর ধর্ম অনুযায়ী বিপ্লবের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি যা বললেন তা অনেক ভক্তের কাছে উল্টোই মনে হবে ঃ "কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও উৎপীড়ন সম্পর্কে [অরবিন্দ] বলেন যে, 'দমননীতি যেন ঈশ্বরের হাতুড়ি–যা দিয়ে পিটিয়ে তিনি আমাদের একটি শক্তিশালী নেশনে পরিণত করতে চান এবং আমাদের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে বিশ্বকে পরিচালনা করাই তাঁর ইচ্ছা। তিনি আমাদের ধ্বংস চান না, ছাঁচে লোহা পেটানোর মত তিনি আমাদের নবরূপে সৃষ্টি করতে চান।' এসময় অরবিন্দের উপর পুলিশের আবার বিষনজর পড়ে। প্রথমে কিছুদিন চন্দন নগরে আত্মগোপন করে থেকে পরে সবার অলক্ষ্যে পণ্ডিচেরি চলে যান। তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। সেখানে তিনি গভীর যোগ সাধনায় নিমগ্ন হন...[অরবিন্দ] বলেন যে, 'ভগবানই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সহাযতা করবেন, আর যথাসময়েই স্বাধীনতা অর্জিত হবে, এখন সকলের কর্তব্য যোগস্থ হয়ে কাজ করা–ভগবানে আত্মসমর্পণ করাই হল যোগসাধনার প্রথম পদক্ষেপ।' কারাগারে তিনি (দেবতা) বাসুদেবের এ মর্মেই 'আদেশ' পেয়েছিলেন।" (দ্রঃ সৌরেন্দ্রমোহন, পৃঃ ২৬৮-৭০)

ইংরেজ শাসকদের এজেন্ট জমিদাররা কর আদায়ের নামে যে অত্যাচার করতেন তার ইতিহাস পড়লে চমকে যেতে হয়। ইংরেজ সরকারকে যেখানে তিন কোটি টাকা কর দিতে হত সেখানে গরীব চাষীদের ও শ্রমিকদের কাছ থেকে আদায় করা হত ১৮ কোটি টাকা। মনগড়া এমন কতগুলো কর আদায় করা হোত যা জানাতেও লজ্জাবোধ হয়। তার সংখ্যা ১৫ বা ততোধিক। যেমন টহুরী, বিয়ের সেলামী, পূজাপার্বনী, জমিদার পুত্রদের স্কুল খরচা, জমিদার পরিবারে তীর্থ খরচা, রসদ খরচা অর্থাৎ সাহেবরা এলে তাদের খাতির তোয়াজ করতে যে খরচা, ডাক খরচা, ভিক্ষা বা মাঙ্গন অর্থাৎ জমিদারের ঋণ শোধ করার জন্য কর, পুলিশ খরচা, ভোজ খরচা, সেলামী অর্থাৎ চাষী নতুন বাড়ি করলে তার দক্ষিণা, আয়কর, খারিজ দাখিল, নজরানা প্রভৃতি। ডক্টর বদরুদ্দিন উমরের পুস্তকে এ তথ্য থাকলেও চিন্তাশীল লেখক রাধারমণ সাহার 'পাবনা জেলার ইতিহাস'-এর ৯২ পৃষ্ঠা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। কর ছাড়াও জমিদাররা ১৬ রকম শাস্তি দিতেন গরীব চাষী ও প্রজাদের। যেমন 'দণ্ডঘাত বা

বেত্রাঘাত, চর্মপাদুকা প্রহার, বাঁশ ও লাঠি দিয়ে বক্ষস্থল দলন, খাপরা দিয়ে নাসিকা কর্ণ মর্দন, মাটিতে নাসিকা ঘর্ষণ, পিঠে হাত বেঁধে বংশ দণ্ড দিয়ে মোড়া দেয়া, গায়ে বিচুটি পাতা দেয়া, ধানের গোলায় পুরে রাখা, চুনের ঘরে বন্ধ করে রাখা, লঙ্কা মরিচের ধোঁয়া' দেওয়া ইত্যাদি। (দ্রঃ সাময়িক পত্রে বাংলা সমাজ চিত্র ঃ বিনয় ঘোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯, ১২৩)

এ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মুসলমান প্রধান চাষীসমাজ বা শোষিত সমাজ আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফোরিত হয়ে জমিদারদের উপর আক্রমণ করে। তখন সমস্ত বাংলা সংবাদপত্রগুলো হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের হাতেই ছিল। তার আগে মুসলমান উচ্চবিত্ত শ্রেণী খতম হয়ে গেছে। সুতরাং রটিয়ে দেয়া হল যে, এটা হিন্দু-মুসলমানের লড়াই। সে সময় সন্ত্রাসবাদীদের বিখ্যাত নায়ক যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা অতীব দুঃখের–"কলকাতার যুগান্তর দলের প্রধান স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ কলকাতা হতে ইন্দ্রনাথ নন্দী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, সুদীর সরকার প্রভৃতি ৬ জন যুবক বোমা, পিস্তল বা রিভলবার নিয়ে ময়মনসিংহে হিন্দুদের রক্ষার জন্য জামালপুর গমন করে। এ ৬ জন এসে বোমা ও পিস্তল দিয়ে কৃষকদের ঘায়েল করে।" বলাবাহুল্য, উল্লিখিত ৬ জন সন্ত্রাসবাদীকে অরবিন্দ ঘোষই পাঠিয়েছিলেন। যিনি পরবর্তীকালে ঋষি অরবিন্দ নামে খ্যাতি অর্জন করেন। (পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ পৃঃ ৩৭; সুপ্রকাশ রায় ঃ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ২৮৮-৮৯)

কিন্তু এটা যে সাম্প্রদায়িক লড়াই ছিলনা, ওটা যে শুধুমাত্র শোষিত ও শোষকের লড়াই ছিল তা নিরপেক্ষ বিচারে স্বীকৃত। সুপ্রকাশ রায়ের ভাষায়–"বাংলাদেশের সেকালের যুগান্তর সমিতির সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নায়কগণ তাঁদের চিন্তাধারা ও আজন্ম পালিত সংস্কার অনুযায়ী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জামালপুরের ঘটনার যে বিকৃত ব্যাখ্যাই করিয়া থাকুন না কেন, এ ঘটনাটি শ্রেণী-সংগ্রামের একটি বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত ব্যতীত, জমিদার মহাজন বিরোধী সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কিছু নয়।" (সুপ্রকাশ রায় ঃ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ২৯০)

তাহলে বোঝা গেল, অরবিন্দের ইংরেজ বিরোধী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও ইংরেজদের এজেন্টদের সাহায্য ও সহযোগিতা বিষয়ে তাঁর পদক্ষেপ যে সঠিক হয়েছিল, তা তাঁর ভক্তদের পক্ষেও বলা মুশকিল। স্বদেশী আন্দোলনের নাম করে এ সন্ত্রাসবাদী দল যখন মুসলমানদের ডেকেছিল তখন আপামর মুসলিম জনসাধারণ সাড়া যে কেন দেয়নি তা সহজেই অনুমেয়।

আইনবিদ বিমলানন্দবাবু লিখেছেন, "মুসলমানরা যখন রাজনীতিতে 'ইনশাল্লা' ঢোকালেন, তখন আমরা খুব চটেছিলাম। কিন্তু আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমাদের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেবী দূর্গাকে দেশজননীর বাহ্যিক রূপ বলে প্রচার করে গেছেন এবং অরবিন্দ, তিলক, বিপিন পাল প্রভৃতি সকল নেতাই বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের পূজারী ছিলেন। অরবিন্দ ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা ছিলেন, তারই সমর্থনে সাহিত্যিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন ঃ 'আমরা দেখিয়াছি দেখিতেছি অরবিন্দ এ বঙ্কিম প্রদর্শিত জাতীয়তাকেই সজ্ঞানে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতেই অনুসরণ করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের অথবা মুসলমানের তিনি ধার ধারেন না। তিনি এক পায়ে দাঁড়াইয়া বগলা মন্ত্র যপ বা বগলামূর্তি পূজা শেষ করিয়া আসিয়াছেন।' গুপ্ত সমিতিতে মাকালীও আছেন এবং শ্রীগীতাও আছে। এতে মুসলমান ভ্রাতাগণ যদি বলেন–'এ ব্যবস্থায় দেশ উদ্ধারের জন্য আমরা যাই-ই বা কি করিয়া, আর থাকিই বা কোন্ মুখে? আমাদের ত একটা পৃথক ধর্ম ও তার অনুশাসন আছে'–এ কথার জবাব ত চরমপন্থীদের এ গুপ্ত সমিতির দেয়াই কর্তব্য।...'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাই অরবিন্দের জাতীয়তা, কংগ্রেসী জাতীয়তা তাঁহার জাতীয়তা নহে, বরং জাতীয়তার বিপরীত বস্তু।' বঙ্কিম-অরবিন্দ-বিপিন পাল এবং তাঁদের উত্তরসূরী বিপ্লববাদীরা বাংলায় এবং তিলক ও তাঁর উত্তরসূরী মহারাষ্ট্র ও উত্তর ভারতে যে জাতীয়তার আমদানী করলেন, তা ছিল নিছক হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ। মুসলমানগণ স্বভাবতই

Goto List

এ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হতে ১৯০৫ হতে শুধু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন তা নয়–তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় বিষে বিষাক্ত রাজনীতির উন্মেষ হল।" (শ্রীবিমলানন্দ শাসমল ঃ ভারত কি করে ভাগ হল, পৃঃ ২৩-২৪)

তাহলে আইনজীবী বিমলানন্দবাবু প্রমাণ্য তথ্য দিয়ে বোঝালেন যে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত হিন্দুদের উৎকট সাম্প্রদায়িকতা এবং মুসলমানদের দূরে ঠেলে পৃথক রেখে দেয়ার জন্য তাঁরাই দায়ী। আর এজন্যই বোধ হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'মুসলিম লীগ' জন্ম নিতে বাধ্য হয়েছিল। শ্রীবিমলানন্দ বাবুও লিখেছেন–"১৯০৬ সনের সুরাট কংগ্রেসে যখন তিলক-অরবিন্দ প্রভৃতি চরমপন্থী নেতারা নরমপন্থীদের অপসারিত করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে দখল করলেন, তখন স্বভাবতই এঁদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কংগ্রেসকেও প্রভাবিত করলো। ১৯০৬ সনেই কংগ্রেস সাধারণভাবেই হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল। এবং তারই প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড়ালো (ঐ সনেই) নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ।" তাহলে মুসলিম লীগের জন্মদাতা কে বা করা তা যেভাবেই শেখান হোক না কেন, আসল ইতিহাস যে দেশের ছাত্র ও জনসাধারণকে আসল শিক্ষা দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৬৩ সনে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০২ সনে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পরে তিনি 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে পরিচিত হন।

তিনি যখন বি. এ. পাশ করেছিলেন তার পরে পরেই ইংরেজদের শাসন ও অত্যাচারের কথা তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। তার জীবন্ত প্রমাণ স্বরূপ তাঁর উক্তির এ উদ্ধৃতিটি যথেষ্ট ঃ "বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট তৈরি করতে চেয়েছিলাম। সেজন্যই আমি হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। সেজন্যই আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হাইরাম ম্যাক্সিমের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের কাছ থেকে আমি কোন সাড়া পাইনি! দেশটা মৃত!" (দ্রঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ স্বামী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ৩)

বলাবাহুল্য, বিবেকানন্দ তাঁর পরিকল্পনায় হতাশ হলেন। তারপর তাঁর আমেরিকা যাবার সুযোগ আসে। আমেরিকায় গিয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য রাখেন। কেন আমেরিকা গিয়েছিলেন এবং তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের সফলতা ও বিফলতার বিতর্কে না গিয়ে তাঁর নিজের লেখা বা বলার উপর নির্ভর করাই ভাল। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় লিখেছেনঃ স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলেছিলেন–"দেখ ভাই, এদেশে যে রকম দুঃখ-দারিদ্র্য, এখানে এখন ধর্মপ্রচারের সময় নয়। যদি কখনও এদেশের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করতে পারি, তখন ধর্মকথা বলব। সেজন্য কুবেরের দেশে যাচ্ছি; দেখি যদি কিছু উপায় করতে পারি।" (দ্রঃ স্বামী অখণ্ডানন্দ ঃ স্মৃতিকথা, পৃষ্ঠা ১০৮)

সতেরো দিন ধরে আরেরিকার চিকাগোতে যে অধিবেশন হয়েছিল সেখানকার কথা বলতে গিয়ে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "সতের দিন ধরে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশন ও বিভাগীয় অধিবেশনগুলিতে প্রদত্ত তাঁর (স্বামীজীর) বক্তৃতাগুলিতে এ কথাই সবচেয়ে বেশী ফুটে ওঠে–ধর্ম নয়, রুটিই ভারতীয়দের সর্বাগ্রে প্রয়োজন।" (বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃষ্ঠা ২২৫)

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে যান। সেখানেও বহু সভায় বক্তৃতা দেন। মিস্ মার্গরেট নাম্নী এক শিক্ষিতা ইংরেজ তরুণীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। ইনি পরে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁরই দেয়া 'নিবেদিতা' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

তিন মাস পরে আবার লণ্ডন থেকে আমেরিকায় গেলেন। পরে ইউরোপের আরও অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করে ১৮৯৪ সনের কলকাতায় ফিরে এলেন এবং কলকাতাতেই রামকৃষ্ণ মিশনের গোড়াপত্তন করেন। 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামকরণ এজন্য করেন যে, রামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর ধর্মীয় গুরু। কিন্তু তাঁর ইংরেজ-বিরুদ্ধ বিপ্লবের সদিচ্ছার কথা বা বিপ্লবী চিন্তাধারার কথা যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সে নীতির গতি পরিবর্তন করে তিনি ঘোষণা করলেন-The amis and ideals of the Mission being purely spiritual and humanitarian, it shall have no connection with politics." অর্থাৎ এ মিশনের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক এবং মানবিক, এর সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক থাকবে না। (The Life of Swami Vivekananda by his Easter and Western Disciples, 1960, p. 502)। ঐ মিশনের উদ্দেশ্য ছিল (১) বৈষয়িক কল্যাণের জন্য কর্মদের শিক্ষিত করা; (২) শিল্প ও কারিগরী শিক্ষাদান ও (৩) জনসাধারণকে বেদান্ত ও ধর্মচিন্তায় উৎসাহিত করা। (দ্রঃ বাঙালী রাষ্ট্রচিন্তা, পৃষ্ঠা ২২৬)

বিলেত থেকে কত টাকা তিনি মোট এনেছিলেন তার পরিমাণ সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে সে সময় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী মিঃ রকফেলার বিবেকানন্দকে বিপুল অঙ্কের টাকার চেক যে দিয়েছিলেন তা প্রমাণিত। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের যোগ্যতাও ইতিহাস বিখ্যাত। কেননা, মিঃ রকফেলারকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করানো সামান্য ব্যাপার ছিলনা। শেষে "রকফেলার জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজীকে, 'আপনার কথামত আমি বিপুল অর্থ সাহায্য করেছি। আশা করি, আপনি খুশী হয়েছেন। আমাকে এ দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।" (দ্রষ্টব্য ডক্টর সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ঃ বিবেকানন্দ স্মৃতি, পৃষ্ঠা ৩৪)

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কারণে বিবেকানন্দের ঔজ্জ্বল্য বেড়েছে একদলের মত, অন্যদলের মত-বিবেকানন্দ একটা স্বতন্ত্র প্রতিভা; তিনি রামকৃষ্ণের ভক্ত হওয়াতেই রামকৃষ্ণের এত পরিচিতি। বিবেকানন্দ বিলেত যাবার বেশ কিছুদিন আগে রামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "বাড়ির অন্ন সংস্থানের একটু ব্যবস্থা করি। তারপর আপনার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে আপনার ব্রত উদ্‌যাপন করব।" রামকৃষ্ণ এ কথায় তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে অন্যান্য ভক্তদের সামনে উপহাস ও বিদ্রূপ করেছিলেন। [দ্রষ্টব্য ঐ, পৃষ্ঠা ৩৫]। এখান থেকে বোঝা যায় যে, ধর্মপালন যপতপ মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োজন মেনে নিয়েও বিবেকানন্দ তাঁর স্বাধীন-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেন।

রামকৃষ্ণের বড় বড় ভক্ত যাঁরা শুধু আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী, তাঁরা বিবেকানন্দের বাস্তববাদিতার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা আরও মনে করেন যে, এটা বিলেত যাবার কুফল। কারণ, তাঁদের মতে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক মুক্তিকামীদের ভক্তির পথ প্রদর্শন করাই কাজ ছিল। "স্বামীজীর সাথে গুরুভাইদের তীব্র বাদানুবাদ দেখা যায়। উত্তেজিতভাবে তাঁকে (বিবেকানন্দকে) এ কথা বলতে শোনা যায়-'I am not a servant of Ramkrishna or any one, but of him only, who serves and helps others, without caring for his own Mukti." আমি রামকৃষ্ণ বা অন্য কারোর চাকর নই আমি তাঁরই সেবক যিনি অপরকে সাহায্য করেন ও অপরের কাজ করে যান-তাঁর নিজের মোক্ষ বা মুক্তির ধার ধারেন না। (The Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples, p. ৫০৭)

ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন মতামতে তিনি কারও পরোয়া করেন নি। তিনি যখন প্যারিসে গিয়েছিলেন তখন Congress of the History of Religion অধিবেশনে যোগ দেন। "এ সম্মেলনে তিনি দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।" (দ্রষ্টব্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ৫)

তিনি পরকালের চেয়ে ইহ্কালের গুরুত্ব মোটেই দিতেন না। আর সেই জন্যই তিনি কিশোর ও যুবকদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "You will be nearer to Haaven through football than through the study of the Gita." এখানে তিনি জানাতে দ্বিধা করেননি যে, গীতা পড়ে যতটা স্বর্গের নিকটবর্তী হওয়া যায়, ফুটবল খেলে তার চেয়ে বেশি স্বর্গের নিকটবর্তী হওয়া যায়।

ইংরেজ-বিতাড়নের ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে তাঁর কিছুটা মিল আছে–"বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিবেকানন্দের হৃদয়পটেও মাতৃরূপে দেশের চিত্র কল্পিত।" (বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৩৮)

বিবেকানন্দ নিজের ভাষায় বলেছেন তাও বিশেষ গবেষণার বিষয়–"আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সে পরম জননী মাতৃভূমি তোমাদের আরাধ্য দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এ কয়েক বর্ষ (অর্থাৎ আগামী ৫০ বছর) ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এ দেবতারাই একমাত্র জাগ্রত–তোমার স্বাজাতি–সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।" (দ্রষ্টব্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৯৮-৯৯)

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দও ইংরেজ শাসনকালে বলেছিলেন, "রাজা প্রজাদিগের পিতা-মাতা , প্রজারা তাঁহার শিশু সন্তান। প্রজাদের সর্বতোভাবে রাজমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত" [দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত গ্রন্থ. ৬, পৃষ্ঠা ২৩৬]। এখানে একটা জিনিস বিশেষ লক্ষণীয় যে–এ উদ্ধৃতিগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলনকে পঞ্চাশ বছর থামিয়ে রাখার ইঙ্গিত ও ইংরেজ শাসকের আনুগত্য স্বীকার করার উপদেশ ছিল বললে তা অস্বীকার করা কষ্টকর। তাহলে কি সে যুগের গগনচুম্বী সুখ্যাতির এভারেস্ট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব তাঁর উপরেও পড়েছিল? অবশ্য অপরদিকে এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, স্বামীজীর লেখা ও বক্তব্য ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজকে আঘাত করেনি, বরং ইসলাম ও মুসলিম জাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

একটু আগেই বলেছি যে তিনি বাস্তববাদী ছিলেন। তা না হলে একজন সন্ন্যাসী হয়ে এ কথা বলতে পারতেন না–'First bread and then religion'। প্রথমে রুটি তারপরে ধর্ম। তিনি অন্যত্র আরও পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ 'রুটি চাই–যে ঈশ্বর কেবল স্বর্গের চিরন্তন সুখের কথা বলে অথচ রুটি যোগাতে পারে না তার প্রতি আমার কোনও শ্রদ্ধা নাই'। (The Complete Works of swami Vivekananda. vol. IV. p. 388)

বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে বিবেকানন্দের যে আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল আপাততঃ একটি উদ্ধৃতি দিয়েই তা প্রমাণ করছি। পরে এ পুস্তকের শেষাংশে স্বামীজীর মুসলমান প্রীতি, ধর্ম নিরপেক্ষতা, সত্য বলার বলিষ্ঠতা প্রভৃতির বর্ণনা ও তাঁর নাম ভাঙ্গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বুননের প্রচেষ্টার কথা বলা হবে।

"হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী ও প্রীতি স্থাপন করা স্বামীজীর জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যখন তিনি চান প্রত্যেক মানুষ Islamic Body and Vedantic Brain লাভ করুক, তখন ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাই নিবেদিত হয়েছে। জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন–'যদি কোন যুগে কোন ধর্মাবলম্বীগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্যরূপে সাম্যের সমীপবর্তী হয়ে থাকেন তবে একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণই এই গৌরবের অধিকারী।" (দ্রষ্টব্য ডক্টর সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ঃ বিবেকানন্দ, স্মৃতি, পৃষ্ঠা ৩৯)

* * *

পঞ্চম অধ্যায়

সর্বশেষ স্বাধীনতা আন্দোলন

আমাদের মধ্যে অথবা অভারতীয়দের মধ্যে বর্তমানে যদি কেহ ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস জানতে চান আর যদি তাঁকে ভারতীয় সরকারি পাঠ্যপুস্তক পড়তে দেয়া হয় তাহলে তাঁরা দেখবেন 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনে সমস্ত বিপ্লবীই প্রায় হিন্দু, মুসলমান জাতি যেন নীরব। আর এ সময় হতে একেবারে স্বাধীনতা প্রাপ্তির তারিখ পর্যন্ত ১৯৪৭-এর আগস্ট পর্যন্ত সমস্ত বিপ্লবই যেন হিন্দুদের দ্বারাই সংঘটিত। সেখানেও যেন মুসলমান জাতি নীরব। শুধু সংখ্যার আধিক্য দেখিয়ে এবং সাম্প্রদায়িকতার কোন্দল কোলাহলে অমুসলমানদের যেন বিব্রত করেছে মুসলমান এবং হিন্দুদের সাথে লড়াই ও ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে আদায় করেছে দু টুকরো জায়গা : যেটার নাম ছিল পাকিস্তান—এক টুকরো পূর্ব পাকিস্থান আর বড় টুকরোটা পশ্চিম পাকিস্তান। অবশ্য ইতিহাসের চাকা আরও ঘুরে পর্ব পাকিস্তান এখন হয়েছে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

অথচ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি স্বাধীনতার পথ পরিকল্পনা ও প্রকাশ মুসলমানদের দ্বারাই সংঘটিত এবং প্রথম ও দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনও প্রধানতঃ মুসলমানদের দ্বারাতেই পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু অমুসলমান বা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বা তদানীন্তন অধিকাংশ হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের বিরোধিতা অথবা অসহযোগিতার কারণে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়। তাতে ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষতি হয় সীমাহীনভাবে।

এক সময় মুসলমান জাতি শাসক জাতি হিসেবে গণ্য ছিল। সাংসারিক স্বাচ্ছল্য, সম্মান ও বড় বড় চাকরি নিয়ে স্বাভাবিকভাবে যে কোনও জাতি বা গোষ্ঠী যদি মাত্র পঞ্চাশ বছর কোন দেশকে শাসন করে তাহলে সে জাতির প্রত্যেকে "শাসক-জাতি হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নতি করতে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে নিতে সক্ষম হবে—এটা ঐতিহাসিক সত্য।

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া এ বিখ্যাত মুসলমান জাতি পৌনে এক হাজার বছর ভারতবর্ষে বিজয়ী জাতি হিসেবে বাস করেছে। অতএব তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও মর্যাদা ভারতের প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের চেয়ে সর্বোন্নত বা বেশি ছিল তাতে এতটুকু সন্দেহ করার অবকাশ নেই। কিন্তু কিভাবে মেরুদণ্ডহীন দরিদ্র জাতিকে পরিণত হল এ ভারতীয় মুসলমানরা, কিভাবে মর্যাদাহীন অশিক্ষিত ও অনুন্নত জাতিতে পরিণত হল এ মুসলমানরা তা জানতে চাইলে আজ জাতি ধর্মনির্বিশেষে শিক্ষিতদের বলতে শোনা যায়—মুসলমান জাতি পিছিয়ে গেছে নাকি উলামাদের ফতোয়া অনুযায়ী ইংরেজি শেখা হারাম করার জন্য। কিন্তু এ তথ্য অসত্য এবং এটা যে কুপরিকল্পিত চক্রান্ত মাত্র অর্থাৎ মুসলমানদের ইংরেজি শেখার পথই যে কায়দা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তার কিছু আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

প্রথমে আলোচনা করা হচ্ছে—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলিম জাতি যোগ দেয়নি, না কি তাদের সংগ্রামীদের মধ্যে যাঁদের হাতে নেতৃত্ব ছিল তাঁরা হচ্ছেন তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল, ব্যরিষ্টার পি, মিত্র প্রভৃতি নেতাগণ। তাঁদের কর্ম পদ্ধতি যেভাবে তৈরি করা হয়েছিল তাতে মুসলমানদের যাওয়ার পথ রুদ্ধ ছিল। কারণ সেটা ছিল পুরোপুরি হিন্দুধর্ম ভিত্তিক এবং ইসলামধর্ম বিরোধী। এ বক্তব্য প্রমাণ করতে একটি ঐতিহাসিক দলিলের উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "যে সভ্যকে দীক্ষা দান করা হইত, তাহাকে একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া ও একবেলা উপবাসী থাকিয়া পরের দিন স্নান ও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত।

দীক্ষাগুরু ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য পুষ্প–চন্দনাদি সাজাইয়া বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞ করিতেন। যজ্ঞের পর শিষ্য 'প্রত্যালীঢ়াসন'-এ উপবিষ্ট হইত এবং দীক্ষাগুরু শিষ্যের মাথার উপর গীতা ও তার উপর তরবারি স্থাপন করিয়া দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইতেন। শিষ্যকে দুই হস্তে প্রতিজ্ঞা-পত্র ধারণ করিয়া এবং যজ্ঞাগ্নি সম্মুখে তাহা পাঠ করিয়া শপথ গ্রহণ করিতে হইত।" (সুপ্রকাশ রায় ঃ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৬৪-৬৫)

অনুশীলন দলের উচ্চস্তরের নেতা পি, মিত্র এবং পুলিনদাস যেভাবে সভ্যদের প্রতিজ্ঞা করাতেন তাতে মুসলমানদের যোগ দেয়া কেন সম্ভব ছিল না সহজবোধ্য ঃ "...নির্জন 'সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে' যাইয়া একটু জাঁকজমক করিয়াই দীক্ষা গ্রহণ দিতাম।...প্রত্যেকেই দীক্ষান্তে 'কালীমূর্তিকে প্রণাম করিয়া আমাকে প্রণাম করিত।" (ঐ, পৃষ্ঠা ১৬৫)

প্রতিজ্ঞাপত্রের 'প্রথম বিশেস প্রতিজ্ঞা'র শিরোনামে লেখা ছিল–ওঁ বন্দেমাতরম। তারপর এ প্রতিজ্ঞপত্রের 'ঙ'র ১ নম্বরে লেখা ছিল–"স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তাই অসৎকর্ম জানিয়াও আমরা অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসাব ডাকাতির পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাকাতিলব্ধ অর্থের একটি কপর্দকও আমরা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া সমুদয় অর্থ আমাদের পরিচালকের হস্তে অর্পণ করিব। আমাদের প্রত্যেকের পারিবারিক অভাব বুঝিয়া তিনি যাহা আমাদের দিবেন আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।" (সুপ্রকাশ রায়, পৃষ্ঠা ১৬৪)

এখানে বোঝা যায়, তরুণের দল বাড়ি থেকে কোন সাহায্য পেত না অর্থাৎ পকেট থেকে চাঁদা দেয়ার রেওয়াজ ছিলনা। অথচ দেখা যাচ্ছে ডাকাতির ফাণ্ড হতে বাড়িতে অর্থাৎ সংসারে টাকা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল–'প্রত্যেকের পারিবারিক অভাব...' শব্দগুলোতে তা প্রমাণ হয়। এখন আন্দোলনের পদ্ধতিকে যদি কেহ 'মাছের তেলে মাছ ভাজা' বলে মন্তব্য করেন তাহলে তা কতটা ভুল হবে তা হিসেব করা কষ্ট।

বিগত দিনের ইতিহাসে মুসলমান প্রধান আন্দোলনগুলোতে দেখা যায় তাঁরা টাকা সংগ্রহ করেছেন নিজেদের সংসার হতে, গ্রামেগঞ্জে চাঁদা তুলে, জমিজমা বিক্রি করে, নিঃস্ব হয়ে তবুও ঠিক এভাবে ডাকাতি করে নয়। তাছাড়া প্রত্যেক বিপ্লবীকে সাহায্য করতেন তাঁদের মা, বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়-আত্মীয়া সকলেই। আরো একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল, মুসলমান বিপ্লবী নেতারা যে সমস্ত হিন্দু সহযোগীদের পেয়েছিলেন তাঁদেরকে মসজিদে নিয়ে গিয়ে ওযু করিয়ে, মাথায় কোরআন ঠেকিয়ে, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলে মন্ত্র পড়িয়ে, দাড়ি রাখিয়ে, লুঙ্গি পরিয়ে, রোযা ও ইফতার করিয়ে সভ্যদের শপথ গ্রহণ করান নি। অতএব উদারতা ও সঙ্কীর্ণতার বিচারে অথবা দূরদর্শিতার প্রাচুর্যে কারা প্রশংসনীয় তার মন্তব্য নিষ্প্রোয়োজন।

আর একটা কথা ভুললে চলবে না–স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম বিপ্লবীরা ডাকাতির পথে না গিয়ে সামনাসামনি সংগ্রামের ময়দানে নেমেছেন, মরেছেন, মেরেছেন, ধ্বংস করেছেন এবং ধ্বংস হয়েছেন। কিন্তু আলোচ্য সন্ত্রাসবাদী দল ব্যাপকভাবে ডাকাতি এবং গুপ্ত হত্যা করেছেন। আর গুপ্ত হত্যায় নিশ্চয়ই বেশি অর্থ ও অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কারণ একটি রিভলভার ও একটি ছোরা সারাজীবন ধরে কাছে রেখে অনেক গুপ্ত হত্যা করা যায়। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে নামলে বন্দুক, কামান, ঘোড়া, হাতি সবই দরকার হয় এবং যদি পরাজিত হতে হয় তাহলে সমস্ত অস্ত্র শত্রুর হাতে চলে যায়–সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, পূর্ববর্তীদের অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল, অপরদিকে এই হিন্দু কবলিত সন্ত্রাসবাদীদের এত অর্থের প্রয়োজন ছিল না। ডাকাতি সম্বন্ধে যদি বলা যায়, ডাকাতি করা হয়েছে বটে কিন্তু দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা মাত্র, তেমন বেশি টাকা সংগ্রহ হয় নি তাহলে উত্তরে বলতে হয়, প্রকৃত ইতিহাসে তাঁদের ডাকাতির বেশ নমুনা মজুদ আছে। কিছু নমুনা পেশ করা হয়েছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ডাকাতি শুরু হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এক বিধবা রমণীর বাড়ীতে ডাকাতি করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী দল জানতে পারেন যে ঐ গ্রামে একজন দারোগা আছেন। তাই তাঁরা নিঃশব্দে ফিরে আসেন। সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, "দারোগার উপস্থিতির সংবাদে তাঁহারা ভয় পাইয়া পলাইয়া যান" (পৃষ্ঠা ২২০)। অথচ 'ঙ' পরিচ্ছদে রাজনৈতিক ডাকাতি সম্পর্কে 'বিশেষ প্রতিজ্ঞাপত্রে'র ৪ নম্বর ধারায় খো ছিল -"প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ডাকাতি করিতে যাইয়া আমরা কোন রমণী, শিশু, দুর্বল, রুগ্ন নিঃসহায় প্রভৃতির উপর কখনই কোন প্রকার অত্যাচার করিব না।" (ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, ১৬৪ পৃষ্ঠা, পূর্ণ তথ্যঃ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ভারতের দ্বিতীয় সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১৩১)

নারায়ণগঞ্জে ১৯০৬-এ এ ডাকাতি করা একটা লোহার আইরন সেফ নিয়ে নৌকায় চাপিয়ে সন্ত্রাসবাদী দল পালাতে চেষ্টা করলে নৌকা ডুবে যায়। সামান্য কিছু টাকা লাভ হয় অথচ গৃহস্থের সর্বনাশ হয়। ১৯০৭-এর ঢাকায় এক পাটের অফিসে ডাকাতি করতে গিয়ে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি; শুধু তাঁদের দোনলা বন্দুকটি লাভ হয়। ১৯০৮-এ শিবপুর ছোরা ও পিস্তল নিয়ে অনেক কিছু করে মাত্র চারশ' টাকা উদ্ধার হয়। ডাকাতি করে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা যেভাবেই খরচ হোক না কেন কর্মীদের সংসারে বা পরিবারের জন্য টাকার ভাগ নেওয়া উপরের শর্তে প্রমাণ হয়েছে। তাহলে কি টাকা বেশী সংগ্রহ করা যায়নি? উত্তরে 'না' বললে ইতিহাসের বিপরীত কথা বলা হয়। যেহেতু ১৯০৮-এ একটা ডাকাতি করে বিপ্লবীরা ২৬ হাজার টাকা হাতে পান। এ বছরেই বাজিতপুরের ডাকাতিতে প্রচুর অর্থ বিপ্লবীরা নিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে বিপ্লবীরা ধরা পড়েন। দলের নরেন গোস্বামী রাজসাক্ষী হয়ে আসামীদের নাম বলে দেয়ার জন্য তাঁকে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হতে হয়। ফরিদপুরে ৮০ হাজার টাকার সংবাদ পেয়ে ডাকাতি করা হয় কিন্তু টাকা তাঁরা লুকিয়ে দেয়ায় বিপ্লবীদের বঞ্চিত হতে হলে তাঁরা তিনটি দোকান লুট করেন। ১৯০৯-এ রাজেন্দ্রপুর ষ্টেশনে ট্রেন ডাকাতি করে ২৩ হাজার টাকা লুণ্ঠন করা হয়। এই 'লুণ্ঠন' শব্দ শুনতে খারাপ লাগলেও ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় কিন্তু ঐ শব্দই ব্যবহার করেছেন। যাইহোক, পুলিশ তাঁদের অনুসরণ করে। বিপ্লবীরা ভয়ে ট্রেন হতে লাফ মারেন। পুলিশ ১২ হাজার টাকা উদ্ধার করে। বাকি টাকা বিপ্লবীরা সামলাতে সক্ষম হন। "১৬ই অক্টোবর অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ মুখোশ, রিভলভার, ছোরা, হাতুড়ি, টর্চ দ্বারা সজ্জিত হইয়া ফরিদপুর জেলার দারিয়াপুর গ্রামে একটি ডাকাতি করিয়া ২৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন।" (সুপ্রকাশ রায়, পৃষ্ঠা ২২৯)

রাজনগরের ডাকাতিতে ২৯ হাজার টাকা এবং মোহনপুর বাজারে ডাকাতি করে আরো "১৬ হাজার টাকা লুণ্ঠন করেন"। ১৯১০-এ শোলগাতীর ডাকাতিতে ২০০ টাকা, ধূলাগ্রামে ডাকাতিতে ৬১৭৫ টাকা, নন্দনপুরে ৬৫০০০ টাকা মহীষার ডাকাতিতে ২২০৪ টাকা বিপ্লবীরা সংগ্রহ করেন (দ্রষ্টব্য Sedition Committee Report, p. 98)। ময়মনসিং -এর ডাকাতিতে ১৫০০০ টাকা, ৭ই নভেম্বর ফরিদপুরে কলারগাঁও-এর ডাকাতিতে ৪৯৩৮৬ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ১৯১১-তে এক ডাক পিয়নের মনি অর্ডার ব্যাগ ছিনতাই করা হয় কিন্তু উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। ৫ই জানুয়ারি অনুশীলন দল এক বাড়ি "থেকে ৫৫৫০ টাকা লুণ্ঠন করেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী গোয়াবিয়ায় নগদ ও অলঙ্কারে মোট ৭৪৫৭ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ২২শে এপ্রিল লক্ষণকাঠি হতে ১০২০০ টাকা ডাকাতি করা হয়। ৩০শে এপ্রিল চরশশা গ্রামের ডাকাতিতে বিপ্লবীরা ২১৫০ টাকা, সিংহায়ের ডাকাতিতে ৮১৭০ টাকা, কালিয়াচকে ডাকাতিতে ৩১২৫ টাকা, বালিয়া গ্রামের ডাকাতিতে ১২১৮ টাকা এবং চাউলপালি গ্রামের ডাকাতিতে অনুশীলন দলের বিপ্লবীরা ১৯৭৭ টাকা লুট করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই বাইগুনতেড়িয়ায় ৩৪৭০ টাকা, ২১শে আয়নাপুরে ৭৫৯৩ টাকা, ২৩শে বিরঙ্গলে ৮০৮০ টাকা, ১১ই জুলাই পানামে ২০০০০ টাকা, ১৫ই জুলাই প্রতাপপুরে ৭০৯৫ টাকা, ১৪ই নভেম্বর ঢাকার লাঙ্গলবন্দে ১৬০০০ টাকা বিপ্লবীরা ডাকাতি করেন

অনুশীলন সমিতির সভ্য রজনী দাস ধরা পড়ে রাজসাক্ষী সেজে সব তথ্য ফাঁস করে দেন। সে মামলার নাম হয়েছিল প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা। এভাবে ১৯১৩-তে দশটি ডাকাতিতে ৬১০০০ টাকা, ভরাকাইরে ৩৪০০০ টাকা ধুধুলিয়াতে ৯০০০ টাকা ডাকাতি করা হয়। গ্রামবাসীরা বাধা দিলে কিছু আহত ও নিহত করে বিপ্লবীরা পলায়ন করেন। কাওয়াকুরির ডাকতিতে ৫১৩০ টাকা, কেদারপুরে ১৯৮০০ টাকা অনুশীলন দলের বিপ্লবীরা লুণ্ঠন করেন। এ ডাকাতিতে এক সাহসী গ্রামবাসী বাধা দিতে গেলে বিপ্লবীরা গুলি করে তাকে হত্যা করেন এবং আরো পাঁচ জনকে গুলিবিদ্ধ করে আহত অবস্থায় পরাজিত করে পলায়ন করেন। এভাবে সরাচর, খরমপুর এবং পশ্চিম সিংগ্রামের ডাকাতিতে বিপ্লবীরা মোট ১৩৪৯০ টাকা লুণ্ঠন করে গ্রামবাসীদের পরাজিত করে বিজয়ী হয়ে অনুশীলন সমিতির ধর্ম সংস্থাকে সার্থক করেন। কিন্তু মুসলমানরা যে এ সমিতিতে ব্যাপকভাবে নাম দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেনি, সে ঘটনা দুঃখের না আনন্দের তার বিচার করবেন আজকের ও আগামী দিনের নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রেমিক মানুষেরা।

হিন্দু জাতি ও হিন্দুধর্ম প্রেমিক খাঁটি হিন্দু দিয়ে গঠিত এই সংগঠনের ডাকাতি ও লুণ্ঠন নিশ্চয় সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের বাড়িতে হয়নি এবং তাঁদের ডাকাতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অহিন্দুদের উপরেই যে হয়েছিল–এমন কথা মনে আসা কঠিন নয়। আর সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর মজবুত হওয়ার ক্ষেত্রে এটাও একটা অন্যতম কারণ। মুসলমানদের এ বিষয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হতে হয় যে, তাঁরা ইংরেজের প্রত্যক্ষ অত্যাচারে জমিদারি ও জমি হারিয়েছেন, কুচক্রান্তে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা চালু হওয়ার তাঁরা চাকরি, সরকারি মর্যাদা ও রোজগার হারিয়েছেন, এবং জাতীয় ও বংশীয় মর্যাদা হারিয়ে উপজাতি ও তপসিলী জাতির মত একটা অনুন্নু জাতিতে পরিণত হয়েছেন। তাঁরা আরো চিন্তা করতে বাধ্য হন যে, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডা, প্রভৃতি জাতি একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পরেই মিশে গেছে হিন্দুধর্ম ও সমাজের সাথে; তারপর স্বাতন্ত্রহারা হয়ে গেছে–তাহলে মুসলমানদের ভাগ্যেও কি তাই আছে?

এরপর ভারতের সে বিখ্যাত নেতা বালগঙ্গাধর তিলক নেতৃত্ব দিলেন হিন্দুজাতির সামনে এসে। গবেষক সুপ্রকাশ রায়ের উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ "এভাবে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবার অজুহাতে বাল্য বিবাহের সমর্থন করে প্রগতি বিরোধীদের শক্তিশালী করে তোলেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি 'গোরক্ষা সমিতি' স্থাপন করে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে 'গোমাতাকে' রক্ষা করবার জন্য গোমাংসভোজীদের বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে অর্থনীতিক যুক্তিতর্কেব কথা বাদ দিলেও প্রধানতঃ ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হওয়ায় এ জাতীয় আন্দোলনের ঐক্য ও অগ্রগতি ব্যাহত করবার পক্ষে সহায়ক হয়। কারণ এ জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনের সহায়ক না হয়ে এ দু' সম্প্রদায়ের বিরোধের একটি প্রধান কারণ হয়ে থাকে। ... ভারতের মুসলমানগণ যে (ঐ সময়) বিপ্লব প্রচেষ্টায় যোগদান করে নেই, রাজনীতির সঙ্গে হিন্দুধর্মের সংমিশ্রণই তার অন্যতম প্রধান কারণ। তার ফলে ভারতের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রথম হতেই কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে এবং এভাবে প্রগতিশীল চরমপন্থী জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভারতের সমগ্র জনগণের ঐক্যের বদলে বিভেদের ভিত্তি রচিত হয়।" (সুপ্রকাশ রায়, পৃষ্ঠা ১১৪)

তাছাড়া হিন্দু বিপ্লবী নেতাগণ শিবাজী উৎসব ও গণপতি উৎসব পালন করেন। এটাও মুসলমানদের মনে হতাশার সৃষ্টি করে, যেহেতু তাতে মুসলমানদের প্রবেশের প্রশ্নই ওঠেনি। শিবাজীকে দেবতার মত বরণ করা তো হলই, সে সাথে 'গণপতি'-শ্লোকে যে ভাব ও ভাষা

ব্যবহার করা হল তাও বড় মারাত্মক–“হায়! তোমাদের দাসত্বে লজ্জা নেই? তা হলে আত্মহত্যাই করা উচিত। হায়! এই কসাইরা দানবীয় নিষ্ঠুরতার সহিত গো-মাতা ও গো-বৎসদের হত্যা করে। তোমরা এ যন্ত্রণা হতে গোমাতাকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হও”।

এ সময় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দল একত্রিত করে একটি দলের নাম দিলেন ‘হিন্দু ধর্মের অন্তরায় বিনাশী সংঘ’। মুসলমানকে ডাকার কথা কিন্তু কারও মনে ছিল না। ১৮৯৯ সনে ‘মিত্রমেলা’ নামে একটা সংগঠন হয়, তাতেও মুসলমানদের নেয়া হয়নি। আর একটি দল সৃষ্টি হল যার নাম ‘অভিনব নব্য ভারত সংঘ’–এখানেও মুসলমানরা উপেক্ষিত। ১৯০৬-এর প্রথম দিকে সৃষ্টি হয় ‘অভিনব ভারত সংঘ’, তাতেও মুসলমানের যাওয়ার উপায় ছিলনা। আবার একটি দল তৈরি হল যার নাম ‘গোয়ালিয়র নব ভারত সংঘ’। কিন্তু মুসলমান সব জায়গায় উপেক্ষিত। তাঁরা যেন ভারতের কেউ নয়। মনে রাখার কথা, তখন কিন্তু পাকিস্তানের পরিকল্পানাই হয় নি।

তারপর ‘হিন্দু মহামেলা’ ও ‘হিন্দুমেলা’ নামে দু'টি দল তৈরি হল। এভাবে নানা হিন্দু সংগঠন মুসলমানদের বাদ দিয়েই চলতে লাগল। এসব সংগঠনের কর্মী ও সভ্যরা ব্যায়ামের নাম করে অস্ত্রশিক্ষা শুরু করেন। তাঁরা তখন ভেবেছিল তাতেই ভারতের উন্নতির চরমতম সুফল পাওয়া যাবে। কেমনভাবে ট্রেনিং চলত সে সম্বন্ধে সুপ্রকাশ রায় এর পুস্তক হতে তুলে ধরছি ঃ “... আর আন্দোলনের মধ্যে থাকবে আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা লক্ষ্যভেদের অভ্যাস, তরবারি শিক্ষা, বোমা ও ডিনামাইট তৈরি শিক্ষা, রিভলভার সংগ্রহের ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করা এবং অপরকে শিক্ষা দেয়া।” কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ‘অপরকে শিক্ষা দেয়ার’ মধ্যে মুসলমান জাতি যেন মানুষ বলে গণ্য ছিলনা, ছিল জড় পদার্থ অথবা বিদেশী শত্রু বা অন্য কিছু।

বঙ্কিমের আদর্শে অরবিন্দ ঘোষের বিখ্যাত বই ‘ভবানী মন্দির’ রচিত হল ১৯০৫ সনে। এতে মুসলমানরা আরও হতাশায় ড়ুবে গেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন তাঁদের সামনে শুধু অন্ধকার। তাই তাঁরা হয়ত বাধ্য হয়েই বাঁচার পথ খুঁজলেন এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ‘মুসলিম লীগে’র জন্ম দিলেন। মুসলমানরা কেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বা স্বদেশী আন্দোলনে আশানুরূপভাবে যোগ দেননি তার কারণ বলতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ঃ “আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয়নি, বিরুদ্ধে ছিল। জননায়কেরা কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন–ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি ওরা (যোগ্য) দেয়নি। কিন্তু কেন দেয়নি? তখন বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে সে আশ্চর্য। কিন্তু এতবড় আবেগ শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল না, মুসলমান সমাজকে স্পর্শ করল না। সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয়নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীর করে রেখেছি। ... আমি যখন আমার জমিদারীর সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলাম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানার এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলাম ঃ ‘ এ কেন?’ তখন জবাব পাইলাম, যে সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায়, তাদের জন্য এ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেক দিন ধরে চলে আসছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। মুসলমানও মেনেছে। জাযিম তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তারপর ওদের ডেকে একদিন বলেছি ঃ আমরা (তোমার) ভাই, তোমাকেও আমার সাথে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে। তখন হঠাৎ দেখি, অপরপক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় নিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়? বাধা এ জাজিম তোলা আসনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোট নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।” (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪)

ডক্টর শ্রী আম্বেদকর লিখেছেন, "বাঙালী হিন্দুদের বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করার প্রধান কারণ ছিল, পূর্ববঙ্গে বাঙালী মুসলমানেরা যাতে যোগ্য স্থান না পেতে পারে সে আকাঙ্খার দরুণ। (দ্রষ্টব্য পাকিস্তান অর পার্টিশন অফ ইণ্ডিয়া–ইংরেজির অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১১০)

ভারতবর্ষে মুসলমান সংখ্যা লঘু হলেও অবিভক্ত বঙ্গে মুসলমান ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। মুসলমান জাতির এ আন্দোলনে যোগ না দেয়ার কারণ শুধু এটাই নয় যে শতাধিক বছরের মুসলিম প্রভাবিত স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোতে হিন্দুরা আশানুরূপ যোগদেননি তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। বরং এ বঙ্গভঙ্গ হওয়া অনেকের মতে মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল ছিল। তাই একজন আইনজীবি লেখকের উদ্ধৃতি দিচ্ছি–"এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল সন্দেহাতীতভাবে মুসলমান বিরোধী এবং গভীরভাবে মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী। এ আন্দোলনের তাগিদে যে সকল সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লববাদী নেতা কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিত হলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন গভীরভাবে মুসলমান বিরোধী। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম' বইতে লিখেছেন ঃ বিপ্লববাদীরা যে শ্রেণী থেকেই আসুন না কেন প্রত্যেকেই ছিলেন মুসলমান বিরোধী। (ভারত কি করে ভাগ হল ঃ বিমলানন্দ শাসমল, পৃষ্ঠা ২১)

তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, কংগ্রেস দলের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের উপর মুসলমানদের আস্থা রাখা কঠিন ছিল। কারণ–"প্রকৃতপক্ষে বড় লাটের সাহায্যে সংগোপনে রচিত পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ গণশক্তির পুঞ্জীভূত ক্রোধ হতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করবার জন্য অস্ত্ররূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই শাসক-গোষ্ঠীর দ্বারা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হতে ভারতের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এ প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন বিপ্লবকে (কৃষক বিদ্রোহকে) পরাজিত করা, অথবা আরম্ভের পূর্বেই তা ব্যর্থ করা"। (R. P. Dutt : India Today p. 289-90)

কংগ্রেসের সভাপতি ১৮৮৫-র ২৯ ডিসেম্বর তাঁর ভাষণে বলেছিলেন ঃ "এটা বোধ হয় অনেকের কাছে নতুন সংবাদ যে ভারতীয় কংগ্রেস–যা প্রথমে সৃষ্ট হয়েছিল-এবং এখনও কাজ করে যাচ্ছে–সেটি বাস্তবিক পক্ষে লর্ড ডাফরিনের দ্বারা হয়েছিল, যখন এ মহাপ্রাণ ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন .... লর্ড ডাফরিন হিউমের সাথে এ শর্ত করেছিলেন যে, যতদিন তিনি ভারতে থাকবেন, ততদিন কংগ্রেস সম্পর্কিত তাঁর নাম সাধারণ্যে প্রকাশিত হবেনা। তাঁর এ শর্ত অক্ষরে অক্ষরে প্রতি পালিত হয়েছিল।" (জাস্টিস্ আঃ মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃষ্ঠা ২৩৫–২৩৬)

অবশ্য এ কংগ্রেস অনেক পরে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব সৃজন করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে কংগ্রেসের চরমপন্থী অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী দলে যে মুসলমানদের মোটেই যাওয়া চলেনা তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তাই বলে এ নয় যে, ১৯০৫-এর পর থেকেই মুসলমানরা সামগ্রিকভাবে ইংরেজদের সাথে সংগ্রাম বন্ধ করে দেয়, বরং ১৯২১ পর্যন্ত মুসলমানরা (মোপলা) কিভাবে বিপ্লব চালিয়েছিল তার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। ১৯২১-এর পরও ১৯৪৭ পর্যন্ত মুসলমানরাা একইভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, কোনভাবেই তাঁদেরকে বিপ্লব থেকে যে বিরত করা যায়নি–সে আলোচনা পরে আসছে।

বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য যদি কেহ প্রস্তাব করেন–মুসলমানরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, বন্ধু হবার যোগ্য, তাদের সাথে মিলনের প্রয়োজন আছে–তা মেনে নেয়া অনেকের পক্ষে অকল্পনীয়। শ্মশান হতে স্বয়ং মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বললেও না। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন–"মুসলমানদের চরিত্রে যে স্বাভাবিক সরলতা আছে তাহা স্বীকার করিবার উপায় নেই। তাঁহাদের গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি যে তাঁহাদিগকে জীবনযুদ্ধে বিজয় লাভের ক্ষমতা দিয়াছে, তাও নিঃসন্দেহে। যে সকল মুসলমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে

আসবার সুযোগ আমার হয়েছে, তাঁদের সকলকেই আমি ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি; তাঁদের সংখ্যা কম নহে। আমার চিরদিনের বিশ্বাস এ যে, প্রধানতঃ মূর্খতা ও প্রাচীন যুগীয় যুক্তিহীনতাবশতই আমরা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এবং ঘনিষ্ঠতার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব দ্বারা সেই ভেদ বিভেদ দূর করা সম্ভব।" (দ্রষ্টব্য 'বরীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও আম্বেদকর' ঃ জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, পৃষ্ঠা ৯৭)

কোন অমুসলমান যদি বলেন, মুসলমানদের বাদ দিয়েই তখন কংগ্রেসের চরমপন্থীরা চলতে চাচ্ছিলেন তাহলে তা শ্রুতিকটুই লাগবে। কিন্তু একজন হিন্দু আইনবিদ, বিমলানন্দবাবু লিখেছেন, "চরমপন্থীরা ভেবেছিলেন, মুসলমান না এলেও ক্ষতি নেই, তাঁরাই একা স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। কিন্তু গান্ধীজী দেখলেন, মুসলমানদের সমর্থন না পেলে ভারতের স্বরাজ আন্দোলন সম্পূর্ণ সফল হতে পারবে না। কি করে স্বরাজ আন্দোলনকে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলনে রূপান্তরিত করা যায়, তিনি তার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলেন ... মুসলমানদের তরফ থেকে খিলাফত কমিটি ঠিক করলেন বড় লাটের সাথে দেখা করে তাঁদের দাবীগুলো তাঁর কাছে উপস্থিত করবেন,–দাবী না মানলে সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন করা হবে। ১৯২০-র ১ আগষ্ট খেলাফত কমিটির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার কথা ছিল (বরাবর মুসলমান বিপ্লবীরা যেমন হিন্দুদের টানতে চেষ্টা করার ইতিহাস পিছনে রেখে এসেছেন এবারও হিন্দুদের একজনকে তাঁদের সাথে নিয়ে, শুধু চেয়ারে বসা নেতা নয়, প্রকৃতই নেতা করার পর জনসাধারণ যদি যোগ দেন তাহলে বিপ্লব বা সংগ্রাম সার্থক হবে–সেজন্য গান্ধীজীকে দলে আনার প্রস্তাব দেন ঃ লেখক)। গান্ধীজী এ খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে রাজি হয়ে যান। কিন্তু ফিলাফত আন্দোলনের উদ্যোক্তারা মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা শওকত আলির নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগের প্রস্তাব আগেই গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তাঁরা প্রকাশ্য সভায় প্রস্তাব পাশ করে মুসলমান জনসাধারণকে ভারতস্থ ইংরেজ সেনাদল থেকে পদত্যাগ করে ভারতীয় আর্মির সাথে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে স্বধর্ম রক্ষার জন্য আবেদন জানালেন। এটা ছিল প্রকাশ্য রাজদ্রোহ। আলি ভ্রাতৃদ্বয় এর আগেই রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে অন্তরীণ জীবনযাপন করে এসেছিলেন। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল, খিলাফত (মুসলমান) আন্দোলনেযোগ দিয়ে তাঁর বৃহত্তর অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানদের সহযোগিতা লাভ করা। কিন্তু হিন্দু সাধারণ এবং বেশির ভাগ নেতৃস্থানীয় হিন্দু খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না এবং এর সংস্পর্শ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।" (দ্রষ্টব্য বিমলানন্দ শাসমল ঃ ভারত কি করে ভাগ হল, পৃষ্ঠা ২৯)

কংগ্রেসীরা কিন্তু তখনও পর্যন্ত 'স্বাধীনতা' কি পদার্থ তা চিন্তা করতে ভরসা করতেন না। তাই বিমলানন্দবাবু বলেছেন, "কংগ্রেসের নেতারা প্রায় এক বাক্যে বললেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাসস পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে ভাল; কিন্তু খিলাফত-এর মুসলমান নেতারা বললেন, পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।" (বিমলানন্দ শাসমল, পৃষ্ঠা ৩০)

গান্ধীজী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আর তাঁর মৃত্যু ১৯৪৮-এ। তাঁর রাজনৈতিক উন্নতির মূলে ছিল মুসলমানদের উদার আগ্রহ; তাঁরাই তাঁকে খিলাফত কমিটির নেতা করে দেয়া, 'মহাত্মা' উপাধি দেয়া এবং সারা ভারতে তাঁকে প্রদর্শন ও উপস্থিত করে মুসলমানদের মনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। গান্ধীজী মানুষ হিসেবে ছিলেন, নরমমনা, অসাম্প্রদায়িক এবং মানুষ প্রেমিক। সে জন্য চরমপন্থীদের ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা তিনি মোটেই মেনে নিতে পারেন নি। চরমপন্থীরা সম্মুখ সমরে না গিয়ে শত্রুকে গুপ্তভাবে হত্যা করতে চাইতেন বা করতেন, অবশ্য তাকেও অনেক স্বীকৃতি দিয়েছেন। গুপ্তহত্যার কয়েকটি নমুনা দেয়া যেতে পারে–যেমন ইংরেজের গোয়েন্দা অফিসার সামসুল আলমকে হত্যা করা হয়। ময়মনসিং-এর পুলিশ অফিসার রাজকুমার নিহত হন। হরিপদ কলকাতার সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নিহত হন। রতিরাল রায়, নৃপেন ঘোষ, সত্যেন সেনও নিহত হন ছোরা ও বন্দুকের

গুলিতে। এভাবে রামদাসকেও হত্যা করা হয়। যাঁদের হত্যা করা হত বেশির ভাগ তাঁরা ইংরেজ কর্মচারি অথবা পার্টির বিরুদ্ধে তথ্য প্রকাশ করার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবার এমন গুপ্তহত্যাও হয়েছে যার কারণ এ সবের মধ্যে নয়–১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২০ মার্চ নিমেজ গ্রামের একটি মন্দিরে ডাকাতি করতে গিয়ে মন্দিরে মোহন্তকে ভুলবশত হত্যা করা হয়। (দ্রষ্টব্য সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৮)

গান্ধী এমন চরিত্রের মানুষ ছিলেন যে, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের নিহত হবার ঘটনা তো দূরের কথা, অত্যাচারী ইংরেজদের কারও নিহত বা আহত হবার সংবাদে তিনি আঘাত পেতেন। সুতরাং সন্ত্রাসবাদীদের সাথে আন্তরিকতার সাথে হাত মেলান তাঁর পক্ষে কখনও সম্ভব ছিলনা। ওদিকে সন্ত্রাসবাদী দলেল জনপ্রিয়তা ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। এটা সত্য যে, তখন গান্ধীজীর চেয়ে লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি ছিল। গান্ধীর বিরুদ্ধে গুজব ছড়িয়ে দেয়া হল–তিনি প্রকৃত হিন্দু নন, বেদ পুরাণ মানেন না এবং মুসলমানদের গো-মাংস খাওয়ার তিনি পক্ষপাতী। তখন তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা, ১২.১০.১৯২১-এ এ গুজবগুলোর ইংরেজিতে উত্তর দিয়ে তা খণ্ডন করলেন। ইংরেজি বক্তব্যের অনুবাদ–"আমি নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলি যেহেতু (ক) আমি বে, উপনিষদ, পুরাণ অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্র বলতে যা কিছু বোঝায়–সুতরাং অবতারবাদ এবং পুনর্জন্মও বিশ্বাস করি; (খ) বৈদিক বিধান সম্মত বর্ণাশ্রমধর্ম আমি বিশ্বাস করি, অবশ্য প্রচলিত অবস্থায় আমার আস্থা নেই; (গ) প্রচলিত অর্থে নয় বৃহত্তর অর্থে আমি গোরক্ষা–নীতি সমর্থন করি; (ঘ) মূর্তিপূজা আমি অবিশ্বাস করিনা।" (পনরই আগষ্ট ঃ শ্রী সত্যেন সেন, পৃষ্ঠা ১০৬)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মাওলানা মহাম্মদ আলির নেতৃত্বে মুসলমান জাতির গান্ধীর সাথে সহযোগীতায় হিন্দু-মুসলিমে যে মিলন সৃষ্টি হয় তাতে ইংরেজ খুব ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মাওলানা মহাম্মদ আলি, শওকত আলি ও হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব প্রমুখ মনীষীগণ সৈন্যদের মধ্যে আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করলে তিনজনকেই ৬ বছর করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এখানে দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, গান্ধীর চেয়ে বড় তো দূরের কথা, মাওলানা মহাম্মদ আলীকে তাঁর সমপর্যায়েও স্থান দেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, তাঁদের নাম সরকারি ইতিহাসে আজ অবলুপ্ত বললেও ভুল হবেনা।

আবদুল আলী খাঁনের তরুণী পত্নীর কোলে মহাম্মদ আলী যখন ছ'বছরের শিশু শওকত আলীর বয়স তখন সাত বছর। তাঁদের এ অবস্থায় রেখে আবদুল আলী খাঁন মারা যান। ২৭ বছর বয়সের বিবি আম্মা আবিদা বানু ছেলেদের ধর্মীয় ধারণা পাকা করে উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা দেয়ার জন্য বিলেত পাঠান। দেশে ফিরে মহাম্মদ আলী চাকরি গ্রহণ করেন। তারপর দেশেরই প্রয়োজনে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। 'কমরেড' ও 'গুপ' (GUP) নামক দু'টি পত্রিকা তিনি পরিচালনা করতেন। কমরেড পত্রিকার উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু-মুসলমানে মিলন সৃষ্টি করা। ইংরেজিতে এ দু'খানা পত্রিকা ছাড়াও 'হামদর্দ' নামে একটি উর্দু পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্যতম অগ্রদূত মাওলানা মহাম্মদ আলী ৫০০ উলামার স্বাক্ষর করিয়ে এ মর্মে ইশ্‌তেহার প্রচার করেছিলেন যে, স্কুল, কলেজ, অফিস এবং সমস্ত ব্যাপারে ইংরেজের সাথে সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে হবে।

নেহেরু-রিপোর্টে মুসলমান স্বার্থ বিরোধী কথা দেখে তিনি কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ভারতবর্ষে থাকাকালীনই গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য তিনি অনলবর্ষী বক্তৃতা দিয়ে যক্ষাকাশে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে অবস্থাতেই তিনি সেখানে যান। আলোচনায় তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বলেছিলেন ঃ স্বাধীনতা না নিয়ে গোলামের (ইংরেজ শাসিত) দেশে আর ফিরব না। হয় তোমাদেরকে ভারতের স্বাধীনতা দিতে হবে নতুবা আমাকে এখানেই কবর দিতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন, আমি এখানে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ভিক্ষা করতে আসিনি; আমার একমাত্র কাম্য পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই আমি এখানে এসেছি। তিনি আরও বললেন, জওহরলালকে স্বাধীনতার

Goto List

কথা উচ্চারণ করতে দেননি মতিলাল নেহেরু। ১৯২৮ সনে যখন স্বাধীনতার জ্বলন্ত আগুন, তখন জওহরলালকে কলকাতাতে তাঁর পিতাই গলা টিপে ধরেছিলেন। 'জওহরলালেরও জন্য আমি বলেছিলাম, বিড়াল হয়ে জন্ম নিয়ে তবুও তোমার পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর না।' ... তখন আমি দাঁড়িয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছিলাম। নেহেরু-রিপোর্টের যে দফায় ঔপনিবেশিক স্বাসয়ত্তশানের দাবীর উল্লেখ ছিল সে দফার প্রতিবাদ করেছিলাম আমিই।

বক্তৃতা করতে করতে তাঁর আরও রক্তক্ষরণ হয়। ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুর ঠিকপূর্ব মুহূর্তে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন সূত্রের একটি খসড়া তৈরি করেছিলেন। সেটা আর তাঁকে শেষ করতে হয়নি। ১৯৩১ খৃস্টাব্দে ৪ জানুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

খেলাফত কমিটির সাথে কংগ্রেসের বিরাট পার্থক্য ছিল যথাক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতা ও ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা স্বাসয়ত্তশাসন নিয়ে। ১৯২১ সনে আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনে সৎ সাহস কিংবা দুঃসাহস নিয়ে যে বেচারা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির কথা উত্থাপন করেন তাঁর নাম মাওলানা হযরত মোহানী। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলে ফেললেন, "....The demand has grived me because it shows lack of responsibility." অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি আমাকে বেদনা দিয়েছে, কারণ প্রস্তাবটি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। এভাবে মুসলমানরা বারে বারে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলে অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছেন। আবার ১৯২২ খৃস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতেও খেলাফত এবং উলামাদের জমিয়ত থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানান হয় এবং প্রস্তাব নেয়া হয় যে, "ভারতবর্ষ এবং মুসলমানদের স্বার্থের খাতিরে এখন হতে কংগ্রেসের মূলমন্ত্র 'স্বরাজে'র পরিবর্তে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' হওয়া উচিত।" এবারেও কংগ্রেস এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করে বলল, "এতদ্বারা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের আমুল পরিবর্তন হবে।"

"এদিকে গান্ধীজী ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেন। ফলে, খিলাফত আন্দোলনের ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের যে মিলন-ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছিল তা ভেঙ্গে গেল।" (দ্রঃ সত্যেন সেন ঃ পনরই আগষ্ট, পৃষ্ঠা ১০৬)

১৯৪৬ খৃস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বেতে তলোয়ার ট্রেনিং স্কুলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ১৯ তারিখ সকাল বেলায় বিশ হাজার জল জাহাজ কর্মী কংগ্রেসের পতাকা ও মুসলিম লীগের পতাকা উড়িয়ে বিপ্লব শুরু করতে চায়। সংবাদ পেয়ে ইংরেজ সরকার ভারতীয় সৈন্য পাঠায় তাঁদের গুলি করার জন্য। কিন্তু ভারতীয়রা ভারতীয়দের বুকে যখন গুলি করলেন না, তখন ইংরেজ সৈন্যই এগিয়ে এল। বিপ্লবীরা প্রস্তুত হলেন মোকাবিলা করার জন্য কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ কেহ 'এগিয়ে' যাননি। জনগণ হরতাল পালন করতে চাইলে কংগ্রেস নেতা সর্দার প্যাটেল তা নিষেধ করেন। শুধু তাই নয় প্যাটেল ধর্মঘটীদের ইংরেজের পদতলে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। ইংরেজ সেনাপতি সমস্ত নৌবিভাগীয় বিপ্লবীদের খতম করার জন্য তৈরি হলেন অথবা ভয় দেখালেন। আর এদিকে সর্দার প্যাটেল একটা বিবৃতি দিয়ে বললেন, "নৌ-বাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে (ইংরেজ) প্রধান সেনাপতির অভিমতকে অভ্যর্থনা করলেন। (দ্রষ্টব্য সত্যেন সেনের পনরই আগষ্ট, পৃষ্ঠা ৪২)

বর্তমান ইতিহাসে কথিত 'জাতির জনক' করমচাঁদ গান্ধী ইংরেজের প্রতি বেশ দরদ রাখতেন। তাঁদের উপর বিপ্লবীদের দ্বারা কোন চাপ এলেই তিনি 'অহিংসা নীতি' প্রয়োগ করতে চাইতেন। ইংরেজকে যত তাড়াতাড়ি তাড়ান যায়–কোটি কোটি মানুষের সাথে সুভাষ বোস ও চিত্তরঞ্জন দাশ পর্যন্ত যখন এ সুর তুললেন তখন হতেই এ সমস্ত নেতাদের সাথে তাঁর মতের গরমিল ও ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়। ১৯৪৬ সনের ৭ জুলাই বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ মহাসম্মেলনে এ একচ্ছত্র নেতা গান্ধীজী বলেছিলেন, "ইংরেজরা ভারত ছাড়বার জন্য নিজেরাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের শান্তিতেই যেতে দেয়া উচিত, আন্দোলন করে তাদের যাবার পথে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়" (দ্রষ্টব্য সত্যেন সেন ঃ পনরই আগষ্ট, পৃষ্ঠা ৫৮)। গান্ধীজীর এ উক্তি তাঁর দয়ালু মনের পরিচয় দেয়; কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাদের মান নির্ণয়ে এ উক্তির মূল্য ও প্রয়োজন কতটুকু তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে।

এমনিভাবে বিখ্যাত নেতা সর্দার প্যাটেল এ সময়ে বললেন, "ইংরেজের সাথে সংগ্রামের আর প্রয়োজন নেই। তাঁরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবে বলে স্থির করেছে।" (দ্রষ্টব্যঃ সত্যেন সেন, পৃষ্ঠা ৫৯)

তখনকার প্রভাবশালী নেতা রাজাগোপালাচারী ২৬ নভেম্বর জামসেদপুরে বললেন, "আমরা তো ইতিমধ্যেই স্বাধীন হয়ে গিয়েছি। ....একদল রোগী আছে-যারা আরোগ্য লাভ করেও মনে করে অসুখ সারে নাই এবং তদনুযায়ী ঔষধ সেবন করতে থাকে।" [দ্রষ্টব্য ঐ. পৃষ্ঠা ৫৯]

নেতৃবৃন্দের এ রকম মনোভাবের সাথে বংশানুক্রমিকভাবে মুসলিম বিপ্লবীরা সকলেই একমত হতে পারেন নি। আবার অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীদের হিন্দু দেব-দেবী মার্কা নীতিতেও নিজেদের যুক্ত করতে পারেন নি; তার কারণ আমরা আগে বলেছি। ঐতিহাসিক সত্যেন সেনও লিখেছেন, "ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের বিশ্বাসীর চক্ষে দেখত না। রাজত্ব হারিয়ে মুসলমানগণই প্রথমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিল।" (দ্রষ্টব্য : পনরই আগষ্ট, পৃষ্ঠা ১০২)

সত্যেন সেন সত্য তথ্য লিখতে গিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভুলত্রুটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে এতটুকু সমীহ করেন নি। তিনি লিখেছেন, "অতঃপর তিলক গোহত্যা নিবারণের উদ্দেশ্যে গোরক্ষা সোসাইটি নামে একটি সমিতি সংগঠন করলেন। এতদ্ব্যতীত শিবাজী উৎসব, হস্তীমুখো দেবতা গণেশ প্রভৃতির পূজাও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হতে লাগল। বাংলাদেশে সুরু হল ধ্বংসের দেবতা কালীর সাধনা। ..... তথাপি হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করবার ফলে জাতীয় আন্দোলনের গতিধারা সম্মুখগতি অবলম্বন না করে পশ্চাদগামী হয়ে পড়ল। কারণ গো-হত্যা নিবারণ, দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মসূচী হলে অপরাপর ধর্মসম্প্রদায় সে প্রতিষ্ঠানকে প্রীতির চক্ষে দেখবে-তা আশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বলাবাহুল্য, এ গোঁড়া হিন্দু মনোভাবই শেষ পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলন হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন বহু হিন্দুও এ গোঁড়ামি বরদাস্ত করতে না পেরে চরমপন্থীদের সংস্রব ত্যাগ করেন।" (দ্রষ্টব্য : সত্যেন সেন : পনরই আগষ্ট, পৃষ্ঠা ১০০-১০১)

অবশ্য এ সমস্ত উৎকট সাম্প্রদায়িক ধারা কেমনভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কলমের অগ্রভাগ থেকে বেরিয়ে এসেছিল তা পরিচয় দিয়েছেন তাত্ত্বিক লেখক সুপ্রকাশ রায়-"এভাবে বঙ্কিমের কাছ থেকে তারা (অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদীরা) লাভ করেছিল উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা। এ শিক্ষাই তারা গ্রহণ করল তাদের জাতীয়তাবাদ রূপে।" (সুপ্রকাশ রায়, পৃষ্ঠা ১২৬)

বঙ্কিমের কমবেশি প্রভাব প্রত্যেক হিন্দুনেতার উপর কেন পড়েছিল, কিভাবে পড়েছিল তার সুষম ব্যাখ্যা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। তবু চরমপন্থীদের কথা ছেড়ে, নরমপন্থীদের ভিতরেও সাম্প্রদায়িকতা ও ছুৎমার্গতা কেমন ছিল তার নমুনা দেখাতে বলা যায়, বিশাল ভারতের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট তখন ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। সেটা ছিল ১৯৩৩ সন। জাতির কাজে জনগণের সেবায় তাঁকে পেশোয়ার যেতে হয়। সেখানে তিনি এক কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে ডিনারে আমন্ত্রিত ছিলেন বলে আগেই বলে দিয়েছিলেন-যে পাত্রে জীবনে কখনও মাংস রাখা হয়েছে তাতে যেন তাঁর খাবার না পাঠান হয়। "তাই তাঁর নিমন্ত্রণকারী বাজার থেকে কিনে আনেন সম্পূর্ণ আনকোরা ডিনার সেট। আর যেহেতু পণ্ডিতজী ছিলেন নিরামিষাশী, তাই তার নিমন্ত্রণকারী বাজার থেকে যোগাড় করলেন সর্বোৎকৃষ্ট ধরণের কলা ও কমলাদি। ডিনার টেবিলে প্রশ্ন উঠল তখন ঃ তাঁকে প্রদত্ত এসব ফল বাগান থেকে টেবিলে আসার মাঝখানে কোন মুসলমান বা অচ্ছুত অস্পৃশ্য হিন্দু ছুঁয়েছে টুয়েছে কিনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ নিমন্ত্রণকারী সে হিন্দু কংগ্রেস-সদস্য পণ্ডিতজীকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। ফলে, নিমন্ত্রণকারীকে সাংঘাতিক রকমে বিব্রত করে দিয়ে পণ্ডিত মালবীয়া কিছু না খেয়েই ডিনার টেবিল থেকে উঠে যান।" (ভুলে যাওয়া ইতিহাস : বারিস্টার সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা ৮৪)

এর সমাধান বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে সময় দিয়েছেন খুব কম। অবশ্য সমাধান অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের মিলন কিভাবে হবে যিনি নির্ধারণ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। যিনি ১৮৭০-তে জন্মে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে উল্কার মত ছুটে চলে গেলেন পরকালের ডাকে। মুখে ভণ্ডামি না করে কাজে পরিণত করার মহান নেতা ছিলেন তিনি। তিনিও কংগ্রেসী ছিলেন, তিনিও সন্ত্রাসবাদীদের দলে গিয়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত নিজেকে নিজেই সংশোধন করে মেরুদণ্ড সোজা করে পুনরায় কাজে নেমেছিলেন। ১৯২৩ সনে তিনি তৈরি করলেন 'নিখিল ভারত স্বরাজ্য দল'। "গান্ধীজীর মত চিত্তরঞ্জনও অচিরেই বুঝতে পারলেন, যেমন বাইরে তেমনি আইন সভার ভিতরেও মুসলমানদের সাহায্য না পেলে তাঁর সংগ্রাম সফল হতে পারবে না। .... ১৯২৩ সনে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীতে তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দু মুসলিম চুক্তি' সম্পাদন করলেন। একে 'বেঙ্গল প্যাক্ট'ও বলা হয়ে থাকে। এ চুক্তির ফলে আইন সভাগুলোতে মুসলমানদের গরিষ্ঠতার অনুপাতে সদস্য সংখ্যা নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হল এবং এ ব্যাপারে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির পূর্ব সম্পাদিত সর্বভারতীয় হিন্দু মুসলিম চুক্তির শর্তগুলো অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হল। .... সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের ৫৫ শতাংশ ও হিন্দু ও অন্যান্যের ৪৫ শতাংশের ব্যবস্থা হয়েছিল। ধর্মীয় সহনীয়তার ক্ষেত্রে এ চুক্তি কয়েকটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিল–(১) নামাযের সময় মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করা চলবে না। (২) মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য গোহত্যা হলে তাতে বাঁধা দেয়া চলবে না। কিন্তু হিন্দুদের মনে আঘাত লাগে এমন স্থানে গোহত্যা করা চলবে না। .... হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হল। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং জমিদার শ্রেণীর হিন্দুরা এ চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ও সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্দ হলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল, যাদের হাতে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের পরিচালনার ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। এমনকি গান্ধীজী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্রঘোষ পর্যন্ত প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ 'মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে আমরা তাদের একটার পর একটা দাবী বাড়িয়ে তুলতেই সাহায্য করছি' (২৫.৪.১৯২৭-এর 'দি বেঙ্গলী')। চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সম্বন্ধে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ 'ইণ্ডিয়া ইউনস্ ফ্রিডম' বইতে লিখেছেন ঃ 'এ সাহসিক ঘোষণা বঙ্গীয় কংগ্রেসের ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছিল। বহু কংগ্রেস নেতা তুমুলভাবে এর বিরোধিতা করলেন এবং মিঃ দাশের বিরুদ্ধে প্রচারশুরু করে দিলেন। ... এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, তিনি দেহত্যাগ করার পর তাঁর কিছু সংখ্যক শিষ্য তাঁর আদর্শকে খর্ব করে দিলেন এবং তাঁর এ ঘোষণাটিকে বাতিল করে দেয়া হল। ফলে এটাই হল যে, বাংলার মুসলমানেরা কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াল এবং দেশ বিভাগের প্রথম বীজ বপন করা হল।' (মূল ইংরেজীর অনুবাদ, পৃষ্ঠা ২১)–এ তথ্য এবং উদ্ধৃতি আইনজীবী লেখক বিমলানন্দ শাসমলের 'ভারত কি করে ভাগ হল' পুস্তকের ৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃত।

১৯২৫-এর ২রা মে চিত্তরঞ্জন দাশ ফরিদপুরে বিশাল জনসভায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বলেছিলেন এবং সে সাথে আরও বলেছিলেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস অপেক্ষা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিই সঠিক। এ কথা বলার ফলে সাম্প্রদায়িকতায় আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মীদের কাছ থেকে যে অপমান ও দুর্ব্যবাহার তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁর বুকে সহস্রমণ ওজনের হাতুড়ির মত ধাক্কা দেয়। শেষে মর্মাহত ও শোকাহত হয়ে অশ্রুপ্লুত নয়নে সভা ছেড়ে তাঁকে নেমে যেতে হয়–"কংগ্রেস কর্মীদেরকাছে দুর্ব্যবহার লাভ করে তিনি মণ্ডপ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। সন্ধ্যা বেলায় তাঁর জ্বর হয়। তিনি অসুস্থ ছিলেন–তা বেড়ে যায়। তাঁর অসুখ সারে নি। ১৬ই জুন দার্জিলিংয়ে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।" (বিমলানন্দ, পৃষ্ঠা ৩৮)। চিত্তরঞ্জনের কোন পুত্র ছিল না–দেশের ছেলেমেয়েরাই যেন তাঁর পুত্র-কন্যা ছিল। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবীও ছিলেন বিদুষী রাজনীতি সচেতনা মহীয়সী নারী।

পূর্বের কথায় ফিরে এসে বলা যায়, মুসলিম লীগ জন্মগ্রহণ করে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু তখনো মহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকা কংগ্রেসী। যখন তিনি মুসলিম লীগে প্রবেশ করলেন তখন পাকিস্তানের কথাও ওঠেনি। চিত্তরঞ্জনের চুক্তির কবর হওয়ার সাথে সাথে বড় বড় মুসলিম নেতা কংগ্রেস হতে সরে পড়লেন-যেমন বিখ্যাত সাংবাদিক ও কতকগুলো পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আকরাম খাঁর মত মানেষেরা।

১৯২৭-এর ২৩শে ডিসেম্বর একটা সাক্ষাতকারে জিন্নাহ জানালেন, "মুসলমানরা আর কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেনা।" (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫.১১.১৯২৭) চিত্তরঞ্জনের এ প্যাক্ট-এর কবর রচনায় যে কংগ্রেসী হিন্দু নেতা বাধা দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্র শাসমল। তিনি একজন নামকরা নেতা। গান্ধীর সহকর্মী। তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারের মামলার আসামী অনন্ত সিং, লোকনাথ বল ও গণেশের পক্ষে বিনা টাকায় লড়ে তাদেরকে ফাঁসি হতে উদ্ধার করেছিলেন। তিনিই ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদককে গুলি করে হত্যা, পেডি হত্যা, বার্জ হত্যা ও আরামবাগ ডাকাতির মামলায় সন্ত্রাসবাদী আসামীদের পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকে লড়েছিলেন। অথচ সন্ত্রাসবাদীরা তার প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতা দেখাননি। শুধু তাই নয়, কৌশল করে তাকে রাজনীতি হতে বের করে দেয়া হয় এবং আজকের ইতিহাসে তিনি উপেক্ষিত বললেও অত্যুক্তি হয়না।

বীরেন্দ্র শাসমলকে কংগ্রেসের পক্ষে দাঁড়াবার মনোনয়ন পত্র দেয়া তো হলই না, তাঁর বিরুদ্ধে অন্য প্রভাবশালী নেতা দেবেন্দ্রলালকে দাঁড় করান হল। তবু যেহেতু বীরেন্দ্রকে পরাজিত করা সহজ ছিলনা তাই চিত্তরঞ্জনের বিদূষী স্ত্রীর পক্ষ হতে শ্রী শাসমলের বিরুদ্ধে একটি ইস্তেহার ছেপে বিলি করা হয়। অবশ্য ন্যায় ও সত্যের ঘোষিকা দেশ বন্ধুর স্ত্রী তা জানতে পেরে পরে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তা জাল ছিল-সেটা মোটেই তার অনুমতি নিয়ে ছাপা হয়নি। যাই হোক, বিধান রায়ের অনুরোধে ভোটের পূর্বে এ কথা গোপন রাখা হয়েছিল। (দ্রষ্টব্য ঃ বিমলানন্দ শাসমল, পৃষ্ঠা ৯৮)

খুবই পরিতাপের বিষয়, চিত্তরঞ্জনের নাম ইতিহাসে যেভাবে থাকা উচিত ছিল সেভাবে কিন্তু রাখা হয়নি। অন্য নেতাদের জন্ম মৃত্যুতে যেমন হৈ চৈ হয়, চিত্তরঞ্জনের ক্ষেত্রে তা কিন্তু হয়না। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর মৃত্যুর জন্য বলেছেন ঃ চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু না হলে ভারত ভাগই হতনা। আর যদি তাঁর মৃত্যুর পরেও ভারতের স্বনামধন্য নেতারা তাঁর 'দাস ফরমুলার' মৃত্যু না ঘটাতেন তাহলে পাকিস্তানের জন্ম নেয়া সম্ভব ছিলনা।

ভারত ভাগ হয়েছে, কিন্তু কত নিরীহ হিন্দু-মুসলমান নিহত ও আহত হয়েছেন তার হিসেব সরকারি মতে প্রকাশ করলেও তা সঠিক নয়। কোটি কোটি মানুষের সর্বনাশ হয়েছে-কত নারী নির্যাতিতা, কত শিশু মাতা ও পিতা হারা, কত স্বচ্ছল পরিবার অভাবের বন্যায় ভেসে গিয়ে সমাজের পরমাণু হয়ে উন্নতির শিখর হতে নিচে খসে পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

ভারতের হিন্দু মুসলমানের লড়াই-এর পূর্বেই মিঃ আর্ণেষ্ট সার্টি সংবাদদাতা হিসেবে যে সংবাদ তারযোগে জানিয়েছিলেন তা হচ্ছে এটাই ঃ "Enough arms and ammunitions to equip more...by laying in stocks of food." এ সংবাদের পূর্ণ বঙ্গানুবাদ হচ্ছে-"গত কয়েক বছরে দশ লক্ষ লোককে সুসজ্জিত করবার মত পিস্তল ও টমি বন্দুক ভারতবর্ষে গোপনে আমদানি করা হয়েছে। প্রকাশ যে, মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই যথাক্রমে এর অর্ধেকের অধিকারী। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, বহু হিন্দু ও মুসলমান নিজেদের ঘর বাড়ী ঘাঁটিরূপে প্রস্তুত করতেছে। এবং সুদীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের জন্য (প্রয়োজন হলে) খাদ্য সংগ্রহ করে রাখছে।" (দ্রষ্টব্য ঃ সত্যেন সেন ঃ পনরই আগষ্ট, পৃষ্ঠা১১৮)

Goto List

জিন্না পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মেনে নিলেও একথা ভুললে চলবে না যে, তিনি একজন কংগ্রেসী রাজনীতিবিদ্‌ ছিলেন। কংগ্রেসের উপর যে অভিযোগে তিনি মুসলিম লীগে যান তা হল–সাম্প্রদায়িকতা ও বৈষম্য। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। "১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু-মুসলমানের (মৈত্রীর) জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তার জন্য তাঁকে 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' (Ambassador of Hindu-Muslim Unity) আখ্যা দেয়া হয়।" (পাক ভারতের মুসলমানের ইতিহাস, অধ্যায়–পাকিস্তানের জন্ম, পৃষ্ঠা ৮৬)

বিলেতে পাঠরত যে ছাত্রটি PAKISTAN কথাটি সৃষ্টি করেন তাঁর নাম রহমত আলী। P-তে পাঞ্জাব, A-তে আফগান, K-তে কাশ্মীর, S-তে সিন্ধু আর বেলুচিস্তানের Tan এ আদ্যক্ষর নিয়ে তিনি শব্দটি সৃষ্টি করেন।

অবশ্য এর প্রথম পরিকল্পনা দিয়েছিলেন ভারতবিখ্যাত কবি ইকবাল। তাঁকেও ইংরেজ 'স্যার' টাইটেল দিয়েছিলেন। কি হিন্দু. কি মুসলমান ইংরেজ সরকার যাঁদের স্যার টাইটেল দিয়েছেন তাঁর প্রতি আমার 'সন্দেহ' আছে; সেজন্য আমি দুঃখিত। তাই বলে তাঁদের প্রতিভা ও সৎকর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অটুট রয়েছে এবং বর্তমান আগামীতে থাকবে।

'দাস ফরমুলায়' ছিল মুসলমানের নামাযের সময় মসজিদের পাশে ঢোল বাজান চলবে না–এ কথাটাকে মূল্যহীন করার ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে বিমলানন্দ শাসমল লিখেছেন ঃ "এ শর্তটি অকেজো করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বরিশালের নেতা সতীন সেন পটুয়াখালিতে এক 'সত্যাগ্রহ' আরম্ভ করলেন, যাতে প্রতিদিন 'সত্যাগ্রহীরা' মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে যেতেন এবং এটা যে বে-আইনি কাজ করে গ্রেপ্তার বরণ করতেন। ... এ 'সত্যাগ্রহ' সমস্ত হিন্দু সমাজে এমন সাড়া জাগিয়েছিল যে, 'বিপ্লবী বীর' রাসবিহারী বসু টোকিও থেকে হিন্দুদের দান হিসেবে ৪০০ টাকা চাঁদা সত্যাগ্রহ কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন। পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ কমিটির সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছাপান ইস্তেহারে ঘোষণা করেছিলেন যে, বাংলায় গ্রামে গ্রামে মুসলমান গুণ্ডারা যে হিন্দু নারী ধর্ষণ ও হিন্দু মন্দির অপবিত্র করছে, তারই প্রতিবাদে তাঁরা পটুয়াখালিতে মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে সত্যাগ্রহ করছেন। ... সারা পূর্ব বাংলায় এর ফলে সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়িয়ে পড়ে।" (দ্রষ্টব্য ঃ বিমলানন্দ শাসমলের 'ভারত কি করে ভাগ হল'র পৃষ্ঠা ১১৬)

বলাবাহুল্য, এর ফলে মুসলমানরা শোভাযাত্রায় বাধা দিলেন। গুলি চলল, তাতে ২০ জন মুসলমান নিহত হলেন। বিমলানন্দ লিখেছেন ঃ "মুসলমানরা আরও ক্ষুব্ধ হলেন যখন সত্যাগ্রহেরজনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পটুয়াখালিতে সত্যাগ্রহের এ প্রহসন দেখেও মৌনব্রত অবলম্বন করে মৌনীবাবা সেজে গেলেন" (বিমলানন্দ শাসমল, পৃষ্ঠা ১১০০)। এসব ব্যাপারে জিন্নাহর সুবিধেই হল। তিনি মুসলমানদের বোঝাতে পারলেন যে, হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের একত্রে থাকা আর কখনো সম্ভব নয়।

এটা প্রমাণ হতে বাকী নেই যে, দেশ ভাগ হওয়ার মূল কারণ ও মহাপাপ হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি। একটি চরম কথা বিমলানন্দ বাবু বলেছেন ঃ "কায়েদে-আজম জিন্নার কাছে পাকিস্তানই শেষ কথা ছিলনা। সুযোগ পেলে তিনি সম্মানজনক মীমাংসায় আসতে রাজি ছিলেন। কিন্তু হিন্দু নেতাদের একগুঁয়েমি এবং বাস্তব সম্বন্ধে এক বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগ নেতাদের এক নিরুপায় অবস্থার দিকে ঠেলে দেয় এবং যখন তাঁরা দেখলেন, হিন্দু এবং কংগ্রেস নেতাদের সাথে কোন মীমাংসা সম্ভবপর নয় তখনই তাঁরা দেশ-বিভাগই একমাত্র সমাধান বলে মনে করলেন। মুসলমানরা প্রথম থেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাসভূমি কখনই চাননি।" (বিমলানন্দ শাসমল, পৃষ্ঠা ১৭৮)

আমাদের মতে, 'সত্যাগ্রহে'র ব্যাপারে গান্ধীজীর মৌনতার কথা বিমলানন্দ বাবু বললেও তখন তার মৌনতা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় ছিলনা। আর জিন্নাহ দেশ ভাগ করার নীতি নিয়ে না চললে তাঁর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া যেত কি করে? সে সাথে বিরাট এক সম্মানীয় দল মন্ত্রী হতে পারতেন কি করে? সে সময় দু' দেশে যাঁরা নেতা হলেন তাঁরা বোধহয় তখন চিন্তা করতে সক্ষম ছিলেন না যে, নিরীহ ভারতীয়দের কত শত মণ রক্ত কত শত বছর ধরে ঝরতে থাকবে!

জিন্নাহ এবং গান্ধী একই বংশের লোক ছিলেন। গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রের ভাষায়—"মিঃ মহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও শ্রী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পিতামহ ছিলেন এক সম্প্রদায়ভুক্ত গুজরাটী হিন্দু। কোন বিশেষ কারণে মিঃ জিন্নার পিতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে করাচীতে বসবাস করেন। ১৮৭৬ সনে বড়দিনের মিঃ জিন্নার জন্ম। গান্ধীজীর মতই অল্প বয়সে তাঁর বিবাহ। পনের বছর বয়সে তিনি এগার বছরের এক বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। পরের বছর আইন পড়তে চলে যান লণ্ডন। ..গান্ধীজীও তের বছর বয়সে দশ বছরের বালিকা শ্রীমতী কস্তুরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।" (দ্রষ্টব্য, গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রঃ অবিস্মরণীয়, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫)

কংগ্রেস করতে করতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গান্ধীর সাথে জিন্নার মত পার্থক্য হয় 'অহিংসা' ও 'আবেদন' 'নিবেদন'-কে কেন্দ্র করে। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে—এ প্রস্তাবে কংগ্রেস কর্মীরা তাঁকে 'মুসলমান' বলে, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত' বলে বিদ্রূপ করলেন। "গান্ধীজী এ নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ উপভোগ করলেন, কোন প্রতিবাদ করলেন না। মিঃ জিন্না ক্ষোভে দুঃখে কংগ্রেস ছাড়লেন। তিনি বুঝলেন যে, গান্ধীজী থাকতে তিনি কোনদিনই হিন্দু কংগ্রেসে প্রাধান্য পাবেন না।" (দ্রষ্টব্য ঃ গঙ্গানারায়ন, ঐ, পৃষ্ঠা ৬)

জিন্নার যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত নেতা খাঁন আবদুল গফফার খাঁন, ফজলুল হক, পাঞ্জাবের ফজল হোসাইন, বিহারের সৈয়দ আবদুল আজিজ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। তাই জিন্নার মনে আবার মিলনের কথা এল। তিনি গান্ধীজীকে অনুরোধ করেছিলেন ঐক্যের জন্য— "কাজেই ১৯৩৭ সনের ২ মে মিঃ জিন্না গান্ধীজীকে অনুরোধ করলেন হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য সমস্যার সমাধানের জন্য" (দ্রষ্টব্য গঙ্গানারায়ণ, পৃষ্ঠা ১১)। অথচ এ প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতা জিন্নাকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে তাতে মনে হয়, তিনি একাই যেন পাকিস্তান করেছেন, আর বাকী সকলেই ছিলেন সাধু ও নির্দোষ।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া করে ব্যরিস্টার হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৯১২-তে। তিনি গান্ধীর ভক্ত হলেও অনেক সময় পার্থক্য দেখা যেত। তবে একথা সত্য যে, জওহরলালের চরিত্রেও গান্ধীর মত সাম্প্রদায়িকতার গন্ধযুক্ত কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। গান্ধীজীর সাথে সুভাষ বসুর মত পার্থক্য ঘটে ঠিকই, কিন্তু সুভাষের জনপ্রিয়তা গান্ধীর মতই হু হু করে বেড়ে উঠেছিল। নানা চাপে পড়েও এ অসাম্প্রদায়িক মানুষটির হিন্দু-মুসলমান তথা সারা ভারতবাসীর স্বার্থে স্বরাজ বা আধা স্বাধীনতা 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' মোটেই চাননি; তিনি চেয়েছিলেন পূর্ববর্তী নেতা ও তখনকার মুসলিম নেতাদের মত ইংরেজ বিবর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা। আর তাই সুভাষ বোসকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হয়।

অবশ্য জওহরলালের গান্ধীজীর প্রতি সীমাহীন ভক্তি ছিল বলে মূল বিষয়ে অর্থাৎ অহিংসা নীতির সাথে তাঁর বিরোধ ছিলনা। তিনি সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন মোট পাঁচ বার। আর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য তাঁরই হয়েছিল। তিনি লেখক হিসেবেও স্বীকৃত। তাঁর লেখা Autobiography, Glimpses of World History, Soviet Russia, Discovery of india নাম করা বই প্রথমে তিন কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন না। একদিন সিমলার হোটেল থেকে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী কমলা নেহেরুকে শাসক ইংরেজ অন্যায় করে বের করে দেয়। হুকুম হয়েছিল চার ঘন্টার মধ্যে

হোটেল ছাড়তে হবে, কারণ তাঁদের মিটিং হবে এবং তাতে ভারতীয় কেহ থাকবে না। তিনি তাই দুঃখে, লজ্জায় ও অপমানে কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দিলেন। (গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র ঃ অবিস্মরণীয়, পৃষ্ঠা ১৭)

গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র নিজেও একজন প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি লিখেছেন, গান্ধী ও সুভাষের 'বিরোধ যখন ঘনীভূত হয়ে উঠল' সে সময় তিনি "কিছুদিনের জন্য বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপ ভ্রমণে। এটা সংগ্রামের আসন্ন প্রস্তুতি না সংকট এড়াবার উপায় লোকে তাই চিন্তা করতে লাগল।"

পরে ১৯৩৯-এ সুভাষ বসু কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গান্ধীর প্রার্থী সীতারামিয়ার বিরুদ্ধে ভোট পেলেন ১৫৮০ আর বিপক্ষে ভোট পড়ল ১৩৭৫। সবাই বুঝতে পারল গান্ধীর সাথে সুভাষের পার্থক্য। গান্ধীজীও বিচলিত হয়ে বললেন ঃ "সীতারামিয়ার পরাজয়ের চেয়ে আমারই পরাজয় বেশী।" (অবিস্মরণীয়, পৃষ্ঠা ২৭)

কিন্তু অবশেষে নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল বেশ বেড়ে গেল। পদলোভশূন্য সুভাস বসু ১৯৩৯-এর ২৯ এপ্রিল পদত্যাগ করলেন। সত্যিকারের নেতা সুভাষ নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদার দিকে না তাকিয়ে গান্ধীজীর কাছে আবেদন করলেন ঃ এটাই সুবর্ণ সুযোগ! আপনি একটু মতের পরিবর্তন করুণ, ইংরেজকে একটা বড় আঘাত হানি। কিন্তু "গান্ধীজী বললেন, 'ইংরেজকে ধ্বংস করে আমরা স্বাধীনতা চাই না—অহিংসা সংগ্রামের নীতি এ নয়।' তাঁর শিশু প্রতিনিধি পণ্ডিত নেহরু ২০ মে দেশবাসীকে শোনালেন যে, যে সময় ইংলণ্ড জীবন মরণ সমস্যায় উপনীত হয়েছে তখন আইন অমান্য আন্দোলন ভারতের পক্ষে হানিকর।" (অবিস্মরণীয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭)

গঙ্গানারায়ণবাবু 'অবিস্মরণীয়'তে আরও লিখেছেন, "নিরুপায় বিপন্ন মাওলনা আজাদ বললেন, এটা আপোষের কথা—স্বাধীনতার নয়। তিনি তখন সভাপতি হিসেবে বলতে বাধ্য হলেন যে, কংগ্রেস আপোষ করা সমিতি নয়—ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংস্থা। অনন্যোপায় হলে ভারতবাসীর অস্ত্রধারণেরও অধিকার আছে।" (গঙ্গানারায়ণ ঃ অবিস্মরণীয়, পৃ. ২৮)

সুভাষ বসু ১৯৪১ সনে কার কথায়, কার পরামর্শে যেন ভারত ত্যাগ করে পৌঁছালেন কাবুলে। আগেই সুভাষের নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয়েছিল মৌলবী জিয়াউদ্দীন—এ নাম পরিবর্তন করলেন কে?

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে লড়তে লাগল। লড়াই হল হিন্দু আর মুসলমানের; অথচ লড়াই হওয়া উচিত ছিল হিন্দু ও মুসলমান এক হয়ে শাসকের সাথে। ভারতে চলল কাটাকাটির তাণ্ডব লীলা—শুধু মরে হিন্দু আর মুসলমান।

এদিকে নেতাজী পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ছুটছেন জার্মানী জাপান আর চেষ্টা করছেন বাইরে থেকে ভারতকে কিভাবে আক্রমণ করা যায়। জাপান সুযোগ পেল সুভাষকে দিয়ে একটা কাজ হাসিল করার। সুভাষও ভাবলেন জাপানকে দিয়ে কাজ হাসিল করে ভারতে তিনি সশস্ত্র আক্রমণ হানবেন, এগিয়ে যাবেন তাঁর সাধের আজাদ হিন্দ বাহিনীর হিন্দু মুসলমান বীর সৈন্যেরা।

সারা ভারতের তথা সারা পৃথিবীর হিন্দু মুসলমানের কানে কানে তাঁর কথা পৌঁছে দেয়ার দরকার হল বলে দু'টি বেতার কেন্দ্র খুললেন—কংগ্রেসকে খুশী করার জন্য। একটার নাম দিলেন 'কংগ্রেস্ রেডিও' আর অফুরন্ত স্বাধীনচেতা মুসলমানদের খুশী করতে দ্বিতীয়টার নাম হল 'আজাদ মুসলিম রেডিও।'

সুভাষ যেন প্রাণ ছিলেন আজাদ হিন্দের; আর দেহটির মস্তকের মত তিনি যাঁকে নির্ধারণ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত যুদ্ধবিদ্ মেজর আবিদ হোসেন—যাঁকে সাথে করে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত গোপনে জার্মান সাবমেরিনে চড়ে ঘাঁটি ছাড়েন। ফাঁসির আসামীর মত

Goto List

রবারের ডিঙ্গিতে কিভাবে জাপানের টোকিও পৌঁছল সে বড় বিস্ময়কর ইতিহাস। সুভাষ বসুর আরও শুধু সহকর্মী নয়, সহযোগী বীর বিপ্লবী কমাণ্ডার ও মেজর নেতাদের মধ্যে ছিলেন হাবিবুর রহমান ও কর্ণেল শাহ নেওয়াজ খাঁন। অন্যান্য বিখ্যাত বীর বিপ্লবী মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল মির্জা এনায়েত আলী বেগ। আর্মি বিভাগের কমাণ্ডার ছিলেন আবদুর মজিদ (এ.ডি.সি)। এখানে একথা যেন মনে না করা হয় যে, শুধুমাত্র মুসলমানরাই সর্বেসর্বা ছিলেন। আসলে হিন্দু নেতাদের নামের স্বর্ণময় তালিকা প্রতি ইতিহাসেই আছে; তা সহজলভ্য। তাই যে সমস্ত দুর্লভ তথ্য চাপা আছে সেগুলোই যথাসম্ভব তুলে ধরা হচ্ছে।

নেতাজীকে যিনি পূর্ণ স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন তিনি হচ্ছেন মৌলানা উবায়দুল্লা সিন্ধি; সুপ্রকাশ রায় যাঁকে 'ওবেদুল্লা' বলেছেন। তিনিই সুভাষ বসুকে ভারতের বাইরে নানা নামে পাঠিয়েছিলেন। তিনিই সুভাষ বসুর নাম দিয়েছিলেন মৌলবী জিয়াউদ্দিন। এ বিখ্যাত বিপ্লবী মাওলানাকে যখন ভারত হতে বের করে দেয়া হয়েছিল তখন সে বিপজ্জনক সময়ের মধ্যে তিনি জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, কাবুল প্রভৃতি স্থানে এমন কায়দায় সংগঠন করে এসেছিলেন যাতে পরবর্তীকালে প্রতিনিধি হিসেবে অন্যের যাওয়া সহজ হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি জায়গায় শিষ্য ও বন্ধু সৃষ্টি করে ভারতের স্বাধীনতার সাহায্য-সোপান সৃষ্টি করে এসেছিলেন। সেখানে যাঁদের সাথে আলাপ করে যাঁদের সাথে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনিক কর্মী। সুভাষ বসু ওরফে মওলুবী জিয়াউদ্দীন নামক বাঙালীকে ইতিহাসে যদিও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে স্থান দেয়া হয়েছে কিন্তু সুভাষের নেতা অর্থাৎ নেতাজীর নেতা মাওলানা উবায়দুল্লাকে আমাদের বর্তমান ও ভাবী সন্তানরা যে কি করে চিনবে তার কোন উপায় রাখা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মওলুবী জহীরুল হক (দ্বীনপুর)-কে উর্দুতে যে পত্রটি দিল্লী থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন, যে বন্ধুবর মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব কর্তৃক অনুদিত হয়ে মাওলানা মুহাম্মদ তাহের সাহেব সম্পাদিত 'ইনসানিয়াত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেটা উদ্ধৃত করছি—

"স্নেহের মওলুবী জহীরুল হক–আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজাদী উপলক্ষে আপনার প্রেরিত পত্রের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। পত্র পড়ে স্মৃতিপটে ভাসে শুধু মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধির স্মৃতি। সে ঘটনা অনেক লম্বা, সংক্ষেপ করলেও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। ১৮১৪ সনে বিশ্বযুদ্ধের সময় শাহ্ ওলিউল্লার (রহঃ) কাফেলার নেতা হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ) অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে কাবুল প্রেরণ করেন। সেখানে মাওলানা উবায়দুল্লাহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে কাজ করার সুযোগ করেন। তন্মধ্যে জার্মানী, ফ্রান্স ও জাপানের এমন সব কর্মী নেতা সেখানে ছিলেন যাঁরা পরবর্তীকালে শাসন ক্ষমতার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ...

২৫ বছর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করে ১৯৩৯ সনে তিনি যখন এখানে আসেন তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তিনি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা কংগ্রেসের কাছে পেশ করে সর্বভারতীয় সংগ্রামের প্রোগ্রাম রচনা করেন। সে সময় গান্ধীজী পর্যন্ত এ পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন; তাহলেও 'ভারত ছাড়' আন্দোলনটুকু অনুমোদন লাভ করে। একদিন চায়ের মজলিসে তাঁর সাথে আমার আলাপ হয়। তাঁর চোখ ও চেহারায় চিন্তার চিহ্ন দেখে আমার মনে অনুসন্ধিৎসুর প্রশ্ন জাগে। আমি প্রশ্ন করতেই তিনি উত্তরে জানালেন, 'আমার ইচ্ছা সুভাষ ভারতের বাইরে যাক।' কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তিনি তাঁর বাসা উখলায় ফিরে যান ....।

দ্বিতীয় দফায় উখলা হতে দিল্লী পর্যন্ত আট মাইল সড়কের কোন একটি জনমানব শূন্য স্থানে তাঁর সাথে সুভাষের সাক্ষাত সংঘটিত হয়। তার পরের সাক্ষাতটি হয়েছিল কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায়। এখানেই তিনি সুভাষকে জাপান যাত্রার জন্য রওনা করেন। জাপান সরকারের নামে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রী হিসেবে তিনি একটি পরিচয়পত্র দেন এবং সেখানকার প্রধান সেনাপতির নামে একটি ব্যক্তিগত বিশেষ বার্তা পাঠান। তাই সুভাষ সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে জাপান সরকারের সৈন্য বিভাগও তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিল। ...শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষ প্রয়োগে মাওলানা সাহেবের জীবন শেষ হয়।...

১৯৪৫ সনের ১ লা সেপ্টেম্বর পুরো এক বছর নয় দিন পর সরকারীভাবে স্বীকার করা হয় মাওলানা সাহেব নিহত হয়েছেন। বাস্তবিক এমনি একজন বিপ্লবীকে ওজনের তুলাদণ্ডে এক পাল্লায় রেখে অন্য পাল্লায় সারা পৃথিবী চাপালেও এ বিপ্লবীর সমান হয় না... আপনার সম্মানীয়া মাতার প্রতি রইল আন্তরিক সালাম। ইতি-আবুল কালাম (আজাদ)"

শুধু সুভাষ বসুর নয়, অনেক নেতার নেতা মাওলানা উবায়দুল্লার কোন মূল্যায়ন আজও হয়নি, মূল্যায়ন হয়নি সে মাওলানা মাহমুদুল হাসানেরও, যিনি ছিলেন উবায়দুল্লা সাহেবের রাজনৈতিক গুরু।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আমরা এ গ্রন্থের গোড়া থেকে শুধু দেখতে পাব–ভেদবুদ্ধি আমাদের ধ্বংস করেছে, একতার অভাব আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দেয়নি। হিন্দুর সাথে মুসলমান, কংগ্রেসের সাথে অকংগ্রেস, রাজনীতিবিদ্‌দের সাথে লেখকদের অনেকক্ষেত্রে মতের অমিল থাকলেও বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অপর পক্ষের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে মিলনমঞ্চে এগিয়ে যেতে বাধা কোথায়? এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুও বলেছেন ঃ "অন্যপক্ষে রাজনৈতিকভাবে বিরোধী হলেও যদি আমরা মনে রাখি যে, শ্রেণীগত বিচারে এরা আমাদেরই সাথী এবং ওদের ভুল, বিচ্যুতি, বিরোধীতা সত্ত্বেও ওদের সাথে যোগাযোগ রাখি ওদের বোঝাবার সাথী এবং ওদের ভুল বিচ্যুতি বিরোধিতা ওদের ভুল বুঝবেই এবং আমাদের সাথে আসবেই।" (বামফ্রন্ট সরকার ও শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা ঃ জ্যোতি বসু-মনোরঞ্জন হালদার পৃ.১১)

ইংরেজের অত্যাচারে যাঁরা জেল খেটেছেন তাঁদের ইতিহাস খিলতে গিয়ে মুসলমান বলে, কংগ্রেস অথবা কমিউনিস্ট বলে তাঁদের নাম বাদ দিতে হবে, এটা কখনই প্রকৃত ঐতিহাসিকের চরিত্র হতে পারেনা। যেমন কমরেড আকদুল হালিম–তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জন্মে মাত্র ৬৫ বছর বয়সে (১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে) ইংরেজের অত্যাচারে শেষ হয়ে গেছেন ভারতের মাটি থেকে। তাঁর জেল-জীবন সম্বন্ধে কমরেড সরোজ মুখোপাধ্যায় লিখেছেনঃ "১৯৬৬ সনে এপ্রিল মাসে মৃত্যুর মাত্র দশদিন পূর্বে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান"। (দুই পৰ্বিক্‌ং, পৃ. ২৭)। এখন কোন কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী ঐতিহাসিক যদি তাঁর সে ইতিহাস চাপা দিতে চান তাহলে ঐতিহাসিক চরিত্র নষ্ট হবেনা কি? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যে মাওলানা উবায়দুল্লা সিন্ধীর কথা আমরা উল্লেখ করেছি তাঁর এবং এ রকম আরও শতশত বীর বিপ্লবীদের ইতিহাস কোন্ 'কারণে' এখনো যে চেপে রাখা হয়েছে এবং কেন যে এখনো পর্যন্ত তাঁদের মূল্যায়ন হয়নি তা অতীব পরিতাপের বিষয়।

লেখক যে পন্থীই হোন না কেন, সত্য তথ্য চাপা দেয়া বা শক্তির জোরে তাঁর বই বাজেয়াপ্ত করার সময় অবশ্যই দেখতে হবে আলাদের অভিযোগ কতটুকু সত্য। কেননা, মিথ্যা অজুহাতে ভিন্নপন্থী লেখকের বিরোধিতা করাও বিখ্যাত মানুষদের নীতি নয়। এ প্রসঙ্গেই এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ-এর একটি মূল্যবান উদাহরণ স্মরণযোগ্যঃ "লেনিন ছিলেন রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নেতা আর ম্যাক্সিম গোর্কি ছিলেন সে যুগের অন্যতম সাহিত্যিক। দু'জনের মধ্যে চরম মতানৈক্য থাকলেও লেনিন তাঁর পত্রে গোর্কিকে লিখেছিলেনঃ লেখার

শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনিই শ্রেষ্ট বিচারক, এ মত আমি অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করি, আপনার শিল্পীক অভিজ্ঞতা ও দর্শন ভাববাদী দর্শন হলেও, উভয়দিক থেকে এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেও আপনি একটা উপসংহারে আসতে পারেন.... ।" (দ্রষ্টব্য মার্কসবাদ ও সাহিত্য ঃ ই, এম, নাম্বুদিরিপাদ, পৃ. ২৬)

আবার পূর্বের কথায় ফিরে এসে বলা যায়–এটা দিবালোকের মত প্রমাণিত হল যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পিছনেও সে 'হতভাগ্য' মুসলিম বিপ্লবীদের অবদানই লুকিয়ে রয়েছে, অথচ জানিনা কোন্ উদ্দেশ্য তাঁদের নাম আজও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

ভারতের বাইরে সুভাষ বসুর ইংজের-বিরোধী ষড়যন্ত্র, অপরদিকে ভারতের ভিতরে মুসলিম লীগ-কংগ্রেসে লড়াই, যেখানে সেখানে বিক্ষোভ, গুলি, অগ্নিকাণ্ড দেখে ইংরেজরা বুঝতে পারল যে তাদের ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যাওয়াই ভাল। এরপরে তাঁরা হিন্দু-মুসলমানকে ডেকে তাঁদের স্বেচ্ছায় ভারত ছেড়ে চলে যাবার কথা জানান।

এদিকে জওহরলালও দেশ বিভাগে রাজি হলেন কারণ বৃদ্ধ বয়সে ক্লান্ত দেহে জেল খাটা আর ভাল লাগছিল না। গান্ধীজীও অবশেষে ভারত-ভাগ মেনে নিলেন। (ডক্টর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ঃ পৃ. ২৯০-৯১)। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত জিন্নার দেশ বিভাগ প্রস্তাবেরই জয় হল।

ঠিক সে সময় মিঃ সোহরাবর্দী ও শরৎ বসু এক নতুন প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তা হল–বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষীদের নিয়ে অবিভক্ত বাংলাদেশের দাবী মেনে নেয়া হক। "কিন্তু তাঁদের এ দাবী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কোন তরফই সমর্থন করল না।" (ডঃ ভট্টাচার্য, পৃ. ২৯২)

খাঁন আবদুল গফফার খাঁন দেশ বিভাগের প্রস্তাব মেনে নিতে পারলেন না। সে যুগের 'লালকোর্তা' (Red Shirt) ও 'খোদায়ী খিদমতগার' বাহিনীর নেতা খাঁন আবদুল গফফার খাঁন, গান্ধী, জওহরলাল তথা কংগ্রেসী নেতাদের এ আচরণে অবাক হলেন এবং হয়ে বললেনঃ আমাদের মুসলিম লীগের অনুগ্রহের উপর ছেড়ে দেয়া হল, যেটা নেকড়ের মুখে ছেড়ে দেয়ার নামান্তর। (India Wins Freedom : A.K.Azad. p. 198)

এদিকে ইংল্যাণ্ডের গোপন পরামর্শে ইংরেজদের সিদ্ধান্ত হল, ১৯৪৮ সনে ভারত পরিত্যাগ করা হবে। কেননা সরস ভারত নীরস হয়ে গেছে, শাসনের নামে শোষণের প্রহসন আর সুবিধাজনক হবে না। কিন্তু ১'৯৪৭ অর্থাৎ পরিকল্পিত সময়ের এক বছর আগেই ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

খুব আশ্চর্যের কথা হল, যে দেশ স্বাধীন হয় সে দেশ লড়াই করে তাদের সাথে, যারা তাদেরকে পরাধীন করে রেখেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায়, কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের অনেক নেতা ইংরেজ সাহেবদের তোষামোদ করতে লেগে গেলেন। উদ্দেশ্য–ভারত ভাগের অংশগুলো যেন তাঁদের মতের অনুকূলে এবং যথাযথ হয়। স্যার র‍্যাডক্লিফকে আদেশ দেয়া হল–তিনি ভারতের ম্যাপে দাগ দিয়ে দিলেন। তথাকথিক স্বাধীনতাসহ দেশ বিভাগের কাজ শেষ হল। ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ঘোষিত হল, আর ভারতের হল ১৫ই আগস্ট। অবশ্য "১৫ ই আগস্ট তারিখে জিন্না পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন লিয়াকত আলী খাঁন। ১৪ই আগস্ট রাত্রে দিল্লীতে গণপরিষদের অধিবেশন বসল, এবং এ গণপরিষদ লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে গভর্ণর জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত করল। অতঃপর নেহরু এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁকে (মাউন্টব্যাটেনকে) তাঁর সরকারী ভবন থেকে নিয়ে এলেন ১৫ই আগস্ট প্রত্যুষে মাউন্টব্যাটেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন, এবং তারপর জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভাকে শপথ গ্রহণ করালেন।" (দ্রঃ ডক্টর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৯৭)

এ কথা বলা যায় যে, আমরা ফলাও করে স্বাধীনতার ইতিহাসকে যেমন করেই বলি বা বলাই না কেন নিরপেক্ষ বিচক্ষণ মানুষ যদি এ তৃতীয় বা শেষ স্বাধীনতার ইতিহাসকে ‘স্বাধীনতার ইতিহাস’ না বলে ‘ইংরেজের চলে যাওয়ার ইতিহাস’ বা ‘ইংরেজের (ভারত) ভিক্ষা দেয়ার ইতিহাস’ বলে আখ্যা দেন তাহলে তার প্রতিবাদ করা খুব সহজসাধ্য হবেনা।

শেষ স্বাধীনতা আন্দোলন অথবা ‘ইংরেজের চলে যাওয়ায় ইতিহাসে’ও হয়ত দেখা যেত মুসলমানরা অনেক বেশী রক্ত দিয়েছেন, অপর সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক বেশী জেল খেটেছেন এবং সর্বহারা হয়েছেন–যেমন হয়েছিলেন বিগত প্রথম ও দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদের আবির্ভাবের পরে মুসলমান সম্প্রদায়ের ইংরেজ বিরোধিতা যেন খানিকটা থমকে দাঁড়ায়। কারণ মুসলমান বিপ্লবীরা বুঝেছিলেন যে তাঁদেরও ইংরেজি শিখতে হবে এবং ইংরেজের সাথে সম্পর্ক খানিকটা মধুর করতে হবে।

‘সৈয়দ আহমদ’ একটি ঐতিহাসিক নাম। আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদের প্রশংসার প্রাচীর তুলে ইংরেজ চেয়েছিল বেরেলীর সৈয়দ আহমদের বিপ্লবী নাম আড়াল করে দিতে। আর ঘটেছেও তাই–শতকরা ৮০ জন লোক যত সহজে স্যার সৈয়দ আহমদকে চেনেন এ শতকরা ৮০ জন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলীকে তত সহজে চেনেন না; অথচ তিনি প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক ও অমর শহীদ। এ পুস্তকে পূর্বেই তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন ১৮১৭-তে জন্মে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ইংরেজ তাঁকে ‘স্যার’ উপাধি দিয়েছিল। তারা তাঁকে দিয়ে তৈরি করছিলেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি একটি অনুবাদ সমিতি করেছিলেন। তাঁর পক্ষ হতে প্রচুর বইপত্র ইংরেজের অনুকূলে উর্দুতে অনুবাদ করে ভারতে বিতরণ করা হয়েছিল। তাঁর লেখা ‘তাফ্‌সীরুল কোরআন’ প্রমাণ করেছিল যে, মুসলমান জাতি ইংরেজের শত্রু নয়, যেহেতু কোরআন ও বাইবেল যথেষ্ট মিল আছে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি হাদীস ও তফসীরের প্রতিকূলেও মত প্রকাশ করেছিলেন। ফলে একটি বৃহত্তর দল তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইংরেজের আনুগত্য লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, সে যুগে ভারতে মুসলিম বুদ্ধিজীবী তৈরির দরজা যেভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, নিঃসন্দেহে সে বন্ধ দরজা খোলার কৃতিত্ব স্যার সৈয়দ আহমদের। সে সাথে একথাও উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবী এ স্যার আহমদের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে প্রভাবিত।

তাছাড়া স্যার আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, মাওলানা আকরাম খাঁন, কবি ইকবাল, বিচারপতি আঃ মওদুদ প্রভৃতি নেতা ও লেখকদের উপর স্যার সৈয়দের যথেষ্ট প্রভাব প্রমাণিত হবে যদি তাঁর তফসীর, পুস্তক ও বক্তৃতামালা তলিয়ে দেখা যায়।

চলতি ইতিহাসে গান্ধী নেহেরু, সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন, প্যাটেল, কৃপালিনী, সরোজিনীর নাম যেখানে আছে, সেখানে উবায়দুল্লা! মাহমুদুল হাসান, মহম্মদ আলি, সাব্বির আহমদ, হাফেজ জামেন ও গফফার খাঁনের মত বিশিষ্ট নামগুলো বাদ গেল কেন–জনগণের এ কৈফিয়ত নেয়ার অধিকাংশ থাকাকেই গণতান্ত্রিক অধিকার বলে। শুধু আবুল কালাম আজাদের নামটুকু রেখেই দেশ নায়কেরা ‘এড়িয়ে’ যাবেন?

ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, ভগত সিং, রামপ্রসাদ, বাদল ও দীনেশ প্রভৃতি প্রাণদাতাদের নাম যেখানে থাকছে সেখানে কেন থাকবে না আস্‌ফাকুল্লার নাম?–যিনি ফাঁসির মঞ্চে হাসতে হাসতে বুকে কোরআন ঝুলিয়ে কোরআনের অংশ আবৃত্তি করে বীরের মত প্রাণ দিলেন। ফাঁসির আদেশে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে দেশের জন্য প্রাণ দেয়ার গর্বে যাঁর দেহের ওজন বেড়ে গিয়েছিল।

সে রহমত আলী, যাঁকে ইংরেজ সরকার ফাঁসি দিলে শুধু নয়, যাঁর সমস্ত জমি-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল তাঁর নাম মুছে দেয়া নিশ্চয় দুঃখের বিষয়। এমনিভাবে জমাদার চিস্তি খাঁন ও হাকিম আলি ভারতের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন্ অপরাধে তাঁদের নাম ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন করা হল? হাসপাতালের কর্মচারি যে 'আবদুল্লা'র ১৯৩২-এর ১লা সেপ্টেম্বর দেশের জন্য ফাঁসি হয়েছিল তাঁর কথা কি ইতিহাসে থাকা উচিত নয়?

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র ভরদ্বাজকে যখন বিদ্রোহী বলে গুলি করে মারা হল তখন তার জন্য বিদ্রোহ ও বিপ্লবের যিনি ও যাঁরা নেতৃত্ব দিলেন–সে আবদুর রহিম, আল্লাহ বখশ্ ও গোলাম রব্বানী শেঠির নাম কি ইতিহাসে থাকার কথা নয়?

যাঁরা গুপ্ত সমিতি তৈরি করলেন তাঁরা যদি ইতিহাসে বেঁচে থাকেন তাঁদের অনুশীলন ও যুগান্তর দলের নাম যদি ইতিহাসে থাকে তাহলে মাওলানা আবুল কালামের গুপ্ত সমিতি 'হালিফুল্লা'র নাম থাকবে না কেন? আর এ 'কেন' বলা মানেই কি সাম্প্রদায়িকতা? এ 'কেন' বলার জন্যই কি লেখকের বই বাজেয়াপ্ত করতে হবে?

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মুজতবা হোসেন ও আলি আহমদের ফাঁসি হল–তাঁদের নাম বর্তমান ভারতের পাঠ্য ইতিহাসে থাকা বোধ হয় অপরাধ ছিলনা। ১৯১৫ সনে রাইসুল্লার ফাঁসি হল; তাঁর নামও আজ উহ্য রাখা হয়েছে। ১৯১৫-তে রুকন্উদ্দিনেরও ফাঁসি হয়েছিল কিন্তু সে নামও আজ অদৃশ্য।

যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা আনতে বহির্ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করেছেন তাঁরা যদি স্মরণীয় মানুষ হন তাহলে রেজা খাঁন–যিনি মাওলানা আজাদের সহকর্মী ছিলেন তাঁর নাম চাপা পড়ল কি করে?

স্বাধীনতার জন্য উগ্র ইংরেজ বিরোধী হয়ে যদি ইতিহাসে নাম কেনা যায় তাহলে বাংলার মকসুদুদ্দিন আহমদ, গিয়াসুদ্দিন আহমদ, নাসিরুদ্দিন ও রাজিয়া খাতুনের নামও ইতিহাসে থাকা উচিত ছিল। ১৯৩০ সনে কোরবান হোসেন ও আবদুর রশীদের ফাঁসি হয়: তাঁদের নাম কোন সদিচ্ছায় আজ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে? ইকবালমন্দ খাঁ ও গজনফর খাঁ দু'জনেই ফাঁসিতে গলা দিলেন–তাঁদের নাম ক'জন জানেন? তাফাজ্জল হুসাইন এবং সাখাওয়াতেরও এমনিভাবে ফাঁসি হয়েছিল, কিন্তু সে নামও আজ ইতিহাসে'র পাতায় নিখোঁজ।

গোলাম জিলানী ২৭ বছরের এক যুবক, গান্ধীর একান্ত ভক্ত। বি.এ. পাশ করে শুধু রাজনীতিই করেছেন। ১৯৩২ সনে পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে শেষে ১০ই ফেব্রুয়ারি প্রহার ও অত্যাচারের আঘাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার উপর যখন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন তখন সরকার পক্ষ থেকে জানান হল–যদি লিখিত মুচলেকা দেয়া হয় তাহলে মুক্তি মিলতে পারে। তাতে শর্ত লেখা থাকবে ঃ তার অন্যায় হয়েছে এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে আর আন্দোলন করবে না। শেষে ইংরেজরা গোলাম জিলানীর পিতাকে জিজ্ঞেস করল, তিনি এ শর্তে ছেলের মুক্তি চান কি না? বীর পুত্রের বীর পিতা বললেন, মুচলেকা দিয়ে পুত্রের মুক্তি চাইনা। পুত্রও মন্তব্য করলেন, 'মুচলেকা দিয়ে মুক্তি চাইনা–কাঁদুক দেশ, স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন; তবু আমি মুক্তিযোদ্ধা।' বীর গোলাম জিলানী জেলেই শহীদ হলেন–এ ঘটনা কি ইতিহাসে স্থান পেতে পারেনা?

১৯২১ খৃষ্টাব্দে আসফ আলীর পিতা মৃত্যুশয্যায় বললেন ঃ আমার আর লড়াই করা হল না, আমি চললাম আল্লাহ্র ডাকে। তবে ইংরেজের সাথে লড়াই করার জন্য আমার ছেলে আসাফ আলীকে দিয়ে গেলাম। তার সাথে দেখা হলনা, কারণ সে জেলে রয়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে লড়াই চালাবে। –সে মহান আসফ আলী ও তাঁর পিতাকে কি আমাদের ইতিহাসের পাতায় একটু স্থান দেয়া যেতনা।?

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নামের পাশে অধ্যাপক বরকতুল্লার নাম তত পরিচিত নয়, অথচ তিনিও আন্তর্জাতিক নেতা। তিনি গরীবের ছেলে ছিলেন। বহু কষ্টে শিক্ষিত হয়ে ভারতের মুক্তির জন্য বহির্ভারতে গিয়ে জার্মানী ও জাপানের সাথে যোগযোগ করেনএবং সর্বভারতীয় সরকার গঠন করেন। এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন তিনি নিজেই। আর সাম্প্রদায়িকতার গন্ধবিহীন সতর্ক দৃষ্টি রেখে সভাপতির পদে বসালেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে। সরকার গঠনের মধ্যে রাজনীতি ছিল এ যে, প্রদানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি 'সাইনবোর্ড' থাকলে যে কোন দেশের যে কোন রাষ্ট্র নেতার সঙ্গে দেখা করা সহজ হয়। বরকতুল্লার দল কাবুল, আঙ্কারা, দামাস্ক ও মিশরের কায়রোতে এবং বক্ষ দেশে গোপন কেন্দ্র স্থাপন করে। উদ্দেশ্য ছিল–বিশ্বজোড়া রাজনীতির ব্যবসায়ী ব্রিটিশকে চারিদিক থেকে ঘায়েল করা। ১৯২৭ সনে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে দেশত্যাগী চাকরি ত্যাগী বিপ্লবী অধ্যাপক বরকতুল্লা প্রাণ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ আপনি কিছু বলতে চান? উত্তরে বলেছিলেন, তাঁর শেষ ইচ্ছা–ভারতে যেন তাঁর কবর হয়। অবশ্য তাঁর সে শেষ অভিলাষ আজও অপূর্ণ আছে। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা সত্য এবং বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও চলতি ইতিহাসে কি স্থান পাবেনা?

এমনি কত নামই যে চাপা পড়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, ডক্টর সাইফুদ্দিন কিচলু, নিসার আহমদ, গোলাম মোজাদ্দেদ প্রভৃতি বিখ্যাত নেতারাও আজ মুছে যেতে চলেছেন চলতি ইতিহাসের পাতা থেকে।

এ ছাড়াও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 'রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্রের'র ইতিহাসে মাওলানা উবায়দুল্লা সাহেব ছাড়াও যে সব মুসলমান বিপ্লবীদের নাম রয়েছে তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী আবদুল্লা, ফতেহ মহাম্মদ, মহম্মদ আলী প্রভৃতি নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাওলানা মাহমদুর হাসান ও মাওলানা আনসারীর নামও সেখানে রয়েছে।

তুকরি গভর্ণর গালিব পাশার সক্রিয় সাহায্যে মাওলানা উবায়দুল্লা মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চালান। তাছাড়া বিপ্লবী মিঞা আনসারি ও সেখ আবদুর রহিমও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম।

'জাহানে ইসলাম' একটি পত্রিকার নাম। 'যুগান্তর' যেমন একটি সংগঠন ও সে সাথে একটি পত্রিকার নাম ছিল, তেমনি এ 'জাহানে ইসলাম'কে কেন্দ্র করে বিরাট সংগঠনও চালান হয়েছিল। এটা কোন প্রাচীন কাহিনী নয়–১৯১৪ খ্রষ্টাব্দের ঘটনা। এ সনের মে মাসে তুরস্কের কনস্টান্টিনোপল শহর থেকে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। উর্দু, আরবী, তুর্কী ও হিন্দী ভাষায় তাতে লেখা প্রকাশিত হত। পত্রিকায় উর্দু বিভাগের সম্পাদক ছিলেন আবু সৈয়দ নামক এক মুসলিম বিপ্লবী। এ পত্রিকা ভারতেও আসত। বিপ্লবীদের রক্ত থেকে উঠত কাগজের চড়া ও কড়া লেখনী পড়ে। অবশ্য ১৯১৪ সনেই ইংরেজ সরকার পত্রিকাটি ভারতে আসা বন্ধ করে দেয়।

তখনকার 'যুগান্তর' পত্রিকা যদি ভারতবাসীকে 'আন্দোলনে' যেগা দেয়াতে সহায়ক হতে পারে, 'স্বরাজ' পত্রিকা যদি বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করার ভূমিকা নিতে পারে তাহলে যে পত্রিকা বিদগ্ধ ভারতবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল তার নাম আজ ইতিহাসে নেই কেন? ইতিহাসের পাতায় এ পত্রিকার পাশাপাশি এ নামটি থাকাও কি উচিত ছিলনা?

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর মুজতাবা হোসেন কয়েকজন 'গদর' বিপ্লবীকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে সৈন্যদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচারকার্য চালান। ফলে 'মালয় স্টেটস্ গার্ডস' ও 'পঞ্চম পদাতিক রেজিমেন্ট' নামক দু'টি সৈন্যদল বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত হয়। এত বড় কাণ্ড ঘটল যে ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা, তাঁদের নাম আজ ইতিহাসে চাপা আছে কেন?

উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে শেষ স্বাধীনতার ইতিহাসে ঋষি অরবিন্দ ও তিলকের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত। কিন্তু সুপ্রকাশ রায়ের মতে নিরপেক্ষ তাত্থিক ইতিহাসবিদ তাঁদের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। আমরা আগেও বলেছি যে, অরবিন্দ জেলখানায় শাস্তি পেয়ে জেল থেকে মুক্তি লাভ করে তাঁর মত ও পথ পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন অর্থাৎ বাসুদেব দেবতার দোহাই দিয়ে নিজেও আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন সে সাথে অপরকেও সরে দাঁড়াবার উপদেশ ও আদেশ দিয়ে পণ্ডিচেরি চলে গেলেন। আর তিলকের জন্য শ্রী সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন ঃ "১৯১৪ খ্রস্টাব্দে জুন মাসে বালগঙ্গাধর তিলক কারাগার হতে বাহির হয়ে আসেন এক নতুন মানুষ হয়ে। বাইরে এসেই তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের পথ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আইন-সম্মত আন্দোলন আরম্ভের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। তিলক মত ও পথ পরিবর্তন করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেও অস্বীকার করেন।" (ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ৪২৩)

তিলকের এ রকম মত পরিবর্তনে ক্রুদ্ধ হয়ে ডক্টর ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ "শ্রদ্ধেয় লোকমান্য তিলক, জনসাধারণের উপর যাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে তিনি গভর্ণমেণ্টের সুরে সুরে দিলেন। 'বার্লিন কমিটি' তাঁর নিকট লোক পাঠিয়েছিল, কিন্তু তিনি কিছু করেন নাই। ... এই জন্যই বলি, ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞে বুর্জোয়ারা আসবেন না। তাঁরা 'আধ্যাত্মিক স্বরাজ' 'দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট', 'হোমরুল' প্রভৃতির দাবি করবেন, কিন্তু স্বাধীনতার দাবি করবেন না। (ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ. ১১০)

পূর্বের কথায় ফিরে এসে এক্ষেত্রে বলা যায়, মুসলমানদের বিরাট অবদান যে শেষ স্বাধীনতার ইতিহাসেও রয়েছে, অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁরাই যে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এ বাস্তবকে নির্দ্বিধায় অস্বীকার করে তাঁদেরকে আজ সরকারি ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সঠিক পদক্ষেপ নয়। তাই আজ ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের মনে কথা হল–তাঁদের সঠিক ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও যেন তা চাপা না পড়ে, তাঁরা যেন উপেক্ষিত না হন, সঠিকভাবে যেন তাঁদেরকে এবং তাঁদের ইতিহাসকে জানতে পারেন বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভারতবাসী।

⁂

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবেকানন্দকে নিয়ে বোধবিকৃতি

আমরা ইতিহাসে দেখলাম সাম্প্রদায়িকতার গোড়াপত্তনে প্রথমে বিভেদের বীজ ফেলেছিলেন কিছু নেতা, অঙ্কুরিত বিভেদ-বৃক্ষকে বড় করলেন আরো কিছু নেতা–অস্ত্র এসে গেল হিন্দু, মুসলিম, শিখ, হরিজনের হাতে; হল রক্তাক্ত লড়াই। দেশ বিভক্তি তার পরিণতি। অথচ ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান-শিখ-খৃষ্টান মিলেমিশে থাকতে পারলেই হত মানবতার প্রকৃত সার্থকতা; কিন্তু তা হতে দেয়া হয়নি। সে বিভেদ-বৃক্ষ আজও তার বংশ বিস্তার করে চলছে, করে চলছে তার প্রভাব বিস্তার–আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক মানুষ, অনেক দল ও গোষ্ঠী।

বর্তমানে সাম্প্রদায়িক কিছু দল বিবেকানন্দকে আদর্শ করে মুসলমান জাতি, তাঁদের ধর্ম এবং তাঁদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যেভাবে কলম ধরেছেন তা বড় বিস্ময়কর, ভয়াবহ ও মারাত্মক।

অনেক পুস্তক-পুস্তিকা এ সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন বই ইতিমধ্যে বহু বহু বার ছাপা হয়ে গেছে, বিতরণ করা হয়েছে অসংখ্য মানুষকে। যেমন একটার নাম 'দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই।' লেখক শিবপ্রসাদ রায়। প্রথম প্রকাশ ১৯৮২-৮৩, পঞ্চদশ মুদ্রণ। প্রথমে সে বই থেকেই কিছু নমুনা তুলে ধরছি–

"ভারতে সে শতকরা সাতানব্বই জন পাকপন্থীই রয়ে গেছে" (পৃষ্ঠা. ৮)। "গত এক বছরে (সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দ্বারা লেখক) কাশ্মীরে তিনশ হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে।" "ব্যাপকভাবে হিন্দুদের গণধর্মান্তর করার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে কোটি কোটি টাকা আসছে।" (পৃ. ৫) "পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাংলাদেশ থেকে এসেছে। মেটিয়ারবুরুজ, পার্ক সার্কাস, মুর্শিদাবাদে কাতারে কাতারে ঢুকেছে। শুধু কলকাতায় চার লক্ষ বিদেশী মুসলমানের হিসেব আছে সরকারের খাতায়। ...সি.পি. এম. (তাদের) রেশন কার্ড করে দিচ্ছে তো কংগ্রেস ভোটার লিস্টে নাম তুলে দিচ্ছে। ... কোলকাতায় হকার উচ্ছেদ করতে গিয়ে জ্যোতি বসু, যতীন চক্রবর্তী সব হিন্দু হকারদের তুলে দিলেন। বাংলাদেশ থেকে আসা বিহারী মুসলমানদের তুলতে পারলেন না। তাদের পিছনে এসে দাঁড়ালেন মিঞা কলিমুদ্দিন (শাম্‌স–লেখক)।" (পৃ. ১৬)

যে সমস্ত পুস্তক নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সে সমস্ত পুস্তকে শুধু মুসলমানদেরকেই আঘাত হানা হয়নি, বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও সম্প্রদায়ের উপরেও আক্রমণ করা হয়েছে–যা অতীব দুঃখজনক ও দেশের সংহতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

এ রকম আর একটা বই–'আসুন, আমরা সবাই মিলে আর. এস. এস-কে খতম করি'*। সপ্তম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮৩। বইটির পঞ্চম পৃষ্ঠায় আছে–"R.S.S.-এর শক্তির উৎস সরকার নয়, আদর্শ কর্মী। ওরা শাস্ত্রও বোঝে, অস্ত্রও বোঝে।"

"মদ্যপান করে, মিথ্যা কথা বলে, বিলাসী জীবন যাপন করে এদেশে আমরা গান্ধীবাদী দলের নেতৃত্ব করছি। পার্লামেন্টকে শুয়োরের খোয়াড় বলে, ধর্মকে আফিঙ বলে আমরা এদেশে কম্যুনিষ্ট হয়েছিলাম, এখন এম. এল. এ. হয়ে এম.পি. হয়ে শনি-সন্তোষীর পূজা করে বিয়ের সময় পণ নিয়ে হাতে একগুচ্ছ মাদুলি পরেও আমরা প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক। আমাদের আদর্শ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র।" (পৃ. ৮-৯)

---

* নামকরণ দেখে বইটাকে আর. এস. এস. বিরোধী বই ভাবার কোন কারণ নেই, বরং বিপরীতার্থই যে গ্রাহ্য, বইটির বক্তব্যে তা প্রমাণিত হয়েছে। –লেখক।

এ ধরণের অপর একটা বই–'সমাজের আহ্বান।' পঞ্চম প্রকাশ, নভেম্বর '৮৩। তার থেকেও কিছু তুলে ধরলাম–"আরবের টাকায় পরিচালিত হচ্ছে তবলিকি (ইসলাম ধর্ম-প্রচারক সংস্থা 'তবলীগ জামাত'–লেখক) আন্দোলন। যার লক্ষ্য হচ্চে, অবিলম্বে হিন্দুস্থানকে আল্লাহ্ তা'আলার রাজ্যে পরিণত করা। সে উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা বাড়ান হচ্ছে, মসজিদে চুনকাম হচ্ছে, মাইকে আজান দেয়া হচ্ছে। লম্বা জামা দাড়ি, আর টুপী পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার মুসলমান। খৃষ্টান, মুসলমান দু-দলের আচরণে কিন্তু প্রকৃত ধর্মচর্চার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। নৈতিকতা আধ্যাত্মিকতার কোন চিহ্ন নেই। ... ধর্মের নামে জাতীয়তা বদলের কারণেই অর্ধেক ভারত পাকিস্তান হয়েছে এবং আজও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এত অশান্তি।" (পৃ. ৬)

"একহাতে কোরআন অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে হত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচারের মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচার হয়েছে।" (পৃ. ৮)

"অর্থনীতির কথা বলে গরীব মানুষের কল্যাণকারীর ছদ্ম ভূমিকা নিয়ে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে কম্যুনিষ্টরা সাম্রাজ্যবাদের তল্পী বহন করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এরা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসী। ... সি. পি. আই. বলেছে, রুশ সৈন্য ভারতে এলে আমরা স্বাগত জানাব। বুঝতে পারছেন মার্ক্সবাদ সে যে নামে এবং যেভাবেই আসুক সে আপনার জাতীয়তার শত্রু।" (পৃ. ১৭)

"অনেক মার্ক্সবাদী বলবে, মানুষের আবার জাত কি? খেটে খাওয়া মানুষের কোন জাত নেই। তাদের বলবেন, খেটে খাওয়া মানুষ কি পূর্ববঙ্গে ছিলনা? সেখানে মার্ক্সবাদ না কোরে জ্যোতিবাবু, প্রমোদবাবু, যতীন চক্রবর্তী, রাধিকা বানার্জীরা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পালিয়ে এলেন কেন?" (পৃ. ৩১)

জওহরলাল নেহরুর জন্য এ পুস্তকে বলা হয়েছে–"একজন কংগ্রেসী নেতাকে তিনি তর্ক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমাকে গাধা বল, হিন্দু হল না।" (পৃ. ২৩)

এমনি আর একটা বই–'আল্লা আমাদের কাঁদতে দাও।' লেখিকা জাহানারা বেগম। সম্ভবতঃ এটা ছদ্মনাম, আসল নাম অন্য কিছু। এ জাহানারা নাম্নী মহিলা অথবা এঁর পিছনে থেকে অদৃশ্য কোন লেখক ইসলামের উপর অনেক আঘাত এনেছেন। সবগুলো উদ্ধৃত করে বই-এর কলেবর বৃদ্ধি না করে শুধু এটুকু জানিয়ে রাখি যে, এ বইটাতেও ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম-সংস্কারের উপর যেভাবে কটাক্ষ হানা হয়েছে, তাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকর্মীরা চিন্তিত না হয়ে পারেন না।

এবারে যে বইটির আলোচনায় আসব সেটির নাম–'একটি সেমেটিক ধর্ম ও তার সমীক্ষা' লেখক হিসেবে নাম ছাপা আছে চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের। আর শিবপ্রসাদ রায়, তাঁর নাম মুখবন্ধকার হিসেবে দিয়েছেন। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, '৯২। প্রকাশক সুশীলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়–সোমড়াবাজার, হুগলী। মুদ্রক ঃ টাউন প্রেস,কালনা, বর্ধমান।

বইটিতে আল্লাহ্, ইসলাম ধর্ম, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং মুসলমানদের জন্য যা লেখা হয়েছে তেমন অশ্লীল, সীমাহীন মুসলিম বিদ্বেষমূলক কোন বই এর আগে অনেকেই দেখেন নি। পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ দিয়ে তার অপব্যাখ্যা এবং লেখকের মন্তব্য যেভাবে করা হয়েছে তা কতটা ও কি রকম ক্ষতিকারক সেটা পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করতে পারবেন কয়েকটা নমুনা পেশ করলেইঃ

"ইসলাম যেখানে ক্ষমতাশালী সেখানে অন্য ধর্ম-সংস্কৃতি বলে কিছু থাকেনা। এটা আবার মনুষ্য জাতির পথের দিশারী, শ্রেষ্ঠ পবিত্র ধর্ম? এই রকম শান্তি ধ্বংসকারী মানবকারী মানবতার বিভীষিকা ইসলাম কৃপা দেখিয়ে মুসলমান তৈরি করতে পারে কিন্তু একটা মানুষ তৈরি করতে পারে না।" (পৃ. ১১)

"তবে কোরআনের বর্ণনায় আল্লাই নিশ্চয়ই মনুষ্য সমাজ ধ্বংসকারী কোন দানব এবং মুহম্মদ তার একজন এজেন্ট মাত্র। আয়াতটি (সুরাহ্ তওবা) থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে মুসলমান মনুষ্যগুণচ্যুত একটি বর্বর জাতি এবং তাদের সঙ্গে অমুসলমানদের সহাবস্থান কখনই সম্ভব নয়" (পৃ.১২)। "আল্লাহ কি দস্যু?... আল্লাহ কি থানার দারোগা?... তবে কি আল্লাহ্ বিশ্ব পরিচালক কমিটির চেয়ারম্যান?" (পৃ. যথাক্রমে ১৩, ১৭, ২০)

"বর্তমান আয়াতে (সুরাহ্ আনফালঃ১) আল্লাহ্কে স্বৈরাচারী ডাকাত সর্দার এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে তাঁর সহকারী হিসেবে দেখান হয়েছে। আল্লাহ্র চেলারা যুদ্ধ করে অর্থাৎ ডাকাতি করে যা লুঠ করে আনবে সেগুলো আল্লা নামী সর্দারকে দিয়ে দিতে হবে এবং সর্দার তখন প্রসন্ন হয়ে সহকারী মুহম্মদকে কিছু ভাগ দেবে।... কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্কে তস্কর বা লুটেরা ছাড়া আর কি বলা যায়?... তাই কোরআন সম্মত মুসলমান যুদ্ধবাজ, অশান্তিপ্রিয় এবং সুস্থতার পরিপন্থী হবেই।" (পৃ,২৩, ২৫)

"দেড় হাজার বছর ধরে একটা মিথ্যে ধারণার বশবর্তী হয়ে চলেছে গোটা মুসলমান সমাজ। ...মহম্মদ প্রকৃত রসুল ছিলেন কি না তাঁর প্রতি আল্লাহর বাণী (কোরআন- লেখক) প্রেরিত হত কিনা এ বিষয়েও ঘোর সংশয় থেকে যাচ্ছে। ...কোরআন কি সত্যিই পরমেশ্বরের প্রত্যাদেশ, নাকি কোন অসাবধানী লেখকের রচনা?" (পৃ. যথাক্রমে ২৯, ৩৫, ৩৬)

বিখ্যাত হাদীস-গ্রন্থ বুখারী শরীফের (১ম খণ্ড, পৃ. ৫০) একটি হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এ পুস্তকে খেলা হয়েছে–"রসুলুল্লাহ এ রকম জ্ঞান যদি কয়েক কুইণ্টাল আমাদের দেশে রপ্তানী করতে পারতেন তাহলে এদেশের অবিশ্বাসী মূর্খেরা জ্ঞানের ইঞ্জেকসন নিয়ে আপনার (রসুলুল্লার–লেখক) মতেই ঈমানদার হয়ে উঠত। এত কষ্ট করে পয়সা খরচ করে আর লেখাপড়া শিখতে হত না।"

"তখনকার কোরআনের কথা আজও অভ্রান্ত হবে এটা কি করে হতে পারে? যে ধর্মকে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায় না সেটা স্থিতিশীল, অবৈজ্ঞানিক।" (পৃ. ৪৪)

সূরাহ 'আহযাবে'র ৩৮ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পারিপার্শ্বিক ঘটনা বা 'শানে নযূল'-কে বিকৃত করে মুসলমানদের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে বইটিতে বলা হয়েছে– "মহম্মদের 'যায়েদ' নামক এক পোষ্যপুত্র ছিল। যায়েদের স্ত্রীর নাম ছিল 'জয়নব'। জয়নবের সাথে মহম্মদের একটু 'অবৈধ' সম্পর্ক গড়ে ওঠার বিষয় জানতে পেরে যায়েদ জয়নবকে তালাক দেয়। তখন মহম্মদ তাঁর ধ্যানগুহা থেকে দুদিন ঘুরে ফতোয়া জারী করেন যে, পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ।" (পৃ, ৫৯)

"হজরত মহম্মদকে একজন মহাপুরুষ জ্ঞানে সবাই শ্রদ্ধা করে, কিন্তু মহামানবের মধ্যে যে কামিনী ত্যাগ ও ইন্দ্রিয় সংযমের কথা দেখতে পাই তা কি ইসলাম ধর্ম-প্রবর্তক মহম্মদের জীবনে দেখা গেছে?" (পৃ,৬১)

এ পুস্তকে মৃত্যুর পর বেহেশত বা স্বর্গ লাভের পরিপ্রেক্ষিতে জানি না কোন উদ্দেশ্য বলা হয়েছে–"যারা আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাও কোরআনের প্রত্যেকটি বাণীই মেনে চলে, অমুসলমানকে কোতল করে, অবশ্যই একগণ্ডা বিয়ে করে বরাহের (অর্থাৎ শূয়োরের–লেখক) ন্যায় সন্তান পয়দা করে–সেই বিশ্বাসী মুসলমানই একমাত্র 'বেহেশত' লাভ করবে।" (পৃ, ৬৩)

এ তো গেল লেখালেখির প্রসঙ্গ। এবারে ভারতেরই মাটিতে প্রকাশ্যে কি হচ্ছে, কেমনভাবে বিভিন্ন দলের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে এবং তাতে জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কতটা অক্ষুণ্ন থাকতে পারে তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

যাঁদের আমরা সাধু সন্যাসী বলে মনে করি, যাঁরা ঠাকুরের নামে কীর্তন করে ধন্য হচ্ছেন তাঁরা যদি স্বামী বিবেকানন্দকে সামনে রেখে–তাঁর মূর্তি, ছবি ও আদর্শের দোহাই দিয়ে মুসলমান বিরোধী কাজ শুরু করেন তাহলে তা নিশ্চয় খুবই বেদনাদায়ক চিন্তা।

আজ যেভাবে তরবারি, লাঠি, তীর-ধনুক ও চাকু-ছোরার ট্রেনিং চলছে তাকে যদি 'ব্যায়াম' বা 'শরীরচর্চা' বলে ধরে নেয়া যায়, তা যদি দেশের যুবশক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য হয় তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে–মুসলমানদের তাতে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়না কেন? এ দেখে মনে পড়ে যায় আগের সে 'অনুশীলন', 'যুগান্তর' ও সাম্প্রদায়িক দলগুলোর কথা। অবশ্য তখন তার প্রয়োজন ছিল যদি স্বীকার করা যায়, কারণ সে অস্ত্র প্রয়োগের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ এবং বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটান' কিন্তু বর্তমানে যে সব অস্ত্রশস্ত্রের ট্রেনিং দেয়া হয়েছে সে সব অস্ত্র কাদের ওপর প্রয়োগ হবে? 'টার্গেট' কারা তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

মহারাষ্ট্রের জনৈকা মহিলা মন্ত্রীর সহযোগিতায় পাওয়া 'অস্ত্রলাইসেন্স' নিয়ে যাঁরা আজ রক্তহোলি খেলতে ছুটেছেন তাঁদের কি ভাবা উচিত ছিলনা, যে, সংখ্যালঘু মুসলমান, শিখ প্রভৃতি জাতিকে যখন আঘাত হানা হবে অথবা নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চালান হবে তখন তারাও প্রতি-আঘাত করবে। দুপক্ষেই কমবেশি নিহত-আহত হবে। শেষে দেখা যাবে–মরেনি নেতারা, মরেছে নিরীহ হিন্দু-মুসলমান-শিখ প্রভৃতি ভারতীয় নর-নারী। (অস্ত্রলাইসেন্সের উপরোক্ত তথ্যের জন্য ভারতের দৈনিক পত্রিকা 'আজকাল'-এর ৭.১১.১৯৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

ধর্মের নামে মন্দির, গুরুদ্বার, মিশন ও মাদ্রাসা যদি মানুষ মারার তালিম দেয়, পূজা মহরম বা এ রকম কিছুকে (বা কোন শোভাযাত্রাকে) কেন্দ্র করে যদি সশস্ত্র হয়ে এগিয়ে যায় তাহলে ভারতের ইতিহাস পুনরায় কলঙ্কিত হতে পারে।

তাই এখানেও বক্তব্য হল, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দকে ভাঙ্গিয়ে যদি সাম্প্রদায়িক নেতারা লোক ঠকাতে চান তাহলে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িকতাকে যে ঘৃণা করতেন এবং হিন্দু, মুসলমান ও ভদ্রলোক কথিত 'ছোটলোক'কে নিয়ে মিলেমিশে যে থাকতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ পূর্বে দেয়া হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও অনেক তথ্যবহুল আলোচনা এ পুস্তকে পূর্বেই করা হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে অসাম্প্রদায়িক চিন্দাধারার মানুষ ছিলেন, তিনি যে মুসলমানদের ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন সে সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য পেশ করার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে উদ্ধৃত তাঁর নিজস্ব বক্তব্যগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তাঁর নীতির সাথে তাঁকে 'সামনে' করে বর্তমান সংগঠনগুলোর নীতির যে কত পার্থক্য তা অনুমান করতে কষ্ট হবেনা।

Goto List

(১) বিবেকানন্দ বলেছেন, "হিন্দু ধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবত্মার মহিমা প্রচার করেনা, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীবও পতিতদের গলায় পা দেয় জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করেনা।"

(২) বিবেকানন্দ আরও বলেন ঃ "জনসাধারণের সেবা, এটা আমাদের করতেই হবে।"–মুসলমানরা কি এ 'জনসাধারণে'র মধ্যে গণ্য নয়?

(৩) স্বামীজী বলেনঃ "মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে।"–আজকের দরিদ্র মুসলিম কি এর মধ্যে পড়েনা? স্বামীজী-ভক্তদের এ কথা মনে রাখা উচিত।

(৪) স্বামীজী আরো বলেন, "যে দেশে কোটী কোটী মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে (বেঁচে) থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মা এ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোন চেষ্টা করেনা, সে কি দেশ নয় নরক! সে ধর্ম না পৈশাচিক নৃত্য।"–সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ করে যে, ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় শোষিত হয়েছে দুদিক থেকে, একদিকে ইংরেজদের দ্বারা এবং অন্যদিকে জমিদার, রাজা, মহারাজা, এবং 'বাবু'-দের দ্বারা–স্বামীজীর এ কথা এখনো তলিয়ে দেখা দরকার।

(৫) বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া–আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি।" তাই বিবেকানন্দের অনুগামীদের প্রশ্ন–মুসলমান 'দুঃখী' ও 'দরিদ্রেরা' কি তাঁর ঐ বক্তব্যের আওতা থেকে বাদ যাবে? "ভারতবর্ষে দরিদ্রদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা (যে) অনেক বেশী"– এ কথা ডক্টর সত্য প্রসাদ সেনগুপ্তও স্বীকার করেছেন। (দ্রঃ মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ–'বিবেকানন্দ স্মৃতি,' পৃ. ৩৭)

(৬) একবার স্বামী বিবেকানন্দকে স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রশ্ন করেছিলেন যে তাঁর মহুলা ও সারগাছিতে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে মুসলমান ছেলেদের নেওয়া হবে কি না। উত্তরে স্বামীজী লিখেছিলেন: "মুসলমান ছেলেদেরও সাগ্রহে নেওয়া হবে, কিন্তু তাদের ধর্মের উপর যেন কোন কারণেই হস্তক্ষেপ না করা হয়। তাদেরও চরিত্রে, ত্যাগ-মাধুর্যে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে হবে।" তাহলে মুসলমান ছাত্ররা তাদের সমাজ, রোজা ও ধর্মবিশ্বাস নিয়েই মিশনে পড়বে–এটা কি স্বামীজীর মনের কথা ছিলনা?

(৭) বিবেকানন্দ বলেছেন–"ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে,"–মুসলমানদের ডোবাতে হবে, তাদেরকে খাওয়ানো চলবে না–কই এ কথা তো তিনি বলেন নি!

(৮) স্বামীজী বললেন ঃ সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে "পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মোছাতে, পুত্র বিয়োগ বিধুরার প্রাণে শান্তি দান করতে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে।"–এখানেও জিজ্ঞাস্য যে, বিবেকানন্দ যে সমস্ত কারণগুলো দেখিয়েছেন তার মধ্যে কি মুসলমানরা পড়েনা? যদি তারা এর বহির্ভূতই হয় তাহলে বিবেকানন্দ কেন প্রত্যেকটির পূর্বে হিন্দু শব্দ উল্লেখ করেনি?

(৯) লাহোরে স্বামীজী একটি সভ্য বা সমিতি স্থাপন করে ঘোষণা করেছিলেন ঃ "এ সভায় সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই।" তাহলে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত সংগঠন ও নেতাদের দ্বারা আজ কিভাবে মুসলমানরা সাম্প্রদায়িকতার শিকার হতে পারেন! তখনকার স্বামীজীভক্ত ও আজকের স্বামীজীভক্তের (একটা দল) মধ্যে কি বিরাট পার্থক্য লক্ষ্যণীয় নয়?

(১০) বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ "ফেলে দে তার শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দেয় তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস।"–ভারতের মুসলমানরা কি বিবেকানন্দ বর্ণিত 'দেশের লোক' নয়? নাকি বিবেকানন্দের সময় দেশে মুসলমান ছিলনা? বিবেকানন্দ যেখানে তাঁর অনুগামীদের দেশের লোককে অন্নসংস্থানের উপায় শিখিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়ে গেলেন, আজ সেখানে তা না করে যদি দেশের মুসলমানদের ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র হয়, তাহলে তা হবে অত্যন্ত দুঃখের।

(১১) স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেনঃ "আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজো হে বাপু! বেদ, কোরআন, পুঁথি-পা্ন্ড়া এখন কিছুদিন শান্তি লাভ করুক–প্রত্যক্ষ ভগবান দয়া প্রেমের পূজা দেশে হোক। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন (অর্থাৎ বাধা–লেখক) অভেদ বুদ্ধিই মুক্তি।" তা যদি হয় তাহলে মুসলমানদের সঙ্গে এত ভেদবুদ্ধি কেন?

(১২) ধর্ম কাকে বলে এ প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ অগ্রস্ত্যানন্দকে লিখেছিলেন: "নীতিপরায়ণ মনুষ্যত্বশালী ও পরহিতরত হওয়ার নামই ধর্ম।" যদি তাই হয় তাহলে বলতে হয়, এই 'পরিহিতে'র মধ্যে কি মুসলমানরা পড়েনা? নাকি তাদের উপকার করলে ধর্ম করা হয়না? আলোচ্য ১ হতে ১২ পর্যন্ত উদ্ধৃতিগুলো ডক্টর সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'বিবেকানন্দ স্মৃতি–মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ' পুস্তক হতে নেয়া।

বিবেকানন্দের এ সমস্ত উক্তির দিকে নজর রেখে বলা যায়–বর্তমানে আধুনিক কোন নকল স্বামীজী অথবা কোন বিবেকানন্দভক্ত তাঁর মতই নামের সাথে 'নন্দ' জুড়ে, অথবা তাঁর মতই গেরুয়া বস্ত্র আর মাথায় পাগড়ি বেঁধে যদি মুসলমানদেরকে ভারত থেকে বিতাড়ন অথবা তাঁদেরকে হত্যা অথবা ধর্মান্তরিত বা শুদ্ধিকরণের কথা বলেন তাহলে তিনি যে 'পরিষদে'রই নেতা বা যে 'সংঘের'ই মধ্যে কি মুসলমানরা পড়েনা? নাকি তাদের উপকার করলে ধর্ম করা হয়না? কর্তা হোন না কেন, তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দের সাথে, তাঁর আদর্শ ও নীতির সাথে মেলালে মিলবে কি না তার উত্তর সহজ ও সাধারণ। তাহলে কি স্বামীজীর কোন গোপন ইতিহাস আছে, যাতে উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর বিপরীত কথা লেখা আছে? বর্তমানের নকল 'স্বামীজী'রা কি সে গোপন আদেশ ও আদর্শকেই মেনে চলেছেন?

মুসলমানদের গোমাংস খাওয়া নিয়ে বর্তমান সাম্প্রদায়িক নেতাদের বিরাট প্রচার, খেলাখেলিও ভাষণ চলছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে–এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দেরও কি এ রকম কোন বিশেষ ভূমিকা বা দুর্বলতা ছিল? আমাদের মতে–স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে এবং রাজনীতি করার বিষয়ে তাঁর যে ভুমিকাই থাক না তাঁর কাজে ও কথায় তিনি মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন–একথা মোটেই প্রমাণ হয়না। তাছাড়া তাঁর মত আমেরিকা-ঘোরা বিশ্ববিখ্যাত নেতার পক্ষে গোমাংস নিয়ে সঙ্কীর্ণ ধারণা রাখা মোটেই সম্ভব ছিলনা। এ প্রসঙ্গে একটি মূল্যমান উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ "একদিন স্বামীজীর কাছে গোরক্ষিণী সভ্য'র জনৈক প্রচারক উপস্থিত হলেন। প্রচারক স্বামীজীকে প্রণাম করে তাঁকে গোমাতার একটি ছবি উপহার দিলেন। স্বামীজী তাঁদের

'সভা'র উদ্দেশ্য কি এ প্রশ্ন করায় প্রচারক বললেন–'নিষ্ঠুর কসাইয়া ভারতবর্ষের গোমাতাদের হত্যা করছে তাই আমাদের সমিতি বিভিন্ন স্থানে পিঁজরা পোল প্রতিষ্ঠা করে কসাইদের হাত থেকে গোমাতাদের কিনে আশ্রয় দিচ্ছে।' এ সময়ে মধ্যভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, সরকারি তালিকা মতে এ দুর্ভিক্ষে প্রায় ৯ লক্ষ লোক মারা গেছে। তাই স্বামীজী প্রচারককে প্রশ্ন করলেন–'আপনাদের তহবিল থেকে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করার ব্যবস্থা হয়েছে কি?' প্রচারক বললেন যে তাঁরা মানুষের সাহায্য করেন না। গোমাতাদের সাহায্য করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য।...প্রচারক (আরও) বললেন, 'মানুষ তার কর্মফলে মারা যায় এবং দুভিক্ষও মানুষের কর্মফল।' স্বামীজীর কণ্ঠে আগ্নেয়গিরির উত্তাপ, তিনি বললেন–'পশু পাখীদের বাঁচাবার জন্য আপনারা অজস্র অর্থব্যয় করেছেন, কিন্তু মানুষের ক্ষুধা নিবাণের জন্য আপনাদের প্রাণ এতটুকু কাঁদেনা! আপনি বলছেন, 'মানুষ কর্মফলের জন্য মরেছে, তাই যদি হয় তবে আপনার গোমাতারাও তো কর্মফলের জন্য কসাইয়ের হাতে মারা যাচ্ছে।' প্রচারক একটু লজ্জিত হলেন কিন্তু বললেন–'কিন্তু শাস্ত্রে যে বলে গরু আমাদের মা'; স্বামীজী হাসতে হাসতে বললেন–'গরু যে মা তা ভালই বুঝতে পাচ্ছি। নইলে এত কৃতী সন্তান আর কেন হবে?" (ডক্টর সত্যপ্রকাশ সেনগুপ্তঃ 'বিবেকানন্দ স্মৃতি'–মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ, পৃ, ৬৮-৬৯)

এরপরেও প্রচারক বিবেকানন্দের কাছে অর্থ সাহায্য চাইলে তিনি বললেনঃ "আমার পয়সা কোথায়? তবে আমার হাতে যদি কখনও পয়সা আসে তবে আগে তা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করব।" আমাদের বক্তব্য হল, প্রচারককে অতি সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করার ক্ষমতাও কি বিবেকানন্দের ছিলনা? নিশ্চই ছিল; তবুও কেন যে তিনি তা করেন নি তার ব্যাখ্যা অপ্রয়োজন।

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ লিখেছেনঃ "বিবেকানন্দের মানবপ্রেম এত সর্বব্যাপক ও সক্রিয় ছিল যে, মুসলমানদের হাত থেকে 'মুসলমানী রুচি' অনুযায়ী প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণে তাঁর দ্বিধা ছিলনা। এরকম দু'টি ঘটনার উল্লেখ করেছেন ভগিনী নিবেদিতা তাঁর Master Isaw Him গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায়। ...এ সর্বাত্মক সহানুভূতির ফলে পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী মুসলমানদের নিকটও যে কত সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছিলেন তার সীমা নেই। কাশ্মীর ভ্রমণের সময় একজন বর্ষীয়সী দরিদ্র মুসলমান রমণী তাঁকে যে ভাবে সযত্নে আপ্যায়িত করেন–সে বৃত্তান্ত তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যদের কাছে বারে বারে উল্লেখ করেও ক্লান্তি বোধ করতেন না স্বামীজী।...ধর্মান্ধ হিন্দুরাই মুসলমানদের বিজাতীয় বলে ভাবতে শিখিয়েছে। তাদের এ দৃষ্টি বিভ্রমই সরলচিত্ত মুসলমানকে হিন্দুর সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধার সৃষ্টি করেছে (যেমন রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন ঃ '...মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি।')...আমেরিকা যাত্রার পূর্বে ভারত ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে হায়দ্রাবাদের নবাব স্বামীজীকে নিজের প্রসাদে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করে শুধু যে উচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন করেন তা নয়, পাশ্চাত্য দেশে স্বামীজীর সমন্বয়ী বেদান্ত ধর্মের আদর্শ প্রচারকে সফল করার জন্য অর্থ সাহায্য করতেও প্রস্তুত হন।...দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড যাত্রার সময় জাহাজ যখন জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করছিল আত্মমগ্ন স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে তীরভূমির দিকে নির্দেশ করে ভাবাবেগ কণ্ঠে বলেছিলেনঃ 'তুমি কি তাহাদিগকে

দেখ নাই? (পুনরায়) তুমি কি তাহাগিদকে দেখ নাই? তীরে অবতরণ করিয়া তাহারা (মুসলমানরা) দ্বীন দ্বীন (ধর্ম ধর্ম) ধ্বনিতে দিক মুখরিত করিতেছে।' একথা বলে স্বামীজী অর্ধঘণ্টা কাল যাবত নিবেদিতার নিকট 'ইসলাম পতাকাবাহী আরব বীরগণের স্পেন বিজয় কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন' (দ্রষ্টব্য সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ঃ বিবেকানন্দ চরিত্র, পৃ, ২৯৫)।"

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ আরও বলেছেন–"তিনি মনে করতেন, ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকার এক হিসেবে ভগবানের আশীর্বাদের মত।...নির্যাতিত হিন্দুর জীবনে মুসলমান-বিজয় এনে দিয়েছিল মুক্তির স্বাদ। এ কারণে মুসলমান শাসনধীনে এক-পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হয়ে গিয়েছিল (দ্রষ্টব্য ঃ The Future of India সম্পর্কে স্বামীজীর ভাষণ)। ...আমাদের নেতাদের দুরদর্শিতা ও সমদর্শিতার অভাবে বিবেকানন্দ পরিকল্পিত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহের (Islamic Body and Vedantic Brain) মিলন সম্ভব হয়নি। এ মিলন সম্ভব হলে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের ধারা যে ভিন্ন পথে প্রবাহিত হত–এ অনুমান অহেতুক নয়।" (দ্রষ্টব্য ঃ 'বিবেকানন্দ ও মুসলমান সমাজ' (প্রবন্ধ) নবজাতক পত্রিকা– সম্পাদিকা মৈত্রেয়ী দেবী, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭১, পৃ. ১৮-২৩)

আজ বড় বেদনার কথা–বিবেকানন্দের সামনে করে যেভাবে শুধু মুসলমান বিবর্জিত হিন্দু সংগঠন হচ্ছে বা কাজ চলছে তাতে মনে হবে বিবেকানন্দ বুঝি মুসলমানদের এক নম্বরের শত্রু ছিলেন। মহান বিবেকানন্দের এ মিথ্যা দুর্নাম নিশ্চিহ্ন করার জন্যই এ তথ্য পরিবেশন। তিনি মুসলমানদের সাথে সহজ ও সাধারণভাবে মেলামেশা করতেন, পরামর্শ নিতেন, পরামর্শ দিতেন এবং পত্রালাপ করতেন–যদিও এসব চাপা পড়া তথ্য তবুও তার মধ্যে থেকে একটি মাত্র পত্র এখানে তুলে ধরছি।

বিবেকানন্দ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন আলমোড়া থেকে নৈনিতালের সরফরাজ হোসেনকে যে পত্রটি লিখেছেন তার অনুবাদ ঃ

আলমোড়া ১০ই
জুন, ১৮৯৮ ইং

"প্রীতিভাজনেষু"

আপনার পত্রের মর্ম বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম এবং ইহা জানিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি যে, ভগবান সকলের অগোচরে আমাদের মাতৃভূমির জন্য অপূর্ব আয়োজন করিতেছেন।

ইহাকে আমরা বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ (একত্ববাদ) ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা, কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম এবং সম্প্রাদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, উহাই ভাবী শিক্ষিত মানব সমাজের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রীঘ্র শ্রীঘ্র এ তত্ত্বে পৌছানোর কৃতিত্বটুকু পাইতে পারে, কারণ তারা হিব্রু কিংবা আরব জাতিগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর; কিন্তু কর্ম পরিণত (Practica) বেদান্ত-যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলে দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করে থাকে-তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টি লাভ করে নাই।

পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এটা যে, কখনও যদি কোন ধর্মের লোক দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এ সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে তবে একমাত্র ইসলাম ধর্মের লোকেরাই আসিয়াছে।

এজন্য আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত (practical) ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই-'যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই তা করতে হবে। মানবকে শিখাতে হবেই যে, সকল ধর্ম, 'এক ধর্মে'রই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং যার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সে বেছে লইতে পারে।

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এ মহান মতের সমন্বয়ই-বৈদান্তিক মস্তিক এবং ইসলামীয় দেহ-একমাত্র আশা।

আমি মানসচক্ষে দেখতেছি, এ বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যত পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক-মস্তিক এবং ইসলামীর দেহ লয়ে মহা-মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠতেছে।

ভগবান আপনাকে মানব জাতির, বিশেষ করে আমাদের অতি হতভাগ্য জন্মভূমির সাহায্যের জন্যে একটি মহান যন্ত্ররূপে (Instrument) গঠিত করুন-এটাই সতত প্রার্থনা।

ইতি—
স্নেহবদ্ধ বিবেকানন্দ

দুঃখের বিষয়, মূল ইংরাজি চিঠির সাথে বাংলা অনুবাদ মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, অনুবাদক মশাই কিছুটা অংশ নিজের বুদ্ধিতে যোগ করেছিলেন। এ পত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষে যে মারাত্মক অসত্য কথাটি অনুবাদক যোগ করেছিলেন তা হচ্ছে এ–"এরূপ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং এর ভিত্তিস্বরূপ যে সকল তত্ত্ব বিদ্যমান সে সম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা পরিষ্কার এবং ইসলামপন্থীগণ সাধারণতঃ সচেতন নয়।" মূল ইতিহাসে বা মূল দলিলে এভাবে ভেজাল দেবার রীতি জাতির পক্ষে যে কত ক্ষতিকারক তা বলাই বাহুল্য। এ নিয়ে আলোচনাও করা হয়েছে। এ মারাত্মক রীতি ইংরেজরা সৃষ্টি করেছিল এবং তারাই ব্যাপক হারে সত্য ঘটনাকে বিকৃত করে ইতিহাসকে করেছিল কলঙ্কিত। কিন্তু স্বাধীনোত্তর চার দশক পরেও কি ভারতের সে একই ঘটনার পুরাবৃত্তি হতে থাকবে? ইতিহাসকে কলুষিত করতে আমাদের কলম কি একটুও কাঁপবে না?

সাম্প্রদায়িকতার শিকার হওয়া থেকে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী বাঘা বাঘা নবীণ ও প্রবীণের দলও আজ রক্ষা পাননি। তাঁদের মাথায় এ কথা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে এবং হচেছ যে–মুসলমানরা কোন মতেই দেশীয় বা ভারতীয় নয়; তারা বিদেশী। অথচ মুসলমান জাতি যে বিদেশী নয়–এ কথা প্রায় সমস্ত ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় মনীষী স্বীকার করেছেন; আমরা এ পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে প্রসঙ্গ অনুযায়ী তথ্যসহ তা প্রমাণ করেছি। পরলাকগত শ্রী মতী ইন্দিরা গান্ধীও এ প্রসঙ্গে অভিমত পোষণ করে বলেছিলেন–"ভারত হিন্দুদের মত মুসলমানদেরও জন্মভূমি এবং মুসলিম শাসনের বহু বৎসর পূর্ব থেকেই মুসলমানরা ভারতে বসবাস করে আসছে।"

এখন তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেয়া হয়–বিদেশ থেকে এলেই 'বিদেশী' হয়, তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে–আর্যরা কি বিদেশী নন? তারা যে বহির্ভারত থেকে আগত তার

হতে আবির্ভূত হবার কথা ঘোষণা করেছেন বলে কি ভারতীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের স্বদেশী না বলে বিদেশী বলতে হবে? কয়েক বছর আগে ভারত-পাকিস্তান বিবাদ-বিসম্বাদে যে সব পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসেছেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাঁদেরকে কি 'বিদেশী' বলে তাড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করতে হবে? আমাদের মতে, এ উদ্বাস্তুরা অবশ্যই ভারতীয়; যেহেতু বর্তমানে তাঁরা ভারতকেই মাতৃভূমি বা নিজের দেশ মনে করেন। অবশ্য কোন উদ্বাস্তু যদি তা মনে না করে ভারতকে শুধুই অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্র মনে করে সঞ্চিত অর্থ ও সম্পদ বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে জমা করে সেটাকেই বাসভূমি বলে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দরতর করতে চান তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি 'বিদেশী'।

যেমন মুসলমান নাদির শাহ। তাঁকে 'বিদেশী' বলে যে অভিহিত করা যায় সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তেমনি ইংরেজরাও যে বিদেশী তাতে সন্দেহ নেই, যেহেতু তাঁরা এ দেশকে নিজের দেশ বলে মনে করেননি। তাই বলে বাবর, হুমায়ুন, আকবর, আওরঙ্গজেব, বাহাদুর শাহ, মুর্শিদকুলি খাঁ ও সিরাজুদ্দৌলাকে এবং বর্তমান ভারতীয় মুসলমানদেরকে যদি 'বিদেশী' বলে উল্লেখ করা হয় তাহলে তা হবে ইতিহাস না জানার নামান্তর মাত্র। ঠিক এমনিভাবে বর্তমান ভারতের খৃস্টান ও মুসলমান জাতি–যাঁদের ভারত ছাড়া আর কোন 'স্বদেশ' নেই, যাঁদের জন্ম-মৃত্যু আয়-ব্যয় সব ভারতকে কেন্দ্র করেই, তাঁদেরকে 'বিদেশী' বলা অর্থ নিঃসন্দেহে সত্য, সততা ও ন্যায় নীতিকে নিহত করারই সামিল।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ–এ দুই মুসলমান দেশ সেখানকার সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় বা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যদি 'বিশ্ব মুসলিম পরিষদ' অথবা 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সমিতি' (R.S.S.) বা 'আমরা মুসলমান' সংগঠন তৈরি করেএবং সেখানকার হিন্দুদের হত্যা, বিতাড়ন অথবা

ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের নামে ব্যায়ামাগার করে এবং তাতে যদি হিন্দুদের প্রবেশাধিকার না থাকে তাহলে যে কোন দেশের যে কোন মানুষ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের এ উৎকট সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে যেমন ধিক্কার দেবেন তেমনই ধিক্কার দিতে দ্বিধা করবেন না সে দেশের প্রশাসন ও প্রশাসকবৃন্দকে। ঠিক অনুরূপভাবে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতে যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা 'বিশ্বমানস'কে কি দাবিয়ে রাখতে পারব?

এখানে পূর্বের সে কথায় ফিরে এসে বলা যায়–আজও যদি আমরা সাবধান না হই তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের মহান ভাবমূর্তি কুয়াশাচ্ছন্নই থেকে যাবে, আর মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে–এ সাম্প্রদায়িক, মুসলিম ও সংখ্যা লঘু-বিদ্বেষী নায়করা যে বিবেকানন্দের অনুসারী ও অনুগামী বলে দাবী করছেন তিনি কোন্ বিবেকানন্দ? তিনি সে মহান অসাম্প্রদায়িক বিবেকানন্দ, নাকি সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট অন্য কোন বিবেকানন্দ?

পরিশেষে বলি–মুসলমান জাতি যদি হযরত মুহম্মাদ (সাঃ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণে চলতে থাকেন, হিন্দু ভাই-বোন যদি স্বামী বিবেকানন্দের (বা কোনআদর্শ পুরুষের) আদর্শই গ্রহণ করেন, ভারতীয় বা স্বদেশীয় খৃস্টান বন্ধুরা যদি যীশু খৃস্টের মহান আদর্শকে অনুসরণ করেন, শিখ ভাই-বোনেরা যদি গুরু নানকের প্রকৃত আদর্শকে সাথে করে এগিয়ে যান এবং যে কোন দল বা সম্প্রদায় যদি তাঁদের আদর্শ নেতার আদর্শকে সামনে রেখে চলতে থাকেন তাহলেই বিবাদহনি সুষ্ঠু সমাজ গড়ে উঠবে, হাতে হাত মিলিয়ে জনকল্যাণকর কাজ করতে থাকবে, না কোন বাধা. সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নবাদিতা, প্রাদেশিকতা এবং সমস্ত রকমের সঙ্কীর্ণতা নির্মূল হয়ে গড়ে উঠবে সৌভাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন।

সমাপ্ত

পাঠক/পাঠিকাদের প্রতি

আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ পেলে আমরা বিশেষভাবে বাধিত হব। এ গ্রন্থ সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ও সাদরে গৃহীত হবে। তবে মতামত ও পরামর্শ সংক্ষিপ্ত হওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।